বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

সপ্তম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
6th Volume
Edited by
Dr. Bijit Ghosh

Price Rs. 100/-

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81-7332-379-8

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা'

শ্রদ্ধেয় অরিন্দম-দা ও চিত্ত-দা-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ সপ্তম খণ্ড

সপ্তম খণ্ড শুরু করেছি এ-কালের বিতর্কিত লেখক সুবিমল মিশ্রের গল্প দিয়ে। নির্বাচিত গল্পটি ছাড়াও তাঁর 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া অথবা সোনার গান্ধীমূর্তি', 'পার্কস্ট্রীটে ট্রাফিক পোস্টে হলুদ রঙ' গল্পগুলি সুপরিচিত।

সুব্রত সেনগুপ্তের 'গোপন দূত', 'জামা', 'টম্যাটো', 'হাতি', 'গোপালের টালবাসা', 'পুরনের সঙ্গে', 'এক্কা দোক্কা', 'পাউরুটি' সমসময়ের উল্লেখযোগ্য গল্প।

শৈবাল মিত্রের অসামান্য বেশ কিছু গল্পের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। যেমন, 'আতর আলির রাজসজ্জা', 'সংগ্রামপুর যাত্রা', 'শবসাধনা', 'ধর্মের কল', 'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল', 'মান্য মাইতির আইন অমান্য', 'কম্‌লি তুই ঘরে যা', 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি রিপোর্ট', 'স্বপ্নলব্ধ সত্য' ইত্যাদি।

কল্যাণ মজুমদারের 'কোঁচ', 'স্বপ্ন বিপণি'; সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মা', 'মুক্তিপণ', 'রক্তিম বসন্ত', 'জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট', 'পাতক', 'ভেজা তবলার বোল'; মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা', 'সুন্দরের সাধনা'; অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প'; উদয় ভাদুড়ীর 'চলো হস্তীকান্দা', 'দ্বৈরথ'; প্রবীর ঘোষের 'সম্বন্ধ', 'কব্জা', 'অনাটকীয়', 'ছয় মিনিটের গল্পমালা', 'চোর' গল্পগুলির কথা উল্লেখের দাবী রাখে।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী', 'ব্রাহ্মণ্য', 'মেরুবিন্যাস', 'মৌরসীপাট্টা'; পীযূষ ভট্টাচার্যের 'কুশপুত্তলিকা'; ভগীরথ মিশ্রের 'জাইগেনসিয়া', 'বিশ্বরূপে রাখাল', 'লাবণের বয়স', 'বাঘের ডাক', 'হুলমারার ভোমরা মাঝি', 'কার্তিকের কড়চা', 'মায়ের জন্য', 'ঝোর-বন্দী' অবিস্মরণীয় সব গল্প।

মনে পড়ছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইঁদুর', 'রাজকুমারীর অসুখ', 'প্রধানমন্ত্রীর সফর', 'হরিণের মাংস', 'ওরা তিনজন', 'মুখ্যমন্ত্রীর উপহার'; সিদ্ধার্থ ঘোষের 'বার্তা', 'জনক', 'রিপোর্টাজ'; শংকর বসুর 'মহড়া'; শংকর দাশগুপ্তের 'অন্ধসুখ', 'আত্মপক্ষের একদিন'; ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রগন্ডি', 'নোনা হাড়' প্রভৃতি গল্পগুলির কথাও।

এছাড়া মনোজ দাসের 'হুতোম', 'পান্তি', 'বিপ্লব ও কমরেড হরিচরণ'; জয়ন্ত জোয়ারদারের 'একজন সি. আর. পি ও একটি নকশাল ভূত' প্রভৃতি গল্পগুলি আমার কাছে যথেষ্ট উচ্চমানের বলে মনে হয়েছে।

এই খণ্ডটি শেষ করেছি মহাশ্বেতা দেবীর পুত্র হিসেবে নয়; স্বনামখ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্প দিয়ে। এই খণ্ডে গল্পের সংখ্যা ৩৯। সময়সীমা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা।** সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব ঃ** তার **জন্ম ও উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর **দীর্ঘ** আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি
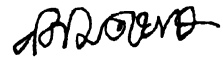
সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট অন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন'**, **'জরুরী অবস্থা'**, বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল'**, **'শ্রুতি'**, 'হাংরি জেনারেশন', **'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,'** **'এই দশক'**, **'নিম সাহিত্য-আন্দোলন'**, **'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

শেয়ালদা স্টেশন ও কপালকুণ্ডলা

সুবিমল মিশ্র

এগারটা দশের লোকাল তারা ধরবে। কিন্তু ধরতে পারলনা, কয়েক সেকেন্ডের জন্য গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। তখন তারা কি করবে।

গুরুদয়াল বলবে বেশ হয়েছে আমড়া গাছে আম ফলেছে

নবকুমার মুখ শুকনো করে বলবে এখন উপায়

তৃতীয়জন ভজগোবিন্দ বলবে চল দুটো অন্ধ মেয়ে খুঁজে আনি আর তাদের রাস্তা পার করে দিই

এখন অন্ধ মেয়েদের কি গরজ পড়েছে রাস্তা পেরোতে যাবার। তারা রাস্তা না পেরোলেও পারে।

অর্থাৎ কিছুই করার থাকবে না। গুরুদয়াল নিজেকে বক দেখাবে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঃ শেয়ালদা স্টেশানে আজ রাত্তির কাটাব। বলে, এক চক্কর ঘুরে নিয়ে নবকুমারের থুতনি ধরে ঃ মানিনী মান কৈরো না। নবকুমার যদি রেগে গিয়ে থাকে বলবে ঃ ধ্যুৎ, সবসময় ইয়ার্কি ভাল্লাগেনা

সবসময় কি ভাল্লাগে চাঁদ

আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা

কার কপালে টিপ দেবে

খোকার, থুড়ি নবকুমারের কপালে

কারণ

নবকুমার যে সেই কাষ্ঠাহরণে গিয়াছিল আর ফিরে নাই। কপালকুণ্ডলার যাত্রীরা তাহার ফিরিবার আশায় বসিয়া আছে।

নবকুমার কি আর ফিরিবে

না নবকুমার আর ফিরিবে না তাহাকে বাঘে খাইয়াছে

সত্যি যদি নবুকে বাঘে খেতো তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কি করে উপন্যাস লিখতো

লিখতো না

সব্বোনাশ হতো তা হলে....বিশ্বাস কর মাইরি আমি মেয়েটাকে নদী থেকে উঠে আসতে দেখেছি...ঠিক তেমনি চুল...নাক....মুখ...

সত্যি মেয়েটার জন্য বুকের কাছটায় বড্ড বেশী ক্যামন ক্যামন করে...

কেউ বুঝলনা... না নবকুমার... না কাপালিক না...

জানিস সেই দুঃখে আজও মেয়েটা কাঁদে

মাঝ-সন্ধ্যেয় দেখিস শেয়ালদা স্টেশানের বস্তি থেকে বেরিয়ে অভিমানিনী কপালকুণ্ডলা রেল-লাইনের অন্ধকারে আত্মহত্যা করতে যায়

আমিও শুনেছি

কি

কপালকুণ্ডলাকে কাঁদতে....ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে...সীমান্তের ওপার থেকে

আমিও দেখেছি

কি

ভিখিরী হয়ে যেতে...জানিস কপালকুণ্ডলা এখনো তোবড়ানো টিনের বাটি হাতে ফুটপাতে ভিক্ষে করে বেড়ায়...হ্যাঁরে এই দেশে...আমাদের এই কলকাতায়...হ্যাঁরে

তোরা গাঁজা খেয়েছিস নবকুমার বলবে

নবুর বিশ্বাস হচ্ছে না ওকে সরেজমিনে দেখাতে হবে এখন রাত কটা

এগারোটা বেজে কুড়ি

আছে চল দেখাই

কে

কপালকুণ্ডলা

কোথায়

নবকুমারকে টানতে টানতে স্টেশন এলাকার বাইরে আনবে। নিওন আলোর নিচে নিজের নিজের ছায়া মাড়িয়ে দাঁড়াবে।

তিনবার ডিগবাজী খা

কেন

নিয়ম

তারা তিনজন তিনবার করে একুনে ন'বার নিওন আলোর তলায় ডিগবাজী খাবে।

কান ধর দু'হাতে

যাহা দেখিব সত্য দেখিব সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা দেখিব না

তারা বলবে এবং তাদের মধ্যে যে কেউ একজন, গুরুদয়াল বা ভজগোবিন্দ, আঙুল দেখাবে। নবকুমার দেখবে একটা মেয়ে দূরে বাসস্টপের কাছে লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সেই কপালকুণ্ডলা

নিকটস্থ হলে তার শাড়ির মেরুন রঙ সে শাড়ি বহুব্যবহারে অতীব শীর্ণ, গালে চোয়ালের হাড় ও খড়ির গুঁড়ো, ঠোঁটের রক্ত ইত্যাকার স্পষ্ট হবে।

তোমার নাম কপালকুণ্ডলা

মেয়েটি তার রক্তাক্ত ঠোঁটে হাসবে।

নামে কি আইসে যায়

তুমি এখানে কেন কপালকুণ্ডলা

আপনাগো আনন্দ দ্যাওনের লেইগ্যা রাজাবাবু

কপালকুণ্ডলা তোমার মনে কি অনেক অভিমান

অভিমান...নাঃ

দুঃখ

নাঃ

তবে তোমার মনে কি কপালকুণ্ডলা

মনে...হি হি হি মন নিয়া কি হইবো বাবু শাড়ি বেলাউজ খুইল্যা দিমু...

কপালকুণ্ডলা তোমার দুঃখ হয় না

দুঃখু কারে কয় গো হি হি হি দুঃখু-কষ্ট আমাগো থাকতে নাই...তা রাজাবাবুগো টাকা আছে না বিনা পয়সায় স্ফূর্তির ধান্দা

এই কথায় নবকুমারের বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠবে, বলবে, হাঁ স্ফূর্তি করব পয়সা আছে

কিন্তু কি করে স্ফূর্তি করা যায়

কেন রেললাইন আছে চলন্ত ট্রেন আছে চমৎকার স্ফূর্তি করা যাবে...সবাই মিলে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ খেলেই হল

ছটাকী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠবে। পাশের ঝোপড়ি থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ সে শুনতে পাবে ঃ যা করবার তাড়াতাড়ি কইর‍্যা নাও বাপু আমার পোলা কান্দতিছে

কপালকুণ্ডলার পোলা

কেন বেশ্যা বলে কি ছেলেপুলে থাকবে না নাকি

কপালকুণ্ডলা তোমার নবকুমারটি কোথায়

গলায় কলসী বাইন্ধ্যা গঙ্গায় ডুইব্যা গ্যাছে।

বেশ করেছে চল আমরা রেললাইনের অন্ধকারে গিয়ে স্ফূর্তি করি

তারা আলো পেরোবে অন্ধকার পেরোবে। আবার অন্ধকার পেরোবে আলো পেরোবে। এমনি করে একসময় না-আলো না-অন্ধকার রেললাইন পেয়ে যাবে।

তারা চারজন

গুরুদয়াল বলবে দ্যাখ আমরা আজ আমাদের লাস্ট ট্রেন ফেল করেছি

ভজগোবিন্দ বলবে কানা ভিখিরী পাইনি কিন্তু কপালকুণ্ডলা পেয়ে গেলাম

নবকুমার বলবে শালা যা থাকে কপালে এসেছি যখন স্ফূর্তি করে যাব

ছটাকী খদ্দেরদের মন রাখার জন্য বলবে ক্যামন চমৎকার জায়গা না...প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে এইনে আইতে হয় আমারে...এই

র‍্যাললাইনে

কপালকুণ্ডলা আমার ডিগবাজী খেতে ইচ্ছে করছে

কপালকুণ্ডলা আমার জোরে জোরে কিছু একটা চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে

কপালকুণ্ডলা এসো তুমি আর আমি দুজনে মিলে একটা খেউড় গাই

যা করবার শিগগির কইর‍্যা লাও আমার পোলা কান্দ্যাছে

কপালকুণ্ডলা ট্রেন লাইনের ওপর অনেক রক্ত শুকিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি

হইব না...প্রতি সন্ধ্যায় আইস্যা আত্মহত্যা কইর‍্যা যাই যে...আমাগো সব রক্ত শুকাইয়া লোহার উপর জং পইড়্যা গেছে

নির্জন রেললাইনগুলোতে আজকাল কারা যেন এসে চুপিচুপি আত্মহত্যা করে যায়

সেই রক্তের গন্ধ

বসতিতে ভেসে এলে

মানুষ ক্লান্ত ও

বিষণ্ণ হয়

কপালকুণ্ডলা তোমার ছেলে কাঁদছে তুমি আত্মহত্যা করবে না

এসো আমরা সবাই মিলে স্ফূর্তি করি

ইঞ্জিন ছুটে আসছে একচক্ষু দৈত্যের মত

কে আগে ঝাঁপ খাবে

আগেপিছে নয় ঝাঁপ খেতে হবে একসংগে পিষে যেতে হবে একই চাকার তলায়

তা হলে এসো আমরা একসংগে স্ফূর্তি করি এই রাত স্মরণীয় হয়ে থাকুক কপালকুণ্ডলা তুমি কিন্তু বললে না তোমার কিসের অভিমান পাশের ঝোপড়িতে তোমার ছেলে কাঁদছে আমরা শিগগির করে বসে নিচ্ছি কপালকুণ্ডলা...

সেই সময় ইঞ্জিনের তীব্র আলো, প্রাচীন বৃক্ষের মত ঋষিকল্প সেই আলো তাহাদের শরীরে আসিয়া পড়িবে। তাহারা সেই আলোর চত্বরে দাঁড়াইয়া আকাঙ্খিত স্ফূর্তির জন্য, পরস্পর রক্তসান্নিধ্যের জন্য অপেক্ষা করিবে।

সুলেমানের বিচার

সুব্রত সেনগুপ্ত

সুলেমান আগে গলফ ক্লাবে কাজ করতো। কাজ ছিল খেলার সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়া, বয়ে নিয়ে আসা। বল কুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ঘন ঘন কামাই করে সে চাকরিটা খুইয়েছে। এদিকে তার বাড়িতে বিবি-বাচ্চা নিয়ে খাওয়ার লোক ছ'জন।

সুলেমানের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। দেখতে বেঁটে, রোগা আর গায়ের রঙ তামাটে। মাথাভরা খুসকি আর বড় বড় লাল চুল। সে ছেলেবেলা থেকে শেরশায়রীর ভক্ত। লিখতে পারে। খন্দকারের দোকানে গিয়ে রোজ উর্দু আখওয়ার 'আজাদ' পড়ে। দু-চারটে ইংরেজি শব্দও জানে। বাংলায় কথা বলতে তার কেমন ইজ্জতে লাগে। কারণ তার ধারণা, তার পূর্বপুরুষরা ঘোড়ায় চেপে ভারত জয় করতে এসেছিল। খোঁজাখুজি করলে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা জাফরের সঙ্গেও হয়তো তার রিস্তেনাতে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষায় সে কথা বলতে পারে না। তাই বাংলার মাঝখানে সে উর্দু, হিন্দি শব্দ ঢুকিয়ে দেয়। উর্দু শের আবৃত্তি করে। প্রিন্স রহিমুদ্দিন লেনের লোকেরা তাকে ঠাট্টা করে বলে, দিওয়ানা। সুলেমান গায়ে মাখে না। আপন মনে আওড়ায়; নহ্ ওহ্ শাহ্ হ্যায় দয়ার হ্যায়। নহ্ ওহ্ তাজ হ্যায় নহ্ ওহ্ তখ্ হ্যায়। সেই সম্রাট নেই সেই নগর নেই। সেই মুকুট নেই সেই সিংহাসন নেই।

কয়েক মাস হলো সুলেমান নতুন একটা কাজ পেয়েছে। যে কাজ তার মোটেই পছন্দ নয়। এক কাবলীওয়ালার কাছে সে চাকরি পেয়েছে। তার কাজটা কি বলছি। তার কাজ সুদের টাকা আদায় করা। যেসব ভদ্রলোক বিপদে পড়ে রেস খেলে বা মদ খেয়ে ফতুর হয়ে বাধ্য হয়ে কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করেন, তাঁদের কারও পছন্দ নয়, সুদের টাকা বা কিস্তির টাকা আদায় করতে কাবলীওয়ালা গিয়ে তাঁদের বাড়িতে বা অফিসে হাজির হয়। সবাই অফিসের সহকর্মী, প্রতিবেশী অনেকে এমনকি নিজের বাড়ির লোকের কাছেও কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করার কথা গোপন রাখতে চায়। সেজন্য দরকার নিরীহ চেহারার একজন লোক। যার চোখ-মুখ বা পোষাক দেখে কোনোরকম সন্দেহ হবে না। সুলেমান সেই লোক। সে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট জায়গায় যায় সুদ আদায় করতে, কিস্তির টাকা আদায় করতে। এই কাজটা শুধু ঝামেলার নয়, সুলেমান জানে, যাঁদের কাছে সে যায় তাঁরা তাকে পছন্দ করে না। বিরক্ত হয় নফরৎ করে। অনেকেই কথা রাখে না। বার বার ঘোরায়! অনেক সময় যত টাকা দেওয়ার কথা তার চাইতে কম টাকা দিতে চায়। কেউ কেউ মেজাজ দেখায়। দু-একজন বেপাত্তা হয়ে যায়। এদিকে দশ-পনেরো দিন হলো এক নতুন কাবলীওয়ালা এসেছে সে খুব কড়া মেজাজের লোক। নতুন মালিক সুলেমানকেও বোধহয় সন্দেহ করে, সুলেমান ঠিকমতো তাগাদায় বেরয় না, টাকা আদায় করে খরচ করে ফেলে। কিন্তু খুদাকে ওয়াস্তে সুলেমানের কোন দোষ নেই।

পুরনো কাবলীওয়ালা, পুরনো মালিক এরকম ছিল না। সে সুলেমানকে পছন্দ করতো। কিন্তু তার অনেক দোষ ছিল। সে জানতো না, বাজারে মুহব্বৎমেঁ নহ্ দিল্ বেচ তু অপনা বিক জাতা হ্যায় সাথ উসকে জফর বেচনেওয়ালা। প্রেমের হাটে নিজের হৃদয় বিক্রি করো না। বিক্রি করতে গেলে তার সঙ্গে বিক্রেতাও বিকিয়ে যায়।

রাসবিহারী মোড়ের কাছে একটা দোকানে মেয়েরা চা-খাবার পরিবেশন করে। সুলেমানের পুরনো মালিক সেখানে যেত। সেখানে এক সুন্দরীর প্রেমের মজায় তার নিজেকে বিক্রি করে দেওয়ার অবস্থা! কি করে আফগানিস্তানে খবর গেল। সুলেমানের মালিকের বড় ভাই এসে উপস্থিত। সুদের কারবার টারবারে বাজারে পাওনা ছিল পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। তার মধ্যে বেশ কিছু অনাদায়ী। মালিকের বড় ভাই সুলেমনের নতুন মালিকের কাছে চল্লিশ হাজার টাকায় কারবার বিক্রি করে ভাইকে বগলদাবা করে দেশে ফিরে গেল। সুলেমানের ভয় হয়েছিল তার চাকরিটা এবার যাবে। কিন্তু নতুন কাবলীওয়ালা তাকে বহাল রেখেছে। পুরনো খাতকদের সুলেমান চেনে। কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা আদায় করতে হয় এসব তার জানা, হয়তো এই কারণে। কিন্তু নতুন কাবলীওয়ালা সুলেমানকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করে না। আজেবাজে কথা বলতেও ছাড়ে না। কিন্তু সুলেমান কি করবে? নোকরি তো তাকে করতেই হবে। সে তার সাধ্যমতো মন দিয়েই কাজ করে। তবু প্রতি মাসে আদায় সমান হয় না। কিন্তু আদায় যে কম হয় তার জন্য সে দায়ী নয়। তার কসুর কি? যে যেদিন টাকা দেবে বলে সেদিন সে তার কাছে হাজির হয়। কিন্তু সবাই কথা রাখে না। সুলেমান তো তাদের সঙ্গে মারপিট করতে পারে না। কিন্তু তার মালিক কিছুই বুঝতে চায় না। গালি দিয়ে বলে, তোমরা সব হারামখোর। কিন্তু পুরানা জামানা ভুলে যাও এসব চলবে না।

সুলেমান ভাবে, তকদীর মেরী! পুরানা জমানায় সেকি এই মালিকের আগের মালিককে বলেছিল, মায়খানাতে গিয়ে পড়ে থাকতে, না বলেছিল, রূপের শমায় পরোয়ানা হয়ে পুড়ে মরতে? সুলেমানের বলার প্রশ্ন ওঠে না। এখনকার মালিককেও তার কিছু বলার নেই। তার সব চাইতে অসহ্য লাগে যখন এই মালিক তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুলেমানের একদিকে পাওনাদার কাবলীওয়ালা আর একদিকে খাতক ভদ্রলোকরা। তার কাজ পাওনাদারের হয়ে খাতকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। পাওনাদার ছেড়ে না দিলে সে কারও ধার ছেড়ে দিতে পারে না আবার খাতক পাওনা টাকা না দিলে সে টাকা আদায় করতে পারে না। সে মাঝখানে পড়ে গেছে। আদায় করতে গেলে খাতক চোখ রাঙায়। আদায় না হলে পাওনাদার চোখ রাঙায়।

সুলেমানের বাদশাহী মেজাজের ওপর ধুলো জমে। সুলেমানের বউ শুকিয়ে শুকিয়ে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায়। ছেলেপুলেগুলোর শুধু মুখের হা বাড়ে, শরীর সেরকম বাড়ে না। এই নোকরী ছাড়তে পারলে ভাল হতো কিন্তু সুলেমান মজবুর।

মাঝে মাঝে দু-একজন খাতকের জন্য সুলেমানের কষ্টও হয়। দারিদ্র্য কি জিনিস তার চাইতে আর কে ভাল করে জানে? সাধ করে কেউ কাবলীওয়ালার কাছে টাকা ধার করে না। নেশা বা রেসের জন্যও সবাই টাকা নেয় না। অনেকের টাকা শোধ করার ক্ষমতা সত্যিই নেই। কিন্তু টাকার লেনদেন সুলেমানের হাত দিয়ে হলে কি হবে টাকার মালিক সুলেমান নয়। সে কারও পাওনা ছেড়ে দিতে পারে না।

অন্যদিকে মালিকের উদ্বেগের কারণও সে বোঝে। প্রায় ডুবে যাওয়া একটা ধারের কারবার সে কিনেছে। কিনেছে, কারবার চালাচ্ছে কিন্তু তার ওপর খবরদারি করার লোকও আছে। আফগানিস্তান থেকে প্রায়ই তার বাবার চিঠি আসে। সুলেমানের বর্তমান মালিকের কোন রকম নেশা নেই। কিন্তু আগের কাবলীওয়ালা যে এখানে এসে বয়ে গিয়েছিল তা এখনকার কাবলীওয়ালার বাবা কখনও ভুলতে পারে না। সেজন্য সুলেমানের নয়া মালিককে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রতি মাসের আদায়ের ওপর কড়া নজর না-রাখলে চলে না।

এই হলো দুদিকের অবস্থা। তার মাঝখানে সুলেমান। মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে ওঠে। কোনদিকে যাবে সে। ইচ্ছে করে কিস্তির টাকা দেয় না, দিতে দেরী করে এমন লোকেরও অভাব নেই। রোজই বলে, আজ নয় কাল। সুলেমান যায় আর খালি হাতে ফিরে আসে। মালিক ভাবে, সুলেমানের গাফিলতির জন্য আদায় হচ্ছে না। সুলেমান ভাবে, আগে বাদশাহ্‌রা

প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো আর সে খাতকদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করে। কিন্তু বাদশাহ্‌রা শাস্তি দিতে পারতো, মকুব করতেও পারতো। সে কোনটাই পারে না। কিন্তু তার মধ্যে এক এক সময় বাদশাহী মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভাবে, যে খাতক ইচ্ছে করে কিস্তি ফাঁকি দিচ্ছে তাকে কিছুতেই ছাড়বে না আর যে সত্যি অপারগ তার হয়ে মালিকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু সুলেমান জানে সে বড় অসহায়। জো কিসীকে কাম নহ্ আ সকে, ম্যঁ ওহ্ এক/মুশতে গুবার হুঁ। যে কারও কোনো কাজে আসতে পারে না, আমি সেই এক মুঠ ধুলো। নহ্ তো ম্যাঁ কিসীকা হবীর হুঁ/নহ্ তো ম্যঁয় কিসীকা রকীব হুঁ/ জো বিগড় গয়া ওহ্ নসীব হুঁ, জো উজড় গয়া/ওহ্ দয়ার হুঁ। আমি কারও বন্ধু নই, কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নই। নষ্ট হয়ে গেছে আমি সেই ভাগ্য, উজাড় হয়ে গেছে আমি সেই শহর। এই হলো সুলেমানের অবস্থা। তবু সুলেমান ভুলে থাকতে চায় যে তার কোনো ক্ষমতা নেই। সে রবকে ডর করে। বেরহ্‌ম সে নয় এই তার ভরসা।

সেদিন সকালে সুলেমান শুয়ে ছিল, একটি ছেলে এসে বলল তাকে তার মালিক ডাকছে। তখনও সুলেমানের ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটেনি। সারা শরীরে অবসাদ। সুলেমানের হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে নোকরী করে তাই বলে কারও নোকর সে নয়। যখন খুশি ডেকে পাঠালেই হলো? এখন সে কিছুতেই যাবে না। আরও অনেকক্ষণ শুয়ে বসে থেকে সুলেমান হাবিবের দোকানে চা খেতে গেল। সেখানে আবার সেই ছেলেটা, মালিক ডাকছে। চল সুলেমান। দ্যাখ লোকটা এত ডাকাডাকি করছে কেন?

সুলেমান ভেবেছিল, গিয়ে দেখবে মালিক খুব গুস্‌সা করে বসে আছে। কিন্তু তার চোখ-মুখের ভাব দেখে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। মালিক তাকে বসতে বলে একটা চিঠি এগিয়ে দিল। এগিয়ে দিয়েই মালিক গড়গড় করে বলতে লাগল, আফগানিস্তান থেকে কাল রাতে একজন লোক এসেছে। সেই মালিকের বাবার এই চিঠি নিয়ে এসেছে। বাবা লিখেছে, গত কমাসের আদায়পত্র তাকে খুবই নিরাশ করেছে। এখানে আগে যে ছিল সে তো বহু অর্থ নষ্ট করে, চরিত্র নষ্ট করে এখান থেকে চলে গিয়েছে। সুলেমানের মালিকও সেই পথে যাচ্ছে কিনা মালিকের বাপের সেই সন্দেহ। যে চিঠি নিয়ে এসেছে সে খুব বিশ্বস্ত লোক। সে নিজের চোখে সব দেখবে, কাজ-কারবার কি চলছে না চলছে। প্রয়োজন হলে সে সুলেমানের মালিককে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

সুলেমান মালিকের এমন অসহায় চেহারা কখনও দেখেনি। এ কথা ঠিক সুলেমান যতটা জানে, তার মালিকের চরিত্রে কোন খাদ নেই। শুধু সন্দেহ থেকে তাকে এখান থেকে চলে যেতে হলে সেটা খুবই অন্যায় হবে। সেটা সুলেমানের পক্ষেও লজ্জার ব্যাপার। সে মালিককে বলল যে, সে জান দিয়ে চেষ্টা করবে যাতে ভাল আদায় হয়।

কিন্তু মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুলেমানের সন্দেহ হল, এমন হতেও তো পারে মালিকের গোটা ব্যাপারটাই বানানো। তাকে একটা চিঠি দেখানো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সে চিঠিটা সুলেমান পড়তে পারেনি। তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই মালিক এসব বানিয়ে বলছে না তার ঠিক কি?

এখন সুলেমানকে সত্যি ব্যাপারটা জানতে হবে। একদিকে মালিক সত্যিই বিপদে পড়েছে, না খাতকদের ওপর আর সুলেমানের ওপর জুলুম করতে চাইছে আর একদিকে যেসব খাতক কিস্তির খেলাপ করছে, তারা দিতে পেরেও দিচ্ছে না, না সত্যিই তারা অপারগ। হ্যাঁ বিচার করে দেখতে হবে। হ্যাঁ বিচার—দুনিয়ায় সবাই ইনসাফ চায়। সুলেমানও ইনসাফ চায়। সুলেমান রাজা সুলেমানের গল্প শুনেছে। এক বাগদাদের বাদশাহ হারুণ-অল-রসিদ আর এই রাজা সুলেমান এঁরা ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

রহিমুদ্দিন লেনের সুলেমান যার ধমনীতে হিন্দুস্তানের শাসকের খুন বয়ে যাচ্ছে আজ ইনসাফ তার ওপর নির্ভর করছে। সুলেমানের যেন হঠাৎ শক্তি বেড়ে গেছে। মালিক যদি সত্যি বিপদে পড়ে থাকে তবে তার স্বার্থ সুলেমানের দেখা উচিত। যারা আমোদ-আহ্লাদ করে

টাকা ওড়াচ্ছে কিস্তি দেওয়ার সময় যত কষ্ট তাদের কিছুতেই ছাড়া যাবে না। তাদের অফিসে একবারের জায়গায় সুলেমান দশবার যাবে, দরকার হলে তাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবে। আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে। যেমন একজন খাতক অধীর চক্রবর্তী, ভদ্রলোক তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। গত ছমাসে তিনি এক পয়সাও শোধ দেননি। তাঁর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা করেও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

আবার সুলেমান যদি দেখে কেউ সত্যিই এমন অবস্থায় আছে যে তার পক্ষে টাকা দেওয়া অসম্ভব আর মালিক এদের ওপর জবরদস্তি করছে, বাপের চিঠিটিঠিসব ঝুটা; তবে সুলেমান মালিকের বিরুদ্ধে যেতেও ঘাবড়াবে না।

চায়ের দোকানে বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে সুলেমান বিড়ি টানতে টানতে ভাবে কি করা যায়? এখন তার মালিকের বাড়ি যাওয়ার কথা নয় কিন্তু একবার গেলে হয়। গেলে হালচাল কিছুটা বোঝা যেতো। তার চোখের সামনে রাস্তা দিয়ে নানারকম লোক আসা-যাওয়া করছে। কেউ বাজারে যাচ্ছে, বাজার থেকে ফিরছে কেউ, ফ্রকপরা ছোট ছোট মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। সুলেমানদের পাড়ায় আছে একটা মাদ্রাসা। এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে যায়। মাদ্রাসার সামসুল সাহেব যাচ্ছেন। রাস্তায় কলের জল নিয়ে রোজকার ঝগড়া হচ্ছে। একটা কল নিয়ে সবাই মিলে কাড়াকাড়ি। কে আগে নেবে। আরে অবিনাশ বাবু না? অবিনাশবাবু তাদের পাড়ায় কি করতে এসেছেন? সুলেমান রাস্তায় নেমে গিয়ে তাঁর নাম ধরে ডাকল। কিন্তু অবিনাশবাবু পেছন ফিরে তাকালেন না। একটা রিকশা পেয়ে উঠে পড়লেন। সাইকেল রিকশা দ্রুত আনোয়ার শা রোডের দিকে চলে গেল। অবিনাশবাবু সুলেমানের ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন। তবে দাঁড়ালেন না কেন? অবিনাশবাবুও তার মালিকের খাতক। প্রতিমাসের সুদের টাকা তিনি তো ঠিকমতই দিয়ে যাচ্ছেন। এমন নয় যে দেখা হলেই সুলেমান এখন আবার টাকা চাইবে। তবে অবিনাশবাবু ওভাবে পালালেন কেন? সুলেমানের হঠাৎ মনে হলো, অবিনাশবাবু এখানে হয়তো কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন। সুলেমানের সঙ্গে তাকে কথা বলতে কেউ দেখে ফেলুক তিনি তা চান না। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। কাবলীওয়ালা বা তার লোক ছুঁলে কত ঘা কে জানে? সুলেমানের মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। এত ঘেন্না কেন?

মালিকের বাড়িতে গিয়ে সুলেমান দেখল, সে মুখ ভার করে বসে আছে। তার সামনে বসে আছে আফগানিস্তান থেকে মালিকের বাপের পাঠানো লোক। দুজনের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল। সুলেমানকে দেখিয়ে তার মালিক নিজেদের ভাষায় কি বলে উঠল। লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে সুলেমানের দিকে লাল চোখে তাকাল। লোকটার মেহেদি লাগানো দাড়িও লাল। সে হাতের চেটো তুলে কি বলল। সুলেমান কিছু বুঝতে পারে না।

বিরাট একটা কড়াই-এ মাংস চাপান। সেদ্ধ মাংসের গন্ধ নাকে আসছে। সুলেমান মাছ-মাংসের স্বাদ ভুলেই গেছে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। সুলেমান নিজের সঙ্গে কথা বলে। নিজেকে ডাকে সুলেমান, সুলেমান। সুলেমান জেগে ওঠো। কেউ তোমাকে চায় না। কেউ না। তুমি কোথায় কার কাছে যাবে। সবাই ঘৃণা করে তোমাকে—যার হয়ে আদায় কর, যার কাছ থেকে আদায় কর, যে আদায়ে বলতে গেলে তোমার পাওনা কিছু নেই। এই আজব দুনিয়া। সেখানে সুলেমান সামান্য একজন আদায়কারী। যে কাজে তার মনের সায় নেই। তবে কোন কাজ সে করবে? বাড়িতে তার দিকে তাকিয়ে আছে তার বিবিবাচ্চাদের জোড়া জোড়া চোখ। তাদের চোখে ক্ষুধা, তাদের চোখে চাহিদা। এদিকে মালিকের, মালিকের রিস্তাদারের লাল চোখ অন্যদিকে খাতকদের চোখে ঘৃণা। সুলেমান কি করে সহ্য করবে? অ্যায় সুলেমান কুছতো বোলো ক্যা তুমহার রায় হ্যায়? এই জিন্দেগী এত নিজের মতলবে চলে এত পাগলামি ভরা—তোমার দোস্তি ভাল না, দুশ্‌মনিও ভাল নয়।

তবু সুলেমানকে বিবাদীবাগ, বেলেঘাটা, ঠাকুরপুকুর ছুটতে হয় কিস্তি আদায় করতে, সুদ আদায় করতে। আবার মালিকের বাড়ি। একদিকে চোখে ক্রোধ একদিকে চোখে ঘৃণা। সুলেমান

ভাবে, তার সঙ্গে রাস্তার ঐ নেড়ি কুত্তার কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এভাবে চলে না। এভাবে চলে না। সুলেমানকে যে কোনো একটা পথ নিতেই হবে।

আজ আবার মালিক তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আজ আবার সে-সব কথা। মালিকের রিস্তাদারও পাশে বসেছিল। সে অবশ্য কোনো কথা বলছিল না। কিন্তু মালিকের গলার স্বর, কথা বলার ধরন সুলেমানকে খুবই বিস্মিত করছিল। মালিক জিজ্ঞেস করল, সে যদি সুলেমানের সঙ্গে তাগাদায় বেরোয় তাতে কিছু কাজ হবে কিনা?

সুলেমান তাকে বোঝায় যে, তাতে বিশেষ লাভ হবে না। দু-এক জায়গায় সে যেতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় সে গেলে ভাল করতে গিয়ে খারাপ হবে। তবে মালিক যেন চিন্তা না করে, সে পুরা কোশিস করছে।

সুলেমান মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারল, সে কোন পথে যাবে তা ঠিক হয়ে গেছে। তাকে মালিকের পক্ষই নিতে হবে। এবার অবিনাশবাবুর মতো লোকগুলিকে শায়েস্তা করতে হবে।

সুলেমানের এখন কাজ হবে, মালিককে বিপদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা। এই হলো ইনসাফ। এই সুলেমানের বিচার। বাড়িতে ফিরে সুলেমান খাতকদের হিসেবের খাতা খুলে বসল। তার বিবি এসে বলল, খুব রাতদিন তো মালিকের পাছায় তেল লাগাচ্ছ, ফয়দা হচ্ছে কিছু?

একে সুলেমান কি বোঝাবে? সে বলতে গেল ইনসাফ—শরীর ঝাঁকিয়ে তার বিবি চিৎকার করে উঠল, যে মরদ বাচ্চাবিবির খাবার জোগাড় করতে পারে না, পোঁদের কাপড় জোটাতে পারে না তার আবার ইনসাফ কী? তার ইনসাফের সঙ্গে সুলেমানের বউ অসভ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল।

বউ-এর বাবা-মা সমেত বউকে খিস্তি করতে করতে সুলেমান বাড়ির বাইরে চলে গেল। বাইরে গিয়ে প্রথমে সে ভাবল, দুনিয়ার সে বে-কসী, বেসাহারা। তারপর বউ-এর শুকিয়ে-ওঠা মুখটা মনে পড়ল। সুলেমানের নিজের শরীর স্বাস্থ্যও কিছু ভাল না। হাড় বার করা শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। পেটে দাদ, মাথায় খুসকি। মুখে খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। কিন্তু তার বউ-এর দিকে তাকানো যায় না। ঠিক যেন কবরে যাওয়ার আগের চেহারা হয়েছে।

মালিকের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে এনে সুলেমান ডালপুরী কেনে। যা বাকি থাকে বউ-এর হাতে দেয়। আরও কিছু টাকা পেলে সে সুর্মা কিনে বউ-এর চোখের কালি ঢেকে দেবে। ডালপুরী ছিঁড়ে কিছুটা বাচ্চাদের মুখে গুঁজে দিয়ে বাকিটা নিজের মুখে দিতে দিতে বউ জিজ্ঞেস করে, সুলেমান তাকে একদিন হাসপাতালে নিয়ে যাবে কি না? সুলেমান সম্মতি জানায়। সুলেমানের বউ খাওয়া-দাওয়া সেরে খুশি খুশি মুখে মেয়ের মাথায় উকুন বাছতে বসে। সুলেমান তাগাদায় বেরোয়।

প্রথমে সে যায় মণ্ডলবাবুর অফিসে। মণ্ডলবাবুর গলায় চেন। ডান হাতের তিন আঙুলে তিনটে আংটি। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি।

আজ মণ্ডলবাবুর মাইনের তারিখ। আজই তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করতে না পারলে সারা মাস তার সারা শরীর হাতড়িয়েও একটা পয়সা বের করা যাবে না। মণ্ডলবাবুর যত পাওনাদার এই মাইনের দিন তাকে ছেঁকে ধরে। কাকে না দিয়ে পারে না, দিতে দিতেই মণ্ডলবাবুর পকেট প্রায় খালি হয়ে যায়। ফলে মাইনে পাওয়ার পরের দিন থেকেই আবার দেনা শুরু। অথচ মণ্ডলবাবু মাইনেপত্তর খারাপ পান না। এমনিতে নেশা-টেশা নেই। কিন্তু শনিবার হলেই মণ্ডলবাবু আর নিজের মধ্যে নিজে থাকেন না। অফিস ছুটি হতে না হতেই মাঠে ছুটবেন।

সুলেমান গিয়ে দেখল, মণ্ডলবাবুর অন্যান্য পাওনাদাররা এসে গেছে। এ মাসে কিছু বেশি টাকা আদায় করতে হবে। গত মাসে মণ্ডলবাবু দশ টাকা কম দিয়েছিলেন। লোকটার

পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন দেখলে কিন্তু মনে হবে না, তার পেছনে এত পাওনাদার ঘুরছে। সুলেমান শুনেছে, মণ্ডলবাবুর বাড়ির অবস্থাও খারাপ নয়।

সুলেমানরা মণ্ডলবাবুর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, মণ্ডলবাবুর সহকর্মী হারাধনবাবু আসছেন। তার মানে মাইনে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। হারাধনবাবু সুলেমানকে চেনেন। একবার ছেলের অসুখের সময় তিনশ টাকা ধার নিয়েছিলেন। সুলেমানকে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। ছ'মাসের মধ্যে সুদে আসলে ফেরত দিয়েছিলেন। হারাধনবাবু এসে বললেন, তোরা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস, মণ্ডলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি?

দেখা হয়নি মানে! সুলেমান বিস্মিত হয়ে বলল, আমরা তো দাঁড়িয়ে আছি—মণ্ডলবাবু তো আসেননি।

হারাধনবাবু বললেন, সে কী! মণ্ডলবাবু তো অনেকক্ষণ মাইনে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

শুনে সুলেমানের মুখ শুকিয়ে গেল। মণ্ডলবাবু ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। আজ টাকা আদায় না হলে এক মাসের মধ্যে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না। এই মণ্ডলবাবুর মতো লোকেদের জন্য আজ সুলেমানের মালিকের বেইজ্জত হচ্ছে। এদের কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

সুলেমানের ইচ্ছে করছিল, সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে মণ্ডলবাবু কোথায় আছেন। এটা তার ফর্জ। ম্লানমুখে মণ্ডলবাবুর অফিস থেকে সুলেমান খগেন সরকারের অফিসে গেল। সুলেমান আর দয়া-মায়া করবে না। খগেন সরকার বলতে চেষ্টা করেছিল, পঞ্চাশ টাকার বদলে এ মাসে ত্রিশ টাকা দেবে। এ মাসে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে অনেক টাকা লাগবে। এর বেশি দিতে পারবেন না। সুলেমান ক্ষেপে গিয়ে বলল, আপনারা ভেবেছেন কি? হকের টাকা চাইতে এসেছি। আপনি কি ভিক্ষে দিচ্ছেন?

খগেন সরকারও মেজাজ দেখিয়ে বলল, ভাল কথায় বললাম—চোখ রাঙাচ্ছ? এক পয়সা দেব না যাও। দেখি কি করতে পার।

সুলেমান আরও রেগে বলল, আমার মালিকের টাকা কি হারামের টাকা! দাঁড়ান, আমার মালিককে আপনার বাড়িতে পাঠাচ্ছি। কাবুলিওয়ালা বাড়িতে হৈ-চৈ করবে। দেখবো তখন মানসম্মান কোথায় থাকে।

কথাটা শুনেই খগেন সরকার কুঁকড়ে গেল। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পাঁচটা দশ টাকার নোট বের করে সুলেমানের হাতে গুঁজে দিল।

সুলেমান মনে মনে হাসে। মানসম্মানের বড়াই করতে গিয়েই লোকগুলি মরলো। তাছাড়া মালিককে সুলেমান কখনই পাঠাতো না। পাঠাতে হলে তাকে কেন পয়সা দিয়ে রাখা হয়েছে?

এরপর সুলেমান গেল একটা ছোট প্লাস্টিকের কারখানায়। এখানে প্লাস্টিকের খেলনা তৈরি হয়। সুলেমানের খাতকের নাম ফুলমণি বিশ্বাস। কারখানার লোকেরা বলল, ফুলমণি এখানে আর কাজ করে না। শরীর খারাপ, না কিসের জন্য ফুলমণি তিন-চারদিন কাজে আসেনি। কারখানার মালিক তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। মাঝবয়সী এক মহিলা হেসে হেসে বলল, যাও না ফুলমণির বাড়ি যাও। তার মেয়ে এখন দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছে।

হ্যাঁ, ফুলমণি বিশ্বাসের বাড়িতেই যাবে সুলেমান। টাকা আদায়ের জন্য সে সব জায়গায় যাবে, আর কোনো ওজর আপত্তি চলবে না।

সকালবেলা গিয়ে সে হাজির হলো ফুলমণি বিশ্বাসের নেবুতলার বাড়িতে। গিয়ে শুনলে, ফুলমণিরা এখন আর এ বাড়িতে থাকে না। সে আর তার মেয়ে নতুন ঠিকানায় উঠে গেছে। বাঃ টাকা মেরে দেওয়ার কতোরকম ফন্দিফিকির। কিন্তু সুলেমানও ছাড়ার পাত্র নয়। সেই বাড়ির চাকরের কাছ থেকে সে ফুলমণির নতুন ঠিকানা জোগাড় করলো। গিয়ে উপস্থিত হলো সেই বাড়িতে।

চারপাশে দরমার বেড়া, মাথায় টালি সার সার কতকগুলো ঘর। এ কোথায় এসে জুটেছে ফুলমণিরা? ফুলমণির মেয়ে কি চাকরি করে? পাড়াটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। পান-

সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞেস করতে সে দাঁত বের করে একটা ঘর দেখিয়ে দিল। এতো দাঁত বের করার কি আছে?

সুলেমান গিয়ে আলকাতরার রঙ-করা একটা দরজার কড়া নাড়লো। চুল আলুথালু, ফোলা ফোলা লাল চোখ, পরনে শুধু শায়া আর ভেতরের ছোট জামা একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলে দু'হাত ছড়িয়ে হাই তুলতে লাগল। হাইতোলা হলে স্ত্রীলোকটি সুলেমানের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল। কাঁপা কাঁপা গলায় সুলেমান জিজ্ঞেস করলো, ফুলমণি বিশ্বাস এখানে থাকে?

স্ত্রীলোকটি মুখে বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তাকে কি দরকার?

সুলেমানের গলা এখনও কাঁপছে। হাতও কাঁপছে। বললো, সে আমার মালিকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে—বাড়ি পাল্টে এখানে এসেছে শুনলাম—

স্ত্রীলোকটি এবার ময়লা দাঁত বের করে হাসল। শরীরে ঢেউ খেলিয়ে বলল, টাকা পাও? পাওনা আদায় করতে এসেছ? তা রাত্তিরে এসো মদন, পাওনা চুকিয়ে বুকিয়ে দেব। এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে—বলেই সে আবার হাই তুলতে লাগলো।

সুলেমানের পা কাঁপছে। সে তবু বললো, ফুলমণি বিশ্বাসের মেয়ে এখানে থাকে শুনেছিলাম?

স্ত্রী লোকটি মুখঝামটা দিয়ে বললো, কেনরে মুখপোড়া, আমায় মনে ধরছে না?— তারপর ঘরের ভেতরের দিকে মুখ করে সে গলা তুলে ডাকলো, ও সুলেখা, তোমার মা-কে কে খুঁজতে এসেছে দেখ।

কালো রোগা একটি মেয়ে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। সুলেমান যতোটা পারল তার আসার কারণ জানাল। মেয়েটি মাথা নিচু করেই বললো, আসুন।

ভেতরে যাবে সুলেমান? ঐ স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাতেও তার গা ঘিন ঘিন করছে। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। কোনরকম ফন্দি করে তার মালিকের টাকা ফাঁকি দেওয়া চলবে না। তার ইনসাফ খুব পরিষ্কার। তাকে মালিকের পক্ষ নিতেই হবে। সে ধীরে ধীরে মেয়েটির পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো। মেয়েটি ঘর পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। সুলেমানও বারান্দায় গেল। এতদূর এসে আর পিছিয়ে থাকলে চলে না। কাল তার মালিক এই ফুলমণি বিশ্বাসের কথা বলেছে। এরা খুব সেয়ানা। নানা কায়দায় টাকা ফাঁকি দিয়ে দেনাদারকে বিপদে ফেলতে চায়।

বারান্দায় মাটির ওপর একজন শুয়ে ছিল। সুলেখা নামে মেয়েটি গিয়ে মুখের ঢাকা খুলে দিতে সুলেমানের চিনতে কষ্ট হলো, এই ফুলমণি বিশ্বাস। সুলেখা তাকে নিচু গলায় কি বলতে

ঘোলাটে চোখ তুলে তাকাল। সেই চোখ সুলেমানকে দেখছে কি না বোঝা গেল না।
। অল্প অল্প নড়ছে কিন্তু শব্দ বেরচ্ছে না।

সুলেখা জানালো, তার মা-র প্রথমে কি অসুখ হয়েছিল তারা বুঝতে পারেনি। তারপর একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সারা শরীরে পক্ষাঘাত ধরেছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। ঐ স্ত্রীলোকটি তাদের এই নরককুণ্ডে নিয়ে এসেছে। সুলেখার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে একবার ভেবেছিল জলে ডুবে কি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু মায়ের মুখ চেয়ে কিছু করতে পারছে না। এদিকে দিনে পাঁচ-দশটাকার বেশি ঘেন্নার রোজগার হয় না। তার অর্ধেক আবার ঐ স্ত্রীলোকটি নিয়ে নেয়।

সুলেমানের মনে হলো, মেয়েটি তার গলার মধ্যে, সমস্ত শরীরে কান্না লুকিয়ে রেখেছে। হায়, সুলেমান কি তোমার বিচার? একদিকে মালিকের থমথমে মুখ আর একদিকে এই মেয়েটার কালিভরা ছলছলে চোখ। কি রায় দেবে সুলেমান। সুলেমান যেন সহস্র ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পায়। তারপর সব নিস্তব্ধ। ভারতের অধীশ্বর এক সম্রাট তার সিংহাসন থেকে নেমে এসেছেন। ন্যায়দণ্ড তাঁর হাত থেকে খসে পড়েছে। তাঁর বিচারবুদ্ধি কাজ করছে না।

কিন্তু এখানে আসার আগে সুলেমানের কাছে নির্দিষ্ট দুটো পথ ছিল। একদিকে তার মালিক আর একদিকে খাতক। সুলেমান ন্যায়ের পক্ষে। কথা ছিল অন্যায় যারই হোক সুলেমান [illegible]। কিন্তু এখন সুলেমান কোন পথে যাবে?
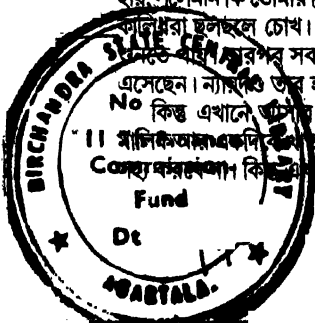
জাফরি

দেবব্রত মল্লিক

দূরে কোথায় যেন হরি সংকীর্তন হচ্ছে। বাতাসে গানের সুর। হরে কৃষ্ণ হরে রাম...। মানসী আর অমল মুখোমুখি। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ওদের ছাদে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে অমল অফিস থেকে ফিরেছে। এখন খোলা ছাদে বসে চা খাবে। গল্প চলবে দুজনার। অমলের অফিসের কথা আর মানসীর বাড়ির।

—আজ তোমার মুখটা কিরকম যেন শুকনো লাগছে। মানসী এগিয়ে অমলের কাছে এল। শরীর খারাপ লাগছে?

—উঃ যেভাবে বাসে করে আসতে হয় তাতে শরীর খারাপ না হয়ে উপায় আছে! রীতিমত যুদ্ধ বুঝলে। রীতিমত যুদ্ধ! আছ তো বাড়িতে বসে বুঝবে কি?

—আহা, দাও না একটা চাকরী জোগাড় করে, দেখি বুঝতে পারি কি না। অমল একথার কোন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝে এমন হয়। যেন কোন কিছুই ভাল লাগে না। গলা শুকিয়ে যেতে থাকে। বার বার জল খেতে ইচ্ছে করে। অমল ভাল করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মানসী কথা শুরু করল।

—জানো তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি?

—তুমি রাগ করবে না বলো?

—বলই না।

—তোমার পুরোনো জামাপ্যান্টগুলো দিয়ে একটা স্টিলের থালা রেখেছি।

অন্যদিন হলে হয়তো অন্য কিছু বলত অমল। এখন শুধু বলল, ভাল করেছো। অমলের উত্তর শোনার পরও মানসী বলতে থাকলো।

—জামাপ্যাণ্টগুলো অনেক পুরোনো। তুমি সেগুলো একদমই পর না। তাই ভাবলাম শুধু শুধু ওগুলো ঘরে রেখে লাভ কি। এই জান তো, আমার সবসুদ্ধ ক'টা স্টিলের থালা হল। পাঁচটা। মানসী ছেলেমানুষের মত আঙুল তুলে দেখালো।

অমল মনে মনে হাসল। সত্যি, মানসী এখনো ছেলেমানুষই রয়ে গেল। সোজা সরল।

...হরে কৃষ্ণ হরে রাম। রাম রাম হরে হরে। কীর্তন জমে উঠেছে। খোল করতাল এখন ঝমাঝম দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে। রাতভোর বেজে চলবে। অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন। অমলের শুনতে বেশ ভাল লাগছে। এ এক অন্য ধরনের মেজাজ। গান শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। বিভোর করে দেয়। মোহিত করে তোলে।

ছোটবেলায় অনেক কীর্তনের আসরে উপস্থিত থেকেছে অমল। বিশেষ করে প্রতি বছর দোলের আগের দিন থেকে যে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন শুরু হত তা ভোলার নয়। সেদিনটা যেন পাড়ার এক উৎসব। দূর দূর থেকে দল আসতো গান গাওয়ার জন্য। একের পর এক গান গেয়ে তারা চলে যেতো। আসর জমে উঠত বিভিন্ন গাওনার সুরে সুরে। মেয়েরা মাঝে মাঝে উলু দিতেন।

এই আসরে একটা মজার ঘটনা ঘটত। সেটা ভেবে অমলের এখন খুব হাসি পাচ্ছে। তার যেন কি নাম ছিল। কিছুক্ষণ ভাবার পর মনে পড়ল। মদন মাষ্টার। কীর্তনের আসরে ওর ডাক বাঁধা ছিল। গান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর মদন মাষ্টার ভাবে পড়ত। অর্থাৎ গান গাইতে গাইতে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু এইরকম একটা সময় আসার আগে উনি পাশের কাউকে জানিয়ে দিতেন তিনি এখন ভাবে পড়ছেন। তাকে যেন দেখা হয়। বিশেষ করে তার পকেটের জিনিসগুলো। একটা চাপা হাসি আসরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বয়ে যেত। তখন আরো জোরে বাজতে থাকতো খোল করতাল। গায়েনের গান তখন উঁচু পর্দায়। আসর জমজমাট।

ছোটবেলার কথাগুলো মনে হলে বেশ লাগে। মনে হয় বেশ ছিল সেইসব দিনগুলো। অমলের সে কথা মনে হলেই একটার পর একটা ছবি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। লাইনবন্দী সার সার ছবিগুলো এসে ভীড় জমায়। স্কুল যাওয়ার ঘটনা। মাঝে মাঝে স্কুল পালানোর বদমাইশি বুদ্ধি। ভাবতে বেশ লাগে। বিশেষ করে একদিনের কথা তো অমলের প্রায়ই মনে হয়।

প্রথম ঘণ্টায়ই হেড মাষ্টারমশাইয়ের ক্লাস। ইংরাজী পড়াবেন। পড়া ছিল গ্রামারের ফ্রেজ। একদম মুখস্থ বলতে হবে। না পারলেই বেত। বাড়ি থেকেই নানা অজুহাত তৈরী করে স্কুলে না আসার ফন্দি আঁটছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অজুহাত ধোপে টেকেনি। তাই পথে আসতে আসতে ঠিক করে ফেলল অমল আজ আর স্কুলেই যাবে না। সঙ্গী জুটে গেল আরো দুজন। ওরাও ক্লাস করতে না পারলে বাঁচে। কোথায় যাবে ওরা? কাছাকাছি থাকলে কারোর নজর পড়তে পারে। তাই দূরে কোথাও যেতে হবে। ঠিক হয়ে গেল গান্ধীঘাট যাবে। একজন বলল এত দূর? দক্ষিণেশ্বর থেকে বারাকপুর। কম রাস্তা? হেঁটে হেঁটে এতটা পথ! ভাবলে কিরকম হাসি পায় এখন। স্কুলের কথা উঠলেই অমলের এ ঘটনার কথা মনে হয়।

সেদিন গান্ধীঘাট থেকে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

এ গল্প মানসীও অনেকবার শুনেছে। আর হেসেছে খুব করে।

তোমরা পারও। আচ্ছা বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে তোমায় কিছু বলল না?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি বললে?

—খেলা ছিল।

—তুমি আবার খেলতেও নাকি?

—শুধু খেলতামই নয়। রীতিমত প্রাইজও পেয়েছি। অমল বুক ফুলিয়ে বলে।

মানসী হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। তা হলে তো তুমি গুণধর!

আগে মাঝেমাঝেই বসে হাসিঠাট্টা হত। এমন কি কখনো কখনো রাতে বেশিটা সময় কি ভাবে যে কেটে যেত বুঝতেই পারত না অমল আর মানসী। তখন ওদের এমন খোলা ছাদ ছিল না নিজের করে। একটা ভাড়াবাড়ির ফ্ল্যাটে বাসা। ফ্ল্যাট মানেই একটা বড় ঘর আর এক চিলতে বারান্দা। সঙ্গে রান্নাঘর এবং বাথরুম যেমন থাকে। ছিমছাম। ছোট পরিবারের জন্য বেমানান নয়। মানসীর প্রথম প্রথম খারাপ লাগেনি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল। সব সময় মনে হয় কিরকম দম আটকে আসছে। একটুখানি ঘর। দু-পা ফেললে তিন পা ফেলার জায়গা নেই। অমল মানসীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। এটা শহর। এখানে এইরকমই সব। কারুরই তেমন তিন পা ফেলার মত জায়গা নেই।

মানসী বুঝতে পারে। তবু যেন অবুঝ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমার প্রায়ই কি মনে হয় জান?

—কি?

—নিশ্বাস নিতে নিতে একদিন এই ছোট্ট ঘরের সবটুকু অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ বোকা কোথাকার। অমল মানসীর লম্বা কালো চুলে আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে দিতে থাকে।

মানসী তখনও বলে যেতে থাকে। তুমি হাসলে। কিন্তু এটা আমার মনের কথা সত্যি করে বলছি। ভাড়া বাড়িতে থাকতে একটুও প্রাণ চায় না। একদম অসহ্য। আমি তো আর বলছি না আমার প্রাসাদ চাই। ছোট টালির ঘর হলেই আমি খুশী। আমার নিজের করে ছোট্ট ঘর শুধু।

—এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। এক্ষুনি আমি কি করে বাড়ি করব।

—আহা, আমি কি আর তোমায় এক্ষুনি করতে বলছি। হেসে দেয় মানসী। চেষ্টা করতে বলছি মাত্র। যেন কয়েক বছরের মধ্যে আমরাও বাড়ি করে ফেলতে পারি। তুমিই তো বল চেষ্টা করলে কি না করা যায়। আমরা চেষ্টা করলে একটা ছোটো মোটো বাড়ি তৈরী করতে পারবো না?

অমলই কি চায় ভাড়া বাড়িতে থাকতে! কিন্তু উপায় কি! শুধু চাকরি করে বাড়ি বানানো সত্যি কঠিন কাজ। তবু কেউ কেউ করছে। দু-একজন অমলের বন্ধু-বান্ধব বাড়ি করেছে। তাদের সবারই মত আজকের দিনে একটা বাড়ি করা বোকামি। তার চেয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকা অনেক ভাল। শুধু শুধু একগাদা টাকা আটকে রাখা। সেই টাকা বরং ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দিলে অনেক লাভ। আর ধার করে করলে তো কথা নেই।

অমল দেখেছে বন্ধুদের মুখের কথার সঙ্গে মনের মিল তেমন নেই। একটু সঙ্গতি এলেই প্রত্যেকেরই ঝোঁক বাড়ি করা। তারপর গলা শুকিয়ে মরা। বাড়ি করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। তবু বাড়ি করা চাই। একান্তই নিজের মত করে ছোট্ট একটা বাড়ি। মুখে যে যতই বলুক না কেন। ছোট্ট একটা বাড়ি। মাথা গোঁজার ঠাঁই—এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই আমরা অন্তরে অন্তরে এক।

মাঝে মাঝে অমল রাতে বাড়ি ফিরে দেখছে মানসীর মুখ ভার। কারণ সেই বাড়ি। বাড়ির গৃহিণী হয়তো কিছু বলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অমলের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। তারপর সান্ত্বনার সুরে মানসীকে বোঝায় ওসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? ভাড়া বাড়িতে থাকলে ও একটু আধটু কথা হবেই।

—এই জন্যই তো বলি। মানসী রীতিমত উত্তেজিত।

—আহা, আমি জানি। কিন্তু কি করব বল। আমাদের মত লোকের সামান্য চাকরি করে বাড়ি করা কি সহজ কথা। তবে চেষ্টা আমি করছি। একথা তোমায় বলে রাখছি মানসী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মানসীর রাগ জল হয়ে যায়। চেষ্টার কথা শুনলেই ও খুশি। মানসী জানে অমল চেষ্টা করতে শুরু করলে, তা এক্ষুনি না হোক কিছুদিনের মধ্যেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মানসী বাড়ীর একটা প্ল্যান মাথায় ছকে নেয়। অমলের কাছাকাছি এসে বসে। তারপর আঙুল দিয়ে হাতের তালুর ওপর বোঝাতে থাকে। জান, এইভাবে দুটো ঘর পাশাপাশি হবে। রান্নাঘর হবে এইখানে। রান্নাঘর আবার একটুখানি করো না। আমি প্রায় বাড়িতেই দেখি রান্নাঘরটা একটুখানি। আমার ভীষণ রাগ হয়। একটা জিনিস বোঝা উচিত। একজনকে সারাদিনের বেশিরভাগ সময়টুকু ঐখানে কাটাতে হবে।

একটানা কথাগুলো বলে যেতে থাকে মানসী। তুমিই বল, ঠিক বলিনি?

—নিশ্চয়ই। অমল মাথা দোলায়।

—আর একটা জিনিস আমার ভীষণ ইচ্ছে।

—কি?

—সুন্দর দেখে জাফরি লাগাবো।

অমল হেসে ফেলে। কেন তুমি বেগম হবে নাকি?

—কেন, কেন?

—জাফরি তো সেই মোগল পিরিয়ডের জিনিস। বেগমদের যেন বাইরে থেকে দেখতে না পাওয়া যায় তার জন্য বাড়ি কিংবা প্রাসাদের চতুর্দিকে জানলার বদলে জাফরি ব্যবহার করা হত। অথচ বেগমরা জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরের সবকিছু দেখতে পেতেন।

—হ'লামই না হয় বেগম। জাফরির ফাঁক দিয়ে আমি আমার বাদশাকে দেখব। সে চাকরি করতে চলে যাবে। রাজপথ ধরে সোজা।

—আমার বেগম তখন ঘরে একা চুপচাপ।

দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে।

—বেশ মজা হবে তাহলে, না? মানসীর হাসি তখনো শেষ হয় না। অমলের এক আর্কিটেক্ট বন্ধু জাফরির ব্যাপার নিয়ে বুঝিয়েছিল ওকে। আজকাল জাফরির ব্যবহার বেড়েছে। রোদ আটকে যায় সুন্দরভাবে। এবং বৃষ্টিও তাই। জল হলে একটু আধটু ছাঁট যা ঢোকে। অথচ হাওয়া খেলার অঢেল সুযোগ। দূর থেকে এক একটা বাড়ি দেখতে বেশ লাগে। ঠিক যে জায়গায় জাফরি লাগানো আছে মনে হয় যেন কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট আলো আঁধার মিশে একাকার হয়ে গেছে সেখানটায়।

অমল এখন ছাদে একা। মানসী নিচে নেমে গেছে ছেলেকে পড়া দেখানোর জন্য। রাতে খাওয়ার আগে পর্যন্ত পড়াবে ওকে। ছেলের ভোরে স্কুল। দুপুরেও একবার নিয়ে বসে পড়াতে। কিন্তু এখন গরমের সময় দুপুরে পড়াতে কষ্ট হয়। গুমোট গরম। জানলা দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। ফ্যানের হাওয়া গরম লাগে। তার ওপর যদি লোডশেডিং থাকে সোনায় সোহাগা। এইরকম আবহাওয়া চলবে যতদিন না বৃষ্টি শুরু হয়। তবে সন্ধ্যার পর শান্তি। বিশেষ করে ছাদে এসে বসলে তো কথাই নেই। অমল তাই অফিস থেকে আসার পর হাতমুখ ধুয়ে সোজা ছাদে বসে পড়ে। বসে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ দুটো বুজে আসে। খাওয়ার আগে প্রায়ই একঘুম হয়ে যায়। ছেলেকে পড়ানোর পর মানসী ছাদে উঠে আসে। আস্তে আস্তে পা টিপে অমলের সামনে এসে দাঁড়ায়। অমল চোখ বুজে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাকে না মানসী। খানিকক্ষণ পায়চারি করতে থাকে। আর ঠিক তখনই হয়তো অমলের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অমল হেসে ফেলে। ক'টা বাজে?

—চল, খেতে চল। মানসী অমলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—খাওয়ার সময় হয়ে গেল? বাবুয়া কি করছে?

—ওর পড়া হয়ে গেছে। খাচ্ছে এখন।

—বাবুয়ার ইংরেজীর কি প্রশ্ন লিখতে হবে বলছিলে?

—কাল লিখে দিও। মানসী আস্তে করে উত্তর দেয়।

—জান, কিরকম ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মানসী জানে। ইদানীং অমল অনেক পাল্টে গেছে। কিরকম যেন একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কথা কম বলে। সেদিন মানসী একটু দূরে বসে অমলকে লক্ষ্য করছিল। ওর মুখটা লম্বা লম্বা লাগছে। ঘাড়টা অনেক সরু হয়ে গেছে। মানসীর থেকে থেকে একটা কথাই মনে হচ্ছিল। অমল হঠাৎ করেই বুড়িয়ে গেছে। এর জন্য নিজেকেই নিজে দায়ী করছে মানসী। অমল তো বারবারই বলেছিল এখন বাড়ি করার দরকার নেই। কিন্তু মানসী আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না। মাঝে মাঝে মানসীর এই জানান-দেওয়া অমলকে একটা গোঁ-এ পৌঁছে দিয়েছিল। তখন অমল মরিয়া। সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে শুধু একটা ভাবনা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমনি করেই হোক নিজের মত করে একটা বাড়ি চাই। চেষ্টা করে বিফল হয়নি অমল। বছর দেড়েকের মধ্যে মাথা গোঁজার মত একটা ঠাঁই করে ফেলল। কিন্তু কিভাবে যে ঠাঁই তৈরি হল, তা একমাত্র অমলই জানে।

টাকা ধার নেওয়ার যা যা রাস্তা ছিল তার একটাও বাকি রইল না। এমনকি ঘরের সোনাও সব শেষ। নামমাত্র একটা ছাড়া। এ ব্যাপারে মানসীর তেমন খেদ নেই। ও বলেছে, আমার অলঙ্কারের ওপর একটুও লোভ নেই। বাড়ি হলেই খুশি।

কিন্তু এখন? বাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও কোথায় যেন কি একটা হারিয়ে গেছে মনে হয়। মানসী অমলের দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। আর তখনই বার বার মনে হয় ওর চাওয়ার কিছু ভুল থেকে গেছে। যা এই মুহূর্তে ও না চাইলেও পারতো। তাই সব সময় এখন অমলের কাছে নিজেকে কেমন যেন দোষী দোষী মনে হয়। প্রথম প্রথম একা নিজে নিজে ভেবে গুমরে মরছিল মানসী। তারপর একদিন অনেক ভেবে থাকতে না পেরে অমলের কাছে এসে মুখ খুলেছিল।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

—হঠাৎ! অমল রীতিমত অবাক।

—আমি ভুল করে তোমার কাছে বাড়ি চেয়েছি।

—ধ্যাৎ, বোকা। জান না মধ্যবিত্তদের সব চাওয়াই ভুল করে চাওয়া। আমাদের এইভাবেই সবকিছু চাইতে হবে আর ভুলও করতে হবে। তুমি বুঝি বসে বসে এসব ভাবছ?

—তোমাকে দেখেই তো আমার ভাবনা আসছে।

হো হো করে অমল হেসে দিল। প্রাণখোলা হাসি। অনেকদিন এরকম হাসেনি অমল। কেন আমি পালটে গেছি?

—যাওনি?

—তাই বুঝি। আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না। যেটুকু তুমি দেখছো সেটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। একটু চিন্তা তো হবেই। অর্থকড়ি নামক সমস্যার কথাটা কি অত সহজে ভুলতে পারি? মাঝে মাঝে তাই ভাবিয়ে তোলে। অথচ এই ভাবনাগুলো আমাদের নাও হতে পারতো। যদি সমাজব্যবস্থার রূপটা অন্য কোন রকম হ'ত।

মানসী চুপ করে বসে থাকে। কোন কথা বলে না। বসে বসে অমলের কথা শোনে। নিজেকে অনেকটা হালকা হালকা মনে হচ্ছে এখন। অমল বলে চলে। যে কোন ব্যাপার নিয়ে তুমি ভাবতে বসলেই তোমার অনেক কিছু মনে হবে। সাত পাঁচ আকাশ পাতাল আর ক[illegible] কি। কিন্তু তুমি খুব সহজভাবে সহজ করে ভাবতে শেখ, এর মত আনন্দ নেই। অথচ দেখ কিরকম সব সাধারণ ঘটনা দিয়ে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। একটা বিরাট প্রভেদের রেখা টেনে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেয় তোমার আমার মধ্যে বড় ফারাক।

নিচ থেকে বাবুয়া চীৎকার করে ডাকল, মা আমার খাওয়া হয়ে গেছে। মানসী অমলকে তাড়া দিল, চল চল তাড়াতাড়ি খেয়ে আসি। এরপর তরকারি মাছ সব নষ্ট হয়ে যাবে।

গরমের দিনে এই এক সমস্যা। একটু রাত হলেই রান্না নষ্ট হয়ে যেতে চায়। মানসী বিকেলে চা খাওয়ার সময় যদিও একবার সব গরম করে রাখে। [illegible]বিশ্বাস হয় না, এ ক'দিন যা গরম পড়েছে। সারাদিন গুমোট থাকে। দুপুরে লোডশেডিং থাকলে গরমটা ভাল করে মালুম হয়। বিশ্রী লাগতে থাকে। অসহ্য মনে হয় সবকিছু। ঘামে শরীরের কাপড় ব্লাউজ সব চ্যাপচ্যাপে হয়ে যায়।

আবহাওয়ার খবরে এ কদিন ধরে রোজ বলছে বিকেলে ঝড় জল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কই। বিকেল হলেই মানসী আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা একটু আধটু কালো হয়। ব্যস্ ঐটুকুই। তারপর হাওয়া এসে সমস্ত মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। নিমেষেই আবার আকাশ পরিষ্কার। তখন গুমোট ভাবটা কিছুটা কমে যায়। শেষে সন্ধ্যার পর বাতাস আরো বাড়ে। অমল এখন নিজের বাড়ির [illegible] বসে বৈশাখী বাতাসের আমেজ অনুভব করে।

—বাড়ি ফিরে এসে আমার এই ছাদে বসা—পরম শান্তি। অফিসে গিয়ে আমার বার বার কি মনে হয় জান?

—কি? মানসী হালকা করে উত্তর দেয়।

—কখন বাড়ি ফিরে ছাদে যেয়ে বসবো।

মানসী মুখ টিপে আস্তে আস্তে হাসে। কোন কথা বলে না।

—কি বিশ্বাস করলে না?

—এবার বল, নিজের বাড়ির ছাদের হাওয়া কেমন মিষ্টি?

—সত্যি। এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই।

বাবুয়ার খাওয়া হয়ে গেলে আর বেশীক্ষণ বসতে পারে না। ও ঘুমিয়ে পড়ে। একদম রাত জাগতে পারে না। ঠিক বাবার মত। মানসী বলে, বাপকা ব্যাটা।

অমল একথার কোন প্রতিবাদ করে না। রাত জেগে কোন কিছু করা সত্যি পোষায় না। এটা একেকজনের অভ্যেস। কিন্তু খুব ভোরে উঠতে পারে অমল। যে কোন কাজ ঘুম থেকে ভোরে উঠে করতে ওর ভাল লাগে। এবং আগ্রহ অনুভব করে। তবে তার জন্য রাত জেগে যে কোন কিছুই করতে পারে না অমল একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই তো সেদিন সমস্ত রাত জেগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কাটাল—কই তেমন তো কোন অসুবিধে হয়নি। এটা পুরোপুরি নির্ভর করে ভাল লাগার ওপর। ভাল লাগাটা এমনই জিনিস, এর জন্য সে সবকিছুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে।

একদিন রাতজাগা নিয়ে কথা ওঠাতে অমল এইসব যুক্তি রেখেছিল। সভা হচ্ছিল তিনজনকে নিয়ে। অমল, মানসী আর বাবুয়া।

বাবুয়া বাবার একটানা কথা শুনে হাততালি দিয়ে উঠল। তুমি ঠিক বলেছ, তুমি ঠিক বলেছ। তোমাকে একশোর মধ্যে নব্বুই দিলাম। এবার মার পালা। বল, এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তোমার মতবাদ।

মানসী চুপ করে হাসতে থাকে। তারপর বাবুয়াকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার মত কি তোমার বাবার মতের থেকে আলাদা হতে পারে?

খাওয়া-দাওয়ার পরও কোন কোনদিন মানসী আর অমল ছাদে এসে বসে। বাবুয়া তখন ঘুমে অচৈতন্য। দুজনে বসে কিছু সময় আবার গল্প-গুজব হয়। পাশের বাড়ির দোতলায় তখন রেকর্ডপ্লেয়ার বাজতে থাকে। ভদ্রলোকের গানের খুব শখ। একটু রাত করেই উনি বাড়ি ফেরেন। প্লেয়ার বাজতে থাকলেই অমল বুঝতে পারে উনি বাড়ি এলেন। শোয়া পর্যন্ত কখনো জোরে কখনো আস্তে প্লেয়ার বাজাতে থাকেন। প্রায় সবই ইংরেজী বাজনা। ঘরে একটা সবুজ আলো জ্বালিয়ে ভদ্রলোক বাজনা শুনতে থাকেন। ভদ্রলোককে অমলের অদ্ভুত মনে হয়।

প্রতিবেশী হিসেবে মাত্র দু-একদিনই যা কথা হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম অনন্তমোহন পাকড়াশী। ব্যবসা করেন। ক্যানিং স্ট্রীটে দোকান। দোতলা বাড়ির ওপরতলায় ওঁরা থাকেন। নিচের তলায় দুজন ভাড়াটে। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পাকড়াশীবাবু বলছিলেন, একদম সময় পাই না, বুঝলেন। একদম সময় পাই না। ব্যবসার মত এমন বাজে জীবিকা আর নেই। খুব ভাল আছেন। যারা চাকরি করে তাদের দেখলেই আমার হিংসা হয়।

—পাকড়াশীবাবু, এটা নেহাতই আপনার বিনয়।

—বিশ্বাস করুন, এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। কি আছে বলুন আমাদের জীবনে। গুচ্ছের টাকাই শুধু রোজগার করি। কিন্তু শখ আহ্লাদ মেটানোর কোন সময় নেই।

অমল বৃত্তি নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাজনা খুব ভাল লাগে?

পাকড়াশীবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সে এক ইতিহাস। ইচ্ছে ছিল বাজনা শিখে বাজিয়ে হব। সে কি আর আমাদের ভাগ্যে আছে। এখন তাই যেটুকু সময় পাই বাজনা শুনে সে সাধ মেটাই।

পাকড়াশীবাবু করুণ করে হাসলেন।

অমল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে উঠে এসে দাঁড়ালে প্লেয়ারে বাজা ইংরিজী বাজনার সুর শুনতে পায় আর তখনই মনে পড়ে পাকড়াশীবাবুর সেই করুণ মুখ। ব্যবসায় গুচ্ছের টাকা রোজগার করতে করতে এখন যে ক্লান্ত।

কীর্তনের সুর এখন আরো স্পষ্ট। রাত বাড়ায় গান অনেক পরিষ্কার শোনাচ্ছে। কথা সেই একই কিন্তু তার ভিন্ন ভিন্ন সুর। হরে কৃষ্ণ হরে রাম। রাম রাম হরে হরে। অমল যত ভাবছে ততই যেন মোহিত হয়ে যাচ্ছে। হরিসংকীর্তনের অদ্ভুত এক অনুভূতি অমলের দেহে মনে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। মানসী বলল, চল অনেক রাত হয়েছে।

—হ্যাঁ, চল।

কাছাকাছি অন্য কোন শব্দ নেই। দূরে রাস্তার ওপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। নতুন কাউকে দেখলে কুকুরটা এরকম ডাকতে থাকে। কে একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। ওর হাঁটার ভঙ্গীটা খুব স্বাভাবিক লাগছিল না। ছাদ থেকে এটা বুঝতে পারছিল অমল।

এটা মানসী একবার হাই তুলল। ঘুমে ওর চোখ দুটো আটকে আসছে।

আজ সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে। সকালে জামা- কাপড় কাচা। দুপুরে সেলাই। এখন তাই খুব ক্লান্ত লাগছে। মাথাটা কেমন যেন টিপটিপ করছে। মানসীর মাঝে মাঝে এরকম হয়। দুপুরে একটু না ঘুমোলে বেশী করে হতে থাকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। তখন মানসীর অসহ্য লাগে।

সন্ধ্যায় ছাদে এক ঘুম দিয়ে নেওয়ার জন্য অমলের ঠিক এই মুহূর্তে ঘুম আসছে না। মানসী ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। তার পাশে বাবুয়া। একটা পা মার কোমরের ওপর রেখে ছেলে ঘুমোচ্ছে। কখনো পা কোলবালিশের ওপর দিয়ে কিংবা মা'র গায়ের ওপর তুলে ঘুমোয় বাবুয়া। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো ঘরে এসে পড়েছে। নেটের মশারির ভেতর সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অমল। মশারির ওপর বন্ বন্ করে পাখাটা ঘুরছে। হাওয়ায় দুলছে মশারির চাল। দুলে দুলে একবার ওপরে উঠছে একবার নিচে নামছে। নীল নেটের মশারিটাকে অনেকটা সমুদ্রের জলের মত মনে হচ্ছে। যেন একধার থেকে ঢেউ তুলে অন্যধারে গিয়ে আছড়ে পড়ছে।

ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজল।

অমল চেষ্টা করল জোর করে চোখ বুজতে। কাল ভোরে আবার অফিস আছে। ভাল করে ঘুম না হলে সারাদিন চোখটা জ্বালা জ্বালা করবে।

চোখ বুজতেই অমলের সামনে ভেসে উঠল অন্য একটা ছবি। খোলা ছাদের ওপর অমল একা বসে আছে। ছাদের চারদিকটা একদম খোলা। এখনো ঘেরা হয়নি। বাবুয়া কোত্থেকে যেন ছুটে এসে ছাদের ধারে দাঁড়াল। অমলের মুখ দিয়ে একটা চীৎকার বেরিয়ে এল— বাবুয়া। ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে নিল। বাবুয়া মা'র পাশেই শুয়ে।

তখনি মনে মনে ঠিক করে নিল অমল কাল থেকে যেমনি করেই হোক ছাদ ঘেরা শুরু করতে হবে। বাড়ির বাইরের রঙের কাজে হাত দেবে তারপর।

রক্তিম বর্ণমালা

হীরালাল চক্রবর্তী

ফুল আর ফুল। তারই মধ্যে ভেসে আছে শুধু মুখখানা। অবাক হয়ে গেছি আমি। এত মানুষ ছিল কোথায়? এত গুণগ্রাহী? আমি তো ভাবতাম ওর কোনো মিত্র নেই। চারপাশে ছদ্মবেশীরা, যারা বন্ধুর ভূমিকায় শুধু ঘাতকের কাজই করেছে।

হাসপাতাল থেকে সরাসরি ওকে আনা হয়েছে এখানে। জানি না, এটা ওর ইচ্ছেয় হয়েছে কি না। এ যে কত বড়ো প্রহসন তা জেনেই যেন ওকে এই রায়বাড়িতে আনা হয়েছে—আমারই সামনে, শেষ বিদায় জানাতে!

মিছিলের মুখে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি দেখতে পাচ্ছি। নাকি এ-ও আমার মনের আর এক ভুল!

...আমি যদি বলতে পারতাম— আজীবন তোমার লড়াই, তোমার বিশ্বাস, তোমার আদর্শ আমাকে যে স্পর্শ করল না, সে শুধু আমারই পাপ। আমি যদি বলতে পারতাম, আমাকে ভালোবাসাই ছিল তোমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল! একান্ত বিশ্বাসভাজন সতুকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেও তুমি ভুল করেছ। রঞ্জু, সতুদের মুখোশটাকে চিনতে না পেরে নিজেকে তুমি আরো বিপন্ন করে তুলেছিলে।

জীবন এক মস্ত যুদ্ধ, রঞ্জু। তোমার জীবনের নিয়মেই আজ সেটা বুঝতে পারি। তোমার আপসহীন যুদ্ধে শামিল না হয়ে সতুরই রং-করা মুখের মোহে ছুটে গেছি। সেদিন মনের মধ্যে এক বিন্দু গ্লানি জাগেনি। দুপুরের নির্জনতায় আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। তুমি যখন নিরলস ঘোড়ার মতো দায়বদ্ধ কর্তব্যের তাড়নায় ছুটে বেড়াচ্ছ, আমি তখন এ যুগের পিঙ্গলার খেলায় মত্ত। চোরাবালিতে জীবনের অর্থ খুঁজে মরছি।

তুমি জানতে তোমার আদর্শ, তোমার জীবনযাপন একদিন আমাকে ধাক্কা দেবেই। যে জীবন আমি বইতে পারি না, তাকেই বরণ করে তোমার বিচক্ষণ মনের সব হিসেব আমি ওলট-পালট করে দিয়েছি। আমি বলিষ্ঠ পায়ে তোমার ঘরে এসে প্রমাণ করতে চেয়েছি বিচারে ভুল হয় তোমারও। শিলিকে বড়োলোকের মেয়ে বলে অগ্রাহ্য করছ। শত্রুপক্ষের ভেবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছ। ভেবেছিলে শিলি বুঝি রোমান্টিকতার পুরোনো কবিতা। তাই তো মনের অক্ষম জেদ আমাকে টেনে এনে ফেলেছে তোমারই সামনে। তখন কি বুঝতে পেরেছি মনের যে দম্ভ নিয়ে এসেছিলাম সে মনই আমার অচেনা, অজানা!

তোমার চারপাশে মুখ-ঢাকা শত্রু। যে সৈনিক যুদ্ধ করে, তাকে জানতে হয় শত্রুব্যূহ ভেদ করেই তাকে এগোতে হবে। চারদিকে চোখ সজাগ না হলে শত্রু তার দুর্বলতম ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে। সতু সেই ছিদ্র দিয়েই ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল তোমার ঘরে। নিজের প্রতি এত বেশি সহিষ্ণু না হয়ে একটু কি কঠোর হতে পারতে না? যা তুমি চেয়েছ, আমি তা চায়ইনি। আমি বর্ণময় জীবন চেয়েছি। আদর্শের আগুন নয়। যখন খুঁজে বেড়াচ্ছি নিবিড়তা, সারা শরীর নিয়ে আমি যখন আতপ্ত উন্মুখ, তখনই তুমি চলে

গেলে বম্বে। একটা রাজনৈতিক নাশকতার কভারেজ করতে। একটা নির্মম সত্যকে তুমি বুঝি নিষ্ঠুর অবহেলায় ঠেলে দিচ্ছ—এভাবেই সেদিন আমার মন বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। আমি অনুমান করেছিলাম নিছক যান্ত্রিকতায় তুমি জীবনের সত্যকে এড়াতে চাও। তুমি যা বোঝাতে চেয়েছিলে তা বোঝার মতো শক্তি আমার হয়নি স্বীকার করছি। আমি কি জানতাম যে সে কষ্ট এত দুর্বিষহ? ভালোবাসারও অসুখ হয়!

তোমার মেধা, শ্রম, একটা ছোটো পত্রিকাকে ঘিরে নষ্ট হয়ে যাক এ যেমন আমি চাইনি তেমনি স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়াও ছিল অসম্ভব। সতুও বুঝতে পেরেছিল তার জীবনের পথ আদৌ এটা নয়। তার মন এরকম একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে পড়তে চায় না। আদর্শের ভড়ংটা আর বেশি দূর টেনে আখেরে কোনো লাভ হবে না ভেবেই সে বড়ো পত্রিকায় যোগ দিল। অবশ্য বামপন্থী ইমেজটা অক্ষুণ্ণ রাখতেই সে একটা বিশেষ কলাম ধরল। আমি জানি, এঘটনায় তুমি আহত হলেও মুখে কিছু বলবে না। তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছিলে যে, একডালে বসা পাখির ঝাঁক থেকে একটি উড়ে গেলে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করবে। তাই একে একে ফলন্ত গাছ লক্ষ করে সবাই উড়ে গেল তোমাকে ছেড়ে। একা—একেবারে একা হয়ে গেলে তুমি। যেমন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একবগ্‌গা তুমি, আমিও সে রকম একবগ্‌গা খেয়ালে। বাবা, কাকা বা ঐতিহ্য টৈতিহ্য কিছুই কিছু নয় তখন। আমার চারদিকে কেবল 'তুমি-ময় জগৎ'। তোমার যুগচিত্রের পাতায় সে সময়ে এক একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। এস্টাব্লিশমেন্টের কাগজগুলোও হকচকিয়ে যাচ্ছে তোমার কেরামতিতে। পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা, অপরিমিত সাহস, বাঘা বাঘা সাংবাদিককেও তাক লাগিয়ে দিচ্ছিল। তোমার কলমের শক্তিকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না তাঁদের।

এমন সময়ে একটা অভাবিত কাণ্ড করে বসলে তুমি। রায়বাড়ির পাপ টেনে না বের করলে বোধ হয় তোমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখাই হত না আমার। আর বলতে কী, মোহের দহে ডুবেও মরতাম না। আমি এসেছিলাম কোমর বেঁধে সম্পাদককে এক হাত নিতে। কিন্তু তোমার মুখোমুখি হতেই কী যেন হয়ে গেল আমার। এ যেন সেই 'তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ'। পরে বুঝেছি, আমার নয় তোমার কপালেই এঁকে দিয়েছিলাম সর্বনাশের তিলক। তোমাকে ছেড়ে যেদিন আবার ফিরে এলাম নিজস্ব ভুবনে, দেখলাম এরই মধ্যে সেখানে সতুর একটা স্থায়ী আসন পাতা হয়ে গেছে। যেন তোমারই বিকল্পের জায়গাটা দেওয়া হয়েছে তাকে। চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যে জায়গাটা ভেঙে দিতে পারতাম আমি, যদি উদার উপেক্ষায় আমাকে অপমান না করতে সেদিন। এমন ভাব দেখালে যেন তুমি জানতেই এই যাওয়াটা আমার সত্য, আমার স্বভাবের সায় ছিল এতেই।

আজ বলতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে ভরসা পাইনি। তোমার স্বপ্নকে আমি তাচ্ছিল্য করেছি। তিল তিল করে মুছে যাচ্ছিল আমার কল্পনা। আমার মন বলত তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ। এর থেকেই একটা হাস্যকর স্বপ্নের দিকে ছোটাছুটি। যে গাছের শেকড় নেই তার গোড়ায় জল ঢেলে কোন্ ভবিষ্যতের মহীরূহের স্বপ্ন দেখ রঞ্জু? তুচ্ছ করেছি তোমার ইডিওলজিকে। আসলে এ আমার রক্তের অহংকার। রায়বাড়ির দম্ভ।

আজ মনের মধ্যে অনেক কথার ভিড়। মনের দরজা খুলে সব কথা বলতে চাই... সেদিন প্রথম সতুর পা পড়ে আমার বেডরুমে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে। পরনে ঘরোয়া পোশাক। ওকে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছিলাম। তুমি সেই সকালে উঠে বেরিয়ে গেছ।

সন্ধের আগে বাড়ি ঢুকবে না বলে আগের রাতেই জানিয়ে দিয়েছিলে। তুমি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সতুকে ডেকে পাঠাই।

ঠাঁ ঠাঁ রোদে স্কুটার ঢুকছে আমাদের গেট দিয়ে। ঝট করে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিলাম। ভেতরটা অসম্ভব কাঁপছে। একটা অজানা অনুভূতি নেশার ঘোরের মতো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

সেই দুপুরের পর থেকে সতু তোমার শিষ্যত্ব ছেড়ে আমার শিষ্যত্ব নিল। তোমাকে ছেড়ে আসার পর সে দরজা আরো অবাধ হয়ে গেল সতুর কাছে। আর তার ক'দিন বাদেই সতু কাকার প্ররোচনায় 'যুগচিত্র' ছেড়ে সতু 'সত্যপথের' দাসত্ব মাথা পেতে নিল।

দুই

তুমি জান রায়বাড়ির একটা রাজনৈতিক ঐতিহ্য আছে। আমার বাবা কাকা সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে আসছেন। বাবার অবশ্য আরো একটা পেশা আছে, ওকালতি। সেটা গৌণ। তোমার লেখাটা পড়ে বাবা তো খেপে লাল। মামলা ঠোকেন আর কী! কাকা খুব ধীরস্থির মাথার মানুষ। বাবাকে নিরস্ত করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু আমার মাথাটা বাবার চেয়েও গরম। আগুন ধরে গেল। আমাদের বাড়ির একেবারে মূল ধরে টান মেরেছ তুমি। এই লেখাটার জন্যে সেদিন তোমার কাগজ রমরম করে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের মতো পরদিনই তোমার দপ্তরে গিয়ে ঢুকেছি। সঙ্গে ছোটোভাই আর তার জনাকয় বন্ধু। ছোটো ঘর। একখানা টেবিলই ঘর জুড়ে বসেছে। তুমি আর সতু পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে আছ। আমি সংগঠন-করা মেয়ে। যত রাগ তত আত্মবিশ্বাস। ভেবেছিলাম একটা হেস্তনেস্ত করে বুঝিয়ে দেব রায়বাড়ির একটি কেশও স্পর্শ করার স্পর্ধা যেন আর কখনো না হয় তোমার। কিন্তু ঘরে ঢুকে তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতেই প্রবল ধাক্কা খেলাম। তোমার তথ্যের ভয়ে যে কাবু হয়েছি তা নয়। তথ্যের সত্যতা নিয়েই তো চ্যালেঞ্জ করতে এসেছি। আমি ধাক্কা খেয়েছি আর এক কারণে। স্বপ্নেও ভাবিনি তুখোড় ছাত্রনেতা রঞ্জন ঘোষই 'অগ্নিগুপ্ত' ছদ্মনামে আগুন ঝরাচ্ছিল তার কলমে। আবার যে দু'জনে কখনো মুখোমুখি হব ভাবব কেমন করে? ছাত্র-ইউনিয়নে তোমার প্রতিপক্ষ হিসেবে যত তর্জনগর্জন ছিল তত ছিল দুর্বলতা। অনেকেই জানত না কলেজে দুটি ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে যত কাজিয়াই হোক, তোমাকে একবার চোখে দেখার তৃষ্ণায় ছটফট করত আমার মনটা। তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন। সত্তরের মাঝামাঝি তুমি পুলিশের তাড়ায় একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে। আর এই সাত বছর বাদে দেখা। তোমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বলতে কখন যে আমার তেজ নিভে গেছে টের পাইনি। যখন বেরিয়ে এলাম একেবারে ভিজে বারুদ। পুরো এলোমেলো ভেতরটা।

সব ছেড়ে যেদিন তোমার সামনে দাঁড়ালাম—না ছিল দ্বিধা, না সংশয়। একবারও মনে হয়নি, যে স্রোতে ভাসতে চলেছি তা আমার মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেভাবে গড়ে উঠেছি তার বাইরে টেনে নিলে জীবনটা জটিল হয়ে উঠবে। তুমি সেটা বুঝতে। এই কেন্দ্রচ্যুতির ফল কী হতে পারে, তা জেনেই যেন আরো বেশি রূঢ় হবার চেষ্টা করেছিলে তুমি। হয়তো ভেবেছিলে একদিন বাধ্য হয়েই আমি ফিরে যেতে চাইব। একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কষ্ট তুমি স্বীকার করতে পার, আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কষ্টের জীবন সম্পর্কে নানা ভয়ও দেখাতে। যা আমার কাছে অতিরঞ্জিত বলে মনে হত। শুনতাম আর হাসতাম মনে মনে। অহংকার করেছি, একবার হোকই না পরীক্ষা।

মন বড়ো বিচিত্র বস্তু। রঞ্জু, সে অহংকার হার মেনেছে আমার রক্তের দম্ভের কাছে। কষ্টের জীবন আমার অভ্যস্ত 'আমি'কে উসকে দিতে লাগল। আমাকে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ করে তুলল তোমার দর্শন। তোমার নির্বিকার ভূমিকা যেন অলক্ষ্যে আমাদের ব্যঙ্গ করছে মনে হল। উৎসবের আলোটা কখন যে নিভে গেল!

এমন সময়ে যে ঘটনাটা ঘটল তাতে মনের ঘরের শেষ দেয়ালটাও ধসে গেল।

তিন

তুমি যদি একবার 'হ্যাঁ' বলতে, জীবনের সচ্ছলতম শীর্ষে উঠে যেতে দেরি হত না। তোমার যে প্রতিভা কলমের নিষ্ঠা আর শ্রমে প্রকাশ পায় তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর। সেটা একটা ছোটো কাগজে সীমাবদ্ধ থাকবে, অনেকেরই তা মনঃপূত ছিল না। তোমার দর্শনের বিরোধিতা যারা করে তারাই আবার তোমার কলমকে সম্ভ্রমও করে। হয়তো বা তার মধ্যে ভয়ের খাদ মিশে আছে। আমার বাবা কাকা এই কারণেই সন্ধি চেয়েছিলেন। সতুকে 'সত্যপথ' টেনে নিয়েছে। তুমি একা। ঠিক যেন অভিমন্যু হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যুদ্ধের মাঝখানে। যে ব্যূহে ঢুকতে চাও, তা থেকে বেরোবার পথ ভবিষ্যতের হাতে রেখেছ। যে মেঘে বাজ তারই নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে বাজের আর দোষ কী!

সেদিন রাত্রে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। আমার মনের অবস্থা তখন এমন যে, একটা ছোট্টো টোকা লাগলেই যেন খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। অন্তর্লীন নিঃসঙ্গতার জমে-ওঠা বাষ্প তখন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। দাম্পত্যজীবনের শেষ দৃশ্য সম্পূর্ণ করতেই বোধ হয় সে রাত্রে তুমি বেরিয়ে গেলে। ঘুম ভাঙল খোলা দরজার আছড়ে পড়ার শব্দে। ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি দরজার এক পাল্লা হাটখোলা। হাওয়ায় দুলছে। ঘর শূন্য। আলোটাও নিভিয়ে যাবার কথা মনে পড়েনি তোমার। দপ করে জ্বলে উঠল মাথাটা। চারপাশ থেকে যেন ষড়যন্ত্রের চাপা স্বর ভেসে এল কানে—ছি ছি! ঝড়বৃষ্টির রাত্রে যুবতি স্ত্রীকে একা রেখে সে যেতে পারল কেমন করে? এই তোমার জীবনের নিরাপত্তা? তোমাকে হেয় করতেই এভাবে সে ফেলে যেতে পারল। এখনো যদি সরে না পড় তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

আমাদের প্রেমের অন্ত্যেষ্টি যেন সে রাত্রেই সম্পূর্ণ করে তুমি ভারমুক্ত হতে চেয়েছ। আমার মন বারবার এই যুক্তিই খুঁজে নিয়েছে।

সকালে যখন ফিরে এলে সারা শরীরে ক্লান্তির ছাপ। মনে হল সারারাত ভিজেছ। চোখ দুটো পাকা বটফলের মতো লাল। এতটুকু মায়া হল না আমার। বরং যখন চা করে আগ্রহ ভরে দিতে এলে এক ধাক্কায় ফেলে দিলাম চায়ের কাপ। ক্লান্ত চোখের থমকানো ভাবটা লক্ষ করে বললাম, অনেক তো কাণ্ডজ্ঞানের কথা শোনাও। ঝড়জলের রাত্রে দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে যাওয়া কোন্ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয়?

সরি। তুমি অপ্রস্তুত হবার ভাব করে বললে, এটা আমার ভুলই হয়েছে। ডাকতে গিয়ে দেখলাম ঘুমোচ্ছ। তাই ডিস্টার্ব না করে দরজাটা ভেজিয়ে—

কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। এটা তোমার ভুল নয়। ইচ্ছে করে, জেনে-বুঝেই করেছ।

তুমি ম্লান হাসলে। বললে, এটা তোমার ভুল ধারণা শিলি। ভুল আমি একটু করেছি তোমাকে না জানিয়ে। ওই সময়ে যদি ছুটে না যেতাম তথ্যটা হাতছাড়া হয়ে যেত। রাগে অন্ধ না হলে ও রকম বিকৃত বীভৎস চিৎকার আমার গলা চিরে বেরোত না।

নিজের কানকেই বিশ্বাস হল না। তারপরেই ভেতরের আক্রোশ দ্বিগুণ বেড়ে গেল আমার। সেদিনই সবকিছু গুছিয়ে যে ভাবে বেরিয়ে গেলাম তা বোধ হয় আমার পক্ষেই সম্ভব।

পরে জেনেছিলাম সেই রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে। গিয়েছিলে আমাদেরই কারখানার ভাঙা পাঁচিল খুঁজতে। পাঁচিল চাপা পড়ে কারখানার একটি মজুর পরিবার মারা পড়েছে। রাতারাতি পাঁচিল তুলে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। দাদা ছিল ওপর ওপর। আসলে সবটাই হচ্ছিল কাকার বুদ্ধিতে। সামনেই কাকার ইলেকশান। সুতরাং ব্যবস্থাটা হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে। তুমি বোধ অনেকদিন ধরে একটা সুযোগ খুঁজছিলে। বড়ো কাগজগুলো অদৃশ্য আঙুলের ইশারায় চুপচাপ। কেউ কল্পনাও করেনি তোমার মতো ছোটো পত্রিকার এক সম্পাদক মাসের পর মাস দাঁতে দাঁত চেপে মাটি খুঁড়ে একটা ভয়াবহ সত্য আবিষ্কার করতে পারে।

তোমার কাগজে যখন খবরটা বেরোয়, কেউ গুরুত্ব দেয়নি। (আমিই কি বিশ্বাস করেছি? তখন মনে হত যা কিছু লেখ সবই অলীক। আমাদের হেয় করাই তোমার উদ্দেশ্য। আমাদের গায়ে কাদা না ছেটালে তোমার সংগ্রাম যেন সম্পূর্ণ হয় না।) কেনই বা দেবে? কাগজের সেল বাড়াবার এ একটা নোংরা পদ্ধতি তোমার। কোনো মজুরই মারা যায়নি। এভাবেই আমার বাবা কাকা প্রত্যেকটি সভায় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। বড়ো বড়ো কাগজের বড়ো বড়ো খবরের ভিড়ে এই তুচ্ছ খবরটা হারিয়ে যাবারই কথা। তা ছাড়া তোমার কাগজ পড়ে ক'জনই বা এ রকম একটা আত্মসন্তুষ্টি ছিল আমাদের বাড়ির পুরুষদের।

কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির বুকে তোমার শানানো ছুরিটা বিঁধল দু'মাস বাদে। তোমার সেই লেখাটার হেডলাইন বোধ হয় ছিল 'দায়বদ্ধ সাংবাদিকের দূরবিন।' তোমার ওই ছোট্টো কাগজ হইচই ফেলে দিল একেবারে। পাঁচিল ভেঙে মাটি খুঁড়ে টেনে তোলা হল শুধু একটি মজুর পরিবার নয়, সার সার কঙ্কালের এক বীভৎস সমাধি। তুমি লিখলে এরা কারখানা থেকে নিখোঁজ পঁচাত্তরের একদল হতভাগ্য শ্রমিকের কঙ্কাল!

তোমার কাগজের মান বেড়ে গেল। বিক্রি তো বেড়েছেই। কিন্তু আমাদের মুখে ছুঁড়ে দিলে রাশি রাশি কলঙ্কের ধুলো। কাকার মুখ পুড়ল। আর আমি? তোমার এ যুদ্ধে শামিল না হয়ে রায়বাড়ির মেয়ের ভূমিকাতেই নেমে যেতে হল পাকাপাকিভাবে।

চার

ভেবেছিলাম তুচ্ছ কুটোর মতো ভেসে যাবে একদিন। অদৃশ্য হাতের খেলা তোমার তো অজানা নয়। তুমি জানতে তদন্তের নামে একটা প্রহসন হবে। তাই-ই হল। ভোটে জিতে কাকা ততদিনে সাংসদ। বাবা আইনের বই ঘেঁটে ঘটনাটাকে একেবারে সমুদ্রের গর্ভে ঠেলে দিলেন। মামলা ভেস্তে গেল। তোমাকে মচকানো গেছে কিন্তু ভাঙা গেল না। বোধ হয় তারই জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও একেবারে বাতিল হল না। প্রায়ই তোমার কাছে শাসানির চিঠি যেতে শুরু করল। তবুও অগ্নিগুপ্তের কলম থেমে যায়নি। তার গতি দুর্নিবার। তোমার 'দায়বদ্ধ সাংবাদিকের দূরবিন' যত জনপ্রিয় হচ্ছিল, ততই শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। সতু পুরোপুরি তোমার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। সে কলম ধরল তোমার অভিযোগ খণ্ডন করতে। দুই শিবিরে দাঁড়িয়ে দু'বন্ধু পরস্পরকে লক্ষ করে অস্ত্র শানাচ্ছে! একদিন সতুকে বললাম, এ অস্ত্রে ওকে টিট করা যাবে না। অন্য অস্ত্র নাও।

কী অস্ত্র?

এতটুকুও দ্বিধা না করে বললাম, ওর চরিত্রে কালি ছিটিয়ে দাও। শুনেছি তোমার দপ্তরে ওর একজন ভক্ত আসে মাঝে মাঝে তোমাকে সাহায্য করতে। তার নাম ঈপ্সিতা। মেয়েটি সুন্দরী, স্মার্ট।

সতুর দু'চোখ খুশিতে চিকচিক করছিল। বলল, দারুণ অস্ত্র! এবার কর্ণ, তোমার কবচকুণ্ডল সামলাও।

রঞ্জু, এটা আমি পারলাম। একটা অকথ্য আক্রোশ আমাকে কেমন উন্মাদ করে তুলেছিল। তোমার দিকে নোংরা অস্ত্র ছুঁড়ে দেবার আগে ব্রুটাসের মতোই অসহায় আমি। একবারও মনে পড়েনি যাকে মিথ্যে অস্ত্রে আঘাত করছি সে আমার আইনসংগত স্বামী। সরকারি খাতা থেকে ও নামটা বাতিল হয়ে যায়নি। তুমি সাংবাদিক। তুমিই বুঝতে পার অসৎ সাংবাদিকের অসাধ্য বলে কিছু নেই। গোয়েবল্‌সীয় থিয়োরিতেই চলল সে কেচ্ছা। ফটো ছাপিয়ে অকাট্যভাবে দেখানো হল তোমাদের অবৈধ সম্পর্ক।

অথচ কোনো প্রতিবাদ উঠল না তোমার দিক থেকে। ইউক্যালিপটাসের মতো খাড়া হয়ে রইলে। তুমি দায়বদ্ধ। তুমি নতুন সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে থাকা সৈনিক। এ অহংকার থেকে তোমাকে টলানো গেল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোন্ গহন পথে তোমার মারণাস্ত্র এগোচ্ছিল, আমি তার বিন্দুমাত্র আভাস পেলাম না।

রঞ্জু, ভালোবাসার ভাষা যদি সরব হয়, হয়তো তার কোনো মূল্যই থাকত না। সতুর ভালোবাসা শরীর-সর্বস্ব নীতিহীন উন্মাদনা। সেদিন যা বুঝতে চাইনি আজ মর্মে মর্মে সেকথা বুঝতে পারছি।

মানুষের ছোটার শেষ নেই। কেউ কেরিয়ারের দিকে, কেউ ভোগের তাড়নায় ছুটছে। তুমিই কেবল ছুটছ বিবেকের তাড়ায়, মানুষের খোঁজে। তুমি প্রায়ই বলতে—যে জাতির জীবন গতিময়, তারই আছে অস্তিত্বের অধিকার। নিথরতার বৃত্তে যে জাতি ঘুমোয় তাকে জাগানোই আজন্মের স্বপ্ন তোমার। আমার চোখ দৃষ্টিহীন, তাই চোখ মেলেও কখনো চক্ষুষ্মতী হতে পারলাম না।

তোমাকে যদি গোপালপুরের বিচে না দেখতাম, বোধ হয় নিজের মনকে দেখা হত না আর একবার ফিরে। আর এভাবে ধিক্কারও দিত না আমার অন্তরাত্মা।

গোপালপুরের বিচের নির্জনতায় আমি আর সতু। সমুদ্র এ সময়ে বিক্ষুব্ধ, গর্জনশীল। সারাদিনই বৃষ্টি। বিকেলের দিকে আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই দু'জনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিচে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দু'পা থমকে গেল। চোখের ভুল না সত্যি! এ সময়ে তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি। সতু তোমাকে লক্ষ করেনি। হয়তো বা করলেও চিনতে পারেনি। কিন্তু এ চোখ যাকে একদিন গভীর করে দেখেছে, তিল তিল করে যার স্পর্শ অনুভব করেছে দেহে মনে, তাকে ধোঁয়াটে আলোয় কেন, অন্ধকারেও চিনতে পারল। অনেক দূর থেকে দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। সমুদ্রের দিকে তোমার মুখ। হাওয়ায় উড়ছে চুল। বিষণ্ন আলোয় তোমাকে বড়ো একা, বড়ো অসহায় মনে হল। ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। কী একটা গলায় এসে আটকে গেল।

সতু অবাক হয়ে গেল যখন বিচ ছেড়ে একাই পা বাড়ালাম হোটেলের দিকে। না, সে রাত্রে সতুর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি।

পাঁচ

পরদিন কলকাতায় পা দিতেই খবরটা কানে এল। যুগচিত্রের ছোট্টো অফিসটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একটা অদৃশ্য চাবুক শপাং করে পিঠে পড়ল। এখন বুঝতে পারছি যে মানুষ কাজের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকে, যার দায়িত্ববোধ পাহাড়ের মতো অনড়, সে অসময়ে বিচে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বিশালতা মাপবে, তাও কি সম্ভব! দিনান্তের ম্লান আলোয় যে ছবিটি আমার বুক মুচড়ে দুমড়ে দিল সে কি এরই জন্য? এত কষ্টের এত শ্রমের 'যুগচিত্র' পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার মন চকিতে বুঝে নিল এর নেপথ্য কাহিনীটা কী। সতু হয়তো সবই জানে। আমাকে কিছু জানায়নি। শুধু কোনো একটা অজুহাতে আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নেওয়াই ওর কাজ ছিল মনে হয়! বারবার একটা বোবা চিৎকার বুক ফেটে বেরোতে চাইছে—এতটা আমি চাইনি..এতটা চাইনি...

অসীম সমুদ্রে, একা এক মানুষ। চারিদিকে মৃত্যুদূতেরা ঘিরে ধরেছে। স্বপ্নের মধ্যে এ ছবি অতল অবচেতনে রক্ত ঝরিয়ে যায়। যে চিৎকার বুক ফেটে বেরোয় না তার যন্ত্রণা মর্মান্তিক।

বাবা সেদিন বললেন, এবার ডিভোর্স স্যুট করে দাও। বাকিটা আমি করব। আমি জানতাম সতু অনেকদিন থেকে এ রকম একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দাদাও একদিন সতুর হয়ে বেশ খানিক ওকালতি করে গেছে। এভাবে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে বসে থাকাটা কারো পছন্দ নয়। তোমার কাছে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ ডিভোর্সও দিচ্ছি না। সতুই শেষে এর একটা ফয়সালা করতে নেমে পড়েছে। সেও তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে বলে কানে এসেছে। হয়তো ওদের মধ্যে একটা রফা হয়ে যাবে। অনেকদিন ধরে মনোমালিন্য চলছিল দু'জনের।

তোমাকে যেদিন ছেড়ে আসি, মনে আছে একটা টিপও ফেলে রেখে আসিনি, যাতে আমার ব্যবহার করা কোনো বস্তুতেই তোমার স্পর্শ না লাগে। এরপর আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম ডিভোর্সের প্রস্তাব প্রথমে আসবে তোমার দিক থেকে। আমাকে ডিভোর্স দেবার অনেক অস্ত্র মজুত আছে তোমার হাতে। আমার যুক্তি বড়ো ভোঁতা। কষ্টকর জীবন-যাপন, ছোট্টো ঘর, দমবন্ধ পরিবেশ ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে দুটো জীবন কেটে ভাগ করা যায় না। তোমার চরিত্রে কলঙ্ক ছিটিয়ে সাময়িক একটা ধাক্কা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। মানুষের বিশ্বাসের শক্তি অত পলকা নয় (এ সত্যটা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম।)। সে চেষ্টা একটা ছোট্টো ঢেউ জাগিয়েই থেমে গেছে। ঈপ্সিতা তারপরেও সেখানে কাজ করছে। ওর আত্মবিশ্বাসকে এতটুকু টলাতে পেরেছি মনে হয় না।

বাবার কথার কোনো জবাব দিইনি। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময়ে বাইরের ঘরে একবার চোখ ফেরাতে দেখলাম সতু বসে আছে। মিনিট দুই বাদে পর্দা টেনে সতু আমার ঘরে এসে দাঁড়াল।

কবে উকিলের চিঠি ধরাচ্ছ?

ভেবে দেখিনি।

তাড়াতাড়ি ভাবো। দেরি করে লাভ নেই।

তাড়া কিসের? তোমার দিকটাও তো মেটেনি।

মিটতে বেশি দেরি নেই।

সতুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হল না। সেদিনের ছবিটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। অন্তহীন সমুদ্রের মুখোমুখি বিষণ্ণ একটি মানুষ। বাতাসে চুল উড়ছে। ছবিটা যেন পাথর হয়ে চেপে আছে বুকের ওপর।

ক'দিন বাদে ছোটোভাই রোহিত একখানা যুগচিত্র এনে দিল আমার হাতে। প্রথম পাতার এক কোণে ছোট্টো একটি খবর। প্রেস পুড়ে যাওয়ার ফলে অর্থের অভাবে যুগচিত্র অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকছে।

কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে দিলাম। মনটা ভার হয়ে রইল। যুগচিত্র বন্ধ হচ্ছে বলে নয়, কাগজের পেছনে যার এত নিষ্ঠা শ্রম তার জন্য। আমি জানি তুমি হেরে যাবার মানুষ নও। তবু এই যে সাময়িক ধাক্কা তোমাকে থামিয়ে দিল এ যেন আমারও হেরে যাওয়া। কিন্তু কেন এমন ভাবলাম? নিজেকে প্রশ্ন করেছি। আমি তোমার কে? তোমাকে তো ছেড়ে এসেছি। ক্ষতি যা চেয়েছিলাম তাও হল। তবে কেন আজও আমার অনেকটা অধিকার করে আছ তুমি? কেন?

ছয়

রঞ্জু, শক্তি কী? বলি বটে, কিন্তু ভালো করে জানি না। একটা প্রত্যক্ষ শক্তির কথাই জানি। অর্থ। জ্ঞান হওয়ার পর এর অসীম ক্ষমতা চিনেছি। বাবা কাকারা প্রদীপ ঘষছেন আর আশ্চর্য দানব জোগান দিয়ে যাচ্ছে। টাকায় কী না হতে দেখেছি এ বয়সে। কাকিমা পাগলা গারদে বসে অবিরাম গান গেয়ে যাচ্ছেন—টাকা চাই, টাকা। এক কেজি ভালোবাসা এক টাকা। এক মণ জীবন দু'টাকা। সোনার হরিণ চাও, পাঁচ টাকা দাও।

এভাবেই গুনগুন করে প্রলাপ বকতেন কাকিমা। বাহাত্তরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসছে সে সময়ে। সোনার তরুণদের জাল পেতে ধরে আনা হয়েছে। গঙ্গার দিকে একটা কুঠুরি ঘর আছে আমাদের। হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল সেইসব ছেলেদের। আর এক ঘরে বসেছেন পুলিশ অফিসার ও রায়বাড়ির পুরুষেরা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা। গভীর পরামর্শ চলছে রুদ্ধদ্বারে (এখন বুঝতে পারি, রায়বাড়ির ওপর তোমার কেন এত ঘৃণা। কেন তাদের বিরুদ্ধে তোমার অক্লান্ত যুদ্ধ)।

তখনো সরাসরি রাজনীতি করতে নামিনি। সেই নবীন তরুণ প্রাণবন্ত হরিণগুলো মহাভোজের বলি হল মাঝরাত্রে। কাকিমা কেমন করে যেন সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। তারপরই মাথার গোলমাল। আরো পাগল করে তুলেছিল বাড়ির দাম্ভিক পুরুষগুলো। শেষ পর্যন্ত কাকিমার আশ্রয় হল পাগলা গারদে।

কেউ দূর স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, সেই পাঁচ তরুণের মৃত্যুর রহস্য এত বছর বাদে ফাঁস হয়ে যাবে তোমার হাতে। ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম। ক'মাস পর বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটাল তোমার নতুন কলেবর নিয়ে বেরোনো যুগচিত্র। কিন্তু রঞ্জু, আমার এমন শক্তি ছিল না, বিপন্ন জেনেও তোমাকে রক্ষা করতে পারি। তুমি রায়বাড়ি সম্পর্কে আর একটু সতর্ক হতে পারতে। টাকার শক্তি যে কী সাংঘাতিক, তা জেনেও তুমি সব কিছু তুচ্ছজ্ঞান করতে পার, কিন্তু এই টাকার মন্ত্রে সমাজ অন্ধ। পাঁচ-পাঁচটা তরতাজা ছেলে গুম হয়ে গেলেও সে চোখ বুজে থাকতে জানে। কাকিমাদের মতো মেয়েরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আমৃত্যু গারদে পচে মরতে পারে। তোমার বিবেক তোমার আদর্শ দুরারোগ্য ব্যাধির মতো তোমাকে চরম ও চূড়ান্ত সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

আজ যা ভাবছি সেদিন যদি এভাবে ভাবতাম! গুপ্ত ঘরে গভীর পরামর্শ বসেছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি টেবিলে পড়ে আছে বজ্রবাহী যুগচিত্রখানা। তখনো পরিষ্কার নয়, কী করতে চলেছেন ওঁরা। কিন্তু মনটা কেমন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। একটা

অস্থির ভাব ঘর-বার করাচ্ছে আমাকে। কী করব, কী করব যখন ভাবছি, সতুকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

কী আলোচনা হল? আমার চাউনি দেখে সতু একটু থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, কীসের আলোচনা?

এইমাত্র যেটা সেরে এলে। আমি চোখ সরালাম না ওর চোখ থেকে। সতু এবার সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, তোমার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওঁদের ব্যাপার ওঁরা বুঝুন। বরং তুমি ফর্মটায় সই করে দাও। কাল তোমার বাবা এটা জমা দেবেন কোর্টে। বলে সতু ফর্মটা এগিয়ে ধরল আমার দিকে।

ও আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম। গলা শক্ত করে বললাম—সতু, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। যুগচিত্র নিয়ে আলোচনা হয়নি বলছ?

আলোচনা বলতে কী মিন করছ?

যা মিন করছি তা ওকে বলা গেল না। তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা কেমন করে বুঝবে সতু? তোমার বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও আমি কারুর কাছে স্বীকার করিনি এ পর্যন্ত। এই স্বীকার না করার আড়ালে তুমি যে আমার হৃদয়-মনের কতখানি অধিকার করে আছ, তা জানার কথা তো নয় সতুর।

সতু মুখ গম্ভীর রেখে বলল—শোনো, আমি দিল্লি যাচ্ছি. ফিরে এসে আশা করব আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে।

কবে যাবে?

আজই রাতের ফ্লাইটে।

তারপর সতু যা বলল তা যে খুব অভিনব তা নয়। দু'জনেরই স্বাধীনতার সম্মান রেখে বিয়ে না করে বসবাস। যার নাম লিভিং টুগেদার—কোহ্যাবিটেশন। আমি জবাব দিলাম না। সতুকে যে কথা বলা যায় না সে কথাই তখন ভাবছি। অনেক প্রথাই ভাঙলে ভাঙা যায়। কিন্তু সবই কি যায়? এ বাড়িতে পশ্চিমি কালচার যে অচল নয় তাও দেখেছি দাদার বউকে দিয়ে। এই যে আমার 'দাপটে সব কিছু ভাঙার প্রবণতা'—এরই মধ্যে কখনো কখনো নিজের দিকে চেয়ে কি চমকে উঠিনি? এই যেমন সতুর লিভিং টুগেদার-এর প্রস্তাব। যে পরিবেশে বড়ো হয়েছি সেখানে স্বাধীনতার সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। তবু সতুর সঙ্গে শুধুমাত্র শরীরী অন্তরঙ্গতার পাপবোধ আমাকে মুক্তি দেবে কি?

ছোটোবেলা থেকেই শিখে এসেছি পুরোনোকে ভাঙো। কিন্তু ভাঙা বলতে কী বোঝায় তা কি জেনেছি আজও? আমাদের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্ব পায় ভোগ, তার হাত ধরে চলে ভণ্ডামি। এ দুয়ের প্রভাব থেকে আমি তো মুক্ত নই। জীবন সম্পর্কে এই মনোভাবকে তুমি ঘৃণা করেছ। করাই তো স্বাভাবিক। সত্যি বলতে কী, তোমার অমোঘ উপস্থিতি নিয়ত আমাদের মিথ্যেগুলোকে চিনিয়ে দেয়। চিহ্নিত করে দেয় আমার পাপবোধকে। যে চেতনা তোমাকে জীবনের অর্থ বোঝায়, মনের গোপনে তার ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে রঞ্জু। নিজের কাছে এ সত্য তো গোপন করা যায় না। রায়বাড়ির কুটিল হাসি তাই এত সন্ত্রস্ত করছে আমাকে। সতুকে দেখেই মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। ওর কোনো কথা আমার কানে যাচ্ছিল না। শুধু অস্ফুট সতর্ক একটা স্বর বেজে চলেছে মনের মধ্যে— সাবধান— সাবধান...

আমার বাবা নিঃসন্দেহে আইনের জগতের একটি ধুরন্ধর শক্তি। কাকা রাজনীতির অশুভ মেধা। আর দাদা ব্যবসার জগতে এমন এক নাম যার কপালে শ্রমিক নিধনের তিলক। এক ঝাঁক কেউটের ছোবল থেকে কতদিন নিজেকে বাঁচাতে পারবে রঞ্জু!

সাত

অজস্র ফুল দিয়ে তোমাকে ওরা সাজিয়ে এনেছে। তোমাকে ঘিরে অজস্র মুখ—শোক, যন্ত্রণা, প্রতিজ্ঞার আশ্চর্য এক একটি ছবি! এত মানুষ তোমার সঙ্গে রঞ্জু! এত মানুষ!

কাল খবরটা কানে যেতে আমূল চমকে উঠেছিলাম। ট্যাক্সির মধ্যে তোমার হার্ট অ্যাটাক। কে যেন ভোরের দিকে টেলিফোনে খবরটা জানিয়েই চুপ করে গিয়েছিল। সতু কি? কিন্তু তার তো কাল দিল্লি যাবার কথা ছিল!

আমার হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। একটা শীত-শীত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে উঠছে একটা আর্ত অসহায় চিৎকার—মিথ্যে, মিথ্যে...

ওরা এল দশটার সময়ে। কিন্তু আমার কাছে কেন? এ কী পরিহাস ওদের? না, না, মহান এই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে পরিহাসের মতো তুচ্ছ কথা আসবেই না ওদের চেতনায়। ওদের চোখে-মুখে অসীম বেদনা আর অপার দৃঢ়তা শুধু। তোমার সত্যকে ধরে রাখার, এগিয়ে নিয়ে যাবার।

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। চোখে সেই মোটা ফ্রেমের চশমা। কপালের ওপর একগুচ্ছ চুলের খেয়াল। ঠোঁটে যেন জীবন্ত ফুটে আছে তোমার সেই বিখ্যাত চাপা হাসিটি। বিদ্রূপে শাণিত। যেন বলছ, আমাকে হারাতে পারনি।

হঠাৎ মনে হল আমিও যদি পারতাম একগুচ্ছ গোলাপ তোমার পায়ের কাছে রাখতে। কিন্তু তুমি যে অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে শুয়ে আছ। আমি পৌঁছাই কী করে! গোলাপই বা পাব কোথায়? তোমার পায়ে দেবার গোলাপের গুচ্ছ তুলে নেবার মতো শক্তি কোথায় পাবে আমার এই হাত দুটো? নিশ্চল দাঁড়িয়ে আমি শুধু অনুভব করি বুকের গভীরে রক্তক্ষরণ—অবিরাম, আমৃত্যু।

মিছিল এগিয়ে চলেছে। দৃঢ়, গতিময়। চলমান একটা প্রত্যয়ের মতো।

ট্যাক্সিটা সরাসরি থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটুও চাঞ্চল্য নেই। সোজা গিয়ে ও.সি.র টেবিলের সামনে দাঁড়াল শিলি।

একটা রিপোর্ট লেখাতে চাই।

বলুন।

যুগচিত্রের সম্পাদক খুন হয়েছেন। হার্ট অ্যাটাক নয়।

আপনি?

আমি রঞ্জন ঘোষের স্ত্রী। যুগচিত্রের সম্পাদক অগ্নিগুপ্ত যাঁর নাম।

কী করে বুঝলেন খুন হয়েছেন?

সব প্রমাণ দেব।

কে খুন করেছে?

বলব। বলবার জন্যেই এসেছি আমি।

অস্ত্রলেখা

সুনীল দাশ

ও আসছে। ও যা লিখেছে তাতে আজ কিংবা আগামী কাল অথবা তার পরেরদিন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ওর সোজা আসার কথা আমাদের এখানে। এই একযুগ পর ওর এত আগ্রহ নিয়ে সোজা আমাদের এখানে আসা শুধুমাত্র কি আমার আর গৌরীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে? নাকি আগ্রহের কারণটা ওর ওই ডায়েরি? আমরা ভাবতে পারিনি, ডায়েরিটার জন্যে এত বছর পরেও ওর ওই রকম টান থাকবে।

মাসখানেক আগে বিতানের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই, এই মাসখানেক ধরে, এক ধরনের টেনশন তৈরি হয়েছে আমার আর গৌরীর মধ্যে। কিছুকাল আগে বিতানের ছোটবোন বিজয়া এসেছিল আমাদের এখানে দুটো দিন থাকতে। সেটা নিয়ে একটা অপরাধবোধ তো আমাদের আছেই। তার ওপর, বিতানের ওই চিঠিটা পাওয়ার আগের সপ্তাহেই বিতানের ছোটভাই বিভাসও এসেছিল ওদের দিদি বিনতার নিরুদ্দেশের দুঃসংবাদ নিয়ে। ওই ব্যাপারটাতে আমাদের কিছু করার ছিল না, করতেও পারিনি। কিন্তু বিতানের চিঠি পাওয়ার পর, ওই ব্যাপারটাতেও মনের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি শুরু হয়েছে আমাদের। এখন মনে হচ্ছে, কিছু কি করতে পারতাম না, অন্তত কিছু করতে চাইছি....তার উদ্যোগটাও তো দেখাতে পারতাম। আমার, গৌরীর এবং বিতানের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের কাছে সেটা খুবই প্রত্যাশিত ছিল।

এক মাস আগে, বিতান ওর মুক্তির খবর জানিয়ে লিখেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে ও সোজা আসবে আমাদের বাড়িতে। দেড় যুগ আগে, কলকাতায় একমাত্র আমাদের বাড়িটাই ওর কাছে ছিল আপন। আমার মার জন্যে ওর ভেতর একটা টান গড়ে উঠেছিল।

এক মাস আগের চিঠিতে বিতান যেদিন আসবে লিখেছিল সেদিন আসেনি। আসেনি দেখে আমরা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম ও আর আসবে না। আমার আর গৌরীর ভেতরের উদ্বেগটাও ধীরে ধীরে থিতিয়ে যেতে শুরু করেছিল। ক্রমে নিজেদের উৎকণ্ঠা নিয়ে একটা দুটো হালকা কথাও ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম।

সম্প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে, আমার একটা সুরময় অভ্যেস তৈরি হয়েছে। ক্যাসেটে বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। কদিন আগে, ওই রকম একটা হালকা ধ্রুপদী বাজনা চালিয়ে, মনের তলায় বিতান প্রসঙ্গ নাড়াচাড়া করতে করতে বিছানায় শরীর ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। সিগারেট ধরিয়ে গৌরীকে বলেছিলাম, 'আসবে বলে মিছিমিছি ভয় দেখাল আমাদের'।

গৌরীও বেশ হালকা গলাতেই শুরু করেছিল, 'এলো না বলে ভেতরের টেনশনটাও কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে—তাই না?'

'ওটা আমার থেকেও তোমার মধ্যে কাজ করছিল আরো বেশি করে। এটা তো সত্যি, একযুগ পর বিতানের আমাকে এই অবস্থায় মেনে নেওয়া সম্ভব হলেও--

তোমাকে এই ভূমিকায় ও কিছুতেই মেনে নিতে পারত না।' আমি হাসতে হাসতেই মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের শোবার ঘরে হালকা সবুজ আলো খুব নরম করে ছড়িয়েছিল। নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রিন্ট গৌরীর নাইটিতে। গৌরী পাউডার ছড়াচ্ছিল ওর ঘাড়ে। আমার কথা শুনে গৌরীর সক্রিয় হাত স্থির হয়ে গেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে গৌরী বেশ তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, 'তোমার চেয়ে আমার অপরাধবোধটা কিন্তু একটুও বেশি হওয়ার কথা নয়'।

আমি বড় করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে হাসি মিশিয়েই বলেছিলাম, 'মেয়েদের এই একটা সুবিধে। বেকায়দায় পড়লেই অনায়াসে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে।'

গৌরী হাত বাড়িয়ে বাজনা বন্ধ করে দিল। রীতিমত চটে গিয়ে বলল, 'বেকায়দায় মানে? তুমি কি বলতে চাইছ?'

'এটা তো ঠিক—ওর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই আমরা একটা অপরাধবোধের শিকার হয়ে পড়েছি।'

'অপরাধবোধ আবার কি? আসলে ওর প্রতি সিমপ্যাথিটাই আমাদের এভাবে নাড়া দিচ্ছে। এক যুগ আগে আমরা তিনজনে তিনজনের সবচেয়ে আপনজন ছিলাম বলেই এমনটা হচ্ছে।'

কথাটা বলে আমি আমার বিদেশী সিগারেটের শেষ অংশে পর পর অনেকগুলো টান দিয়ে, অবশিষ্ট টুকরোটা মীনেকরা ছাইদানের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে বললাম, 'আচ্ছা, মনে করো, আমাদের বাড়ি বিতান এলে যে দৃশ্যটা তৈরি হবে, সেটা যদি উল্টো হতো--তার মানে এক যুগ আগে পালাতে গিয়ে--বিতান না ধরা পড়ে-- আমি যদি ধরা পড়তাম পুলিসের হাতে? আর তখন চাকুলিয়ার সেই বাড়িটা থেকে তোমাকে নিয়ে আমার বদলে বিতান যদি গা ঢাকা দিতে পারতো?'

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলেনি গৌরী। হয়তো সেই মুহূর্তেই এক যুগের ওপর সময় পেরিয়ে, ওর মন চলে গিয়েছিল বাংলা-বিহার সীমান্তের চাকুলিয়ার পুরানো সেই বাড়িটায়। দোতলার জানলা পেরিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গিয়েছিল বাইরের ঘন অন্ধকার বিঁধে অনেক দূরে। তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে যেন এমন আবহে বলেছিল, 'খুব একটা বদল হতো না সে দৃশ্যে। শুধু তোমার জায়গায় বিতান থাকতো আর এক যুগের ওপর সময় পেরিয়ে বিতান না এসে তুমি আসতে জেল থেকে।'

গৌরীর শিথিল স্বর থিতিয়ে যাওয়ার পর সেদিন বলেছিলাম, 'তাই কি? দেখতাম কি এমন সাজানো গোছানো জীবনের মাঝখানে তোমরা দুজনে আছো?'

'ঠিক তাই। কেন না বিতানের বয়সটাও তো ছাব্বিশে আটকে থাকতো না। এক যুগের ওপর বয়স শুধু তাকে চর্বি দিতো না, পরিণত মনটাও দিতো। বাস্তব জীবনের সঙ্গে প্রতিদিন ঘষা খেয়ে ওর ভোঁতা হয়ে যাওয়া ইচ্ছেগুলোতে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শান পড়তো।'

কেন জানি না অনেক দিন পর গৌরীকে ঈষৎ উত্যক্ত করার মজা ঢেউ ভাঙছিল আমার মধ্যে। বললাম, 'আমার তা মনে হয় না। আমাদের মধ্যে বিতানই একমাত্র কখনো শত্রুকে পিঠ দেখাতে শেখেনি। মনে আছে, মধুসূদনের দুটো লাইন বিতান মাঝেমধ্যেই আমাদের শোনাতো, 'ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি/রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।'

এর আগে পর্যন্ত গৌরী তার নিজের ভেতরের দংশনগুলোকে দাবিয়ে, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছিল আমাদের সুখী গৃহকোণের স্বপক্ষে। আমার শেষ কথাটা ওকে ধ্বসিয়ে

দিয়েছিল সেখান থেকে। গৌরী তক্ষুনি চলে গিয়েছিল পাশের ঘরে, আমাদের দশ বছরের ছেলে তুতু সে-ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

এইভাবে শুধু সেই রাতটাতেই নয়, বিতান আমাদের দুজনের মাঝখানে বারবার ঢুকে পড়ছে। এই তো সেদিন ফ্যাকট্রির একটা হাঙ্গামা মিটিয়ে বাড়ি ফিরে গজগজ করছি দেখে আচমকা গৌরী বলে উঠেছিল, 'ভাবা যায় কি রকম পাল্টে গেছে তোমার ভূমিকাটা! এক সময় বিতান আর তুমি অপ্রেসড মানুষদের জন্যে কি লড়াই করেছ, মনে আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ঘা দিয়েছিলাম আমিও। বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে। মনে আছে তখনকার তোমার ভূমিকাটাও। ডিক্লাসড্ হওয়ার সেই হিতবাদী সাধনা পর্বও। আর আজ?'

দপ করে জ্বলে উঠতে গিয়েও নিবে গেছিলাম দুজনেই। নিজেদের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিলাম—এ কী হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে! এরকমটা হবে কেন?

বরং এর উল্টোটা হওয়াই তো স্বাভাবিক! খবরটাকে তো রীতিমত খুশির মনে করে নিতে পারি। এত বছর পর আমাদের প্রিয়জনকে দেখার আনন্দে, পুরনো সে দিনের কথার স্মৃতি ছোঁয়ায়, আমাদের ভেতরে ভেতরে কি একটা আনন্দ পাওনা হয়ে উঠেছে না? আর সব কথার ফাঁকে ফাঁকে আমরা এও কি ভাবছি না— বিতান জেল থেকে বেরিয়ে রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়ার আগে যে কটাদিন থাকবে আমাদের এখানে, সেই কটাদিন ও কত সহজে কত খুশি হয়ে থাকতে পারে? বিতানের আসাকে ঘিরে একটা ঘন বন্ধুত্বময় আয়োজনের ছক কি আমরা এর মধ্যেই তৈরি করতে শুরু করিনি?

আমরা দুজনেই ইদানীং বিতানের ভাললাগা মন্দলাগাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেবে আনছি। যেমন গৌরীকে সেদিন বললাম,'শোনো, এখন আমাদের দরজায় জানলায় যেসব পর্দা ঝুলছে ওগুলো পাল্টানো দরকার। পর্দাগুলো বড় বেশি রঙচঙে। দামী বলে বলছি না, কিন্তু এর বদলে তোমার যে এক সেট হ্যাণ্ডলুমের পর্দা আছে সেগুলো টাঙানো থাকলে বিতানের ভাল লাগবে অনেক বেশি। মা বেঁচে ছিলেন যখন, বিতান যখন এই বাড়িতে নিয়মিত আসতো, তখন থেকে এ-বাড়ির দরজা জানলায় ও তো ওই ধরনেরই পর্দা দেখেছে।

গৌরী আমার কথায় সায় দিয়ে বলেছে, 'ঠিক। আর শোনো, তোমার এই স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ার বক্স দুটো রাখতে গিয়ে মার ফটোটাকে আর রাখা যায়নি এ ঘরে। বিতান যে কদিন থাকে সে কদিন না হয় এগুলোকে সরিয়ে মার ফটোটা এনে রাখি। ওর ভাল লাগবে।'

'হ্যাঁ। আগে আরো একটা বদল দরকার--আমাদের ওই ভি.ডি.ও দেখার ব্যাপারটাকে পুরো সরিয়ে ওই জায়গাতেই আমরা আবার বুক সেলফটাকে এনে রাখতে পারি। আগে যেমন ছিল। অবশ্য আগের সেই সব বইপত্তর আর পাওয়া যাবে না। ভালো কিছু বই পেলে বিতান আর অন্যকিছু চাইতো না।'

গতকাল বিতানের দ্বিতীয় চিঠি এসেছে। লিখেছে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালে ছিল ও এক মাস। রায়গঞ্জেও ও চিঠি লিখেছিল; কোনোরকম উত্তর না পাওয়ায় বিতান উদ্বিগ্ন। বেশ কিছুকাল ও নাকি ভাই-বোনদের কোন খবরই পাচ্ছে না।

কাল রাত থেকে বৃষ্টি পড়ছে অনবরত। সামনের রাস্তায় হাঁটুজল, আমার ফ্যাকট্রি, গৌরীর অফিস, তুতুলের স্কুল—আজ সব বাতিল । সারাদিন ধরে আমি আর গৌরী আমাদের খুব যত্ন করে সাজানো ঘরগুলোর বাড়তি চাকচিক্য যতটা সম্ভব আড়াল করেছি।

খানিকটা এলোমেলো করে দিয়ে আমাদের আগেকার সাদামাটা জীবনটাকে খানিকটা টেনে আনতে চেয়েছি। কতটুকু বা পেরেছি। আমার এবং গৌরীর দুজনেরই দেহের আয়তন বেশ খানিকটা বেড়ে যাওয়ার ফলে, টানাটানি করতে করতে মাঝেমধ্যে খুব হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। তুতুল আমাদের কাণ্ডকারখানায় খুব মজা পাচ্ছিল। সন্ধে পর্যন্ত আমাদের বিতানের জন্যে অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটল।

সন্ধের পর এক বিজনেসম্যান বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিল। আমার একটাই মাত্র গাড়ি, দিন দুই হল সেটিও খারাপ হয়ে কারখানায়। এক নাগাড়ে বৃষ্টি আর জলবন্দী রাস্তায় ট্যাক্সির আশা না করে ঠিক করে ছিলাম আজ আর বাড়ির থেকে বার হব না। কিন্তু নাছোড়বান্দা বন্ধুপত্নী গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। বেরোনোর মুখে গৌরী একবার শুধু বলল, 'এখন আর কি বিতানের আসার আর কোনো চান্স আছে?'

'মনে হয় না।' বলে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের অগোছাল দশা দেখে তখন বিতান এবং খানিকটা নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল রীতিমত। নিজেদের খুব বোকা মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কি দরকার ছিল নিজেদের সুখী অবস্থাটা আড়াল করার জন্যে এভাবে সবকিছু ওলোট-পালট করবার! নতুন করে গুছোতে কি আবার কম পরিশ্রম। মন থেকে বিতানকে এখন পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া দরকার।

বিতান কিন্তু এলো। তুতুন ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। আজ বন্ধুর পার্টি থেকে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরেছি। গৌরীও বিছানায় গেল এইমাত্র। বাইরে সেই টানা বৃষ্টির শব্দ। নরম সবুজ আলোয় আমি ক্যাসেট শুনছি।

ডোরবেল বেজে উঠল পরপর দুবার।

'রাত কটা এখন?' পাশের ঘর থেকে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল গৌরী।

'পৌনে বারোটা।'

'দরজা খুলো না'।

'যদি বিতান হয়?'

গৌরী কোনো উত্তর দিল না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'বাইরের আলোটা জ্বালো।'

আমি আলো জ্বেলে বারান্দায় ঝুঁকে তাকালাম নিচের দিকে, বললাম, 'কে? কাকে চাইচেন?'

নিচে দরজার সামনে ভিজছে যে মানুষটি, এখন মুখ তুলতেই চিনতে পারলাম, বিতান। গৌরীও পাশ থেকে দেখছিল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

বিতান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাসি ভাসিয়ে ওর ভরাট গলায় যথারীতি শাণিত বাচনভঙ্গিমায় বলল, 'এক যুগের ওপর ব্যবধানে দেখা—এমন মানুষকে এতো সহজেই মধ্যরাতে এভাবে ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়।'

'তুই বলেই খুললাম। তোর ব্যাপারে আমাদের দুজনের কি ভুল হতে পারে?'

গৌরী খুব উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'উঠে এসো চটপট। ইস্, পুরো ভিজে গেছ দেখছি। সারাটা দিন আজ তুমি আসবে ভেবে ভেবে সময় গুনেছি। এত রাতে এলেই বা কোথা থেকে?'

বিতান ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আরে হল কি, হাসপাতালে আমার পাশের বেডের রোগীটি আমাকে অনুরোধ করেছিল তার বাড়ির খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে। সেই খোঁজখবর নিতে গিয়েই আটকে গেলাম। ওর বাচ্চা মেয়েটা খুব অসুস্থ, সেটার একটা ব্যবস্থা না করে আসা গেল না।'

গৌরী বলল, 'তুমি একেবারে একই রকম আছো।'

বিতান বলল, 'সন্ধের পর তোমার এখান থেকে একবার ঘুরে গেছি। তালা দেওয়া। রাতের খাওয়াটাও সেরে নিয়েছি পাঞ্জাবী হোটেলে। রুটি আর তড়কা। একবার ভেবেছিলাম আজই রায়গঞ্জ চলে যাব। যাওয়া গেল না।'

জল মোছার জন্যে গৌরী একটা তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছিল বিতানের দিকে। এখন ভেতর থেকে পায়জামা পাঞ্জাবী নিয়ে এলো। বিতান হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, 'তোমাদের খুব ঝামেলায় ফেললাম।'

গৌরী হেসে বলল, 'তোমার মুখে এসব কথা মানায় না।'

বিতান এসেছে দেখেই গৌরী তার ফিকে গোলাপী নাইটির ওপর সাধারণ শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছিল। তবু খানিকটা আগে পার্টি থেকে ফেরার প্রসাধন ও ক্লান্তি ছড়িয়েছিল ওর মুখের রেখায়। গৌরীর চুল ছোট করে ফেলার পর ওর মুখের পুরোনো ছাঁদটা অনেকটা হারিয়ে গেছে। এক পলক স্থির চোখে বিতান বোধ হয় সেটাই লক্ষ করল মনে হল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিতান ওর ছেড়ে-ফেলা ভিজে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চুপসে-যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি আমার সিগারেট এগিয়ে দিলাম। বিতান বিদেশী সিগারেট প্যাকেটটার দিকে তাকাল। আমি লাইটার জ্বেলে দিলাম। বাহারী লাইটারটাও এদেশের নয়।

বিতান ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তোদের বাড়ির চেহারাটা একেবারে পাল্টে গেছে। পাশের বাড়িটা না থাকলে চিনতে পারতাম না।'

'হ্যাঁ। অনেক দিনের বাড়ি তো। সব ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। একটু সারিয়ে সুরিয়ে নিলাম আর কি।'

এরপর খানিক সময় কি নিয়ে কথা এগোবো খুঁজে পেলাম না। গৌরী ভেতরে গেছে কফি করে আনতে। বিতানের ভাইবোনের প্রসঙ্গটা আমিই তুলবো কিনা ভেবে পাচ্ছি না।

আমি অনেকদিন ভেবেছি রায়গঞ্জে বিজয়ার কাছে একটা চিঠি লিখবো। ভেবেছে গৌরীও কিছুদিন আগে মানে চার পাঁচ মাস আগে বিজয়া একটা পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিল আমাদের। তারিখ উল্লেখ করে জানিয়েছিল বিজয়া দুদিনের জন্যে কলকাতায় আসছে। কোথায় যেন একটা ইন্টারভ্যু দেওয়ার কথা ছিল। আমার কাছেই দুটো দিন থাকার কথা ছিল। এতে গৌরী এবং আমি দুজনেই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু বিজয়ার আসার দিনটা আমাদের দুজনের কারোরই সঠিক খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা আউটিংয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা কলকাতার বাইরে চলে গেছিলাম তিন চার দিনের জন্যে। ফিরে এসে দেখলাম বিজয়া একটা চিঠি লিখে গেছে। এক লাইনের চিঠি, 'অনেক দরকারি কাজের চাপে আপনারা আমার আসার কথাটা বোধ হয় একেবারে ভুলে গেছেন।' চিঠিটা পেয়ে অপরাধবোধ আমাদের দুজনকেই দংশন করেছে। চিঠি লিখতেও খানিকটা সংকোচ হয়েছে। ওদের দিদি বিনতার চিঠির প্রত্যাশায় ছিলাম। বিনতাই আমাদের বরাবর নিয়মিত চিঠি লিখেছে তার হাসপাতাল থেকে। দু বছর হল নার্সের চাকরিটা পেয়েছিল বিনতা। কিন্তু গত তিন-চার মাস হ'ল সেই বিনতারও কোনো চিঠি আসেনি। বুঝতে পারছিলাম, বিজয়ার ব্যাপারটাতে খুব অভিমান হয়েছে তার। হওয়ারই কথা। তারপর তো গত মাসে আচমকা বিভাস এসে খবর দিল বিনতার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সব খবরই এতদিনে বিতানের কাছে পৌঁছেছে নিশ্চয়।

দুজনের মধ্যেকার স্তব্ধতা ঠেলে দেওয়ার জন্যে কিছু একটা বলতে চাইলাম। বললাম, 'আজই তুতুনকে বলছিলাম তোর কথা। তুতুন, আমাদের ছেলে'—

'কত বয়স হ'ল যেন? কোন্ স্কুলে পড়ছে?'

'এই দশে পড়ল। একটা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে দিয়েছি।'

বলার পর খেয়াল করলাম একটা নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে বিতানের মুখের রেখায়। ওর ওই হাসির খোঁচাটাই আমায় মনে করিয়ে দিল, মৌলিকতা বিনাশী শিক্ষা ব্যবস্থার চাকরতন্ত্র সম্পর্কে একযুগ দেড়যুগ আগে অনেক কিছু বলেছি আমরা, অনেক কিছু লিখেছি। এখন। তুতুনের স্কুলের নামটা বলার পর বললাম, 'জন্মের আগে থেকেই আজকের ছেলেমেয়েরা একটা প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কিছুটি করার নেই বিতান। তবু অবস্থা অনুযায়ী তৈরি হয়ে পরে যাতে লড়তে পারে তার ব্যবস্থাটুকুও না করে গেলে, পরের জেনারেশন্ বড় হয়ে আমাদেরই দোষারোপ করবে, তাই না?'

অতোটা বলার পরও বিতানের মুখের রেখা থেকে ছুরির ফলার মতো চকচকে হাসিটা নিবলো না দেখে আমি যেন ভেতরে ভেতরে আরো খানিকটা কুঁকড়ে গেলাম। সহজ হতে চেয়ে বললাম, 'তুই এসেছিস বলে কি ভাল লাগছে আমাদের কি বলবো। পুরোনো সেই দিনগুলোকে অনুভব করছি।' বলেই তলায় তলায় কেমন কেঁপে গেলাম যেন। সর্বনাশ। ওই 'পুরোনো সেই দিনগুলোর কথাটা উচ্চারণের পিঠে পিঠেই ওর ডায়েরীর কথাটা উঠে আসতে পারে যে।' সব কথা থামিয়ে বিতান বলে উঠতে পারে, 'আগে আমার ডায়েরীটা বার করে দে, ওটার জন্যেই আমার আসা।' অদৃশ্য ছুরির ফলাটা আমার কণ্ঠনালি, আমার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে যাচ্ছে বার বার।

বিতানের মাথার পেছনে উঁচুতে আলো। ওর মুখের রেখায় ছায়া পড়েছে। চোয়ালভরা দাড়িতে কয়েকটি সাদা আঁচড়। ভারি ফ্রেমের চশমার কাচের তলায় দুটো চোখের তীক্ষ্ণতা একটুও কমেনি। অনেকটা ভেদ করে, অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় দৃষ্টি। মুখের আদল এক হলেও বিভাসের মুখের রেখার চরিত্র আলাদা। বেশ কিছুটা সরল, খানিকটা অসহায়, অনেকখানি করুণ বিভাসের মুখ। বলার সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দিদির নিরুদ্দেশের নেপথ্যকাহিনী বিভাস কেমন অকপটে আমাদের বলেছিল। আর দিদিকে খুঁজতে খুঁজতে কোন্ কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছিল—বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল উনিশ বছরের ছেলেটার।

বিতান বলল, 'তোদের দুজনের চেহারাই অনেকটা পাল্টে গেছে, অবশ্য পাল্টেছে আমারও।'

'তবু এমন কিছুই বদলাসনি। তুই ঢুকতেই গৌরী বলল, না, তুই একেবারে, একই রকম আছিস।'

'হ্যাঁ। হয়তো আটকে ছিলাম বলেই ভেতরের বাইরের সব রকমের বদলটাও আটকে আছে।'

ডায়েরীর কথাটা কি ওকে এখনই খুলে বলে দেবো? বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের রেখা কি রকম কঠোর হয়ে উঠবে অনুমান করতে পারছি। না, এখন নয়, একটু পরে বলবো। গৌরী কফি নিয়ে আসুক, তারপর ধীরে ধীরে বিজয়া এবং বিভাসের কথাও আনতে হবে। আমি না, আমার সামনে গৌরীই তুলবে প্রসঙ্গগুলো।

আমি বললাম, 'তোর ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না বিতান। সেদিন পুলিস যদি কোনোক্রমে তোর কাছ থেকে আমার সন্ধান পেতো'—

ট্রেতে কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে গৌরী এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সামান্য খাবার। আমাদের সবচেয়ে সাদামাটা পেয়ালায় গৌরী কফি ঢালতে শুরু করল। পাছে না আবার নীরবতা শক্ত হয়ে বসে, তাই কথায় কথায় বললাম, 'আসলে জানিস কি বিতান, আমরা স্বপ্নকে যতটা ভালবেসেছিলাম, সত্যে ততটা আস্থা রাখতে পারিনি।'

'এখন কি সত্যে আস্থা রেখেছিস?'—বিতানের আচমকা এই প্রশ্নটার জন্যে আমি বা আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে গৌরী হেসে বলল, 'একটা যুগের ওপর সময় পেরিয়ে গেলে কি হবে—তোমাদের মধ্যে তর্ক করার ঝোঁকটা কিন্তু একটুও কমেনি। তাই না?'

বিতান কোনো উত্তর করল না। গৌরী আবার বলতে শুরু করল, 'জানো তো, কিছুক্ষণ আগেই ওকে আমি বলছিলাম, বিতানের পক্ষে রাত দশটায় এগারোটায় আসা কোনোদিনই তো তেমন কিছু ব্যাপার ছিল না। ও-ই একমাত্র পারে সব রকমের ঠুন্‌কো ভদ্রতার বেড়া ভাঙতে। আমার কথাই সত্যি হ'ল।'

গৌরী এসব কথা বলেনি। তবু যেন বলেছে এমনভাবে কথাটাকে মেনে হাসলাম। বিতানও হেসে বলল, 'বুঝতে পারছি. তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।'

আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলাম, 'আরে সে রকম জমপেস পার্টি থাকলে আমাদের ফিরতে দেড়টা দুটো হয়ে যায়। এখনো তো রাত একটাও হয়নি।' বলিনি। তার আগেই বিতান বলল, 'জল চাই আর এক গ্লাস।'

গৌরী জল আনার জন্যে আবার উঠতে যাচ্ছিল, আমি উঠে বললাম, 'তুমি বোসো, আমি আনছি।'

ভেতরের দিকে দু পা এগিয়ে যেতে বিতান বলেছিল, 'এমনি জল আনিস।' 'এমনি জল' বলতে বিতান নিশ্চয় ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল নয় বোঝালো।' গৌরী যে এক গ্লাস জল এনেছে ট্রেতে সেটা খুবই ঠাণ্ডা। আমি আর মুখ ফিরিয়ে বিতানের চোখের দিকে তাকালাম না। কিন্তু ভেতরে চলে আসতে আসতে টের পাচ্ছিলাম বিতানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলা আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। ওর দৃষ্টি কি আমার পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা খুঁজতে চাইছে? আমি যত তাড়াতাড়ি পারলাম ওর চোখের সামনে থেকে কিছুক্ষণ পালিয়ে বাঁচলাম।

গৌরী আর বিতান গল্প শুরু করল। আমি পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছি বিতান বলছে, 'তোমাদের সুখী দেখে ভাল লাগছে খুব।'

'তাই কি? এমন হলে তুমি কি সত্যিই সুখী হতে?'

বিতান ভরাট গলায় হেসে বলল, 'আমি হতাম কি না বলতে পারবো না, কিন্তু তোমাদের সুখী দেখাটাও তো সুখের।'

'বিতান, খুব মেকানিক্যাল হয়ে গেছি আমরা।' গৌরীর স্বরে বিষাদ ঝরতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে বিতানের হাসির শব্দটা তাড়া করে এলো পাশের ঘর পর্যন্ত। হাসতে হাসতে বিতান বলল, 'ওটা তো সুখের ফ্রেমওয়ার্ক।' তারপর এক চুমুক নীরবতা পার করে গলার স্বর পাল্টে বলল, 'একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারছি, তোমরা কিছুতেই কেন যেন সহজ হতে পারছো না।'

আমাদের চোখেমুখে কি ভয় প্রকট হয়ে উঠছে? অথচ এখনো তো বিতান আমাদের ভয়ের কেন্দ্রের দিকে এগোয়নি! ওর ডায়েরীটা নিয়ে এখনো কোনো কথা তোলেনি। আর যতক্ষণ না ও প্রসঙ্গটা তুলছে ততক্ষণ আমরাও ওকে বলে উঠতে পারছি না যে, বহুকাল আগে পুলিসের ভয়ে আমরা ওর ডায়েরীটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

এক গ্লাস জল এনে রাখলাম বিতানের সামনে। বিতান কথান্তরে বলল, 'বিনতা আগে নিয়মিত চিঠি লিখতো। কিছুকাল হল ওর কোনো চিঠিই পাইনি। তোদের লিখেছে?'

বললাম, 'না। বিনতা তার হাসপাতালেও আর নেই। মাসখানেক আগে বিভাস এসেছিল বিনতার খোঁজে।'

'এখানে—তোদের কাছে এসেছিল বিভাস? বিনতা চাকরি ছেড়েছে কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গৌরী ধীরে ধীরে বলল, 'হাসপাতালে বিভাস তার দিদির খোঁজে গেছিল। সেখানে বিভাস বেশ অপমানিত হয়েছে। ঐ হাসপাতালেরই এক সিনিয়ার নার্স খুব খারাপ ভাষায় বিভাসকে জানিয়েছে, বিনতা নাকি তার নিজের হাসপাতালেরই মেটারনিটি ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল। অবৈধ সন্তান প্রসবের পর হাসপাতাল ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। ওই ধরনের মেয়ে সম্পর্কে জানার কোনো রকমের আগ্রহও ছিল না কারো।'

গৌরী থামার পর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না বিতান। বলতে পারল না। ও কি ভেতরে ভেতরে ভাঙতে শুরু করেছে? আমরা কি ওর বিব্রত হওয়ার মধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চার করতে শুরু করেছি? ওকে অন্যভাবে আহত হতে দেখে আমরা কি নিজেদের পিঠের অস্ত্রের আঘাত ভুলে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি?

গৌরী আবার সহানুভূতির স্বরে বলে উঠল, 'বেচারি বিনতা! গায়ের রক্ত জল করে ক' বছর ও-ই তো সংসারটাকে টেনেছে! নইলে কবেই কোথায় ভেসে যেতো বিজয়া আর বিভাস!

সমমর্মিতার স্বর ভাসল আমার গলাতেও। বললাম, 'বিভাসের খুব আশা ছিল—এবার তুই ঘরে ফিরলেই ওরা সত্যিকারের সুখের দিনের মুখ দেখবে। একজন ঘরে ফেরার আগেই অন্যজন যে এভাবে ঘর ছাড়বে বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি। পাগলের মতো দিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়। খুব সরল ছেলে তো, কারো কাছ থেকে কোথাও কোনো খোঁজ পাওয়ার ইঙ্গিত পেলেই নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকানো যায় না, ভাবা যায় না কোলকাতায় এসে কোথায় কোথায় ঘুরেছে ও।'

বিতান আমার চোখের দিকে তাকাল। না, ছুরির ফলার মতো শাণিত সে-দৃষ্টি নয়, বরং ছুরিকাহত হওয়ার যন্ত্রণাটা যেন আমি চিনতে পারছি ওর তাকানোর মধ্য দিয়ে। বিতানের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে আমি বললাম, 'কোনো একজন বোধ হয় বিভাসকে খবর দিয়েছিল, কোলকাতার কোন এক খারাপ গলির মুখে বিনতার মতো কোনো একজনকে দেখেছে। সেই শুনে বিভাস এখানকার রেড-এরিয়াগুলো পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। ভাবা যায়? তারপর এসেছে আমাদের এখানে।'

আমি আর বললাম না যে, বিজয়া আমাদের কাছে কোনো রকম সাহায্য না নেওয়ার জন্যে বলে দিয়েছিল বিভাসকে। তবু বিধ্বস্ত বিভাস শেষ আশায় এসেছিল আমাদের কাছে।

'তুই কি করলি?' —আবার ধারাল হল বিতানের চোখ। ও ভেঙে যাচ্ছে দেখে, আমি যে ভেতরে ভেতরে সহজ হওয়ার দিকে এগোচ্ছিলাম—সে পথটা যেন ও বন্ধ করে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তে আর কি করতে পারি বল? বিভাসকে বললাম ফিরে গিয়েই যেন বিনতার একটা ফোটো পাঠিয়ে দেয়। আজ পর্যন্ত বিভাস সেটাও পাঠায়নি।'

চোয়াল শক্ত করে কিছু সময় বসে থাকল ও। ঘড়ির কাঁটা দুটো তখন দেড়টা দেখাচ্ছে।

বিতান বলল, 'অনেক রাত হল। তোরা শুয়ে পড়।'

'দাঁড়াও, তোমার বিছানাটা করে দিই। মশারি টাঙাতে হবে, না হলে ঘুমোতে পারবে না।'

'কোনো দরকার নেই। এই বড় সোফাটাই যথেষ্ট।'

'আমি এক্ষুনি পেতে দিচ্ছি এগুলো।' বলতে বলতে গৌরী চাদর-বালিশ এনে বিছানা করে দিল। মশারির খুঁট বাঁধার সময় আমি সাহায্য করলাম। বিতান নিঃশব্দে সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে থাকল। চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিলাম, ও তাকিয়ে আছে জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে। আমাদের পিঠের দিকে ওর চোখ ফিরে ফিরে আসছিল কিনা লক্ষ করিনি।

গৌরী এক গ্লাস জলও রেখে গেল ঢাকা দিয়ে। বিতানকে ঘুমোতে বলে আমরা আমাদের ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। আজ আর আমার নরম আলোর আবহে ক্যাসেটে বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমনো হবে না।'

'আর একটা কথা' বলে বিতান কিছু একটা বলতে চাইল। কথাটা শোনা মাত্রই আমরা আবার ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াইনি। বরং ও আসার শুরু থেকে যে শঙ্কাটা আমাদের মনের তলায় তির তির করে কাঁপছিল, মুহূর্তের মধ্যে সেটাই এবার জোরে নাড়া খেয়ে উঠল। অনেক বছর আগে পুড়িয়ে ফেলা বিতানের আগুন-দিনের দিনলিপির ছাইয়ের মতোই বোধ হয় সেই মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল আমার মুখটা। বিতানের চোখ বেশিক্ষণ আমাদের পিঠের ওপরে থাকাটাও খুব অস্বস্তিকর। মুখের উদ্বেগ সরিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে তাকালাম ওর দিকে।

শক্ত চোয়ালে বিতান তার সিগারেটের শেষ অংশটুকু মিনে-করা অ্যাশট্রের গর্তে গুঁজে দিচ্ছে। আমি ঘুরে তাকানোর পর ও বলল, 'শোন্ আমার সকাল বেলায় ঘুম না ভাঙে যদি ডেকে দিস। বেশ সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আমি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই গৌরী বলল, 'সে তোমাকে বলতে হবে না, ঠিক উঠিয়ে দেবো।'

আশ্বাসটুকু দিয়ে, বিতান আমাদের পিঠের দিকে চোখ ফেরানোর আগেই আমরা দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন আমাদের ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। সকালের তাজা রোদ এসে পড়েছে আমাদের ঘরের মধ্যে। মধ্যরাত্র পর্যন্ত আশঙ্কায় কাটানোর পর ঘুমসুখটা বেশ গভীর হয়েছিল আমাদের। বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি সামনের ঘরের দিকে এগোলাম। বিতান বেশ সকালেই ওকে ডেকে দিতে বলেছিল যে!

সামনের ঘরের জানালা দিয়েও রোদ এসে মশারি ডিঙিয়ে বিছানার মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। বিতান শুধু ঘরে নেই তাই নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিতান চলে গেছে। জেগে উঠে ও আর আমাদের ঘুম-সুখটা নষ্ট করতে চায়নি। অল্প পরে গৌরীও এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

বিতান চলে গেছে কিন্তু আমাদের সাজানো গোছানো ঘরের বিশৃঙ্খলা বড় উৎকটভাবে এই দিনের আলোয় তাকিয়ে আছে আমাদের দুজনের দিকে। অর্জিত অবস্থাকে আড়াল করতে চাওয়ার বোকামি এই মুহূর্তে যেমন লজ্জা দিচ্ছে আমাদের, তেমনি একটা স্থায়ী ভয় কি শেকড় চালাতে চাইছে বুকের মধ্যে? বিতান কি যে কোন দিন আচমকা ওই রকম এসে পড়বে? কিংবা ক্রমাগত আসতে থাকবে? আর প্রতিবারই আমাদের সাজানো গোছানো ঘরটা এই রকম এলোমেলো করে দিয়ে যাবে?

চারপাশ থেকে চোখ তুলে দিয়ে আমি আর গৌরী দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম। মানুষের জীবদেহের সুবিধে এই যে দুজনে দুজনের চোখের দিকে যত সহজে তাকানোর উপায় আছে, দুজনে দুজনের পিঠের দিকে তাকানোর সেই সোজাসুজি উপায়টা নেই! ভাগ্যিস্ নেই!

হরধনু কাহিনীর পুনর্লিখন

শৈবাল মিত্র

রামমোহন শিক্ষায়তন পরিদর্শনে এসে ইনস্পেক্টর জগৎ ঘোষ ক্লাস ফোরের ছাত্র সুবোধকে প্রশ্ন করল, হরধনু কে ভেঙেছিল? প্রশ্ন শুনে জগতের মুখের দিকে সুবোধ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। জগতের একপাশে স্কুলের হেডমাস্টার নিশিকান্ত সান্যাল, অন্যপাশে ক্লাসটিচার রমেশ ভারতী।

গরমকাল। ক্লাসরুমে ফ্যান ঘুরলেও মোটাসোটা শরীর জগৎ গলগল করে ঘামছে। রুমালে মুখ মুছে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে জগৎ আবার বলল, বল, কে ভেঙেছিল বল?

সুবোধের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। ছলছল করছে দু-চোখ। থমথমে গম্ভীর মুখ করে নিশিকান্ত দেখছে সুবোধকে। হাত কচলাচ্ছে রমেশ ভারতী।

বল। ভয় কি, বল।

জগতের সস্নেহ কথাতে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সুবোধ। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলতে থাকল, আমি ভাঙিনি স্যার। সত্যি বলছি, আমি ভাঙিনি।

রুদ্ধকণ্ঠ সুবোধ ফোঁসফোঁস করতে থাকল। জবাব শুনে জগৎ অবাক হয়ে হেডমাস্টারের দিকে তাকাতে ক্লাসটিচার রমেশ ভারতী করুণ গলায় জগৎকে বলল, স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, সুবোধ অতি ভাল ছেলে। হরধনু ভাঙার মত কাজ সে করতে পারে না।

একজন শিক্ষকের কাছ থেকে এমন কথা জগৎ আশা করেনি। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে সাধারণ একটা প্রশ্ন সে করেছিল। প্রশ্নটার জবাব সবাই জানে। মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা সীতাকে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে রামচন্দ্র হরধনু ভেঙেছিলেন। রামমোহন শিক্ষায়তনের মত নামী স্কুলের ক্লাস ফোরের একজন ছাত্রের এত সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর না পারার কথা নয়। ফি বছর রামমোহন শিক্ষায়তনের ষাট-সত্তরজন ছাত্র প্রাইমারি পরীক্ষা পাস করে। পাঁচ, সাতজন বৃত্তি পায়। গত তিনবছর ধরে রামমোহন শিক্ষায়তন পরিদর্শন করছে জগৎ। ঘুরে ঘুরে স্কুল দেখে খুশি হয়েছে। বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞানের দু-চারটে সরল প্রশ্ন বিভিন্ন ক্লাসে করে চটপট জবাব পেয়ে স্কুল সম্পর্কে ভাল ধারণাই হয়েছিল। এক ধাক্কায় সেই ধারণা আজ ভেঙে যেতে জগৎ অস্বস্তি বোধ করল। রমেশ ভারতীয় কথা শুনে সে ভয়ও পেয়েছে। তার মুখ দেখে চাপা গলায় হেডমাস্টার বলল, রমেশ কিছু ভুল বলেনি। ভাঙচুর করা যাদের কাজ, আমাদের এলাকায় তারা নেই।

অতঃপর জগতের আর কিছু বলার থাকে না। হেডমাস্টারের ঘরে ফিরে ঢকঢক করে একগ্লাস জল খেয়ে তখনই জগৎ স্কুল ছেড়ে চম্পট দিল। একটা প্রশ্ন করে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষকদের জ্ঞানের বহর টের পেয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস তার ছিল না। গাড়িতে

ওঠার আগে পর্যন্ত জগতের কানের কাছে মুখ এনে নিশিকান্ত, রমেশ ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করে যা বলে গেল, তা হল, সুবোধ খুব ভাল ছেলে। সে নির্দোষ। হরধনু ভাঙেনি।

অফিসে ফিরে আরও দু-গ্লাস জল খেল জগৎ। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। অন্যদিনের চেয়ে সে বেশি ঘামছিল। আধঘন্টা বাদে একটু সুস্থ হয়ে রামমোহন শিক্ষায়তনে লেখাপড়ার শোচনীয় অধোগতি সম্পর্কে একটা কড়া নোট লিখে সে জেলা অধিকর্তাকে পাঠিয়ে দিল। নোটের শেষে খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য লিখল। মন্তব্যের মূল কথাগুলো হল, গত পনের বৎসর যাবৎ গণমুখী শিক্ষানীতির প্রবর্তন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে নানা উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইলেও অন্তরালে কিছু গোলমাল দেখা দিয়াছে। সামান্য একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গুরু, শিষ্য উভয়েই ভুল করিতেছে। এই দুর্গতি রোধ করিতে জরুরি ভিত্তিতে এখনই কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

জেলা শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠিটা পাঠিয়ে সামান্য স্বস্তি বোধ করলেও জগতের মনের অশান্তি কাটল না। নানা প্রশ্ন তাকে খোঁচাতে থাকল। ক্লাস ফোরের ছাত্র সুবোধের সমবয়সী কয়েকজন ছেলেকে ধরে প্রশ্নটা করার বাসনা জাগল। ছেলেগুলোকে কীভাবে, কোথা থেকে পাওয়া যায়, ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশীদের ন-দশ বছরের কিছু ছেলেমেয়ের মুখ। এইসব ছেলেমেয়ের কাছে হরধনু ভঙ্গকারীর নাম জানতে চাইলে বেশিরভাগ নিশ্চয় সঠিক জবাব দেবে। যারা পারবে না, তাদের লজ্জিত অভিভাবকরা সন্তানদের আবার রামায়ণ, মহাভারত পড়াতে বসবে।

রামমোহন শিক্ষায়তনের ঘটনা, শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক হালচাল সম্পর্কে গবেষণায় জগৎকে প্রেরণা দিল। পরবর্তী সাতদিনে পরিচিত, অর্ধপরিচিত প্রায় পঁচিশজন ন-দশ বছরের ছেলের সঙ্গে সে দেখা করল। শিশুদের জন্যে পকেট বোঝাই করে লজেন্স, চকোলেট, কিছু ডটপেন, কালি আর পেন্সিলের লেখা যুগপৎ, এবং এককভাবে মোছার জন্যে দু-ধরনের সাতটা ইরেজার নিল। প্রতিটি উত্তরদাতাকে চকোলেট, লজেন্স এবং শুধু নির্ভুল উত্তরদাতাকে চকোলেট লজেন্সের সঙ্গে একটা করে ডটপেন এবং রাবার দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু পঁচিশজন শিশুর সঙ্গে সাতদিন ধরে কথা বলে যে অভিজ্ঞতা তার হল, তা মোটেই সুখের নয়। সুখের যে নয়, তার প্রমাণ হল, চকোলেট, লজেন্স শেষ হয়ে গেলেও সবগুলো ডটপেন, রাবার পকেটে পড়ে থাকল। মাঝখান থেকে নতুন ফ্যাচাং বাঁধল। জগতের সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুদের ধারণা হল, জগতের মাথাটা বেতাল হয়েছে। আড়ালে আবডালে দু-একজন বলেও ফেলল কথাটা। জগতের হরধনু সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে পাড়ার বাচ্চাদের একজন হঠাৎ বিকেলে জানলা দিয়ে জগৎকে ধনুখুড়ো বলে ডেকে লুকিয়ে পড়ল। দু-চারদিনের মধ্যে শিশুমহলে ধনুখুড়ো নামটা জানাজানি হয়ে গেল। বালকেরা বাড়ির জানলা বারান্দা থেকে জগৎকে ধনুখুড়ো বলে ডেকেই গা ঢাকা দিত। প্রথমে কয়েকদিন ডাকটা শুনে জগৎ খেয়াল করেনি। কিন্তু হরধনু প্রসঙ্গটা মাথায় থাকার জন্যে ধনু, এবং খুড়ো যুক্ত ধনুর গভীর অর্থদ্যোতনা অনুভব করে একহপ্তা পর থেকেই সে চমকে উঠতে লাগল। কী ঘটছে তলিয়ে না বুঝলেও খাবারে তার রুচি কমে গেল। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে থাকল। প্রতিবেশী এক ব্যাঙ্ক অফিসার রাস্তায় একদিন জগৎকে ধরে বেকসুর ধমক দিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, আমার ছেলেকে আর কখনও আজেবাজে প্রশ্ন করবেন না। আপনার প্রশ্ন শুনে ভয়ে তার জ্বর এসে গেছে। হাই টেম্পারেচার।

জগৎ তার প্রশ্নের নিরীহত্ব ব্যাঙ্ক অফিসারকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হল। কাজের অজুহাতে ব্যাঙ্ক অফিসার একমুহূর্ত দাঁড়াল না।

পাড়ায় যখন জগৎকে ঘিরে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা চলছে, তখন তার অফিসের অবস্থাও শান্ত নয়। ঘটনাবলী নতুন বাঁক নিয়েছে। এক দুপুরে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের এক অফিসার জগতের অফিসে এসে বলল, আপনার গোলমেলে নোট পড়ে শিক্ষা-অধিকর্তা ক্ষুব্ধ। জল আরও ঘোলা হবার আগে নোটটা প্রত্যাহার করে নিন। অফিসারের কথা শুনে জগৎ হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলা যায়, সে যখন ভাবছে, অফিসার বলল, গত পনের বছরে সরকারি শিক্ষানীতি রাজ্যকে যখন এগিয়ে দিয়েছে, সে তুলনায় কোথায় সামান্য কি ভাঙচুর হল, মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসব তুচ্ছ বিষয়ে আপনার মত দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার কেন মাথা ঘামাবে?

একমুহূর্ত থেমে অফিসার আবার বলল, ইনস্পেক্টরের চাকরি করলেই যে স্কুল পরিদর্শনে যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই। কাজ দেখাবার জন্যে কেন এত কুটকুটুনি আপনার? অফিসে আসুন, চেয়ারে বসুন, বাড়ি যান, মাসের শেষে মাইনে নিন। ব্যস চুকে গেল ল্যাঠা।

জগৎ বোবা। পাথরের মত বসে আছে। নোটটা দু-একদিনের মধ্যে প্রত্যাহারের কথা তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে অফিসার চলে গেল। দু-গ্লাস জল খেল জগৎ। ঘামে ভিজে সপসপে রুমালে কপাল মুছতে মুছতে জগৎ ঠিক করল, রামমোহন শিক্ষায়তন সংক্রান্ত নোটটা প্রত্যাহার করবে না। ফলে ঘটনা আরও জট পাকাল। আত্মীয়-পরিচিত মহলে তার পাগল হয়ে যাবার খবর দ্রুত রটে গেল। পাড়ার আনাচে-কানাচে থেকে ন-দশ বছরের শিশুদের সঙ্গে তাদের দাদারাও তাকে ধনুখুড়ো বলে ডাকতে শুরু করল। কয়েকজন এত দুঃসাহসী হয়ে উঠল যে ধনুখুড়ো বলে ডেকে পালাবার দরকার বোধ করল না। ফিচেল হাসিমুখ নিয়ে জগতের নাকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তেড়ে গিয়ে দু-চার চড়চাপড় কষাবার ইচ্ছে অনেক কষ্টে সংযত করল সে।

পনের দিনেও নোটটা প্রত্যাহৃত না হতে জগতের কাছে জেলা শিক্ষাদপ্তর থেকে পিওনবুকে একটা চিঠি এল। সাদা কাগজে টাইপ-করা চিঠির বক্তব্য হল, হরধনু ভাঙার বিষয়টি খুব গোলমেলে। কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে পাঠানো হল। অতঃপর এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

জল যে গড়াচ্ছে, নানা ঘটনায় টের পেয়ে জগৎ দস্তুরমত আতঙ্কিত হল। সে টের পাচ্ছিল, পরিচিত লোকজন, স্ত্রী ছেলেমেয়েও তাকে এড়াতে চাইছে, সহকর্মীরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, আড্ডা, আলোচনায় তাকে দেখলে চুপ মেরে যাচ্ছে সবাই। অন্তরঙ্গ সহকর্মী বিজন বক্সি একদিন মুখের ওপর বলে দিল, তুমি যা করেছ, ঠিক নয়।

বিজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জগৎ। ব্যঙ্গমাখা গলায় বিজন বলল, হাঁ করে থাকলে মুখে মাছি ঢুকে যাবে।

কথাটা বলে জগতের হাঁ মুখ, তার চিবুক ধরে নিজের হাতে বিজন বন্ধ করে দিল।

রামমোহন স্কুল পরিদর্শনের একমাস পরে কলকাতার শিক্ষামন্ত্রক থেকে জগৎ একটা চিঠি পেল। জেলা শিক্ষাদপ্তর ঘুরে চিঠিটা এল তার হাতে। চিঠি পড়ে জগৎ জানল হরধনু সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে শিক্ষামন্ত্রক বিভাগীয় কমিশন নিযুক্ত করেছে। কমিশনকে তদন্তে সাহায্য করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক।

চিঠির ওপরে বড় বড় করে লেখা জরুরি এবং গোপনীয় শব্দ দুটির দিকে তাকিয়ে জগতের হাত পা ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট হয়ে গেল। অফিসঘরের জানলা দিয়ে সে বাইরে তাকাল।

ঠা-ঠা রোদে পুড়ে যাচ্ছে নীল আকাশ। জানলার বাইরে ঘাসের ওপর পরিত্রাহি ঝগড়া করছে দুটো শালিক।

পরের একটা মাস জগৎ খুব ভয়ে ভয়ে কাটাল। তার শরীরের ওজন কমে গেল। প্রতিমুহূর্তে তদন্ত কমিশনের প্রতীক্ষা করতে করতে পোশাক, চালচলন অবিন্যস্ত, শিথিল হল। বর্ষার শুরুতে শিক্ষামন্ত্রক জানাল, তদন্ত কমিশনের বিচার বিবেচনা পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাঙা হরধনুর যথাযোগ্য মূল্য দিতে সরকার রাজি।

জেলা শিক্ষাদপ্তর ঘুরে জগতের কাছে সরকারি হুকুমনামাটি পৌঁছলো। প্যাঁচালো ইংরেজিতে লেখা হুকুম পড়ে প্রথমে মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারল না। আরও দু-তিনবার পড়া শেষ করে কিছুটা বোধগম্য হতে তার মনে প্রশ্ন জাগল, ভাঙা হরধনুর জন্যে ক্ষতিপূরণের টাকা কে নেবে? প্রশ্নটার সদুত্তর না মিললেও একটা বাজে ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনায় জগৎ খুশি হল।

গল্পের সমাপ্তি এখানেই হবার কথা। চালু গল্পটি এরকম জায়গাতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সব গল্পের সমাপ্তিই সাময়িক। চিরতরে, চরম সমাপ্তি কোনও গল্পে ঘটে না। নদীর মত প্রবহমান গল্প যুগোপযোগী পরিণাম খোঁজে। মার্কস, এঙ্গেলস-এর গল্প লেনিন, স্তালিন, মাও জে দং-এ শেষ হয় না। গল্পের রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায় ক্রুশ্চভ, ব্রেজনেভ, দেং জিয়াও পিং, গরবাচভ, ইয়েলৎসিন। গল্প তবু থামে না। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, রুজভেল্ট, আইসেনহাওয়ার হয়ে গল্প গড়িয়ে যায়। কেনেডি, রেগন, বুশ, কোথায় গল্পের উপসংহার?

হরধনু কাহিনীও ত্রেতাযুগ থেকে সাম্প্রতিকে এসে নতুন মোড় নিয়েছে। ভাঙা হরধনুর জন্যে ক্ষতিপূরণের টাকা সরকার মঞ্জুর করতে, টাকাটা কে পাবে ভেবে মনে খটকা লাগলেও জগৎ খুশি হয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল, হরধনুভঙ্গ নিয়ে যারা জলঘোলা করতে চাইছে, নগদ টাকা পেলে তারা চুপ করে যাবে। হিমঘরে জমা পড়বে হরধনু ফাইল। পরিচিতরা আর তাকে পাগল ভাববে না। পাড়ার বাচ্চারা ধনুখুড়ো বলে পেছন থেকে আওয়াজ দেবে না।

কিন্তু সে যা আশা করেছিল বাস্তবে সেরকম ঘটল না। হরধনু সংক্রান্ত গোপন তথ্য কীভাবে যেন ফাঁস হয়ে গেল। বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীপক্ষের নেতা মুলতুবি প্রশ্ন তুলল। লিখিত প্রস্তাব সভায় পেশ করার আগে দীর্ঘ, জ্বালাময়ী ভাষণে বিরোধী নেতা বলল, বোফর্স কেলেঙ্কারির চেয়ে একটা সাঙ্ঘাতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে সরকার এখন সবকিছু ধামাচাপা দিতে চায়। সেটা সম্ভব হবে না। বিষয়টির সঙ্গে শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। বেআইনিভাবে কোটি কোটি ডলারের লেনদেন চলেছে। খুব সাবধানে, সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। ইস্যুটি নিয়ে দুই বৃহৎ শক্তিও ল্যাজে খেলছে। ঘটনার ওপর নজর রাখছে। জনসাধারণ বিষয়টি পরিষ্কার জানলে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। বোমাবর্ষণ হতে পারে ওয়াশিংটনে।

বিরোধী নেতার বক্তৃতা শেষ হতে জবাবী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, দুষ্কৃতিকারীদের আটক করার জন্যে পুলিসকে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা চাইলে হরধনুর ক্ষতিপূরণের টাকা আরও বাড়িয়ে দিতে সরকার রাজি। মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে সরকারপক্ষ যখন টেবিল চাপড়াচ্ছে, অসন্তুষ্ট বিরোধীরা সভা ছেড়ে চলে গেল। আধ ঘণ্টা বাদে সভা আবার বসতে বিরোধীপক্ষের প্রস্তাবিত বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি সরকার মেনে নিল। রহস্যরোমাঞ্চ গল্পের মত করে হরধনুকাহিনী প্রায় সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। একটা

ইংরেজি, একটা বাংলা সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী নেতার সমর্থনে লেখা সম্পাদকীয়তে দুজনকেই প্রশংসায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অফিসের চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়ে জগতের গা ছমছম করছিল। সে টের পাচ্ছিল এক মস্ত ঝামেলা হাতির পায়ের মত মাথার ঠিক ওপরে স্থির হয়ে আছে। সেই পা যে কোনও মুহূর্তে থেঁতলে দিতে পারে। বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু হলে সে রেহাই পাবে না। পাশের টেবিলের সহকর্মী বিজন অফিসে না আসায় ঘরটা ফাঁকা। বোকামি করে সাপের মাথায় পা দিয়ে অনুতাপে ভারি হয়ে আছে জগতের মন। কীভাবে বোকামি, ভুল শুধরে নেওয়া যায় সে ভাবছে। শিক্ষামন্ত্রক থেকে ফাইলটা গায়েব করা সম্ভব নয়। যা করা যায়, তা হল, মূল রামায়ণের হরধনু ভাঙার কাহিনী পড়ে সবাইকে শোনাতে পারে। হরধনু কি, কে ভেঙেছিল, কেন ভেঙেছিল, এসব তথ্য জানা থাকলে বিষয়টি নিয়ে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি হবে না। ঝামেলামুক্ত হবার আর একটা উপায় আছে। উপায়টা কঠিন, শ্রম এবং সময়সাপেক্ষ। তবু জগৎ চেষ্টা করবে। সেই সন্ধেতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে রামমোহন শিক্ষায়তনে যাবার বাস ধরল জগৎ। বাড়ি থেকে স্কুল আঠার কিলোমিটার দূর। রাত প্রায় নটায় সে যখন স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল, ঘন অন্ধকারে গ্রাম ডুবে আছে। চারপাশ স্তব্ধ। মুঠো মুঠো জোনাকি উড়ছে। কোথাও মানুষজন নেই। একজন গ্রামবাসীকে ধরে হেডমাস্টারের বাড়িতে জগৎ পৌঁছলো। তাকে দেখে হেডমাস্টার নিশিকান্ত সান্যাল চমকে গেলেও মুখে বলল, আসুন, কী সৌভাগ্য আমার।

ভেতরে ঢুকব না।

সে কি হয়? আপনি অতিথি। অতিথি নারায়ণ।

জরুরি একটা কথা বলে আমি চলে যাব।

কী কথা?

হরধনু বলে কিছু নেই। সেটা ভাঙার চেষ্টাও কেউ করেনি।

হাসিমুখে নিশিকান্ত বলল, আমি জানতাম, ভুল স্বীকার করতে হবে আপনাকে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষই ভুল করে।

ফোরের ক্লাসটিচার রমেশ ভারতী আর সেই ছেলেটি, কী যেন নাম, হ্যাঁ, সুবোধ, তাদের কাছেও একবার যেতে হবে। আপনি নিয়ে চলুন।

কাল সকালে আমি জানিয়ে দেব।

আজই আমি যেতে চাই।

হ্যারিকেন হাতে জগতের সঙ্গী হল হেডমাস্টার।

আরও মাসখানেক পরে বিচারবিভাগীয় তদন্ত যখন শেষ পর্যায়ে, দেখা গেল, চেনা অচেনা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জগৎ প্রশ্ন করছে, হরধনু ভাঙার বিষয়ে আমি কি আপনাদের কিছু বলেছিলাম? যদি বলে থাকি, তাহলে মাপ করবেন। হরধনু বলে কিছু ছিল না, নেই। সবটা কাল্পনিক।

তার কথা শুনে কেউ গম্ভীর হচ্ছে, কেউ হাসছে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে কেউ।

বিচারবিভাগীয় তদন্তের বিষয় নিয়ে জগতের এই মস্করায় বিরক্ত হয়ে তাকে হাজতে পোরার কথা পুলিস যখন ভাবছে, তখন পাড়ার মধ্যে মজা করার মত সত্যিকারের একটা পাগল পেয়ে জগতের প্রতিবেশীরা হলো খুশি।

রতির গোপন প্রেমিক

সুব্রত নিয়োগী

দেবাঞ্জন অফিস থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। জানলার ওপারে আবছা অন্ধকারে চিকের মতো বৃষ্টির পর্দা। বে অব বেঙ্গলের ডিপ্রেসন এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। বৃষ্টির তোড় বাড়তে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ কমে এলো। স্নান সেরে অলস ভঙ্গিতে লিভিং রুমের ডিভানের উপর গা এলিয়ে দেবাঞ্জন। হাতে ভালো হুইস্কি দু-পেগ। মাঝে মাঝে চুমু খাওয়ার মতো ক্রিস্টাল গেলাসে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে দেবাঞ্জন। প্রতি সন্ধ্যায় দু-পেগের বেশি সে খায় না। খায়ও বেশ সময় নিয়ে যাতে চট করে কিক্‌ না করে। ভি-সি-আর-এ একটা বিদেশী হাফ-পর্নো ছবি চালু আছে। টিভির পর্দায় রঙিন খোলামেলা পোশাকে কিছু নারী-পুরুষ নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। দেবাঞ্জনের চোখ টিভির পর্দায় অথচ মন যেন ওখানে নেই।

দেবাঞ্জন টিপয়-এর উপর থেকে আজকের খবরের কাগজটা তুলে নেয়। কাগজে এখনও সকাল বেলার মতো টাটকা গন্ধ। রতি কাগজ পড়ে না। তবুও রোজই নিয়ম মতো কাগজ আসে। দেবাঞ্জন এক ঝলক হেডলাইনগুলো চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দেয়।

দূরে কিচেনে রতিকে দেখা যাচ্ছে। গ্যাস ওভেনের নীল শিখার সামনে দাঁড়িয়ে টুকিটাকি কাজ সারছে রতি। রতির পরনে একটা লো-কাট ঢিলেঢালা টি শার্ট আর ঢোলা পাজামা। ওর ফর্সা বুকের মনোরম ভাঁজের মাঝখানে নীলকান্ত মণির মতো দুলছে হারের লকেট।

চোখ দুটো ক্রমশ আড়ষ্ট হচ্ছে দেবাঞ্জনের। হয়তো লালচে হয়ে উঠেছে একটু — রতি দেখলে বুঝবে।

রতির টিকালো নাকে মুসুরির দানার মতো ছোট্ট হীরের টুকরো সবচেয়ে আগে চোখ কাড়ে। দেবাঞ্জন বুঝতে পারে না, রতির কোন্‌টা তাকে কামাতুর করে বেশি — ওর প্রিন্সেসের মতো নাক না নাকের উপর মুসুরির দানার মতো হীরের নাকছাবি।

রতি ওর স্টেপস চুলের গোছা মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথার উপর তুলে দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই চুলের টুকরোগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে কপালের উপর। আবার তা তুলে দিচ্ছে। যেন এ এক মজার খেলা রতির।

ঠিক সেই সময় ডিভানের পাশে টিপয়-এর উপর রাখা কর্ডলেস টেলিফোন বেজে ওঠে। অদ্ভুত মৃদু, নির্জন দুপুরে ঘুঘু ডাকার মতো স্বরে টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

প্রথম যেদিন রিসিভার পাল্টে দিয়ে যায় টেলিফোনের বাজনা শুনে রতি বলেছিলো, বাজনাটা বড্ডো সেক্সি।

হা হা হাসিতে ফেটে পড়েছিল দেবাঞ্জন। বলেছিল ইয়োর হাইনেস, তুমি নিউটার জেণ্ডারেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলে।

টেলিফোন বাজতে দেখে হাত বাড়িয়ে ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নেয় দেবাঞ্জন। মাউথপিস মুখে লাগিয়ে কিছুটা জড়ানো গলায় বলে, হ্যালো, বাসু রায় স্পিকিং।

ওপার থেকে আর কোন শব্দ ভেসে আসে না এবার। দেবাঞ্জন বুঝতে পারে এ ফোন রতির প্রেমিকের। দেবাঞ্জন আবার বলে, হ্যালো— হ্যালো— হ্যালো। ওপার থেকে দু-চারটে ফিস ফিস কথাবার্তা ভেসে আসে শুধু। দেবাঞ্জনের মনে হয়, কারা যেন গোপন ষড়যন্ত্র করছে তার বিরুদ্ধে। তারপরেই সব চুপ। বুঝতে পারে, লাইন ডিসকানেক্ট করা হয়নি। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, প্লিজ স্পিক আউট। তখনই ও প্রান্ত থেকে টেলিফোন কেটে দেবার 'কট' শব্দ হয়।

কিচেন থেকে রতি অবাক হয়ে স্বামীকে দেখে। এগিয়ে আসে — এ কী! চেঁচাচ্ছ কেন? কার ফোন?

দেবাঞ্জন কথার উত্তর দেয় না। রতি প্রেম-বিলাসিনীর মতো মাথায় হাত রাখে। ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলে চুলে বিলি কেটে বলে, রিল্যাক্স দেবা— রিল্যাক্স। অথচ দেবাঞ্জনের কাছে রতির আর রতির প্রেমিকের অ্যাফেয়ারটা গোপন নেই আর। কিন্তু কত সহজে রতি ব্যাপারটা গোপন করে আছে দেবাঞ্জনের কাছে। হাজার কথাবার্তারও ফাঁকেও মুখ ফস্কে প্রেমিকের কথা বলে না রতি। দেবাঞ্জন হাবেভাবে ওর প্রেমিকের কথা জানতে চায়। কিন্তু রতি যেন বুঝেও বুঝতে চায় না।

এ ক' বছরে রতি যা চেয়েছে দেবাঞ্জন শুধু তাই করেছে। রতি বাচ্চা চায়নি বলে ওদের বাচ্চা হয়নি। রতি চেয়েছে বলে আস্কেলেশ্বর থেকে কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়েছে দেবাঞ্জন। ওখানে থাকলে নিশ্চয় এত দিন চড় চড় করে উঠে যেত সে। এক্সপোর্ট ম্যানেজারের লোভনীয় পদের সঙ্গে সঙ্গে শোফার ড্রিভেন কার ও আরো অজস্র পারক্যুইজিটের আরামে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে পারত দেবাঞ্জন।

রতির আকর্ষণীয় মুখমণ্ডলের সঙ্গে টরসোর কত তফাৎ। কোমরের তিনটি বিলোল চর্বির ভাঁজ ছাড়া রতির শরীর নেহাতই সাদামাঠা। অথচ রতির মুখের দিকে তাকালে লোভ জেগে ওঠে।

অথচ কত সহজে রতি অফিস যাবার সময় দেবাঞ্জনকে পেছন থেকে কোট পরিয়ে দেয়। রতির ব্রা-হীন মোহন স্তনযুগল ওর পিঠকে সামান্য সময়ের জন্য ছুঁয়ে যায় তখন। টাই-এর নট্ বাঁধা শেষ হলে আদুরি হয়ে বুকে মাথা রাখে রতি। তখনই। ঠিক তখনই দেবাঞ্জনের বলতে ইচ্ছে হয়, রতি, তোমার অভিসারের খবর আমি পেয়ে গিয়েছি। বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার প্রেমিককে আমি খুন করব, রতি। ময়দানে যে ঝাঁকড়া গাছের নীচে আমরা প্রাক্ বিবাহ পর্বের প্রেম সারতাম সেই নির্জন গাছের নীচে তোমার প্রেমিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিস্তল থেকে পর পর ছ'টা গুলি করব। অথচ একটা গুলিও তোমার প্রেমিককে বিদ্ধ করবে না। সব কটা কার্তুজ ওর যৌন আবেদনময় শরীরের দু-পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাবে শুধু। মৃত্যুভয়ে যখন তোমার প্রেমিক আমার পা জড়িয়ে ধরবে তখন কেবলমাত্র তোমার প্রেমিক বলেই তাকে ক্ষমা করে দেব আমি।

রতি কাছে এলেও দেবাঞ্জন কিছুই বলতে পারে না রতিকে। রতির সম্মোহক নারীগন্ধের কাছে বাগদাদের আতরকে তার মনে হয় নেহাৎই সস্তার সুবাস।

দেবাঞ্জন উন্মত্তের মতো চুমু খায় রতিকে। দুই পুরুষ হাতে পিষ্ট করে রতির রেশমের থলির মতো স্তনদ্বয়— যাকে জড়িয়ে আছে নীল শিরার জাল।

দেবাঞ্জনের ফ্ল্যাটের নীচে তখন অফিসের কালো পিক-আপ কার একটানা হর্ন বাজিয়ে চলেছে।

দোলের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎই রতির এক বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা এসপ্লানেডে। কীএকটা সিনেমা দেখে ফিরছিল ওরা। তখনই লিণ্ডসের মোড়ে ট্রাফিকবাতির ইশারায় দাঁড়ানো গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসা সঞ্জয় সিংকে দেখতে পেলো রতি। তারপর দেবাঞ্জনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, এই সঞ্জয়। গাড়ির ভেতর থেকে সঞ্জয়ও চেঁচিয়ে উঠল, হাই রতি। রতি দেবাঞ্জনকে ফুটপাথে একা ছেড়ে দিয়ে ইস্কুলের মেয়ের মতো ওর দিকে দৌড়ে যায়। রতি ওর সঙ্গে হাতপা নেড়ে নানা কথা বলে। ঈর্ষায় দেবাঞ্জনের বুক জ্বালা করে। নিমেষে রতি দেবাঞ্জনের কাছে কেমন অচেনা হয়ে যায়। সঞ্জয়ের কী এক রসিকতায় শরীর দুলিয়ে অসভ্যের মতো হাসে রতি।

দেবাঞ্জন জানে রতি ও সঞ্জয়ের এই আলাপচারিতায় কী কথা হচ্ছে। রতি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করছে, শ্রেয়ার সঙ্গে প্রীতমের বিয়ে হলো কী না, কিংবা সায়ন স্টেটস থেকে ফিরছে কবে, দামিনী ডিভোর্স পেয়েছে কী না — এই সব। তারপর গলা নামিয়ে ওরা আরো দু-চারটে কথা বলে। তখন নিশ্চয় দেবাঞ্জনের সম্পর্কে কিছু কথা হয় ওদের।

হলুদ বাতির ইশারায় আবার গাড়িতে স্টার্ট দেয় সঞ্জয় সিং। বাতাসে কয়েকটা কথা ভেসে এসে দেবাঞ্জনকে আমূল নাড়িয়ে দেয়—দেখো একদিন তোমাকে নিশ্চয় কিডন্যাপ করব।

উত্তরে রতি কী বলল বুঝতে পারে না দেবাঞ্জন।

কত সহজে রতি ওদের অবৈধ সম্পর্কটা দেবাঞ্জনের কাছে লুকিয়ে রেখেছে, যেমন করে সে ব্লাউজের আড়ালে তুলোয় করে তীব্র সুগন্ধি লুকিয়ে রাখে। হাজার কথার ফাঁকেও রতি প্রকাশ করে না ওর প্রেমিকের নাম। দেবাঞ্জন জানে, নাইট ল্যাম্পের মায়াবি আলোয় বিছানায় তার পাশে শুয়ে থেকেও রতি আর এক পুরুষের কথা ভাবে। যে তার স্বপ্নের পুরুষ।

দেবাঞ্জন ঘুমের ভান করে রতির দিকে তাকিয়ে থাকে। রতিকে দুধসাদা সাটিনের নাইটিতে এক অলৌকিক নারী বলে মনে হয়। ওর অহংকারী নাকের উপর মুসুরির দানার মতো হীরকখণ্ডটা আলো লেগে চক্‌চক্ করে।

দেবাঞ্জন ঠিক বুঝতে পারে, রতির দু-চোখে দু-ফোঁটা চোখের জল মুক্তোর মতো টলটল করছে। এক্ষুনি তা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে। দেবাঞ্জন কী আরো কাছে যাবে রতির? চোখের মুক্তো দুটো পরম মমতায় ধরে রাখবে দু-হাতের অঞ্জলিতে? দেবাঞ্জন জানে, এই চোখের জল কেবলমাত্র রতির প্রেমিকের জন্য নিবেদিত। রোম সম্রাট নিরোর মতো সেই মহামূল্যবান চোখের জল কাচের আধারে সঞ্চয় করে রতির প্রেমিককে উপহার দিতে চায় দেবাঞ্জন।

রতি ও তার প্রেমিক দুজনে মিলে ষড়যন্ত্র করে দেবাঞ্জনকে যে কোনো মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে হুইস্কির গেলাসে ঢেলে দিতে পারে ঝাঁঝালো বিষ।

দেবাঞ্জন যখন কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে নেমে চৌরঙ্গির চওড়া রাস্তা পার হবে, ঠিক তখনই উল্টোদিক থেকে ভারি লরি এসে দেবাঞ্জনকে চাকার তলায় পিষে ফেলতে পারে।

অনেক কিছুই মানুষ প্রেমের জন্য করে।

ভালবাসার জন্য করে।

রতিকে সেদিন রাতে হঠাৎই জিজ্ঞেস করে দেবাঞ্জন, রতি তোমার ভয় করে না?

— কিসের ভয়?

অবাক হয় রতি।

— না, তাই বলছি— ডোণ্ট হারবার এনি ইলিউসন অ্যাবাউট এনিথিং।

দেবাঞ্জন বিয়ের পর হানিমুনে গিয়েছিল রাজস্থানে। নানা জায়গা ঘুরে শেষে আজমীরের এক স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ দেখিয়েছিল সে রতিকে। দুর্গম সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ওরা

স্নানাগারে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্নানাগারে ঢুকতে পারেনি। স্নানাগারের কোনো দরজা ছিল না। চারিদিকে উঁচু উঁচু দেওয়াল।

এই বদ্ধ স্নানাগার নিয়ে গাইড একটি প্রচলিত গল্প শুনিয়েছিল সেদিন। গল্পটা এই রকম : এক নবাব বহুদিন পরে মৃগয়া থেকে অন্দরমহলে ফিরে দেখে রানির ঘরে অন্য পুরুষ। নবাবের উপস্থিতি টের পেয়ে রানির প্রেমিক সেই পুরুষ এই স্নানাগারে পালিয়ে এসেছিল। নবাব রানিকে কিছু না বলে সেই মুহূর্তে রাজমিস্ত্রি ডেকে চিরদিনের মতো স্নানাগারের একমাত্র দরজায় দেয়াল তুলে দিয়েছিল। রানির প্রেমিকের হয়েছিল জীবন্ত সমাধি।

রতি সেদিন গাইডের মুখে সে গল্প শুনে বলেছিল, কী সাংঘাতিক!

ওই গল্পটা আজ আবার দেবাঞ্জন রতিকে মনে করিয়ে দেয়। রতি আবার বলে, সত্যি কী ভয়াবহ গল্প!

দেবাঞ্জন বলে, গল্প নয় রতি— আজ যা সত্যি, আগামীকালই তা গল্পের মতো শোনাবে। বিয়ের আগে রতিকে তার প্রিয় পোশাকে আসতে দেখে দেবাঞ্জনের বুকের মধ্যে যেমন হাইহ্যাটস বাজত, তেমনি রতির প্রেমিকেরও বাজে। এখন সব স্বামীদের মতোই দেবাঞ্জন অতি পরিচিত। সব স্বামীদের মতোই এক রকম। দেবাঞ্জন এখন শুধু মিসেস রতি বসুরায়ের পতি।

রতি বলেছিল, দেবাঞ্জন, বিয়ের পর তুমি কি আমার উপর বসিং করবে? তারপর কেটিশ গলায় আরো বলেছিল, হাজব্যাণ্ডদের বসিং আমি একদম লাইক করি না।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে দেবাঞ্জন, রতির সঙ্গে আজকাল তার ভালবাসার কথা খুবই কম হয়। অথচ একদিন দমকা হাওয়ার মতো রতি দেবাঞ্জনের জীবনে এসে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। তাকে মনে হয়েছিল, সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। একেবারে আলাদা। আজ রতির প্রেমিকের রতিকে যা মনে হচ্ছে, দেবাঞ্জনেরও ঠিক তেমনি মনে হয়েছিল একদিন। এখন তাদের সম্পর্কটা যে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেবাঞ্জন জানে না। তাদের সম্পর্কের গভীরে যে ফল্গুর মতো ধস নামছে তা বাইরের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা টের পায় না।

ঘরভর্তি পুরুষের মাঝখানে রতি অনায়াসে দেবাঞ্জনের হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করে। পুরুষের মনে যৌনঈর্ষা ধরানোতে রতির জুড়ি নেই।

রতির প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হলে দেবাঞ্জন তাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি পারবে রতির যোগ্য হয়ে উঠতে? তুমি কি জান বসন্তের সন্ধ্যায় রতি তুলোয় করে কোন্ সুগন্ধি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে? গোলাপ কি জানে তার সৌন্দর্যে মানুষ মুগ্ধ হয়? রতিও জানে না।

রতির প্রেমিক এ সব জানতে পারে না। তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে শুধুই প্রেমিক। মিসেস রতি বসুরায়ের প্রেমিক।

রতির গোপন প্রেমিকের কাছে দেবাঞ্জনের আকুল অনুরোধ— রতি যখন ভোরবেলায় স্বচ্ছ নাইটির উপর হাউসকোট জড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে সে যেন রতির সামনে না আসে। তার মনে রাখা উচিত সে রতির প্রেমিক, স্বামী নয়।

দেবাঞ্জন ভাবে, দেবাঞ্জনের মতো এমন স্বজনহীন মানুষ কে আছে সংসারে? রতির দিকে তাকাতে গিয়েও চোখ সরিয়ে নেয় দেবাঞ্জন। রতি যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে এক মায়াবি রমণী।

রতির হাতে গিমলেটের সোনালি গেলাস। রতি খুব আস্তে ডাকে— দেবাঞ্জন।

— উঁ! কিছু বলবে রতি!

— তোমার ফিরোজকে মনে আছে?

— কোন্ ফিরোজ?

দেবাঞ্জনের গলার স্বর জড়িয়ে এসেছে।

— সেই যে পিটার ক্যাটে এক শনিবার দেখা হলো। একা একটা টেবিলে বসে ড্রিংক করছিল। গায়ে লাল কশাক শার্ট। দাঁতে কালো নিকোটিনের দাগ। মাথার চুল তামাটে।

— হ্যাঁ, কাঁধে ভারি ব্যাগ। রাস্তার ভবঘুরে ছেলেদের নিয়ে কী যেন একটা ডকু-ফিল্ম তুলছে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র ইস্টম্যান কালার ছবির পর্দা থেকে নেমে এসেছে। আর তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিল যেন ফ্লার্ট করছে!

— আরে তোমারও হিংসে আছে দেখছি! তোমাকে তো অতটা নাইভ মনে হয় না।

— রতি, আমার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা ভারি জানতে ইচ্ছে করে।

রতি মজা করে প্রায় আবেগহীন ভঙ্গিতে বলল, আপনি সুন্দর ফিজিকের অধিকারী, আপনাকে প্রায় হ্যান্ডসাম বলা যেতে পারে, কণ্ঠস্বর বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ, সবশেষে কমন ম্যানের সঙ্গে আপনার একটা নিরাপদ দূরত্বের সম্পর্ক বজায় আছে— মানে একেবারেই ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্ব নয় আপনার— কি, ঠিক আছে তো?

— না, রতি...

কি একটা বলতে যায় দেবাঞ্জন।

রতি বাধা দিয়ে বলে, বুঝেছি। আবার পাগলামিটা জেগেছে।

রতি একেবারে দেবাঞ্জনের পাশে এসে বসে। রতির ঈষৎ ভারী নিতম্ব বহির্বাস ভেদ করে দেবাঞ্জনের শরীরকে স্পর্শ করে থাকে।

দেবাঞ্জনের মনে হয়, এ রতি নয়, অন্য কেউ।

— রতি, আমি তোমার পায়ে উপুড় করে দেব আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব।

দেবাঞ্জনকে বড়ো ব্যাকুল দেখায়।

রতির দুই মোহন স্তন দেবাঞ্জনের অ্যাতো কাছে যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না সে। প্রায় রেপিস্টের মতো আচমকা সে ঝাঁপিয়ে পড়ে রতিশরীরে। ওর সারা শরীরের পৌরুষ পরম নির্ভরতায় রতির নারীশরীরের উপর ঢেলে দেয় দেবাঞ্জন। দেবাঞ্জনের বিদ্যুৎপ্রতিম জিহ্বা চকিতে অনুভব করে আর এক লালাসিক্ত চঞ্চল নারী-জিহ্বার পিচ্ছিলতা ও তীব্র ঘ্রাণ। তাদের দুই অসম শরীর এমনভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করে যেন মনে হয় উভয়েই তাদের হারানো অর্ধেককে বহুদিন পরে খুঁজে পেয়েছে। এক সময় তাদের দুই শরীর একই ছন্দে, একই তালে দুলতে থাকে। দেবাঞ্জনের মনে হয়, তাদের শরীরে আর আলাদা ফুসফুস, আলাদা হৃৎপিণ্ড নেই। মিলেমিশে একাকার।

রাত বাড়ে। বৃষ্টির বেগ গাঢ় হয়। জানালার কাচে সশব্দে ফেটে পড়ে অকালবৃষ্টির অসংখ্য বড়ো বড়ো ফোঁটা। আর সেই সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠে রতি ও দেবাঞ্জনের নিজস্ব জগতে প্রবেশাধিকার চায়। একটানা বেজে চলে টেলিফোন। দেবাঞ্জন ভাবে, এ-ফোন রতির প্রেমিকের।

দেবাঞ্জন রতির প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে বলল, রতির প্রেমিক, তুমি যেই হও না কেন রতি তোমাকে সব দিতে পারবে না। ভিখারির মতো হাত পাততে হবে রতির সঙ্গ-সুখের জন্য। সর্বদাই এক অপরাধবোধ ও ভয় কাজ করবে তোমাদের দুজনের।

টেলিফোন ধরার জন্য দেবাঞ্জন রতির শরীর থেকে মুক্ত হতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই পারল না। রতির দুই মৃণাল বাহু আর সোনার থামের মতো পা দেবাঞ্জনকে স্ত্রী-মাকড়শার মতো আকর্ষণ করে থাকে। টেলিফোনটা একটানা বেজেই চলল।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর নেই।

ঝুল-ঝাঁপ্পি

কল্যাণ মজুমদার

রুমালে বার কয়েক ঘষছে। তবু নস্যির হাত। ঘরে ঢোকার মুখে পাঞ্জাবীর গায়েও বার দুয়েক ঘষে নিলো। পাঞ্জাবীরও যা অবস্থা। বটব্যাল সায়েব কিছু বলেন না। তাহলেও এই পোষাকে এই ঘরে ঢুকতে তারক মরমে মরে যায়। কিন্তু উপায় কী! পাঞ্জাবীর বিকল্প যা, সে-ভাবে তো আসা যায় না—খালি গায়ে। টেবিলের সামনে বসেও দু হাঁটুর ওপরে রাখে দু হাত।

— বলো টারকবাবু, কী ব্যবস্থা করলে?

বটব্যালের মুখে লম্বা চুরুট। সেজন্য ত ট-হয়ে উচ্চারণ হয়। সায়েবের এই বাবু বলাটা কেন তারক জানে না। ও অনেকবারই বলেছে, আমাকে তারকই বলবেন। সায়েব রাজী হননি।

— আর কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভয়ে ভয়ে বললো তারক।

— আবার সেই কথা! ছ'মাসের বেশি তুমি আমাকে এই কথা বলে আসছ। তুমি যদি না পারো সে-কথা বলো না স্পষ্ট করে।

— স্যার, আপনি আমার উপর রাগ করছেন। কিন্তু—

না-না। না, তারকবাবু। আমি রাগ করছি না। ব্যবসার ব্যাপারে কি রাগারাগি চলে! তুমি আমার দিকটা ভেবে দ্যাখো। প্রায় এক বছর আগে বলেছি তোমাকে। তোমার ভরসায় ক্লায়েণ্টকে কথা দিয়েছি। এখন যদি একটা সামান্য জিনিষ সাপ্লাই করতে না-পারি তাহলে ব্যবসারই বা কী হয়, আমার রেপুটেশনও কোথায় যায়!

— আমি বুঝতে পারছি, স্যার। কিন্তু এমন কঠিন জিনিশ, একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে, আপনি ভেবে দেখুন, আগে আপনি বলার এক মাসের মধ্যে দিয়ে গেছি ঠিক যেমনটি চেয়েছেন। সিক্সটিন উইকস এইটিন উইকস বলুন, আমি স্যার কালই আপনাকে এনে দেবো। কিন্তু থার্টি-টু উইকস, একেবারে ফুলগ্রোন--

বাধা দিয়ে বটব্যাল বলেন, টাকাটার কথাও ভেবে দ্যাখো। দু'শ-পাঁচশর বদলে একেবারে তিন হাজার। ফুল-গ্রোন বলেই তো!

— না স্যার, টাকার ব্যাপারে আমার কিচ্ছু বলার নেই। আমি সব সময়ে বলি, আপনার মত দরাজ দিল, মহৎ মানুষ—

— থাক, থাক। ফাইন্যাল বলো, তারকবাবু, কবে দিতে পারবে।

নাক টেনে, গলা পরিষ্কার করে তারক বললো, একটা কেস পেয়েছি, স্যার। আগামী সপ্তাহে থার্টি-টু উইকস হবে। আট-দশ দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

— কেস জেনুইন?

— নিশ্চয়ই স্যার। আমি যেমন জেনুইন, সেই রকম। আপনি আমাকে তো বিশ্বাস করেন।

বটব্যাল চোখ সার্চলাইটের মতন তারকের মুখের ওপর পড়ে। মুখ দেখেই মানুষ বুঝতে পারেন এমন অহংকার তাঁর আছে। আছে বলেই এ-ব্যবসা তিনি চালাতে পারছেন।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, ঠিক আছে তবে। আমি আরো এক সপ্তাহ্ ওয়েট করবো। নো মোর—

— আমি কথা দিচ্ছি স্যার, আপনি পেয়ে যাবেন। আগামী সপ্তাহেই পাবেন।

— দেখা যাক। এখন অন্য আর কিছু চাই না।

এবার তারকের উঠে পড়ার কথা। বিনা-প্রয়োজনে সময় নষ্ট করা বটব্যালের স্বভাব নয়। কিন্তু তারক উঠলো না। বটব্যালের ভুরু জিজ্ঞাসায় কুঁচকে ওঠার আগেই, জিভ কামড়ে তিনবার ঢোঁক গিলে তারক বললো--স্যার--

— ইয়েস্—

— ইয়ে— মানে শ'পাঁচেক টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে।

— সে কী টারকবাবু!

— কেসটা খুব— খুউবই ডিফিকাল্ট স্যার, অনেক খরচা আছে। নইলে আমি কখনো অ্যাডভান্স চাইনি।

— চাওনি সেটা ঠিক। কিন্তু আমার পলিসি জানো--মাল দাও, টাকা নাও।

— সেতো বটেই স্যার। কিন্তু কেসটা এত কঠিন--প্রায় অসম্ভব জিনিষ—

— কী কঠিন-কঠিন করছ তখন থেকে! অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গলা চড়ে বটব্যালের, ইটস নাথিং বাট আ ফিটাস। থার্টি-টু উইকস— ফুল গ্রোন—বাট ফিটাস অল দ্য সেম!

তারকের আজ টাকা চাইই। নতুবা এভাবে কখনো বলতে পারতো না। মরীয়া হয়ে বলে— আট-মাসের ভ্রূণের চেয়ে জীবন্ত বাচ্চা পাওয়া অনেক সোজা, স্যার। এর জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে। ডাক্তারকে দিতে হবে, পার্টিকে দিতে হবে, আরো নানারকম খরচা আছে। আপনি তো স্যার, ভ্রূণ পেয়েই খালাস, আমাকে যে কী ভাবে জোগাড় করতে হয়— নেহাৎ স্যার পেটের দায়ে। নয়তো বামুনের ছেলে হয়ে—

— থামো, টারকবাবু, থামো। টাকা নিয়ে যাও তুমি। কিন্তু কোনো ট্রিকস খেলার চেষ্টা করো না। শুক্রবারের মধ্যে আমার মাল চাই।

— পাবেন স্যার, শুক্রবারের মধ্যেই পাবেন।

— গুড। শোনো টারকবাবু, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। থার্টি-টু মীনস থার্টি-টু। কমবেশি হলে এক পয়সাও পাবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গলা মুখ আরেকবার মুছে নিলো তারক, ঘেমে গিয়েছিল তো! ঐ হায়নার সামনে বেশিক্ষণ বসাই মুশকিল। গলা বুক থেকে শুরু করে গ্রেটার-ইনটেস্টাইন পর্যন্ত সব শুকিয়ে যায়।

পাঁচ বছর ধরে লোকটার সঙ্গে কারবার। অথচ আজো পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ হতে পারলো না। সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় যেন চিবিয়ে আস্ত খেয়ে ফেলবে। একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, টাকা পেলেও কৌতূহল মরে না--স্যার, এই নানা বয়েসের ভ্রূণ নিয়ে আপনি কী করেন?

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলো তারক। কখনো চার মাস, কখনো পাঁচ মাস—চোদ্দ থেকে কুড়ি সপ্তাহের ডিম্যাণ্ডই বেশি। এবারই হঠাৎ একেবারে আট মাস--থার্টি-টু উইকসের

চেয়ে বসলো। এ জিনিশ কি চাইলেই পাওয়া যায়? আট মাস ধারণ করে খসাতে চাইবে কোন মাগী? তার চেয়ে একটা গোটা বাচ্চা নিলে হয় না?

তো বটব্যাল এমন গলায় জবাব দিলো, ওর মনে হলো শালা গলার মধ্যে যেন অ্যাটম বোম পুষে রেখেছে—কেউ মুর্গি কিনলে মুর্গিওলা কখনো মাথা ঘামায় নাকি সেটা খাবে না পুষবে, বা কারুকে দিয়ে দেবে কিনা। কত কীইতো মুর্গিটাকে নিয়ে করা যায়। সো?

এরপর তারক জানতে চাইবে সায়েব ভ্রূণ নিয়ে কী করেন, ওর বাপ তেমন কোনো আয়রন-ম্যান ছিল না। অবশ্য নানা সূত্রে শুনেছে, এসব ভ্রূণ ডাক্তারী গবেষণার জন্য এক্সপোর্ট হয়। ল্যাবরেটরী—মিউজিয়ামেও দরকার হয়। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত ব্যাপার আছে। জ্যান্ত মানুষের কোনো দাম নেই, অথচ একটা চার মাসের ভ্রূণের জন্য দু'শো টাকা যে কোনো সময়ে পাওয়া যায়। মানুষের হাড়ও নাকি ভালো দামে বিকোয়—সে-লাইনটা তারক ধরেনি। একসঙ্গে বেশি ব্যাপারে জড়িয়ে সামাল দিতে পারবে, তেমন বেওসায়ী রক্ত ওর শরীরে নেই।

পাঁচটা চকচকে পাটভাঙ্গা নোট পাঞ্জাবীর ভেতরে গোপন পকেটে, গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে আছে। তারকের মনে হয়, গায়ের তাপ বেড়ে গেছে। এখনই খালাসীটোলায় গেলে হতো। কতদিন যায়নি!

ইচ্ছা দমন করে। সানি পার্ক থেকে হেঁটে গড়িয়াহাট। বাস ধরে ভবানীপুর। ডাঃ সামন্তকে আজই বলা দরকার।

ওকে দেখে রামচরিত বললো, রাম রাম চক্কোত্তিবাবু।

— রাম রাম। নতুন কেস কিছু এলো?

— কঁহা! কুছ নহি। মার্কিট বহুত ডাল আছে।

রামচরিতের কথায় করুণ সত্য, ভ্রূণ না হেলদি বেবীর মত বেরিয়ে আসে। কান্নাটা তারক ঠিকই শুনতে পায়। নতুন কেস-ফেস না এলে তারক বা রামচরিতের চলে কী করে? ডাঃ সামন্তের নার্সিংহোমের দারোয়ানি করেই কেবল রামচরিত মুলুকে দশ একর জমি, পাকা বাড়ি বানাতে পারেনি তো!

কিছুকাল আগেও এই নার্সিংহোমের দরজায় গাড়ি-ট্যাক্সির ভিড় লেগে থাকত। কত কেস ফেরৎ দিতে হতো। আর তখন বটব্যাল বললেই মাপ মতো ভ্রূণ তারক হাজির করে দিতো। তারপর গভর্ণমেন্ট যেই বললো, এমটিপি লিগ্যাল, অমনি গাড়িগুলো মুখ ঘুরিয়ে হাসপাতালে ছুটছে। এমটিপি—মেডিকেল টারমিনেশন অব প্রেগনেন্সি। যত্তো সব! সোজা কথা বলনা বাপু, পেট-খসানো। রাঁঢ়ের নাম সুচরিতা!

অবশ্য কেস যে কিছু কম আসে তা নয়। বড়লোকেরা হাসপাতাল পছন্দ করে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মানইজ্জত, সার্কাসের খেলায় দড়ির ওপর হাঁটার মতন, সারাক্ষণই গেল-গেল ভাব। সুতরাং কেস আসেই। আসবেও। মানুষ তো পশুর চাইতে উন্নততর জীব—সারা বছরই, তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই মেটিং-ডে। ফলে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, তা বলে ভুল নিয়ে কেউ কি বসে থাকে?

তাছাড়া অন্য কতরকম কেসইতো আসে। যত মানুষ, তত অসুখ। নেহাৎ তারকের ভ্রূণমুখী মন, ওতেই যা কিছু আমদানী। আলসার-অর্শ-গল-ব্লাডার নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

— রামচরিত, ডাক্তারবাবু আছেন?

নার্সিংহোমের দেয়াল ঘেঁষে ডাঃ সামন্তর বটলগ্রীন গাড়িটা তারক ঠিকই দেখেছে। তবু, জিজ্ঞেস করলো, কাছাকাছি কোথাও যদি বেরিয়ে থাকেন। ডাক্তারদের জন্য ইমার্জেন্সি লেগেই থাকে।

বটব্যালের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ৩/৪ বছর আগে থেকেই ডাঃ সামন্তর এখানে কাজ করছে তারক। কাজ বলতে বাঁধাধরা কিছু না। ডাক্তারবাবু যখন যা বলেন— কখনো কোনো রোগীকে ইনজেকশন দেয়, ল্যাবরেটরীতে ব্লাড-স্টুল-ইউরিনের স্যাম্পেল দিয়ে আসে, রিপোর্ট আনে, গাড়ি খারাপ হলে মেকানিক ডাকে। কেস নিয়ে এলে কমিশন পায়। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের পঁচিশ বছরের চাকুরে তারকনাথ বাড়ি বাড়ি ঘুরে কম লোক চিনেছে! মানুষের বিপদে, অবাঞ্ছিত গর্ভের মতন বড়ো বিপদ ভদ্রমানুষের আর হয় না, তারকের নিঃস্বার্থ সাহায্য ডাক্তারবাবুর বরাভয়ের চেয়ে এতটুকুও কম স্বস্তি ও নিশ্চিন্তির নয়। এবং তারক যা করে স্বার্থহীনভাবে করে। পার্টির কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয় না। পরোপকারের মধ্যে কুঁচকি-চুলকানোর মতন তুষ্টিপ্রদ একটা মহৎ-মহৎ ভাব থাকে।

ভ্রূণ সাপ্লাইয়ের লাইনটা ধরার পর তারকের বরং অনেকবারই মনে হয়েছে, পার্টিদের খালাসের ব্যাপারটা ফ্রি করে দিতে পারলেই ভালো। ওরা যা খসানোর জন্য ডাক্তারকে টাকা দেয় তারক সেই মালই সাপ্লাই করে বটব্যালের কাছ থেকে টাকা গুণে আনে। শালার দুনিয়া, মাইরি, আজব।

প্রথম দিকে কাজটা, ভ্রূণ-পাচার, ডাক্তারবাবুকে লুকিয়েই করত। নার্স জমাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ভেবেছিল এভাবেই চালিয়ে যাবে। তখনো বটব্যালকে সম্যক বোঝেনি।

একদিন বটব্যাল বললেন, আড়াই মাসের ভ্রূণ চাই। দিলেই তিনশ টাকা। সন্ধ্যেবেলাতেই সেদিন কেস ভর্তি হলো। টেন উইকস। খুশিতে তারক অলিম্পিক রানারের মতন দৌড়বে ভাবছিলো। কিন্তু হেড নার্স এসে বললো, কেসটা কিউরেট করা হবে। তার মানে ভ্রূণ পাওয়ার কোনো আশা নেই। অথচ ওটা চাই-ই। বটব্যালকে কথা দিয়ে এসেছে। টাকাটারও ভীষণই দরকার।

অগত্যা ডাক্তারবাবুকে বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ততদিনে তারক মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে যে, ডাক্তারবাবুকে বিশ্বস্ত সেবায় সেই টিকা ও দিতে পেরেছে যাতে তাঁর মনে ওর জন্য স্নেহ ও করুণা কোনোরকম ক্রোধকে সক্রিয় হতে দেবে না।

ডাঃ সামন্ত ওর আবেদন শুনে বললেন, ওটা নিয়ে তুমি কী করবে?

তারক বাঁ-হাতের তালুতে নস্যি-টেপা ডান হাত আড়াল করে বললো, স্যার, একটা পার্টি ওটার জন্য কিছু টাকা দেবে বলছিল। আপনি তো আমার অবস্থা জানেনই—

ডাক্তারবাবুর আপত্তি করার কিছু ছিল না। টাকা যা পাওয়ার তা তিনি পাবেনই। কারুর ক্ষতি না করে যদি অন্য কারুর উপকার হয় তো ভালো কথা।

বললেন, ঠিক আছে, তারকনাথ। ঐ ফিটাস তুমি পাবে। আমি হিস্টেরটমি করে দেবো। তবে একটু সামলে-সুমলে। আমাকে যেন বিপদে ফেলো না।

তখনো এমটিপি লিগ্যাল হয়নি।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে তারক দেখলো ডাক্তারবাবু ঘরে একা। কাগজপত্র দেখছেন ! এই-ই সময়। এখনই কথাটা বলে ফেলা দরকার। তারক রুমালে দু-হাত

ভালো করে মুছে নেয়। হঠাৎ ধক্ করে ওঠে বুক—ডাক্তারবাবু যদি রাজী না-হন। পলকের জন্য চোখের পাতায় দুলক্ষ কালো পিঁপড়ের উপস্থিতি টের পায়। পলকের জন্যই কেবল। কোনো কল্পিত ভয়ে কুঁকড়ে যাবে তারক সে-রকম মানুষই নয়। নিরুপায় হলে শেষ অস্ত্র হিসেবে গলায় করুণ হাহাকার বাঁশের বেহালার মতন বাজাতে একটুও দেরি করবে না। ডাক্তারবাবু এসবে এখনো ভড়কি খেয়ে যান।

তারকের কৃশ ছায়া টেবিলে পড়তেই ডাঃ সামন্ত মুখ তুললেন, কী খবর তারকনাথ?

— একটা কেস ছিল, স্যার।

— কী কেস?

— খস্—মানে—এমটিপি, স্যার।

— ও! কত ওল্ড?

একটু বেশিই স্যার। থার্টি-টু উইকস।

— কী বললে! ডাঃ সামন্ত চেঁচিয়ে ওঠেন— থার্টি-টু উইকস— সেতো ফুল গ্রোন! না তারকনাথ, এটা আমি পারবো না।

বুক কাঁপে তারকের। ম্যারাথনের শেষ পাকে এসে পা পিছলোবে? সমূলে মারা পড়বে যে। গলার ভাঁজে তৈলাক্ত মসৃণতা এনে বললো, এ-কেসটা আপনাকে করে দিতেই হবে, স্যার।

— তার মানে?

— এ আমার নিজের কেস— কোনো রিস্ক নেই।

— নিজের মানে—তোমার স্ত্রী?

— না, মানে স্ত্রী নয়। তবে একরকম তাই আরকি!

ডাঃ সামন্ত কিছু বুঝতে না-পেরে বিহ্বল বোধ করেন। স্ত্রী নয়, অথচ একরকম তাই-ই, এর একটা অর্থই হয়। তারকনাথও— ? মহা-পাখোয়াজ লোক বটে! মনে-মনে হাসেন তিনি, কোনো মানুষকে দেখেই কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু তারকনাথও— আশ্চর্য!

তারক বললো, এই দেখুন স্যার, আমি সব রিপোর্ট নিয়ে এসেছি। ব্লাডপ্রেসার ওয়েট সব নর্মাল। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। তবু কিছু হলে আমি তো আছিই।

ডাক্তারবাবু বললেন, বয়েস কত?

— মেয়েদের বয়েস—তা সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ—

— এটা কত নম্বর?

— ছয়, না, সাত নম্বর, স্যার। সেজন্যই মানে— ভয়ের কিছু নেই।

— ভয়ের কথা হচ্ছে না। তুমি এত দেরি করলে কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

নিরীহ, লাজুক অপরাধী-অপরাধী মুখ করলো তারক। গলার স্বরের মসৃণতাতেই কাজ হয়েছে। এবারে আরো মিহিস্বরে বললো, আমাকে আগে বলেনি, এখানে ছিলও না। তারপর স্যার, টাকাপয়সার ব্যবস্থা— খরচাপাতি তো কম না—

— টাকা পয়সা? আমি তোমার কাছে টাকা নিতাম তারকনাথ?

— ছি ছি ছি। সে-কথা বলিনি স্যার। আপনাকে দেবো সে টাকা আমার কোথায়। তেমন আস্পর্দ্ধাও হবে না আমার। তবু স্যার খরচা তো একটা আছে। আমি তো জানি— অষুধপত্র, নার্স, এনেসথেসিয়া— হুজ্জোত কি কম!

এই সব বুকনি বিশ্বাস করবেন ডাঃ সামন্ত তেমন নির্বোধ নন। তিনি তীক্ষ্ণ প্যাথলজিক্যাল চোখে তারকের মুখ দেখেন। সেই কবেকার হিস্টেরটমির কেসটার কথা মনে পড়ে। সে কী একটা? তারপরও কতবার করেছেন। নার্স-সুইপারের সঙ্গে বন্দোবস্ত

করে তারকনাথ কত পয়সা বানিয়েছে সঠিক ধারণা করতে পারেন না বটে, তবু একটা অনুমান তো আছেই।

প্রখর স্বরে বললেন, সত্যি করে বলোতো, তারকনাথ, তোমার মতলবটা কী?

ডাক্তারবাবুর গলার স্বরে সাইরেন শুনতে পেলো তারক। হঠাৎই কণ্ঠ শুকনো লাগে।

— স্যার!

— তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কী?

নির্ভুল সাইরেন! আর উপায় নেই। তারক টের পায় পাঞ্জাবী ভিজে উঠেছে। সাদা -কালো লোমের গোড়ায় শিরশিরে ঘাম। ও বোঝে আর দেরি করা বৃথা। ও একই সঙ্গে গলা আরো তৈলাক্ত, আরো মিহি করে, বাঁশের বেহালায় ধীর ছড় টানে। ভাঙা গালে, শুকনো ঠোঁটে গলিত তরল হাসির স্পিরিট ছড়িয়ে বলে,

— আপনার কাছে কিছুইতো লুকোছাবি নেই, স্যার। সবই জানেন। পাঁচটা ছেলেমেয়ের একটাও মানুষ হলো না। বড়ো মেয়েটাকে নিয়ে কী যন্ত্রণায় পড়েছি, কী বলবো আর! বিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই স্যার, পার্টি যখন বললো থার্টি-টু উইকসের জন্য অনেকগুলো টাকা দেবে, তখন ভাবলাম, একমাসে আর কী আসে যায়। নইলে মিথ্যে বলবো না স্যার, মালতী আমাকে মাসখানেক আগেই বলেছিল। আপনি দেবতা— আপনার ভরসাতেই— এবারটা কোনোমতে বাঁচিয়ে দিন স্যার! বাপ হয়ে নিজের মেয়ের নির্বিঘ্ন কথা আর কি বলবো— ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ডোম-চাঁড়ালের কাজ করছি—

শেষের তিন লাইনে বেহালা এমন কঁকিয়ে বাজালো, তারক নিশ্চিত যে ডাক্তারবাবুর মনের রাগ বা দ্বিধার এমব্রাইও-ও নিখুঁতভাবে কিউরেটেড হয়ে গেছে। একেবারে ক্লীয়ার লাইক হুইসল। কথাটা ডাক্তারবাবুকেই বলতে শুনেছিল।

— তুমি কি মানুষ, তারকনাথ!

বলতে গিয়েও বললেন না ডাঃ সামন্ত। মানুষের ডেফিনিশন সম্পর্কে তিনি আজকাল আর একেবারে নিশ্চিত নন। এতরকম আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য কেস দেখেছেন, দেখছেন যে তিনি আর প্রচলিত রীতিতে মানুষকে বোঝার ও বিচার করার চেষ্টা করেন না।

— এবারটা উদ্ধার করে দিন, স্যার! তারক গলায় গভীর মীড়ের কাজ তোলে। অনুনয়ে গলে যায়।

পুরো এক মিনিট ভাবলেন ডাঃ সামন্ত। চিত্ত অনেকটাই দ্রব। তারকের অবস্থা তিনি জানেন। এক ধরনের মমতাও জমে গেছে মনে। প্রায় শ'চারেক এমটিপি করছেন বছরে, না হয় আরো একটা করবেন। তারকের সঙ্গে আরো কথা বলা মানে অযথা সময় নষ্ট।

বললেন, ওয়েল, তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে। কিন্তু তারকনাথ, অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন এমটিপি করা খুব রিস্কি।

লাফ দিতে গিয়েও থেমে গেল তারক। বুকের মধ্যে আশ্বস্ত খুশির থৈথৈ উচ্ছলতার ওপর করুণ-করুণ আঁকিবুকি বজায় রেখে বললো, বলেছি তো, স্যার, আমার নিজের কেস। রিস্কের জন্য ভাববেন না। আমি তো আছি— থাকবো। আমি তো আপনাকে বিপদে ফেলবো না, স্যার!

— তবে আর কথা কী। কবে করাতে চাও?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে তারক হিসেব করে, আজ শনিবার, বটব্যালকে যদি কথামতো মাল দিতে হয় তবে বিষ্যুৎ-শুক্রবারের মধ্যে ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে। শুক্রবার বলতে গিয়েও ভাবলো, হাতে একটা দিন থাকা ভালো।

বললো, বুধ-বিষ্যুৎ যেদিন বলবেন।

ডাক্তারবাবু তাঁর ডায়েরি দেখে বললেন, বুধবারে পারবো না। বিষ্যুৎবারেই হবে। পেশেন্টকে বুধবার রাতেই আনতে হবে। সেসব তো তুমি জানোই। কিন্তু মনে রেখো, আমি আবারো বলছি, এটা খুব রিস্কি কাজ। তুমি বরং আরেকবার ভেবে দেখো।

আবার ভাবাভাবি। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে তারক সোজা খালাসিটোলায় চলে এলো। একটা পাঁইট নিয়ে ঘনঘন চুমুক দেবার পরই কেবল মগজের মধ্যে ছুটন্ত ঘোড়াটা কিছু শান্ত হয়। আরেক চুমুক মুখের মধ্যে কুলকুচি করার মতন নাড়তে নাড়তে নিজের মনে কুলকুল হাসে। ফেরেববাজিতে নোবল প্রাইজ দেবার নিয়ম নেই, মাইরি! কেমন টুপি পরানো হলো দুজনকে। কিচ্ছু খরচ নেই, ডাক্তারবাবু টাকা নেবে না ও জানতই। তবু স্রেফ কৌশলে পাঁচটা পাটভাঙা নোট পকেটে জমা। শালা, ডাক্তারবাবু নির্ঘাৎ ভেবেছে ও অন্য কোনো মেয়েমানুষের পেট করে দিয়েছে। সত্যি কথা জানলে ব্যাটা হয়তো রাজীই হতো না। তবে হ্যাঁ, মেয়ের কথাটা ঠিক বলেছে। ঐ খানকি, নিজের মেয়ে তো কী হয়েছে, এতদিন যে পেটটা বাঁচিয়ে রেখেছে তাই-ই ঢের। আজকাল কোন একটা ছোকরার সঙ্গে খুব নাকি আশনাই চলছে—ওর মা বলেছে। বটব্যালের কাছ থেকে টাকাটা খিঁচে নিয়েই ওকে বিদেয় করবে। দিনদিন যা সব কেচ্ছা দেখছে। কম কেস নিয়ে গেছে নাকি ডাক্তারের কাছে! শালা যত পেট খসিয়েছে তা দিয়ে আরেকটা কলকাতা শহর ভরিয়ে ফেলা যেত।

কিন্তু তারক নেমকহারামি, না, ভ্রূণহারামি বলাই ঠিক, করবে না। কেচ্ছাগুলো হয়েছে বলেই না ও ভ্রূণগুলো পেয়েছে। বটব্যাল একটা চামার। একশ দুশর বেশি দিতেই চায় না। অর্ডার-মাফিক মালগুলো যেন ফেক্টরিতে তৈরি হয়! তবু তা হোক ঐ দিয়েই বেঁচে গেছে। সাতটা প্রাণীর খাঁই কিছু কম না। তাওতো বাপের আমলের বাইশ টাকা ভাড়ার ঘর দুটো ছিল। নইলে এতগুলো মানুষের শোবার জায়গা করতেই পাছার কাপড় খুলে পড়ত।

ঘরের কথা মনে হতেই তারকের মেয়ের প্রতি মনটা নরম হয়। বেচারীর আর দোষ কী! চোখের সামনে বস্তির মধ্যে যা দেখছে, এই উঠতি বয়সের কুটকুটানি না হয়ে পারে না। শুধু বস্তির মধ্যেই বা কেন, নিজের ভাইবোনের জন্ম-বেত্তান্তও যে দেখেনি তাইবা কে বলবে! বউকে নিয়ে শোবার জন্য ওতো আলাদা কোনো ঘর পায়নি।

বউটাও তেমনি। বোকা-বোকা, গুবো-গুবো হলে কী হয়, পেটের মধ্যে যেন ইঁদুর-মারা কল বসিয়ে রেখেছে। ছুঁলেই আর রক্ষা নেই। তারক সাবধানী চালাক চতুর মানুষ। সেজন্য মাগীর বিয়োনোটা ছ'য়েই আটকে রেখেছিলো। শেষ বাচ্চাটা টেঁসে যাওয়ার পর ক'বছর ইঁদুর কলের যন্ত্রপাতি খারাপ হয়েছিল বোধহয়। নিশ্চিন্ত মনে বেহিসেবী হতে গিয়েই ফের ফেঁসে গেল।

তখন দিনরাত বটব্যালের উস্কানি। তিন হাজার টাকার টোপ। তারকের মাথার মধ্যে ইনট্রা-ক্রেনিয়াল ইনজেকশন ফুঁড়তে থাকে। সারা কলকাতা তোলপাড় করে কেস ধরার জন্য। বৃথা। হারামী বটব্যাল খালি-খালি ডাক পাঠায়—কী হলো, তারকবাবু, তিন হাজার দেবো বলেছি, আর তুমি একটা ফিটাস জোগাড় করতে পারছ না।

বত্তিরিশ সপ্তাহের ভ্রূণ যেনবা বেবীফুড বা কেরোসিন। বাজারে নেই, কিন্তু লাইন ধরতে পারলেই পাওয়া যাবে! চেষ্টা কিছু কম করেছে নাকি? চব্বিশ-পঁচিশ সপ্তাহের কেস পেলেই গিয়ে বলেছে, আরো কয়েক হপ্তা ধরে রাখো, একেবারে ফিরি করিয়ে দেবো। তখন তারক তিন হাজার থেকে এক হাজার পর্যন্ত খরচ করতে রাজী ছিলো।

হলে কী হবে! অতদিন কেউ অপেক্ষা করতে চায় না। সবাই ভয়ে শামুক সাজে—বেশি দেরি হয়ে যাবে, জানাজানি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা যেন বিপ্লব করার মতন। গোপন ও দ্রুত নাহলেই বিপদ। এই সব সময়ে লোকে টাকার প্রলোভনও তাচ্ছিল্য করে। উল্টে ওকেই বলে, আপনাকেও কিছু দেবো, জলদি খালাসের ব্যবস্থা করে দিন।

তিতবিরক্ত তারক ভেবেছিলো বলবে, এ-মাল পাওয়া যাবে না। ও অন্তত সাপ্লাই করতে পারবে না। বটব্যাল অন্য চেষ্টা করুক। বলি-বলি করেও বলেনি। তিন হাজার অনেকগুলো টাকা। মেয়ের বিয়েটা ভীষণ জরুরী। ওটাকে পার না করতে পারলে কোনদিন কী করে বসবে কে জানে!

এই রকম যখন মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল অবস্থা তারকের তখনই একদিন মালতী বললো, বুড়ো বয়সে তুমি কী করলে বলোতো!

কেঁদে-কেঁকিয়ে গালাগালির তুফান ছুটিয়ে সে এক ভয়ানক এক অবস্থা। যেন তারক একাই দায়ী। মেয়েমানুষের ঐ এক ঢং। খাওয়ার সময় সব চেটে-পুটে খাবে, তারপর গণ্ডগোল হলেই যত দোষ মুখপোড়া মিনসের। তিন নম্বর সন্তান থেকেই এরকম চলছে।

— দুদিন বাদে মেয়ের বে হবে। এখন এসব— কী নজ্জা! ধাড়ি ছেলেমেয়ের সমুখে ধুমসো পেট নিয়ে ঘুরতে পারবো না। তুমি যাহোক ব্যবস্থা করো।

মালতীর গর্ভবতী হওয়ার চাইতেও ওর মুখে ব্যবস্থার কথা শুনে তারক চমকে ওঠে বেশি। পরপর দু'মেয়ের পর ছেলে হতেই তারক আর ছেলেপুলে চায়নি। চতুর্থ সন্তানের সময় ব্যবস্থার কথা বলেছিল। মালতি তখন না হক কী-না বলেছে! ব্রাহ্মণীর পাপপুণ্য জ্ঞান তখন বিষফোঁড়ার মতন টনটনে ছিল। এবারে মালতী নিজে থেকেই বলছে। বাঃ! ওকে আর অহেতুক মুখ-ঝামটা খেতে হবে না!

তারক বললো, কদ্দিন হয়েছে?

লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে মালতি বলে, তিন মাস চলছে। —ঐ ভঙ্গি দেখে তারকের মনে হয়, এই বয়েসেও অমন ভঙ্গি আসে— মেয়েরা এক তাজ্জব সৃষ্টি বটে!

— তিন মাস! এদ্দিন বলোনি কেন?

— বুঝবো তবে তো!— ঝাঁঝিয়ে ওঠে মালতি— আগে দু'একবার গোলমাল হয়েছিল।

— এখন বুঝলে কী করে?

মুখে আঁচল টিপে হাসি চাপতে-চাপতে মালতী বলে, তুমি আর হাসিও না। ছ'বিয়োনী মাগীকে উনি গবভো চেনাচ্ছেন!

কথায় অসঙ্গতি না-থাকলে আর মেয়েমানুষ! তারক অনর্থক তর্ক করেনি। সামন্ত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করবে বললো।

পরদিনই বটব্যালের অমোঘ ডাক। এবং রীতিমতো দাবড়ানি।

— তাহলে টারকবাবু, তোমার সঙ্গে আমার কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হবে। একটা মাল তুমি দিতে পারছ না— কবে পারবে তাও বলতে পারছ না। এভাবে তো বিজনেস চলে না।

কাজকর্ম বন্ধ করে দিলে তারকের চলবে কী করে! সাতটা হাঁ-করা মুখ, মেয়ের বিয়ে, তার ওপর মালতী আবার একটা বাঁধিয়ে বসেছে। ঝাপসা চোখে তারক সেদিনই বটব্যালের বদলে হায়নার মুখ দেখে প্রথম।

তখনো ঝুলঝাঁপ্পি খেলার কথা মনে পড়েনি ওর। কাতর স্বরে বলেছিল, আরো কিছুদিন সময় লাগবে স্যার। ফল ধরলেই তো হয় না, পাকার সময় দিতে হবে।

— সময় দেবো না বলিনি তো। কিন্তু ফল ধরেছে কিনা সে-খবরটা তো দেবে।
— দেবো স্যার, দু'চারদিনের মধ্যেই দেবো।

হারাধন মুনসির কেসটা ছিল হাতে। পাঁচ মাস। ভজিয়ে-ভাজিয়ে ওটাকেই আট মাস পর্যন্ত টেনে নেবে ভেবেছিল। কিন্তু সেদিনই খবর নিতে গিয়ে শুনলো আগেরদিন কলকাতায় পড়ে কেস লিক্যুইড হয়ে গেছে। হারাধন বউকে নিয়ে হাসপাতালে।

মনের দুঃখে, যন্ত্রণায়, উদ্বেগে দিশাহারা তারক খালাসিটোলায় একটা পুরো পাঁইটই গিলে ফেললো। মাল খেলেই মাথাটা যা সাফ থাকে! বুদ্ধি খোলে। মাথা তোলপাড় করে নানারকম বুদ্ধির সুতো ধরে টানাটানি করে ও।

হঠাৎ ঘাড়ের ওপর রদ্দা—কী রে, এখনো ঝুলঝাঁপ্পি চালিয়ে যাচ্ছিস!

ঘাড় ঘোরাতে হয়নি। রদ্দার হাঁটু-কাঁপানো আদর, গলার স্বরে গমকলের শব্দ আর ঝুলঝাঁপ্পি এই তিনে মিলে যদি বলাইচন্দর না হয় তবে অহিংসা সত্যাগ্রহ আর অনশনের সঙ্গে গান্ধীজীর কোনো সংস্রব ছিলো না।

— বলাই, তুই! পুরোনো সাঙাতের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে তারক খাবি খায়। দুটো পাঁইটের অর্ডার দিতে এক মিনিটও দেরি করে না।

ছেলেবেলায় বহরমপুরে মামার বাড়িতে যখন যেত তখন থেকেই বলাইয়ের সঙ্গে দোস্তি। ওর কাছেই ঝুলঝাঁপ্পি খেলা শেখা। বিরাট বিরাট আম গাছের ওপরে উঠে এ-ডাল ও-ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঝুপুস শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো। নিচে পুকুর থাকলে জলে, নইলে মাটিতেই। হাড়গুলো যে জায়গামতো থেকে গেছে, অত ঝুলঝাঁপ্পির পরও, সে কেবল হনুমানের বংশধর বলেই। মানুষের হাড় অত শক্ত হয় না।

অনেক বছর পর দেখা হলে বলাই জিজ্ঞেস করেছিল, তারক কী করছে। এক গাল হেসে ও বলেছিল, কী আবার, ঝুলঝাঁপ্পি!

বলাই প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, সেই একই ব্যাপার। এ-ডাল ও-ডাল ধরে ঝুলছি আর লাফাচ্ছি। বেঁচে থাকার ডন বৈঠক আর কী!

অনেকদিনের কথা। তারক ভুলে গিয়েছিল। জীবন ভোলেনি। সারাদিন আসলেই যা করে, এক জায়গায় ঝুল দেয়, আরেক জায়গায় ঝাঁপ্পি লাগায়—ফেরেববাজের জীবন ছ্ছাড়া অন্য কিছু কি?

নেশার পায়ে, একটু বেশি রাতে ঘরে ফেরার সময় ঐ চিন্তাগুলো পেয়ে বসে। তখনই, ঐ ঘোরের অবস্থাতেই, সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলে। খেলছি যখন, শালা, নিয়ম-মাফিকই খেলবো।

পরদিনই মালতীকে ডাক্তারের কাছে হাজির করলো। সামন্ত ডাক্তার না। দীর্ঘচেনা অন্য ডাক্তার। আগেই বলে রেখেছিলো যেন মালতীকে আসল কথা কিছু না-বলে। এটুকু ম্যানেজ করতে না-পারলে তারক আর করলো কী!

ডাক্তার বললো মালতী ঠিকই তিন মাসের গর্ভবতী। ও বউকে বললো, হুঁ হুঁ! আমি ঠিক ধরেছিলাম, এ হতেই পারে না। আমি বলে কত সাবধানে সব সারি। হলেই ভাবতাম বুড়ো বয়েসে কোথায় কি ঢলাঢলি করেছ!

বউ মানে না— কী যা তা বলছ! তাহলে এই যে তিনমাস ধরে—আমি কচি খুকী নাকি!

আরও একটু রসিকতা করে তারক বোঝায়— আসলে ওর টিউমার হয়েছে। টিউমার হলে গর্ভের সব লক্ষণই দেখা দেয়।

— ও মা! সেতো সাংঘাতিক রোগ গো!

ঐটুকু চিৎকারে তারক ঘাবড়ায় না। বলে— কিচ্ছু সাংঘাতিক না। ক'দিন পর— ম্যাচিওর হলেই অপারেশন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এত সহজে এ-ব্যাপার মেটে না। খিঁচিখিঁচি লেগে থাকে। প্রতিবেশীদের মধ্যে রটে যেতে, মুখরোচক খবর রটতে দেরি হয় না, সবাই নানারকম মতামত জানাতে লাগলো। যার মধ্যে ভয়ের মিশেল অনেকখানি। পেটে টিউমার— ক্যান্সারের আগাম দূত। এর জানা তার চেনা অনেকের হয়েছে, কেউ মরেছে। কারুর জরায়ু বাদ দিতে হয়েছে। রোগের বিষয়ে জ্ঞান দিতে ডাক্তার হওয়ার দরকার হয় না।

ছ'মাস পেরুতেই মালতী বলে, তুমি বলছ টিউমার। আর আমি পষ্ট পেটের মধ্যে নড়াচড়া টের পাচ্ছি।

তারক বললো, ও তোমার মনের ভুল। টিউমারও একটু-আধটু নড়াচড়া করে।

বললো বটে, তবু আরো কয়েক বার ডাক্তার ম্যানেজ করতে হলো। মেয়েমানুষ তো নয়, একেবারে ভীমরুলের চাক। রাতদিন গোঁ গোঁ।

পাঁইটের শেষ ফোঁটা গলায় ঢেলে উঠে পড়লো তারক। আর মাত্র কটা দিন। আজ গিয়েই ঘোষণা করে দেবে— বুধবারে ভর্তি, বিষ্যুৎবারে অপারেশন। তারপরেই— না, তার আগে অবশ্য বটব্যালের কাছ থেকে পুরো টাকা গুণে নিতে হবে। টাকাটা হাতে পেলেই— ঝপাস!

কলকাতায় তেমন গাছ নেই। থাকলে উচ্চিংড়ে ছেলেগুলোকে তারক নিশ্চয় ঝুলঝাঁপ্পি শিখিয়ে দিত।

বিষ্যুৎবার সকাল নটার আগেই তারক নার্সিংহোমে হাজির। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় মালতীকে জমা দিয়ে গেছে। হেড নার্স থেকে সকলেই জানে ওর নিজের কেস। সেজন্য মালতী প্রায় ভি আই পি পেশেন্টের মর্যাদা পাচ্ছে।

রামচরিতের কাছে ফর্টি পার্সেন্ট ফর্মালিন সল্যুশন ভরা কাচের জার রেখে এসেছে। ফিটাস বেরুলেই ওতে ভরে বটব্যালের কাছে চালান করবে।

গতকালও ডাক্তারবাবু বলেছেন, খুব রিস্কি তারকনাথ। শুধু তোমার জন্য, নইলে এই কেস আমি কিছুতেই করতাম না।

তারক ভীতু না মোটেই। কত উঁচু ডাল থেকে লাফ দিতেও কখনো বুক কাঁপেনি, অতিরিক্ত শ্বাস ফেলেনি একটা। অথচ, এখন বুকের মধ্যে থেকে থেকে একটা, ভয় বলবে না— উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা— জেগে উঠছে : মালতীর কিছু হবে নাতো? মালতী যদি আসল কথাটা জেনে ফেলে? জানলেও তারকের শঙ্কিত হওয়ার কিছু থাকবে না। একটু যা চেঁচামেচি করবে, গালাগাল দেবে। ও ঠিক বুঝিয়ে দেবে, মালতীই তো 'ব্যবস্থা'র কথা বলেছিল। এইটুকু ঝুল না-দিতে পারলে সারাজীবনে তারক কী আর খেলা শিখলো!

কিন্তু, যদি মালতীর কিছু হয়!

শুকনো মুখ দেখে রামচরিত তিনবার বলে গেছে, ঘাবড়ায়ে মং চক্কোত্তিবাবু। রামজীকো নাম লিন। সব ঠিক হইয়ে যাবে। লেকিন হামকো ভুলিয়ে যাবেন না।

শালা, বুড়ো শুকুন। নিজের শেয়ারের জন্য হাঁকুপাকু করছে।

তারক ঘড়ি দেখলো— এগারোটা দশ। ইন্ট্রাইউটেরাইন হাইপারটনিক স্যালাইন গত রাতেই দেওয়া হয়েছিল। এতক্ষণে তো মিটে যাওয়া উচিত। ডাক্তারবাবু ও-টিতে ঢুকেছেন অনেকক্ষণ।

দু'দুবার নস্যি আঙুলে টিপেও টানতে ভুলে গেল তারক। খুব অস্থির বোধ করে। পাঞ্জাবীর নিচে লোমশ ত্বকে থকথকে জল। মুখ মুছে ও-টির দরজায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে এগারোটা চোদ্দ। ওটা বন্ধ নাকি?

বেশি উদ্বেগে ঘনঘন পেচ্ছাপ পায়। এরমধ্যেই তিনবার ঘুরে এসেছে। আর একবার যাবে নাকি? আরো একটু পায়চারি করে, কিছু পরে যাবে না হয়।

তারপরেই খুট শব্দ। ও-টির দরজা খুলে একটি নার্স বেরিয়ে আসে। মুখ দেখেই তারক বোঝে ভয়ের কিছু নেই।

নার্সটি যেতে-যেতে বললো, হেলদি মেল বেবী— এভরিথিং ওকে!

তারক প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি। সব ঠিক আছে অর্থাৎ মালতীর কিছু হয়নি— এই উদ্বেগ-মুক্তির শ্বাস মোচন করেই ও প্রথম কথাটা লুফে নেয়। বেবী? হেলদি? মেল? মানে? বেবী কে চেয়েছে? এম-টি-পিতে বেবী হয় নাকি? ডেলিভারীতে বেবী, এম-টি-পিতে ফিটাস। এ নার্সটা নতুন। এখনো কিছু শেখেনি।

যাকগে, মালতী ভালো আছে, সেটাই দারুণ স্বস্তির। ডাক্তারবাবু বেরুলেই হেড নার্সের কাছ থেকে ফিটাসটা নিয়ে সোজা সানিপার্ক। রামচরিতকে বললে হয় একটা ট্যাক্সি ডাকতে। থাক, একটু পরেই হবে।

ডাক্তার সামন্ত বেরিয়ে এলেন ও-টি থেকে। তারক তড়িত-পায়ে এগিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপে— আপনাকে কী বলবো স্যার, আপনি যা করলেন—

— তারক।

ডাক শুনেই তারকের নাড়ী-ভুঁড়ি দলা পাকিয়ে যায়। উনি তো কখনো তারক বলে ডাকেন না। তবে কি— মালতী— তারক ভাবতে পারে না। কপালে ঘাম।

— তারক, ইটস আ লিভিং হেলদি মেল বেবী।

লিভিং? জ্যান্ত? জ্যান্ত ছেলে? ডাক্তারবাবু ঠিক বলছেন? নাকি ও ভুল শুনছে? এম-টি-পি করতে এসে জ্যান্ত ছেলে?

— স্যার।

— আমি তোমাকে বলেইছিলাম, এটা খুব রিস্কি। কখনো কখনো এমন হয়। আমার হাতে এই প্রথম। তুমি ভেতরে গিয়ে ছেলে দেখতে পারো।

ভুল নয়। ডাক্তার ভুল বলেননি। ও ভুল শোনেনি। ঠিক বুঝেছে, ও গিয়ে জ্যান্ত হেলদি ছেলে দেখতে পারে। ছেলে— জ্যান্ত ছেলে!

— স্যার, এতো আমি চাইনি। ও ছেলে নিয়ে আমি কী করবো?— তারক স্মরণকালে প্রথম আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়ে।

— জানি তারক, কিন্তু আমি তো জ্যান্ত ছেলেকে মারতে পারি না।

ডাক্তারবাবু কখন চলে গেছেন তারক জানে না। ওর চোখের ওপর কোটি কোটি কালো পিঁপড়ে। গলা-বুক শুকিয়ে খর।

ও কোনো ডাল দেখতে পাচ্ছে না। মাটি জল কিছুই চোখে পড়ছে না। আদিগন্ত অন্ধকার শূন্যতার ওপর ও একা দাঁড়িয়ে। কিন্তু খেলা তো শেষ হয়নি।

ঝাঁপ না দিলে খেলা শেষ হয় না।

কান্না

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

'ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়াকুম। আমিন।' জিয়ারতের এই দোয়ার পর কয়েক পলকের বিরতির সুযোগে সবুজ সোয়েটার ও সবুজ-হলুদ চেক-কাটা লুঙি-পরা লোকটি কী বলতে এগিয়ে আসছিল, তার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে আফাজ আলি একনাগাড়ে আয়াত পড়তে শুরু করে। এক সুরা শেষ করে ধরে আরেক সুরা, কোনো-কোনো সুরা বার এমনকী ১০ বার পর্যন্ত পড়েও সে ক্লান্ত হয় না। আফাজ আলি পড়ে একটু ধীর লয়েচ আবৃত্তিতে তার করুণ সুর, পড়তে পড়তে ঝাপ্‌সা কান্নায় গলা ভিজে-ভিজে যায়, কিন্তু ভিজে শব্দের উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। সামনে দামি ইণ্ডিয়ান আগরবাতির আবছা ধূসর ধোঁয়ায় এবং হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধে কবরের ভেতরকার লাশটির চেহারা বাইরের জ্যান্ত মানুষের জোড়া জোড়া চোখে ভাঙা-চোরা আকার পায় এবং অপরিচিত পবিত্র ভাষার রহস্যে কবরের ভিতর-বাইরের ফারাক কমতে থাকে। আফাজ আলির কাঁদো-কাঁদো গলায় ঢেউ ভাষার দুর্বোধ্যতাকে ছাপিয়ে মরহুমের প্রতি সবার আবেগকে চড়িয়ে দেয় নিবেদনের চূড়ায়, সেখান থেকে হঠাৎ করে নামা কঠিন। আয়াতের ভাষায় কারও দখল না থাকায় সব কথাই হয়ে দাঁড়ায় মুর্দার সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগের প্রকাশ। তার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের মিহি ও মোটা কাহিনী একাকার হয়ে সবাইকে ব্যাকুল করে তোলে এবং শোকের আগুন উত্তাপ হয়ে ফাল্গুনের এই শেষ দুপুরে তাদের শরীরে একটু-একটু ওম দেয়। আফাজ আলি বিড়বিড় করতে করতে সবুজ সোয়েটার ও সবুজ-হলুদ চেক-কাটা লুঙিকে আরেকবার দেখে, লোকটি কৃষ্ণকাঠির কুদ্দুস হাওলাদারের ছেলে মনুমিঞা, আফাজ আলির ছেলের চাকরির ব্যাপারে কয়েকবার বরিশাল আসা-যাওয়া করেছে। দেখা হলেই টাকা, দেখা হলেই টাকা। একে এত দিলে চাকরি হবে, ওকে এত না দিলে হওয়া চাকরিটা ফসকে যাবে।— এখন দেখো, একেবারে ঢাকায় গোরস্তান পর্যন্ত হানা দিয়েছে। আফাজ আলির এখন কথা বলার সময় কোথায়? জিয়ারতের দোয়া পড়ার সুরে মুর্দার আত্মীয়স্বজন ফোঁপাতে শুরু করেছে, এই রেশটা সে নষ্ট করে কীভাবে? একটু তফাতে দাঁড়ানো মনুমিঞার মুগ্ধ চোখ সেঁটে গেছে দুই দিকের কবরগুলোর ওপর। দেখুক, ব্যাটা ভালো করে দেখে নিক। ৮০৪ নম্বর কবর আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো, লাল সিরামিক ইটে গাঁথা ৭৮১৯, সাদা সিমেণ্টের ওপর মোজাইক করা ৭৯৮৪,— সবগুলো সে নয়ন ভরে দেখুক। প্রতিটি কবরের শিয়রে সেট-করা সাদা পাথরে আল্লার কলামের ২/১টা লাইন, তার নিচে মুর্দার নাম, ফেলে-যাওয়া ঠিকানা এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। খোদার কালাম বুঝতে না পারুক, বাংলা কথাগুলোই পড়ুক। তাতেও তার সময় কাটবে। কত কবরের ওপর সবুজ ঘাসের গালিচায় লাল চিনা ঘাসের বর্ডার, কোনো-কোনোটির মাঝখানে বা একধারে গোলাপ, রজনীগন্ধা

কিংবা ডালিয়া। সারি সারি কবরের মাঝ দিয়ে জিন্দা মানুষের চলাচলের জন্যে সরু পাকা রাস্তা,— মনুমিঞা একটু ঘুরে ঘুরে দেখুক না। এখানে খামাখা দাঁড়িয়ে থাকে কেন? আফাজ আলির এখনো তো ঢের দেরি। মোনাজাতের জন্যে সে হাত তুললে সবার হাত উঠল। অথচ ঐ বেআক্কেল ছোঁড়াটা তাও করে না। আফাজ আলি মরহুমের নাম করে তাকে বেহেশত নসিব করার জন্যে আল্লার দরবারে এবার মিনতি জানায় বাংলায়। তার মিনতির আর শেষ নাই। মরহুমের বাবা মা এবং আরো আগেকার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মরহুম সুখে শান্তিতে বেহেশতবাসী হোক, আল্লা তাদের গুনাখাতা মাফ করে দিক। আল্লার দয়ার সীমা নাই, গুণাগার মানুষের ওপর রহম বর্ষণ করেন বলেই তিনি রহমানুর রহিম। মোনাজাত শুনতে শুনতে কারো-কারো চোখে পানি আসে, মোনাজাতের জন্যে এক হাত নিয়োজিত রেখে অন্য হাতে চোখ মুছতে গেলে নোনা পানি নামে দুই চোখ ঝেঁপে। বেদনা ও মিনতিতে গলা কাঁপিয়ে আফাজ আলি বলে, 'হায়াৎ হোসেন খান সাহেবকে তুমি উঠিয়ে নিয়েছ, তোমার বান্দাকে তুমি ফিরিয়ে নিলে, আমাদের কোনো নালিশ নেই। আল্লা, তুমি তাঁর বিবি ও আওলাদদের এই শোক সহ্য করার তৌফিক দাও, হে আল্লা রাব্বুল আলামিন।' মরহুমের ছেলেরা হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করলে মনুমিঞা রঙবেরঙের কবরের সৌন্দর্য উপভোগ করা স্থগিত রেখে শোকার্ত জটলার কাছাকাছি চলে আসে। শোকাভিভূত ও কান্নায় ভেঙে-পড়া কেউ কেউ এক হাতে নিজের নিজের পাঞ্জাবি বা প্যান্টের পকেট ছুঁয়ে দেখে। দিনকাল খারাপ, যেখানে সেখানে পকেটমার, প্রাণ ভয়ে কাঁদার পথও ভদ্রলোকদের বন্ধ হয়ে আসছে। এদের নিরঙ্কুশ শোক উদ্‌যাপনের সুযোগ দিতে আফাজ আলি চোখের ইশারায় মনুমিঞাকে একটু সরে যেতে বললেও তার অশ্রু ভেদ করে চোখের নির্দেশ বোঝা মুশকিল। আফাজ আলির মোনাজাতেই সে বরং মশগুল, তাদের কৃষ্ণকাঠির আফাজ আলি মৌলবি ঢাকার এত বড়ো বড়ো মানুষের শোককে কীভাবে উস্‌কে দিচ্ছে তাই দেখে সে অভিভূত। আফাজ আলিকে জরুরি খবরটা দেওয়া দরকার, যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে নিয়ে লঞ্চঘাটে যেতে হবে— এসব কথা তার মনেই থাকে না।

মোনাজাত চলতে চলতেই কবরের চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। মালি ও গোরকোনদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও কথাকাটাকাটি কিংবা গোরস্তানের শেষ মাথা থেকে একটি কোকিলের অবিরাম ডাক কিংবা নতুন লাশ নিয়ে ঢোকা শবযাত্রীদের কলেমা শাহাদত আবৃত্তি— কোনো কিছুই আফাজ আলির মোনাজাতে বিঘ্ন ঘটাতে বা শোকার্তদের প্রতিক্রিয়ায় চিড় ধরাতে পারে না। আফাজ আলি মোনাজাতের প্রায় শেষে এসে 'আল্লা পরওয়ার দিগার, মোহাম্মদ হাবিবুল্লার জন্যে তোমার এতগুলো বান্দা আজ—' বলতেই শবযাত্রীদের একজন বলে, 'হায়াৎ হোসেন খান।'— নাম ভুল করলেও আলিমুল গায়েব আল্লা ঠিকই সংশোধন করে নেবেন— এই আস্থা থাকা সত্ত্বেও আফাজ আলি বিব্রত হয়, মুর্দার নাম বলতে নিজের ছেলের নাম বলে ফেলায় তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবে কয়েক মুহূর্তেই সামলে নিয়ে মোনাজাত অব্যাহত রাখে।

কয়েক সারি সামনে ডোরা-কাটা নীল শার্ট গায়ে, চশমা-পরা কাঁচাপাকাচুলমাথা লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখে এবং আসরের নামাজের আর দেরি নাই বলেও বটে, শবযাত্রীরা টের না পেলেও আফাজ আলি দীর্ঘ মোনাজাত শেষ করে একটু আকস্মিকভাবে। মুর্দার আত্মীয়স্বজনদের নেতৃস্থানীয় মুরুব্বির হাত থেকে ১০০ টাকার চটো নোট এবং মুর্দার কবর ও আখেয়াতের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে সে বিদায় নেয়। এবার তাকে

ছুটতে হয় সামনের কয়েক সারি পর আরেকটি কবরের দিকে, ৮২২২ নম্বর কবরের দিকে ছোটার তাগিদে মনুমিঞার কথাও তার মনে থাকে না। ৮২২২ নম্বরের আজ মৃত্যুদিবস, সকালবেলাতেই শরিফ মৃধাকে লাগিয়ে কবরের শুকনা ঘাসে পানি দিয়ে রেখেছে। আগাছা পরিষ্কার করে টালির রেলিংটা ভিম দিয়ে ঘষতে বলেছিল, তা মৃধা বলে, ওই সাহেবের বিশ্বাস নাই, না-ও আসতে পারে, তখন ভিমের দাম দেবে কে? লোকটা এসেই পড়েছে যখন তো এখন বরং মৃধাকে দিয়ে সাফ করাবার কাজটা শুরু করা যায়। কিন্তু শরিফ মৃধা গেল কোথায়? আফাজ আলি লম্বা আলখাল্লা ও লুঙি সামলে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ৮২২২-এ পৌঁছুবার আগেই কাঁচাপাকাচুলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে কাল্লুমিঞা। শরিফ মৃধা কোথায় মরতে গেল? শরিফ মৃধা আর কাল্লুমিঞা দুজনেই এই গোরস্থানের গোরকোন-কাম-মালি, কিন্তু বেশ আগে থেকে কাজ করছে বলে কাল্লুমিঞার দাপটটা একটু বেশি। হায়দর বখস ও কাল্লুমিঞা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করে, কবর জিয়ারতের জন্যে লোকজনকে হায়দর বখসের কাছে ধরে আনে কাল্লুমিঞা এবং হায়দর বখস আবার কাল্লুমিঞাকে কবর দেখাশোনার কাজ জুটিয়ে দেয়। হায়দর বখস লালবাগের মানুষ, ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন আসা-যাওয়া করেছে, উর্দু ভাষাটা তার অল্পস্বল্প জানা, এমনকী মোনাজাতের সময় উর্দু বাক্যাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু পানজর্দাকিমামঘষা গলায় তার কাঁদোকাঁদো ভাব প্রায় আসেই না এবং উর্দুশব্দখচিত হলেও তার মোনাজাত সংক্ষিপ্ত। তাই দাপটের গোরকোন-কাম-মালি কাল্লুমিঞাকে দিয়ে হায়দর বখস পার্টি হাতাবার যতই ফন্দিই করুক, আফাজ আলির দোয়াদরুদ আর মোনাজাত শোনার পর কারও সাধ্য নাই যে তাকে বাদ দেয়। আবার মুর্দার কবর কি তার আখেরাতের হেফাজতের চেয়ে বরং বড়ো-বড়ো বাড়িতে মিলাদ পড়াবার দিকে হায়দর বখসের ঝোঁকটা বেশি। আফাজ আলি কি ইচ্ছা করলেই ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীর আলিশান বাড়িতে সামিয়ানা-টাঙানো মহফিলে মিলাদ পড়াতে যেতে পারে না? শুধু ইশারা করা। তারপর দেখো, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, গাড়ি দিয়ে যাবে। কিন্তু এই গোরস্তানের বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে হলে তার ছটফট ছটফট লাগে। কত কবরের তদারকি তাকে করতে হয়, কবরের বাসিন্দাদের জন্যে দোয়া পড়া, কোরান খতম করে তাদের নামে বকশানো, এমনকী শরিফ মৃধাকে তাগাদা দিয়ে কবরের আগাছা ছাঁটা, ঘাস গজানো, গাছ লাগানো ও ফুল ফোটাবার দায়িত্বও তো পালন করতে হয় তাকেই। এসব কাজে হায়দর বখসের মনোযোগ কম। বেশ তো, বড়ো-বড়ো বাড়ি ঘুরে তুমি মিলাদ পড়ো, চেহলামের দিন কেরাত করে নাজাতের দোয়া পড়ো,— না করেছে কে? এইসব নিয়েই থাকো। এখানে আফাজ আলির ভাগে হাত বসাতে আসো কেন? এই দেখো, কাল্লুমিঞা এখানে দাঁড়িয়েই কী কেরামতি করে ফেলেছে, হায়দর বখস এসে এখন কথা বলছে ওই কাঁচাপাকাচুলের সঙ্গে। না—। আফাজ আলির এতদিনের পার্টি, আর রাখা গেল না! কাঁচাপাকাচুলের সঙ্গে ক্রমবিলীয়মান দূরত্বের তুলনায় আফাজ আলি অনেক চেঁচিয়ে বলে, 'আসসালামোআলায়কুম। আসছেন? আমি তো সকাল থিকাই পথের দিকে চাইয়া রইছি।' সালামের জবাবটা পর্যন্ত না দিয়ে কাঁচাপাকাচুল হায়দর বখসকে হুকুম করে, 'শুরু করেন।' হায়দর বখস দোয়া পড়ার পাঁয়তারা করতে করতেই আফাজ আলি বলে, 'আপা আসে নাই?' এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করে কাঁচাপাকাচুল তাকে জিগ্যেস করে, 'কী হুজুর, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোথায়? ঈদের দিন এতগুলো টাকা দিয়ে গেলাম, চিনা ঘাসের বর্ডার দেবে, আপনার কথামতো আবার গোলাপের চারা লাগাবার জন্য এক্সট্রা টাকা দিলাম। কৈ, কিছুই তো করেনি।'

হারামজাদা শরিফ মৃধা করলটা কী? সকালে এক পানি ঢালা ছাড়া ৮২২২-এ কোনো কাজই সে করেনি। আফাজ আলি কী বেইজ্জতটাই না হলো! ওদিকে হায়দর বখসও লম্বা লম্বা দোয়া পড়ছে খুব কায়দা করে। আফাজ আলি ঠিকই বোঝে, এসব হলো মক্কেল ভাগাবার মতলব। তা এত যে গলা সাধছে, কাঁচাপাকাচুল এসবের কোনো পরোয়া করে? মোনাজাতে শামিল না হয়ে শ্বশুরের কবরের সামনে সে কিনা সিগ্রেট ধরায়। বেয়াদবের একশেষ! সিগ্রেট টান দিতে দিতে আফাজ আলিকে খামাখা বকে, 'আপনারা গোরস্তানে ব্যবসা ফেঁদেছেন তো ভালোই, তা টাকা নিয়ে কাজ করেন না কেন?' লোকটার কথার ধরনই এরকম, সুযোগ তৈরি করে মুনসি মৌলবিদের ওপর এক চোট ঝাড়ে। তারা নাকি ধর্মের নামে ব্যবসা করে, তাদের পয়সার খাঁই নাকি বেশি, তাদের দারুণ খাবার লোভ!— বললেই হলো? আরে, মৌলবি মুনসি ছাড়া চলবে তোদের? আফাজ আলির শ্বশুর মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরী বলে, মানুষ যত বড়োই হোক না কেন, ধনদৌলত বিদ্যাবুদ্ধি যতই হোক, মৌলবি ছাড়া তার জানাজা পড়াবে কে? মৌলবি ছাড়া তোদের বিয়ে পড়াবে কে? জন্মের পর আকিকা হবে মৌলবি ছাড়া? আকিকা, শাদি ও মওত— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানের পদে পদে মৌলবি দরকার। 'দোলনা হইতে কবর তক মৌলবি ছাড়া মুসলমানের উপায় নাই, উপায় নাই, উপায় নাই!' এসব নসিহত দেওয়ার সময় শ্বশুর সাহেবের গলায় ওয়াজের সুর এসে পড়ে। দপদপিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখেল পাশ করে হাবিবুল্লা বাকেরগঞ্জ কলেজে ভর্তি হওয়ার জেদ ধরলে আশরাফুদ্দিন জোর বাধা দেয়, 'অন্তত আলেম পর্যন্ত পড়ো, আল্লার এলেম বরকত দেয়।' হাবিবুল্লার উদ্বেগ, মাদ্রাসা লাইনের ভবিষ্যৎ কী? তারই গ্রামের কলেজে-পড়া ছেলেরা তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ছোট্রো করে হাসে, আর সহ্য হয় না। বাপ তো মৌলবি লাইনে পড়েছে, বৌছেলেমেয়ের ভরণপোষণের জন্যে তাকে পড়ে থাকতে হয় ঢাকার গোরস্তানে। এইসব শুনে আফাজ আলি উসখুস করলেও তার গোপন সায় কিন্তু ছেলের ইচ্ছায়। বি.এ., এম.এ., না হোক, আই.এ. পাস করেও ছেলের যদি ছোটোখাটো চাকরি একটা জোটে তো জীবিত অবস্থায় কবরবাস থেকে সে রেহাই পায়। শ্বশুরের সঙ্গে সে তো আর বেয়াদবি করতে পারে না, কিন্তু হাবিবুল্লা নানার মুখের ওপর জবাব দেয়, 'মাইজা মামুরে তাইলে মাদ্রাসা থাইকা ছাড়াইয়া লইলেন কেন?' মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীর মেজোছেলে পড়ে বরিশাল পলিটেকনিকে, পাশ করে চাকরি তো পাবেই, আর 'মাইজা মামু বেতন যা পাইবো, উপরি পাইবো কম করিয়া তার পাঁচগুণ।' নাতির এরকম বেতমিজি কথার ঝাঁকুনিতে আশরাফুদ্দিনের নসিহত থেকে ওয়াজের সুর ঝরে পড়ে, সরাসরি ভঙ্গিতে সে বলে, 'চাকরির বাজার ভালো না। এম. এ., বি. এ. পাশ করিয়া ছ্যামরাগুলি পথে পথে ঘুরতেয়াছে, নজরে ঠেহে না?' কিন্তু 'চন্দ্রসূর্য যতোদিন জ্বলবে, মানুষের হায়াতমওতের আইন আল্লা যতদিন দুনিয়ায় জারি রাখবে, মৌলবি ছাড়া মানুষের চলবে না। কথাটা ভাবিয়া দেখিও।'

তা এখন মনে হয়, কথাটা আশরাফুদ্দিন ঠিক বলেছিল। একবার ফেল করে সেন্টার বদলে বোর্ড-অফিসে পয়সা খরচ করে হাবিবুল্লা এইচ এস সি সেকেণ্ড ডিভিশনেই পাস করল, তাতে লাভটা হলো কী? চাকরি তো জোটে না। তার চাকরির জন্যে ঘুষের টাকা জোগাতেই আফাজ আলির কাহিল হাল। মাসখানেক আগে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা হাওলাত করে বরিশালে ঘুষ দিয়ে এসেছে। কুদ্দুস হাওলাদারের ছেলে মনুমিঞা এখন হাজির হয়েছে ঘুষের ২য় কিস্তির টাকা আদায় করতে। তিনবছর কলেজে পড়েই চাকরি করে জাতে উঠতে পোলা তার পাগল হয়ে উঠেছে, তা সেই

জ্বাতে ওঠার জন্যে টাকাটাও তার বাপকে কামাই করতে হয় মুর্দাদের জন্যে দোয়াদরুদ পড়ে। আল্লার কালামের বরকত না থাকলে তার সংসার চলে? মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরী যে সে মানুষ নয়, সমস্ত থানার মধ্যে নামকরা আলেম, তার জবানের কথা কি আর মিথ্যা হতে পারে? এই ব্যাটা কাঁচাপাকাচুল যদি সেই কথা একটুও বোঝে! তার দিকে চশমার ভেতর দিয়ে কীরকম তাকিয়ে বলে ফেলল, 'আপনে যান হুজুর, এখানে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি ক্লায়েন্ট হারান কেন? বড়োলোকের লাশ আবার মিস করবেন না।' লোকটা 'হুজুর' কথাটাও এমন বাঁকা করে বলে যে এর চেয়ে একটা গালি শোনা বরং ভালো। আরে .২০ টাকার বেশি তো দেওয়ার মুরোদ নাই, তোমার অত তেজ কীসের? বৌ সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা প্রায় একরকম হলেও কিন্তু ৫০ টাকা ছাড়ে। বৌকে ব্যাজার করতে ভয় পাও, আর আখেরাতের কথা ভাবো না? কোন কলেজের মাস্টার, এই গোরস্তানে ঐসব মানুষকে পোঁছে কে? মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড়ো-বড়ো রইস মানুষ। মন্ত্রী, সেক্রেটারি, মেজর জেনারেল, সিনেমার হিরো, বড়ো-বড়ো মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ-করা সায়েবরা এখানে আসে, এই কাঁচাপাকাচুলকে এখানে গুনতির মধ্যে ধরা যায়? মরহুম শ্বশুরের জন্যে তবু এখন আসতে পারো, মরলে তোমার লাশ ঢুকতে পারবে এখানে? আজিমপুরায় রিক্সাওয়ালা আর ফেরিওয়ালাদের পাশে সাড়ে তিনহাত জায়গা পেলেই বর্তে যাবে। এইসব প্রফেসর লাইনের মানুষদের আফাজ আলি হাড়ে-হাড়ে চেনে। হাবিবুল্লাকে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিয়ে দিতে ঘুষ নিলে যে লোকটা, দবিরুদ্দিন না কবিরুদ্দিন মোল্লা, সেও তো কোন কলেজের মাস্টারই ছিল। আবার মনুমিঞার সঙ্গে গিয়ে আফাজ আলি ছেলের চাকরির জন্যে ১ম কিস্তি ঘুষ দিয়ে এল, জাহাঙ্গীর কাজী,— সে লোকটিও তো বরিশাল না খুলনা না যশোর কলেজের প্রফেসর, কী একটা অফিসার পোস্টে বদলি হয়ে এসেছে '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিস্তার প্রকল্প' অফিসে। এখানে যতদিন থাকে দুই হাতে টাকা কামাবে, তারপর সরকারের মর্জিমতো কোথায় কোনো কলেজে ঠেলে পাঠাবে, আবার সেই মাস্টার তো মাস্টারই! তবে, কাজ করার মুরোদ আছে বলেই না সে টাকা নেয়। কাঁচাপাকাচুল তো সেটাও পারে না। তার এত তেজ কীসের? রাগে আফাজ আলির কদমে যেন হাওয়া লাগে, খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে একরকম ছুটতে থাকে গোরস্তানের গেটে মসজিদের দিকে। এই রাগ তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্যে কাঁচাপাকাচুলের ওপর, না ছেলের চাকরির ঘুষের ১ম কিস্তির টাকা-নেওয়া সেই অফিসারে-পরিণত-প্রফেসরের ওপর, না তার পুরনো পার্টি ভাগিয়ে নেওয়ার জন্যে হায়দর বখসের ওপর, না হায়দর বখসকে ডেকে আনার জন্যে কাল্লুমিঞার ওপর, না ঠিকমতো হাজির না থাকার জন্যে শরিফ মৃধার ওপর— স্থির করতে না পারায় উত্তেজিত হয়ে সারিসারি কবরের ভেতর দিতে হাঁটতে হাঁটতে যার সঙ্গে ধাক্কা খায়, চোখ মেলে দেখে যে সেই লোকটি হলো মনুমিঞা। সঙ্গে-সঙ্গে তার রাগের টার্গেট পেয়ে আফাজ আলি প্রায় ধমক দিয়ে জিগ্যেস করে, 'কী মিঞা, কী মনে করিয়া?'

'চাচা আপনে ঐ গোরের দাফন করিয়া কৈ গেলেন আমি আর দেখি না।'

'আরে, আমার কি মরণের টাইম আছে? লও, আগে নামাজ পড়িয়া আসি। আজান হইল, লও যাই।'

কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নত বেশ তাজিমের সঙ্গে পড়লেও ফরজের ২য় রাকাতের রুকুতে যাবার সময় ইমাম সাহেবের বুলন্দ গলার 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ ছাপিয়ে আফাজ আলির কানে বেজে ওঠে গোরস্তানের গেটে কয়েকটা গাড়ি থামার, গাড়ির দরজা খোলার

ও বন্ধ করার মিঠে বোল। এই বোলেই গাড়ির খানদানের ইশারা স্পষ্ট। এইসব গাড়ির সঙ্গে মানানসই কোনো শরিফ ভদ্রলোক দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে! এখন নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স পার্টি এল, কবরের জায়গা বাছাই করবে, কবর কাটার গোরকোন নিয়োগ করবে। বাদ মগরেব বা বাদ এশা বায়তুল মুকাররমে জানাজার পর লাশ আসবে। এই লাশের দাফন, জিয়ারত, মোনাজাত ধরতে পারলে কিছু কামাই হয়, তাহলে মনুমিঞাকে দিয়ে বাড়িতে কয়েকটা টাকা পাঠানো যায়। হাবিবুল্লার চাকরির কদ্দূর কী হলো কে জানে? আবার কত টাকার ধাক্কা! এখন কাল্লুমিঞা আবার এই নতুন পার্টিকে হাত না করে ফেলে!

না, গোরস্তানে লাশ এখন পর্যন্ত আনা হয়নি। আহা রে! জোয়ান ছেলে এভাবে মরে। বাপ কোন ফরেন কোম্পানির খুব বড়ো অফিসার, ছেলের লাশ নিয়ে পৌঁছেছে আজ দুপুরবেলা। আহা! বাপের কষ্টের সীমা নাই। ২/৩ মাস লাখ-লাখ টাকা খরচ করে ছেলের চিকিৎসা করাল লন্ডনে; আবার দেখো, নিজে এসেছে ছেলের কবরের জায়গা ঠিক করতে। মরহুমের ভাইবোন সব থাকে অ্যামেরিকা, জার্মানি, জাপানে। সবাই এসে পড়েছে, জার্মানির বোন না ভাইয়ের ফ্লাইট আসবে সন্ধ্যার দিকে। সে এসে পড়লে বাদ এশা জানাজা, বায়তুল মুকাররম থেকে লাশ নিয়ে সোজা গোরস্তান। এদের আয়োজন সব নিখুঁত, গোরস্তানে এত সব রডলাইটের ছড়াছড়ি, রাতদিনের ফারাক নাই, কিন্তু এর মধ্যেও এরা নিয়ে এসেছে ১৫/২০টা চার্জ লাইটার। শরিফ মৃধা এখন আর গাফিলতি করেনি চা কবর খোঁড়া, বাঁশ, চাটাই জোগাড়ের ভার সে দখল করে নিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার পিছে ঘুরছে মনুমিঞা। আফাজ আলি মসজিদে ঢুকলে ছোকরা সটকে পড়ল কখন? যাক, ছ্যামরা সফরে আছে, নামাজ কাজা করে পড়লেও চলে। গেরাইম্যাটা বরং ভালো করে সব দেখুক, দেখুক টাকা রোজগারের জন্যে আফাজ আলির খাটনির কোনো সময় অসময় নাই, রাতদিন তাকে দুই পায়ে খাড়া থাকতে হয়। তাকে দেখে মনুমিঞা এগিয়ে আসে, বলে, 'চাচা, হাবিবুল্লার খবর তো ভালো না।'

'কেন? ট্যাহা তো তোমার মোকাবেলাতেই দিলাম। আরেক কিস্তি এই মাসে আর পারলাম না। শবেবরাত যাউক, ট্যাকা দেমানে? ঐ সায়েবে তোমারে কিছু কইছে? হাবিবে তোমারে পাঠাইলো কোন আক্কেলে? হারামজাদায় ভাবলে ঢাকায় বুঝি ট্যাকার গাছ আছে, না? হ্যায় বললে আর মুই গাছ থন ট্যাকা পাড়িয়া দিলাম?' দীর্ঘ সংলাপের ঝাঁঝে কিছুক্ষণ আগের মুর্দার জন্যে রোনাজারি সম্পূর্ণ মুছে গেলে সে থামে। এই সুযোগে মনুমিঞা বলে, 'না চাচা, ট্যাকার মামলা না। কয়দিন হাবিবের খুব দাস্ত। আর—'

'অর দাস্তের সোম্বাদ পৌঁছাইতে তুমি ঢাকা আইছো? বাকেরগঞ্জে সরকার হাসপাতাল বানাইলো কি তোমাগো বায়োস্কোপ দ্যাহাইতে?'

'না চাচা, কথা হেইডা না। কথাডা শোনেন।' মনুমিঞার কথা শেষ করার আগেই শরিফ মৃধা এগিয়ে এসে তাকে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। এখানে দুই সারি কবরের মাঝখানে সরু রাস্তার ৪টে কবর আফাজ আলি আর শরিফ মৃধার এখতিয়ারে। পাথরে-বাঁধানো কবর ঘেঁষে আফাজ আলি দাঁড়ালে শরিফ মৃধা বলে, 'হুজুর, আপনে আজই বাড়ি যান। আপনের পোলার কঠিন ব্যারাম। এই লোকে আমারে সব বলছে।'

কয়েক হাত দূরে নতুন সারির শুরুতেই ওপরে রডলাইট এবং নিচে চার্জলাইটের চোখ-ঝলসানো আলোয় কবর খুঁড়ছে গোরকোনরা, ফাল্গুন মাসেও তাদের মাটি-মাখা গেঞ্জি ঘামে কাদা। এত আলো, অথচ তাদের কালো কালো গতর ও সেইসব গতরের

আরো কালো ছায়ায় কবরের ভেতরটা আন্ধার ঠেকে। মনুমিঞা মরিয়া হয়ে বলে, 'চাচা, গেলে আজই মেলা করা লাগে। হাবিবের অবস্তা আমি যা দেখিয়া আসছি—।'

সে কী দেখে এসেছে? এই জন্যেই কি একটু আগে ১২৩৪৫ নম্বরে দাফনের পর মোনাজাতে আল্লা তাকে দিয়ে হাবিবুল্লার নামে আগাম আরজি করে রাখল?— ৭৭৬৯ নম্বরের পাথরের চওড়া ও মসৃণ রেলিঙে আফাজ আলি ধপ করে বসে পড়লে তারই তদারকিতে ও শরিফ মৃধার হাতে লাগানো গোলাপের কাঁটা তার ঘাড়ে খোঁচা মারে। গর্দানটা তার একটু মোটাই, কিন্তু চামড়া সে তুলনায় পুরু নয় বলে ঘাড়টা চিনচিন করে উঠল। এই সঙ্গে অনেক আগেকার শিশু হাবিবুল্লা তার ঘাড়ের ওপর বসে দোল খেতে থাকলে সেখানটা শিরশির করে এবং আরেকটু ওপরে খচখচ করে বেঁধে এখনকার হাবিবুল্লার চাকরির ঘুষ বাবদ হাওলাত-করা ৫০০০ টাকার নোটের কোণাগুলো। গোলাপকাঁটার খোঁচা থেকেই যায়, টাকার চাপে মিলিয়ে যায় শিশু হাবিবুল্লার ছোট্টো পায়ের দুলুনি। টুপির নিচে তার গোটা মুণ্ডু জ্বলে ওঠে দপ করে; শবেবরাতের বাকি মোটে ৬দিন, এখন কি তার বাড়ি যাবার সময়? কত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সাফসুতরো করতে হবে কত মুর্দার নাম এবং তাদের জন্মমৃত্যুর তারিখ। ৬৬৯৮ নম্বরে গালিচার মতো ঘাস না দেখলে মুর্দার মেজর জেনারেল ছেলে আফাজ আলির ওপরে কী অপারেশন চালাবে আল্লা মালুম। উত্তরের শেষ কবর অনেক দিনের, এর বাসিন্দার মৃত্যুর সময় তার ছেলের বয়স ছিল ১৫/১৬। লোকটি এখন ৩৫/৩৬ তো হবেই, এই ২০টি বছর ধরে শবেবরাতের সন্ধ্যায় সে একবার আসবেই। কবরের বেলফুলের গাছগুলো সাফ করাতে হবে। এ কি একটা দুটো কবর? পুরনো সব পার্টির অনেক মুর্দার কথা ভুলে যায়। নিজের বাপ মায়ের কবর, এমনকী কেউ কেউ ছেলেমেয়ের কবর বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে কবে! অনেকেই মালিও হয়তো ঠিক করে গিয়েছিল মাসকাবারি চুক্তিতে, ২/১ বছর নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে করতে তাদের শোক চাপা পড়েছে নানা ধান্দায়। হয়তো ৩/৪ বছর ধরে লাপাত্তা। হয়তো এর মধ্যে মুর্দার ছেলের হার্টের বাইপাশ সার্জারি হবে ব্যাঙ্ককে কিংবা তার একমাত্র মেয়ের ব্লাড ক্যানসার ধরা পড়েছে, চিকিৎসা করতে রওয়ানা হবে অ্যামেরিকা, মুর্দার বিধবা স্ত্রী এসে স্বামীর কাছে দোয়া চাইতে এলে আফাজ আলি তার মোনাজাতকে প্রথমে ফোঁপানি ও ক্রমে হাউমাউ কান্নায় চড়িয়ে সেই বিবিসায়েবকে কাবু করে ফেলেছে। শোকের ওপর চাপা-দেওয়া ছাই উড়ে গেল বেগমসায়েবের কাছে ২০০/৩০০ এমনকী ৫০০ টাকাও কোনো ব্যাপারই নয়। আফাজ আলির হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা ছেঁচরে ছেঁচরে হেঁটে গেটে গিয়ে সেই যে গাড়িতে উঠল, হয়তো ৪ বছর তার আর দেখাই নাই। তবে তাদের সবার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সব নোট করা আছে আফাজ আলির ডায়রিতে। শবেবরাতের আগে-আগে কাছাকাছি কয়েকটা দোকান থেকে আফাজ আলি তাদের সবাইকে টেলিফোন করে। কারো কারো ফোন নম্বর পালটে গেছে, তাদের হদিস করা যায় না; বাপ মা কি ছেলেমেয়েকে আন্ধার গোরে সেঁধিয়ে কেউ-কেউ পাড়ি দিয়েছে সৌদিতে কি সিঙাপুরে কি অ্যামেরিকায়। যাদের পাওয়া যায় তাদের কেউ কেউ বলে, আফাজ আলিকে আব্বার কি আম্মার ভার দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে আছে। স্মৃতিতে-বেদনায়-ভারি-গলায় তারা বলে, 'আব্বা গোলাপফুল বড়ো ভালোবাসতেন হুজুর, কবরে ভালো গোলাপের চারা লাগিয়ে দেবেন? দাম যা লাগে দেব। শবেবরাতের রাতটা আব্বার সঙ্গেই থাকব ভাই।' কারও মায়ের প্রিয় ফুল ছিল রজনীগন্ধা। মুর্দাদের পছন্দ অনুসারে ও তাদের ছেলেমেয়েদের অনুরোধে গোলাপ, রজনীগন্ধা,

ডালিয়ার চারা লাগানো হয়। ছেলেমেয়েরা অনেকেই অর্ডার দিয়েই খালাস, শেষ পর্যন্ত আসতে পারে না। যারা আসে তাদের কাছ থেকে আফাজ আলি আর শরিফ মৃধা বাধ্য হয়ে দাম নেয় তিনগুণ চারগুণ। লোকসান পুষিয়ে না নিলে তাদের চলবে কেন? তবে খোদার রহমতে শবেবরাতে আর লোকসান হয় না। ঐ রাতে এখানে যেন মেলা বসে যায়! মুর্দার সাথে জিন্দার সেদিন মিলনের রাত। মুর্দা প্রিয়জনদের জন্যে জিন্দা মানুষের মোহাব্বত ছোটে সেদিন নহরের পানির মতো। গোরস্তানের বাইরে ফকির মিসকিনের ভিড় ঠেলে মানুষের ঢুকতেও খুব কষ্ট হয়। গাড়ি থাকে সেদিন ঐ দূরে বড়ো রাস্তার কিনারে। গোরস্তানের ভেতরে যেমন জিন্দার সাথে মুর্দার মিলন, বাইরে তেমনি খালি গাড়ি আর ভিখারি। এত গাড়ি আসে যে, সামলাতে ডজন-ডজন পুলিশ হিমসিম খায়। ফকির মিসকিনদের সেদিনকার রোজগার তাদের সারা বছরের কামাইয়ের সমান। লোকে পয়সা দেয়, রুটি হালুয়াও দেয় দেদার। রুটি যা মেলে ব্যাটা ফকুরনির বাচ্চা রোদে শুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়, কয়েক সপ্তাহ ধরে তাই গেলে। সে তুলনায় হুজুরদের রোজগার আর কী? এর ওপর মানুষ কত ফন্দিই শিখেছে। আজকাল যেখানে সেখানে মাদ্রাসা, মাদ্রাসা করার চেয়ে সোজা কাজ মনে হয় আর কিছু নাই। দীনের নামে সব ফেরেব্বাজি। মাদ্রাসার তালেবেলেমদের ধরে এনে তাদের দিয়ে দোয়া পড়িয়ে লোকজন সস্তায় বেহেশতে পাঠাতে চায় বাপমাকে। অত সোজা? আল্লার কালাম জানে না, দোয়া পড়তে পারে না সহিমতো, তাদের দিয়ে তোমরা আখেরাতের ফায়দা লুটতে চাও? তবে হ্যাঁ, আছে, বুঝদার শরিফ মানুষও আছে, তারা মুনসি মৌলবি ঠিকই চেনে, কদরও করতে জানে। টেলিফোনে সেইসব মানুষকেই বাপমায়ের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথাটা মনে করিয়ে দেয় আফাজ আলি। শবেবরাতের পবিত্র রাতে এসে তারা নিজেদের ইহকাল ও মৃত আত্মীয়স্বজনের আখেরাতের জন্যে বড়ো উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়। মরহুম আব্বা আম্মা কিংবা ভাইয়া ও আপাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আফাজ আলির মোনাজাত শুনতে শুনতে তারা ফোঁপায় এবং কারো-কারো ফোঁপানি গড়ায় কান্নায়। তারপর দায়িত্ব সম্পন্ন করে ঘরে ফেরার সময় তাদের কারুকাজ-করা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পুরুষ্টু মানিব্যাগ বের করে আফাজ আলির হাতে যা দেয় তাতেই সে সন্তুষ্ট। পার্টির সামনে টাকা সে গুনেও দেখে না। এই ফজিলতের রাতে গোরস্তান জুড়ে আল্লার ফেরেশতা, যেখানে যা পাওয়া যায় তাতেই বরকত। মাত্র কয়েকদিন বাদে শবেবরাতের এই বেহেশতি মহফিলে শরিক হতে না পারলে আল্লার রহমত আর জুটবে কোত্থেকে? হাবিবুল্লার চাকরির জন্যে ঘুষের চয় কিস্তির অন্তত সিকিটা পেলেও একটু এগিয়ে থাকা যায়। বাকি টাকার জন্যে হাত পাততে হবে কুদ্দুস হাওলাদারের কাছে। ৫০০০ নেওয়ার সময় চুক্তি হয়েছিল যে, চাকরি হলেই প্রথম মাসের বেতনের সবটাই কুদ্দুসকে দিতে হবে। বাকি টাকা শোধ হবে মাসে মাসে ৪০০ করে দিয়ে। এর ওপর লাভ দিতে হবে চক্রগুণ হারে। পরহেজগার মানুষ, কুদ্দুস সুদ নিতে পারে না বলে লাভের অংশ নেয়। তাকে লাভ দিতে দিতেই তো হাবিবুল্লা ফতুর হয়ে যাবে, আফাজ আলি নিজে কিছু দিতে পারে তো কুদ্দুসকে লাভ দেওয়া থেকে খানিকটা বাঁচা যায়। এই সময় বাড়ি না গেলেই কি নয়?

'মনুমিঞা, হাবিবুল্লার অবস্থা কি খুব খারাপ ঠেহে? ধরো, শবেবরাতটা যদি পার করিয়া যাই—'

'চাচা, গেলে আইজই মেলা করা লাগে।' মনুমিঞাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে শরিফ মৃধা, 'হুজুর বাড়ি যান। শবেবরাতের অহনও ছয় দিন। আপনের আসাযাওয়া ধরেন দুই দিন, বাড়ি থাকবেন একদিন। ঢাকায় আওনের বাদেও আপনে তিনদিন পাইতাছেন।'

ভোরে বরিশাল ঘাটে নেমে প্রথমে বাসে বাকেরগঞ্জে পৌঁছেই ইসহাক রিকশাওয়ালার মুখে খবর পাওয়া গেল ছ হাবিবুল্লার দাফন হয়ে গেছে কাল বিকালে। ওর রিকশায় উঠে আফাজ আলি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। দোয়াদরুদ পড়া দূরের কথা, ইন্নালিল্লা বলার কথাও তার মনে নাই। আড়াইবাঁকি ঘাটে খেয়ানৌকায় পায়রা নদী পাড়ি দিতে দিতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকা দোলে, আফাজ আলির দিকে তাকিয়ে অপরিচিত কোনো যাত্রী বলে, 'হুজুর দোয়াদদরুদ পড়েন। এই রবিবার দিন শিবপুরের মধু সাহার গুয়ার নাওখান ডোবলো। কন তো, ফালগুন মাসিয়া নদী, বাও নাই বাতাস নাই, কৈ থন কী হইয়া গেল!' আফাজ আলি শুধু পায়রার ঢেউ দেখে। ফাল্গুনের রোদে ঢেউগুলো রোদ পোহায়, এইসব ঢেউয়ের নিচে জলস্রোত ওঠানামা করে জলে-ডোবা মানুষের লাশের ওপর। নিচে কী হলো যে কবরগুলো এভাবে কাঁপে? ওখানে কি গোর-আজার হচ্ছে? চমকে উঠে আফাজ আলি আস্তাগফেরুল্লা পড়ে এবং গ্রামের ঘাট পর্যন্ত আস্তাগফেরুল্লা পড়াই অব্যাহত রাখে।

আফাজ আলির বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগেই হামলে কেঁদে ওঠে হাবিবুল্লার মা। দরজায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার শ্বশুর, 'বাবা, আর একটা দিন আগে আসলে দেখা হইতো।' তারপর সে সান্ত্বনা দেয়, 'আল্লার মাল, আল্লায় নিছে। মনডা শক্ত করো, শক্ত করো।'

না, মনুমিঞা ঢাকায় গিয়ে খবর গোপন করেনি, হাবিবুল্লা মারা গেছে মনুমিঞা তখন বরিশাল থেকে ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গেছে। দাস্তের রোগী, পরে বমিও হচ্ছিল, এই রোগীর লাশ বেশিক্ষণ রাখা নিরাপদ নয়। এই দক্ষিণে দাস্তের ব্যারাম খুব হচ্ছে, শরিয়তমতো সব লাশের দাফন পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। বাকেরগঞ্জ হাসপাতালে ডাক্তারদের কেউই সপ্তাহে দুই দিনের বেশি হাসপাতালে থাকে না। ছোকরা এক নতুন ডাক্তার এসেছে, সে একাই সামাল দিচ্ছে কয়েকটা ইউনিয়নের রোগী। হাসপাতালে স্যালাইনের ব্যাগ ছিল মোটে কয়েকটা, মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীর প্রভাবে তার একটির নোনাজল মিশেছে হাবিবুল্লার পানসে রক্তের সঙ্গে। হায়াৎ নাই, ওষুধ থাকলেই আর কী হতো?

খালের ধারে মাঝে-মাঝে বেতবন, খাল পেরিয়ে গোরস্তান। গোরস্তানের অপর পাশে মোটা-মোটা বাঁশের ঘন ঝাড়। দাস্তবমিতে কয়েকদিন হলো রোজই মানুষ সাফ হচ্ছে, এখানেও কয়েকটা নতুন কবর। আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার জিয়ারতের দোয়া পড়তে মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীকে অনুরোধ করলে সে আবার বলে আফাজ আলিকে, 'দাফনের সময় আমি দোয়া পড়ছি। তুনি নিজে জিয়ারত করো, মোনাজাত করো, বাপমায়ের কান্দন খোদায় শোনে।'

বিড়বিড় করে জিয়ারতের দোয়া পড়তে শুরু করে আফাজ আলি। একটু হোঁচট খায়। না, না, দোয়া তার ভুল হয়নি, কখনো হয়ও না। এই গোরস্তানের কি ছিরি, এখানে এই দোয়া পড়ে আল্লার কালাম নাপাক করে ফেলা হয় না? এ কী গোরস্তান না ভাগাড়? এ সব কি মুর্দাকে ইজ্জতের সঙ্গে দাফন করা, নাকি লাশ দড়ি বেঁধে টেনে এনে পুঁতে রাখা হয়েছে? খালের ধারে বেতবন থেকে মানুষের ও বাঁশঝাড় থেকে পর্দানশিন মেয়েমানুষের গুয়ের গন্ধ, রাত্রে শেয়ালের-খোঁড়া কবরগুলোর ভেতর থেকে উঁকি দেওয়া বয়স, লিঙ্গ ও পেশা নির্বিশেষে মুর্দাদের খুচরাখাচরা ঠ্যাং, রান বা হাঁটুর গন্ধ এবং গিজগিজ করা গাছপালা লতাগুলোর ভেষজ গন্ধ মিশে ফাল্গুনের ফুরফুরে হাওয়ায় অবিরাম ঘুরপাক খায়। দুষ্টুমি করে এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নদীপথ হয়ে খালের পানিতে ভেসে-আসা নোনা বাতাসের ঝাপ্টা। স্থানীয় গন্ধের অবিরাম ঘুরপাক

ও সমুদ্রের বাতাসের অনিয়মিত ধাক্কা সামলানো আফাজ আলির পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে। জিয়ারতের দোয়া তবু মুখস্থ পড়া গেল।— আল্লা তার ছেলেকেই নিল, তা আল্লার কালাম আল্লাকে নিবেদন করতে আফাজ আলির আর কী কষ্ট হবে? কঠিন কাজ হলো আল্লার দরবারে মোনাজাত করা, আল্লার কাছে সে চাইবে কী? ছেলের রুহের মাগফেরাতের জন্যে আর্জি করতে গেলেই তার গর্দানে লাগে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের নিশ্বাস। মোটা গর্দানের তুলনায় পাতলা চামড়ায় ছ্যাঁক লাগে। ছেলের রোজগারে মাসে মাসে, ঋণশোধের রাস্তা তার চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। হায়রে, নিজের আওলাদ তাকে এটুকু সাহায্যও করল না! নদীপথ হয়ে খালের-ওপর-দিয়ে আসা সমুদ্রের নোনা বাতাসে আফাজ আলির চোখে পাতলা মেঘ জমতে না জমতে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের নিশ্বাস-মেশানো স্থানীয় হাওয়া সব শুষে ফেলে এবং সেই সঙ্গে গলার আর্দ্রতাও শুকিয়ে গেলে দুই হাত তুলেও লোকটা কিছু চাইতে পারে না। গোরস্তান থেকে ফিরতে ফিরতে এমনকী তার শরীরের রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়ার দশা হয়, আফাজ আলি সেই শুকনা শরীরে বল সঞ্চয়ের আশায় কথা বলতে চায় মনুমিঞার সঙ্গে। কিন্তু কী বলবে তাও মনে করতে পারে না।

সেই কথা তার মনে পড়ে পরদিন। হাবিবুল্লার চাকরির জন্যে দেওয়া ঘুষের বম কিস্তির টাকাটা কী মনুমিঞা ফেরত আনতে পারে?

না, তা হয় কী করে? বন্ধুবিয়োগে কাতর মনুমিঞা জানায়, '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিস্তার' অফিসার জাহাঙ্গীর কাজী। স্যার তো টাকাটা পেয়েই বিভিন্ন জায়গায় ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়েছে, তার পকেটে গেছে সামান্য একটি অংশ। তবে টাকা পরিশোধের জন্যে আফাজ আলি এত অস্থির হচ্ছে কেন? আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার তো টাকাটা এক্ষুণি চাইছে না। এটা কোথাও খাটালে তার কিছু লাভ তো হতোই, আফাজ আলির এত বড়ো বিপদ, লাভ যতটা কম দেওয়ার জন্যে সে বরং একটু তাড়াতাড়ি টাকাটা শোধ করুক। পাশের গাঁয়ের মানুষ, নানাদিক থেকে আত্মীয়তাও আছে, আফাজ আলির বিপদ মানে তারও বিপদ। আফাজ আলিও যেন তার কথা ভাবে।

এদিকে বাড়িতে আফাজ আলির বৌয়ের দাস্ত শুরু হয়েছে। আফাজ আলির এখন উপায়? শবেবরাতের আর মোটে ৪দিন বাকি। তার সমস্যা বোঝে আশরাফুদ্দিন, 'কত বড়ো-বড়ো মানুষ তাগো মুর্দা ময়মুরুব্বির জিম্মাদারি তোমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে আছে, তুমি এখানে বসিয়া থাকলে চলবে?' তারপর যেচে সে জামাইয়ের হাতে ১০০০ টাকা তুলে দিয়ে পরামর্শ দেয়, এটা সে বাড়িতে রেখে যাক, এ দিয়ে হাবিবুল্লার মায়ের চিকিৎসা হবে, কয়েক দিন তার সংসারও চলবে। তবে শবেবরাতের পরপরই আফাজ আলি যেন টাকাটা মানি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেয়। তার নিজের টাকা হলে কথা ছিল না. কিন্তু মাদ্রাসা ফাণ্ডের টাকা, 'এম পি সায়েবে বহুত তদ্‌বির করিয়া তিরিশহাজার স্যাংশন করাইছে, আমার হাতে দশহাজার দিয়া বললে, এই দিয়া বিসমিল্লা করেন, টাকা আসতে আছে। শবেবরাতের পর কনোসটেরাকশনের কামে ইনশাআল্লা হাত দিমু। টাকা নাজাই পড়লে শরম পামু, মনে করিয়া পাঠাইয়া দিও বাবা।' বলতে বলতে মওলানার শোককাতর গলার ভার লাঘব হয়, সে জানায়, এদিকে মাদ্রাসায় কাজের ধুম পড়ে গিয়েছে। আফাজ আলির ছোটোছেলে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল হাবিবুল্লার তাগাদায়, ঝড়ে ঐ স্কুল ভেঙে যাওয়ার পর এখনো মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার কাছেই এবতেদায়ি মাদ্রাসায় দেওয়া হচ্ছে নতুন টিনের ছাউনি, সামনের বার মেঝেও পাকা হবে.— আফাজ আলি

বললে আশরাফুদ্দিন ছেলেটাকে ওখানে ভর্তি করিয়ে দেবে। বাকেরগঞ্জে আলিয়া মাদ্রাসার বিল্ডিং করার টাকা এসেছে মেলা, বিলাত না অ্যামেরিকার কোন নাসারা প্রতিষ্ঠান টাকা ঢালছে আমাদের দীনি এলেমের জন্যে, তারা বুঝতে পাচ্ছে, ইসলাম ছাড়া আর গতি নাই। আফাজ আলির চিন্তার কোনো কারণ নাই, এই লাইনে পড়লে তার ছোটোছেলের রুজির অভাব ইনশাআল্লা কখনো হবে না।

আল্লার এলেম শিখতে শিখতে ছেড়ে দিয়েছিল বলে হাবিবুল্লার ওপর আল্লা কি নারাজ হয়েছে? হঠকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর ক্ষোভে তার জন্যে আফাজ আলির শোক দানা বাঁধতে পারে না, আবার টলোমলো শোক এলিয়ে দেয় তার ক্ষোভকে। শোক বা ক্ষোভ তাকে জ্বালাতে বা বিঁধতে না পারলে তার সামনে সব বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ফাঁকা শরীর ও ফাঁকা মাথার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তবে তাকে সচল রাখে আসন্ন শবেবরাত। শবেবরাতের আর ছ'দিন, প্রতি পলকে সময়টা কমে আসছে। দুপুর ভাত খেয়ে রওয়ানা হলে সন্ধ্যার মধ্যে বরিশাল। বরিশাল থেকে ৮টার লঞ্চ ধরতে পারলে পরদিন ভোরবেলা ঢাকা। তাহলে কালকের দিনটা পুরো কাজে লাগানো যায়। কত মানুষকে টেলিফোন করতে হবে, এবার দরকার হলে সে না হয় বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মানুষের ছাইচাপা শোককে উস্‌কিয়ে দিয়ে আসবে।

'আসসালামুআলায়কুম ইয়া আহলালে কুববে'। নিজের কর্মস্থলে পা দিয়ে আফাজ আলি গভীর তাজিমের সঙ্গে মুর্দাদের সালাম করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, কবরগুলো থেকে নীরব জবাব তার কানে আসে, 'ওয়ালেকুম সালাম ইয়া রহমতুল্লা ইয়া বরকাতুহু ইয়া মাগফেরাতু।' শবেবরাতের সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে, গোরস্তানের বাইরে থেকেই এর আয়োজন শুরু। দেশের নানা এলাকা থেকে ফকির মিসকিন এসেছে সপরিবারে, সারি করে বসেছে তারা রাস্তা জুড়ে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ও মারামারির মধ্যে দিয়ে চলেছে তাদের উৎসব এবং মহোৎসবের প্রস্তুতি। এদের ওপর আফাজ আলির কোনো রাগ নাই আজ, গরিবের দোয়া আল্লা কবুল করে সবার আগে।

ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল শরিফ মৃধাকে। ৮১৩০ নম্বর কবর বড়ো অবহেলায় ছিল, সেটা সাফ করা হয়েছে তো? ৫০৬৮তে গোলাপ ফুটল? এই মুর্দা গোলাপ পছন্দ করত, তার মেয়ে প্রতি শবেবরাতের দিন বিকালবেলা এসে বাপের কবর থেকে বাপের লাশের বাসিরক্তে-লাল ও শুকনা-মজ্জায়-পুরুষ্টু একটি গোলাপ তুলে ভ্যানিটি ব্যাগে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে, ঐ ১টি গোলাপের দাম এমনকী ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে, এর ১৫০ টাকাই তার, বাকিটা দিতে হয় শরিফ মৃধাকে। ৬৬৯৮-এ সবুজ ঘাসের গালিচা না দেখলে মুর্দার মেজর জেনারেল ছেলের শোক ঠিকমতো জমে না। ঘাস গজাবার কদ্দুর কী হলো?

'সব্বই হইবো হুজুর, ঘাবড়ায়েন না।' শরিফ মৃধা তাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু আরো জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে, হুজুর বরং সেদিকে নজর দিক। কী?— 'সেইদিন যে পার্টি দেইখ্যা গেলেন, উনিরা আসছে। আপনে তো বাড়ি গেলেন গিয়া, দাফনের সব বন্দোবস্ত করলাম আমি। কাল্লুরে ঢুকবার দেই নাই। হায়দর বখস হুজুরে ঐদিন দোয়া পড়ছে। আজ আগে কুলখানি, অহন তারা আইছে জিয়ারত করতে। কয়টা গাড়ি ভইরা মানুষ, মনে হয় ১৫/২০ জনের কম না। গাড়িই আইছে ৮/১০ খান। হায়দর বখস হুজুরে গেছে ইসকাটন, মিলাদ পড়াইতে। আপনে জিয়ারত পড়েন। পার্টি মালদার। আমার কথাটা কইয়া রাইখেন। হায়দর বখসরে দিয়া কাল্লু এইটা দখল করার তালে আছে। দেইখেন কিন্তু।'

ঐ কবরের সামনে ভিড়। ওদের দেখে লম্বাচওড়া এক ভদ্রলোক বলে, 'ঐ মওলানা সাহেব কোথায়? দাফনের দিন ছিলেন, তিনি নেই?'

'ঐ হুজুরে বাড়ি গেছে, তার ছেলের অসুখ।' শরিফ মৃধার এই জবাবে আফাজ আলি চমকে উঠে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জানায়, 'তিনি কোথায় মিলাদ পড়াতে গেছেন। এসে পড়বেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন?'

কবরের চারদিকে বাঁশের চাটাই দিয়ে কী সুন্দর বেড়া দিয়েছে, অস্থায়ী বেড়া, তাতেই কী কারুকাজ! মুর্দার শিয়রে বেড়ার সঙ্গে ঝুলছে দামি অ্যালুমিনিয়ামের পাত, সাদা ঝকঝকে পাতে ঘন কলো বর্ডারের ভেতর কালো অক্ষর ফুটে উঠেছে মুর্দার নাম এবং তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। জন্ম ও মৃত্যুর দিন, মাস ও বছর। হাবিবুল্লার জন্ম তারিখ আফাজ আলির ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু সাল কি ভুলতে পারে? কাঙালের মতো আফাজ আলি মিনতি করে, 'আমি জিয়ারত পড়িয়া দেই স্যার। আমারে পড়তে দেবেন?'

অনুমতি পাওয়ার আগেই আফাজ আলি জিয়ারতের দোয়া পড়তে শুরু করল।

কবরের চার কোণা থেকে ওঠে দামি আগরবাতির ধোঁয়া, সেই ধোঁয়ার গন্ধ খচিত হয় পাশের কবরের গোলাপ ও উল্টোদিকের কবরের বেলফুলের গন্ধে। জমায়েত শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের কারো-কারো পারফিউমের সুবাস ও মুরুব্বিগোছের কারো জামার মেশক্অম্বর আতরের খুস্বু ঐ আগরবাতি, গোলাপ ও বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আফাজ আলির কণ্ঠের আয়াতগুলোকে আলগোছে ঝুলিয়ে রাখে কবরের ওপর এবং একই সঙ্গে পরম যত্নে গুঁজে গুঁজে দেয় কবরের চারপাশে। ছেলেটা ঘুমাক, মশামাছিতে সে যেন এতটুকু উসখুস না করে। তার কাফনে কি মাটির দাগ লেগেছে? গোসল করানোর সময় তার শরীর থেকে দাস্তের সমস্ত চিহ্ন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে তো? মাটির ভেতরে শুয়ে-থাকা তার শরীরের সমস্ত নাপাক জিনিস সাফ করতে আফাজ আলি দোয়া পড়ে একটু ঝুঁকে। ধীরে ও বিলম্বিত লয়ে আয়াত পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ পান-না-খাওয়া গলা তার ভিজে যায় এবং সেই সঙ্গে ভেজায় শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের চোখের কোণ। মোনাজাতের জন্যে হাত তুললে আগরবাতির ধোঁয়ার মেঘ নামে তরল হয়ে, তরল ধোঁয়ার সঙ্গে পারফিউম, মেশক্অম্বর আতর, গোলাপ ও বেলফুল এবং সর্বোপরি আগরবাতির গন্ধ আফাজ আলির বিড়বিড়-করা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে তার গলায়। জিয়ারতের দোয়া শেষ হলে ঐ গলায় তার মোনাজাত বলকায়, 'আল্লা পরওয়ারদিগার, তোমার রহমতের শেষ নাই। তোমার পেয়ারের বান্দাকে তুমি তোমার কোলে টেনে নিয়েছ, তাকে তুমি বেহেশত নসিব করো আল্লা। তার আব্বা-আম্মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আজ তোমার দরবারে তার রুহের মাগফেরাত চাইতে এসেছে, আল্লা রব্বুল আলামিন, তাদের দোয়া তুমি কবুল করো আল্লা।' একটু থেমে সে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'আল্লা তোমার পেয়ারের বান্দাকে তুমি তোমার কোলে টেনে নিয়েছ, আমাদের কোনো নালিশ নাই, কারো কোনো নালিশ নাই, আমার কোনো নালিশ নাই!' শেষ শব্দদুটি ভাঙা রেকর্ডের মতো তার ভাঙাচোরা গলা থেকে বারবার বেরুতে থাকলে শোকার্তদের কারো-কারো চোখে বিষাদের সঙ্গে মেশে বিস্ময়। এবারে 'আল্লা' বলে আফাজ আলি মোনাজাতে-তোলা দুই হাতের চওড়া ফাঁকের ভিতর দিয়ে কবরের বেড়ায় ঝোলানো অ্যালুমিনিয়ামের পাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে চোখের নোনা মেঘের আড়াল ছিঁড়ে তরুণ মুর্দার নাম সে ভালো করে পড়ে নেয়, বানান করে করে পড়ে, স্পষ্ট করে পড়ে। তারপর

ধীরে ধীরে বলে, 'শাহতাব কবির তোমার পেয়ারের বান্দা, তুমি তাকে তুলে নিলে, কারো কোনো নালিশ নাই আল্লা। তুমি তাকে এতই মোহাব্বত করো যে, তার বাপমায়ের কথা তোমার একবার মনে পড়লা না? আল্লা পরওয়ারদিগার, তোমার রহমতের দরিয়া কি শাহতাব কবিরের ওপর ঢেলে ঢেলেই শুকিয়ে ফেললে?' এইবার সে ফোঁপায়, গলা খাঁকারি দিয়ে ফোঁপানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে ফের বলে, 'আল্লা, এত বড়ো উপযুক্ত পোলাডারে তুমি বাপের বুক হইতে কাড়িয়া লইলা? অর মায়ের বুকডা তুমি খালি করিয়া দিলা?' কবরের পাশে-দাঁড়ানো লোকজন তাদের রক্তসূত্রে পাওয়া অভিজাত সংযমে কান্নাকে লুকিয়ে রাখে শরীরের খাঁজে-খাঁজে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তারা শোককে আব্রু দিতে জানে। কিন্তু তাদের জোয়ান ছেলের জন্যে আফাজ আলির মোনাজাত তাদের চাপা ঠোঁটে ঢুকে পড়েছে; তারা একটু বিহ্বল হয় এবং মৌলবিটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় এই কবরে প্রতিদিন নিয়মিত কোরানপাঠের কাজে তাকে মাসকাবারি চুক্তিতে নিয়োগদানের বিষয়ে বিবেচনা করে। আফাজ আলি আল্লাকে জিগ্যেস করে, 'আল্লা, তার নাদান বাপটার কথা একবার তুমি ভাবিয়া দেখলা না?'

মোনাজাতে আফাজ আলির গেরাইম্যা লবজের প্রয়োগে শরিফ মৃধা উদ্বিগ্ন হয়, মোনাজাতে হুজুরের জবান সবসময় খুব চোস্ত। শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের দিকে তাকিয়ে শরিফ মৃধা তাদের চোখমুখের জরিপ করে। না, ওদিকে মুসিবতের আভাস নাই। অনেকের চোখেই মেঘ জমেছে, এখন মেঘ থেকে অঝোরে পানি ঝরানো চাই। কিন্তু আফাজ আলির এরকম দশা শরিফ মৃধা আগে কখনো দেখেনি। মোনাজাত করতে করতে আবার ভুলভাল কিছু বলে ফেললে সব পণ্ড হবে।

আফাজ আলি শরিফ মৃধার দিকে খেয়াল না করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'আল্লা, আল্লা রব্বুল আলামিন, শাহতাব কবিররে তুমি বেহেস্ত নসিব করো আল্লা। কিন্তু, পাক পরওয়ারদিগার, তার বাপটারে কি তোমার নজরে পড়লো না? বাপটা কি তামাম জীবন খালি গোরস্তানে গোরস্তানেই থাকবো?' এবার শোকার্তদের বেশ কয়েকজনের শরীরের ভেতর লুকিয়ে-রাখা-শোক ধাক্কা দেয় তাদের গলায় এবং তাদের অন্তত তিনজনের মোনাজাতে-নিয়োজিত হাতের বিন্যাস ভেঙে পড়লে সেইসব হাত নিজেদের মুখে চেপে ধরে তারা ফোঁপায়। প্রায় একই সময়ে আফাজ আলির হাতও ঝুলে পড়ে নিচে এবং উপুড় হয়ে পড়ে-যাওয়া ঠেকাতে ঐ হাতজোড়া দিয়ে সে আঁকড়ে ধরে কবরের বেড়ার দুটো খুঁটি। তাতে একটু বল পেয়ে সে বলে, 'আল্লা, তার নাদান বাপটা কি খালি গোর জিয়ারত করার জন্যেই দুনিয়ার বাঁচিয়া থাকবো। আল্লা!' তার ফোঁপানি চড়ে গেছে কান্নায়, আল্লার প্রতি তার নিবেদন এবং আল্লার কাছে তার মোনাজাত চাপা পড়ে তার ভেউভেউ কান্নার নিচে। আফাজ আলি প্রাণপণে ডাকে, 'আল্লা, আল্লা গো! আল্লা।' তার কান্নায় আল্লার নাম ভিজে চপচপে হয়ে যায়, ভিজতে ভিজতে এমনকী মুছে যাবার হাল হলেও আফাজ আলি হাউমাউ করে কাঁদে।

ভারততীর্থ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

একটো হিস্যা শুনিয়ে মালিক ঃ

'চিন্তাসে চতুরাই ঘটে
দুখসে ঘটে শরীর
পাপসে ধন-লছমী ঘটে
কহ্ গয়া দাস কবীর—;

চিন্তা করে মেজাজ নষ্ট, দুঃখে নষ্ট শরীর। আর পাপ করলে সব অর্থ নষ্ট হয়ে যায়—এমন কথা বলেন কবীরদাস।

কানী লাইন কটি উচ্চারণ করেই মনের প্রশান্তিতে হেসে উঠল। তার চোখের লালচে ড্যালা দুটো থিরথির করে কেঁপে উঠতেই আমি চমকালাম। ঝড়ের দাপটে, এলোমেলো বাতাসের মোচড়ে এক হিচলায় শরীরের বেশ কিছু অংশ গেল ভিজে।

আর্দ্র বাতাসে সারাটা দিন ছিল ভয়ানক গুমোট। ভাপে সিদ্ধ হবার মত চামড়ার অভ্যন্তর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। এক ফোঁটা ঘাম শুকোবার মত বাতাস ছিল না। বিকেলের কিছু আগে গৃহত্যাগী হয়ে পায়ে পায়ে শহর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরালা-নির্জন এলাকায় চলে এলাম। দূরে দূরে ইটভাটার চিমনি, পীচ-ঢালা বাস রাস্তা এবং বেশ কিছুটা দূরে হাটের বাঁধা চালা। সপ্তাহে দুদিন দূর-দূরান্তের মানুষ সওদা কেনা-বেচার আসর জমায়। সব কিছু টপকে সবুজ অঞ্জন রেখা।

শহর আমাকে আকর্ষণ করতে পারে না। শহরবাসীদেরও অবিমিশ্র ভালবাসায় গ্রহণ করতে পারি না। এই গুমোট পরিবেশে তারাও আপন আপন গৃহকোণ ছেড়ে সেজে-গুজে রাস্তায় নাক উঁচিয়ে হাঁস-ফাঁস করছে, সোনা শাড়ি কিংবা এক আধ টুকরো ফল মিষ্টি চপ কাটলেটের লোভে হুমড়ি খাচ্ছে দোকানে —কিনুক বা না-কিনুক একটু শুঁকতে পারলেও যেন কৃতার্থ। আর জীবনযন্ত্রণা অর্থাৎ মাংস-মজ্জার লোভে হয়ে উঠছে কামাতুর।

আমি এই শহর জীবনের গুহা পেরিয়ে আসতে আসতেই মধ্যপথে আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রহস্যের মত মেঘ জমে উঠল। ঘন, কাল এবং গুরুগুরু। তার পটভূমিতে দূরের গাছপালারা ধূসর হয়ে উঠল। আহা মেঘ। ঝড়। অস্বস্তিকর স্থবিরত্বের শেষে হয়ত এমন করেই ঝড় ফুঁসে ওঠে। ভেসে আসে ঠাণ্ডা বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর ঘূর্ণি এবং ঝটপট গাছেদের সর্বাঙ্গে এলোপাথাড়ি—যেন উপড়ে ফেলবে।

একটু পরেই, আর দশটা মানুষের মত ঝড়-জলের হাত থেকে শরীরটুকু বাঁচাতে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটতে হল। আমার পোশাক ও চুলের আনাচেকানাচে তখন বাতাসের ক্ষিপ্ত আস্ফালন। পাকা রাস্তার পাশে, মস্ত নর্দমা টপকে একটা চালা।

কুঁড়ো, ভুষি ইত্যাদি নানা প্রকার শস্য-ছালের ধূসর গন্ধ এবং তীব্র গোময়ের ঝাঁজ। পাশেই একটা আটাচাকির কল—দুটো পাথরের মাঝে শস্যকে যেখানে পেষাই করা হয়। আমি এসে একটা চালার নিচে দাঁড়ালাম বৃষ্টি তখন ধেয়ে এসেছে। একটু পরেই টের পেলাম আশ্রয়ের স্থানটি মোটেই মজবুত নয়, জংধরা টিনের। ফলে জলের ধারা গলগলিয়ে উঠলে টুপটাপ নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হতে লাগল।

অন্ধকার ছায়া-ছায়া। বাতাসের মোচড়ের সঙ্গে জলের উচ্ছ্বাস এবং নিমেষে মেঘটা আদিগন্ত ছড়িয়ে ঈষৎ পিঙ্গল হয়ে গেল। আমি প্রকৃতির নিয়ম নিপুণত্বের কথা ভাবতে ভাবতে অলস দৃষ্টিতে দেখছিলাম জলকণার শুভ্র অস্পষ্টতা ও ক্বচিৎ যানবাহন চলাচলের কদমফুলি হেডলাইটগুলো।

অন্ধকার পারিপার্শ্বিকে আমি এতক্ষণ দৃষ্টি দিই নি, হঠাৎ বিড়ির গাঢ় ধোঁয়া আমার অনুভূতি স্পর্শ করল। তাকিয়ে দেখলাম একই আশ্রয়ের কোণে কয়েকটা মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব। উবু হয়ে হাঁটু ঠেকিয়ে আছে। তাদের কথাবার্তা কম, উপরন্তু বৃষ্টিতে আমার কিছুই কানে আসছিল না। মাটি-মাখা আঙুলে বিড়ির স্থূল সশব্দ টানে লালচে চোখগুলো উসকে উঠছিল শুধু।

সামনেই বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাবার আশায়, বিনা সংকোচে এবং ভূমিকা ব্যতিরেকেই হ্যালা-ফ্যালা ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবে সব?' কেউ জবাব দিল না। যেন এড়িয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে বেঁচে যায়। আমারও একটু খোঁচাবার কৌতূহল হল। জানি প্রতিপক্ষের কাছে আমি যথার্থই ভদ্র ও বাবু গোছের। সুতরাং এ কৌতূহলটা স্বাভাবিক।

'কি হে, বলছ না যে.....কদ্দুর যাবে?'

টুক করে কে যেন জবাবটা ছেড়ে দিল, 'সামনের ভাটায় বাবু'।

আমি নড়া-চড়া মানুষগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লাম, 'ঐ ভাটায়?....তা এদিকে দল বেঁধে কেন?'

ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বিড় বিড় করল। তাদের জীবনযাত্রার আপন গণ্ডীর মধ্যে আমার কৌতূহলী আলাপের ছায়া নিশ্চয়ই বিরক্ত উৎপাদন করেছে। অনিচ্ছায় উত্তর দিল একজন, 'হাটে এয়েছিলাম।'

হাট! হ্যাঁ, আজ হাটবার। আমি তাকালাম সওদা কেনা-বেচার নির্দিষ্ট স্থানটুকুর দিকে। আমার হাসি পেল। ওখানে এখন চালার খুঁটিগুলো নিঃশব্দে নির্জনে এত অসহায়ভাবে ভিজছে, মনেই হয় না সপ্তাহে দুদিন ঐ এলাকাটুকু ঘিরে মানুষ এত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে।

বুঝলাম ভাটার কুলিরা হাট করতে এসে আটকা পড়েছে। সাপ্তাহিক সওদায় সুবিধা হল না আজ। এর বেশি ওরা আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। নিজেরা ফিসফিস শুরু করে দিল। তালুতে টকাস্ টকাস্ বা ঠোঁটে চুকচাক শব্দ—বুঝলাম কোন দুঃখজনক ভাগ্যের আলোচনা চলছে।

সামনেই বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

বৃষ্টির একটানা দৃশ্যে একঘেয়েমি না-কাটাতে পেরে মানুষগুলোর মধ্যেই ফিরে আসতে হল। 'আগুন আছে, আগুন?'

পেতলের সস্তা পেট্রোল বাতিটা জ্বালিয়ে কাল মোটা আঙুলগুলো আগুনটা আড়াল করতে, আমি ঠোঁটেচাপা নেশার বস্তুটা সেখানে গলিয়ে দিলাম।

'খাবে বিড়ি?'

তিনজন আমার দান গ্রহণ করে ঠাণ্ডায় খকখক কাশতে লাগল।

আমি মানুষের এই ছোট্ট পালটিকে চিনি। খনি, বাগিচা এবং শস্যক্ষেত্রে এরা মুখ বুজে কাজ করে। উত্তরভারত থেকে ধান গম কেটে নেমে আসে পুবে, পশ্চিমে—উদরের উৎকণ্ঠায়। হ্যাঁ, উত্তরভারত থেকে। ভৌগোলিক সীমানায় এ ভূখণ্ড হল হিমালয়ের নীচে গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে। এই সেই ভূখণ্ড যেখানে যুগে যুগে ইতিহাসের মানুষ ভারতবর্ষের বুকে এসে প্রথম উপস্থিত হয়েছিল। প্রথম সেই হিন্দুকুশ থেকে সভ্যতার মন্ত্র নিয়ে এল একদল। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে—ভারততীর্থের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ এই ছোট্ট পালটার পিতৃপুরুষদের তারা দিয়েছিল পার্থিব জীবনের উর্ধ্বে নতুন জন্মের আস্বাদ আর গ্রহণ করেছিল বস্তু অর্থাৎ ভূমি। দুয়ের সংঘাতেই ত ভারততীর্থ।

এই দীর্ঘ বছর পরও, এই মানুষের পালেরা সারাটা বছর ভুরু ঝরা ঘাম পায়ে ফেলে কয়েকটা কাঁচা পয়সার জন্য। বর্ষার কাদাজলে গ্রামের জমিতে শস্যের কাজ শেষ হয়ে গেলেই, আশ্বিনের পরেই গাঁয়ে গাঁয়ে দাদন পৌঁছে যায়। সময় হলেই সর্দারেরা গাদাই ট্রেনে পার্শেল করে আনে এখানে—পুবের বিখ্যাত শহরে। এখান থেকেই কেউ কেউ চালান যায় ইটভাটায়—উদয়াস্ত মাটি কাটে, ইট বানায়, আগুনে সেঁকে, গুনে গুনে তোলে লরীতে। কেউ কেউ যায় জন খাটতে, জোগান দিতে। রোদে জলে চামড়া পুড়িয়ে, পুনরায় গ্রীষ্মের দাবদাহে মজুরের পাল ফিরে যায় উত্তরে, আপন আপন গাঁয়ে। সেখানে খেতের কাজের পর মরশুমি হাওয়া দলাদল মেঘ মাথায় জলের ঝাঁঝরি ঢালতে শুরু করে মাঠ-ঘাট, পাহাড়ে জঙ্গলে। ধরতি ঋতুমতী। চাষবাস লাঙ্গলের দরকার। এই মানুষের পালেরা, আজকের এমনভাবে হাঁটু লাগিয়ে থাকার মত জমিদারের উঠোন প্রান্তে একদা গোপনে খৈনির চিমটি দাঁতে গুঁজে পিচ্ পিচ্ থুতু ফেলত। খেতির কাজে মালিকের দয়াভিক্ষা চায়। দিনে তিনসের ধান আর কিছু গম। উঠোনে এদের ছায়া পড়া নিষেধ। কারণ নিম্নবর্ণের রক্ত বহন করছে এরা। কুরমী, ভূমিহার, মুচি-মাহাতোদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুতদের উঠোনে ওঠাবার কোন বিধি নেই। সমানেই বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

প্রথম কথা বলে উঠল ধনচাঁদ মাহাতো। ধূলিধূসর রুক্ষ চুল, কাল গাঁট্টাগোট্টা চেহারা এবং রোদজলে পোড়া চামড়া। নিজের দলের কাছে আপশোস করে বলল, 'জলে আর চাকি খুলবে না... আটা মিলবে কোথায়?'

'কোথায় আর মিলবে? এখন ঘর চল।'

চুকচুক আপশোসের শব্দ করল সে।

আমি ওর কথায় যোগ দিলাম এবং আলাপ পরিচয়ের সূত্রে একটা কুলপঞ্জী বার করে নেয়াও কষ্টসাধ্য হল না।

ওর মুলুক বর্তমান ভৌগোলিক হিসাব অনুযায়ী হাজারীবাগ জেলায়। গ্রাম থেকে নিকটতম রেললাইন সাতাশ মাইল, বাসরাস্তা মাইল উনিশের মত হবে। হাতুড়ে ডাক্তারটিকেও দেখাতে গেলে মুমূর্ষু রুগীকে নিয়ে ডুলিতে এগার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। ডাক্তারের ব্যাপারে ওদের অবশ্য কোন অসুবিধে নেই, কারণ ওসব শয়তান অর্থাৎ সূঁচ-ওষুধ পবিত্র শরীরে ওরা ঢুকতে দেয় না।

ধনচাঁদ মাহাতোর বাপ কালু মাহাতো প্রভুর সম্পত্তি রক্ষায় প্রাণটুকু বিসর্জন দিয়ে গ্রামে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। খুব ধর্মভীরু ছিল সে এবং পার্থিব জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যে কোনদিন হা-হুতাশ করত না। কারণ আগামী জন্মের পুণ্যকর্মে দিনরাত মশগুল থাকত

সে। জমিদার অনুগ্রনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে ছিল চাকর। রাতের অন্ধকারে ডাকাতের টাঙ্গির মুখ তুচ্ছ করে বুক পেতে দিয়েছিল।

গ্রামের পণ্ডিতজী বলত শাস্ত্রের কথা। শূদ্রদের এই পার্থিব জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় প্রভুর সেবা করা। নিমকহারামি করলে নাকি দশ নরক ভোগের পর মানুষ গাধা বা শুয়োরের যোনিতে স্থান পায়। কালু মাহাতো সজ্ঞানে কোন পাপ করেনি অথবা শয়তানকে মাথায় দেয়নি স্থান। সামান্য সুতোটুকুতে লজ্জা ঢেকে প্রাণপাত করেছে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষায়। শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জিত রাক্ষসের বংশধর ডাকাতেরা —সীতাকে যাদের নির্দয় পূর্বপুরুষেরা চুরি করেছিল--টাঙ্গির ঘায়ে খসিয়ে দিল মুণ্ডুটা, ফেড়ে ফেল্ল বুক। কাছারি ঘরের উঠোনে কি রক্তের কাদা! গাঁয়ের লোক ওজন করিয়েছিল বিশাল কলজেটা--প্রায় সের দেড়েকের মত হবে। প্রভু শোকে কেঁদেছিলেন--গাঁয়ের জনসমক্ষেই ঝরিয়েছিলেন চোখের জল।

জলের হিচলা আসছে। সমানেই বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

কালু মাহাতোর বাপের নাম ঢিলং মাহাতো। হাবা-হাবা নুলো। তার কোন সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। তবুও ঘর ভরে উঠেছিল শিশু সন্তানে। পণ্ডিতজীর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল— ভগবানের অপার করুণায় পৃথিবী টিকে আছে, বংশবৃদ্ধি হচ্ছে জীবের। ঢিলং বেশিদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস পায় নি, জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে উধাও। পরে গাঁয়ের একজন স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কুড়ুলটা আর নখে আঁচড়ান রক্তাক্ত পোশাকটা নিয়ে ফিরে এসেছিল।

ঢিলং-এর বাপ তিলু মাহাতোরা প্রথম পাহাড় কেটে জঙ্গল সাফ করে জমির পত্তন করেছিল। পরে ডিকুরা এসে চাষযোগ্য জমি হাত বদল করে। কারণ শাস্ত্রে ইতরজনের কাছে মা ধরিত্রীর মালিকানা দেয়া লেখা নেই। সর্বজনভোগ্য জলবাতাসের মত ভূমিবিলি নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না।

এই সব কুলপঞ্জী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে, ধনচাঁদ মাহাতোর কথা শুনে মনে হল আমাকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। দশটা কথার উত্তরে পাচ্ছিলাম একটা। বিশেষ করে ওদের রুজি রোজগার, বাপ-ঠাকুর্দার কথা, দাদন, পার্থিব সুখদুঃখের ব্যাপারে বেশি কথাবার্তায় সে নারাজ। বরঞ্চ আপনার গণ্ডির মধ্যে আলোচনা, গুজগুজ বা হাসিঠাট্টায় এই ছোটখাট পালটার উৎসাহ বেশি। রাস্তা দিয়ে চলন্ত লরীতে ছাগল পাঁঠার মত জলে বিপর্যস্ত কুলিদের দেখে দলটা হাসছিল কিংবা ভাঙা হাটের কোন ঘটনা নিয়ে অহেতুক গালগল্পে মেতে উঠেছিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে ধনচাঁদ আপশোসের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল শস্য পেষাইয়ের দোকানটার দিকে। একজন শরীর অর্থাৎ তবিয়ত নিয়ে আলোচনা তুলল। ধনচাঁদ বোঝাল, 'দেহটা মাটি। চোখ বুঝলেই শেষ.....কি হবে ভেবে?—'

'মাটি কেন? পেট থেকে কি গাছ হয়?—'

'দূর! আস্ত গাধা! মরার পর ভগবান বাতাসে মিলিয়ে গেলে.....গরু ছাগলদের দেখিস না।'

আমি হাসি দিয়ে ওদের অপ্রস্তুত করে বল্লাম, 'বাঃ, বেশ বুঝিস ত!'

ধনচাঁদ ক্ষুণ্ণ হল। তোতলাতে তোতলাতে বল্ল, 'সব বুঝি আমরা। ....থাকি বোকাপানা, সব বুঝি বাবু।'

সামনেই বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

হঠাৎ বামা-কণ্ঠ হাই-তোলা স্বরে অন্ধকার ফুঁড়ে উঠল। সে যেন এসব আলোচনা থেকে অনেক দূরে। 'কি মাসরে ইটা?...জষ্টি?....উঃ কবে দেশে যাব।... কে বিড়ি খাচ্ছিস? দে'গ বাবু একটা বিড়ি।' মানুষেরা পালটা ধমক দেয়। আমিই একটা বিড়ি এগিয়ে দিই। ওরা কিন্তু উষ্মার বিড়বিড়ানি থামায় না।

কানী জন্ম-অন্ধ। ইঁটভাটারই একজন মেয়েকুলীর বোন। ওখানে সে ওর ক্ষমতা মত খাটে আর সপ্তাহে দুদিন হাটে ভিক্ষে করতে আসে। গায়েগতরে মাংস-টাংস আছে। জন্মান্ধ বলে ওর সাদি হল না কিন্তু পাঁচ ছবার ভোগ করেছে প্রসব যন্ত্রণা। এখনও ওর কোলে একটা বাচ্চা। ভাটার মালিক, লরীড্রাইভার, কুলী, হাটের ব্যাপারী কিংবা নিরালা পথের কোন বেখাপ্পা পথিক এই সর্বশেষ সন্তানটির পিতা হতে পারে।

পালের সঙ্গে প্রতিবছর কানীকে আনে ওর বোন।

আর্থিক লাভ মন্দ হয় না। ভিক্ষের পয়সা কিংবা মজুরীটা নিজের কবলে রাখতে পারে। জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভে দলের সঙ্গে কানীও ফিরে যায় দেশে, সন্তান হারিয়ে যায় পৃথিবীর জনারণ্যে, লেগে পড়ে ফসলের কাজে। ফের আশ্বিনে হাজিরা দেয় এখানে——গর্ভভারে তার শরীরে তখন চিকন লাবণ্যের ঢল নেমেছে।

পৃথিবীর আলো-বাতাস না চিনলেও, রাস্তাঘাট সে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যায়। অনেক চোখঅলা লোকের চাইতেও ভাল।

এই কানীর কুলপঞ্জীতেও দেখা যায় তার মা যাযাবরের মত কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। তার মাকে অর্থাৎ কানীর দিদিমাকে ছ্যাঁকা দিয়ে মেরেছিল শাশুড়ি। দিদিমার মা অবিশ্যি মরেছিল নিজেই; গলায় পাথর চাপিয়ে জলে ডুবে। তার মা বা দিদিরা পালে পালে বিক্রি হত এ হাটে ও হাটে।

বাতাস চাবকাচ্ছে প্রাচীন গাছটাকে।

বিড়ির ধোঁয়ায়, আনন্দে কানী আমায় বলে উঠল, 'ভগবান মঙ্গল করবে বাবু, হাটত বসল না, দুটো পয়সা ফেলে যা। ....কি ভাবছিস অত?'

'ভাবছি আর কি? চিন্তা ছাড়া ত মানুষ বাঁচে না। তাই একটা কিছু ভাবতেই হবে।'

কানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তখন বলে উঠল, 'একটা হিস্যা শুনিয়ে মালিক....'

ভাবলাম প্রতিবাদ করব না, কিন্তু বৃষ্টি তখনও ধরে আসে নি। তাই ইচ্ছে করেই যোগ দিলাম, 'পাপে ধন-লক্ষ্মী নষ্ট হবে কেন? ...পাপ না করলে ধন-লক্ষ্মী আসবে কি করে?'

কানীর সঙ্গে ধনচাঁদও জিব কেটে উঠল, 'ই ঠিক না।'

যেন বজ্রপাত হল আমার এ উল্টো কথায়।

'কেন ঠিক না? ....পৃথিবীতে এত লোক, এত তাদের টাকা, তাদের কেউ পাপ করছে না?'

ধনচাঁদ জবাব দিল, ই'ত এ জনমের টাকা নয় বাবু।... অন্য জনমের।'

হেসে জবাব দিলাম, 'মরলেই ত মাটি।...অন্য জনম মানে?'

'দশটা জনম আছে বাবু।... তারপর সুখ।'

আমি কিছু বলতে গেলে সে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। ইতিমধ্যে কানী যেন আঘাত খেয়ে জেগে উঠেছে।

'আপনি বলছেন দুনিয়ার মালিক নাই?... নিশ্চয় আছে, এ'ত হাট গ। ভগবান আমাদের হাটে পাঠাচ্ছেন কেমন সওদা করি দেখতে। হুঁ বাবা! ভগবান নাই বল্লে চলে?'

প্রসঙ্গত আমি কানীর সঙ্গে ও ব্যাপারে কোন কথাই তুলি নি। এ তার কাল্পনিক অভিযোগ। আমার হাসি পেল। হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এই কয় জনম?'

'ই মস্ত জ্ঞানের কথা বাবু।...আমি কি বলতে পারি?'

ধনচাঁদ মনে মনে এতক্ষণ কিছু কথা ভাবছিল। রাগত স্বরে আমাকে উল্টে জিজ্ঞেস করল, 'পৃথিবী —মানে এই সোনার মাটির জনম আপনি জানেন?'

'হুঁ, না-জানার কি আছে? সূর্য থেকে।'

কানী তাচ্ছিল্যের হাসি দিল। ধনচাঁদ আমার অজ্ঞতার জবাবই দিল না। কানী মুখ ফুটে বল্ল, 'না'গ, ঠিক না।'

'কি তবে?'

আমাকে সে মুচির মেয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল, যে না' কি ছিল অসাধারণ সুন্দরী ও অসূর্যম্পশ্যা। তার রূপের বর্ণনায় সূর্যদেবও নাকি টলে উঠেছিল। থাকত সে মস্ত এক গাছের মাথায়। পৃথিবী তখন জলমগ্ন, শুধু জল আর জল, স্থল বলতে কিছু নেই। একদিন সেই রূপবতী মুচী-কন্যা একটি পাতা ছিঁড়ে ফেলেছিল জলে। হাজার হাজার বছর সে পাতাটি জলে ঘুরপাক খেয়ে, দৈবাৎ স্থির হয়ে গেল একবার । সেই সুযোগে জন্ম নিল মাটি, গড়ে উঠল ধরিত্রী, জমি, ঘাস এবং শস্য। গম, যব, ধান।

হ্যাঁ, ধান থেকে ফুলের পাপড়ির মত ভাত। আহা কি স্বাদ! কি গন্ধ! কানীরা জানবে কোত্থেকে? বর্ষায় ওদের থালায় শুধু ঘাসবীজ জোটে।

ঠাণ্ডা আমেজে কানীর কণ্ঠে গান বেজে উঠল, 'জানি না, কয় জনমের শেষ হল'গ...।'

জলের ধারা একটু কমতেই ছপ্ ছপ্ শব্দে মানুষের ছোটখাট পালটা রাস্তা পেরিয়ে ছুটল অন্ধকারে ভাটার উদ্দেশ্যে।

কানীর গানের রেশ কানে বাজতে মনে হল ও না জানলেও, আমি জানি ওর কত জনম হল। চোখ বুজতেই ভাসতে লাগল এই ত সেদিন জনম শুরু। হিন্দুকুশ পেরিয়ে দলে দলে যেন কারা আসছে। মালিনীর তীরে শান্ত বনচ্ছায়ে তারা মন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করল 'স্বর্গ!' পুনর্জন্ম! পাপপুণ্য! আত্মা! সেবা!' জ্ঞানের অঞ্জলি উজাড় করে দিল। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে—সৃষ্টি হল ভারততীর্থের। সেই থেকে এই পালেরা উলঙ্গ দেহে যাযাবরের মত ছুটছে ত ছুটছেই। কাল মেঘের মত এক দেশ থেকে অন্যদেশে। সুতরাং দশ জনমান্তে সুখ আসার দিন কত বাকি হিসেবটা বিশেষ অসুবিধের নয়।

বাতাস চাবকাচ্ছিল প্রাচীন গাছটাকে। উপড়ায় নি; কারণ শিকড় থাকে গভীর থেবে গভীরে যেখানে বাতাস এখনো পৌঁছয়নি।

সুন্দরের সাধনা

মিহির ভট্টাচার্য

পিচ বাঁধানো চওড়া সরকারি রাস্তা সোজা চলে গেছে। রুটের বাস এই রাস্তা ধরেই যাতায়াত করে। রাস্তার দু-পাশে চাষের খেত। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা গ্রাম। গ্রামের চেহারা আগের মতো আর নেই। দু-একটা পাকাবাড়ি, এমন কি দোতালাও দেখতে পাওয়া যায়। এদিককার অনেকেই শহরাঞ্চলে চাকরি করে। শুধু ধারে-কাছের ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্রিক মফস্বল শহরেই নয়, খোদ শহর কলকাতায়ও এধারের লোকেরা চাকরি করে। পাকাবাড়ি তৈরি হলেও, বিজলি বাতি এসে গেলেও, গ্রামের চেহারা গ্রামের মতোই। গাছপালার জটলা, কুমড়ো কিংবা লাউয়ের লতানে গাছ, জাবর-কাটা গরু, ছাগল, হাঁস বা মুরগি ন্যাংটো বা ইজের-পরা আদুল গায়ের ছেলে বা মেয়ে—এ সবই দেখা যায়। দু-একটা তেল-চকচকে চেহারা বাদে রুক্ষ, শুকনো, নিরন্ন সব চেহারা। রাস্তার ধারের জলাগুলোতে ব্যস্ত নারী, কিশোর-কিশোরী, বাচ্চাদের ভিড়। যদি জল ছেঁচে কিছু পাওয়া যায়।

উমানাথকে বাসের কণ্ডাক্টর যেখানে কলেজ বলে নামিয়ে দিলো সেখানে পা দিয়ে বিকেলের অবসন্ন রোদেও চোখে ফুলকি কাটলো। চাষবাসের চিহ্ন দু-পাশে। বাসটা সোজা চলে গেছে। লোক নেই, শহরের লক্ষণ নেই। অথচ কলকাতায় বসে যা শুনেছে তাতে ছোট এক মফস্বল শহরের কলেজে ওর চাকরি। প্রাথমিক ধন্দটা কাটিয়ে ওঠার পর কলেজের চিহ্ন দেখতে পেলো। একটু এগিয়ে ডান দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। তার মুখে সিমেন্টের তীর-ফলক। লেখা—রাজ কলেজ। ফলকটার একটু আগে বাস রাস্তার ওপরেই একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ। তার নিচে চা-বিস্কুট-পাঁউরুটি-পান-সিগারেটের দোকান। দোকানঘর বাঁশ-দরমা আর খড় দিয়ে তৈরি করে নেওয়া। অশ্বত্থ গাছ তাকে ছায়া দেয়।

উমানাথ ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলো। জায়গার নির্দেশ নিখুঁত না পাওয়ার জন্য ওর পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে। তবে অসুবিধের কিছু নেই। কলেজ কম্পাউণ্ডেই প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার। অধ্যাপক ও ছাত্রদের হোস্টেলও আছে। সুতরাং আজকেই রিপোর্ট করতে পারবে। তার আগে গলা ভেজাবার জন্য একটু গরম চা দরকার।

চায়ের দোকানে দুজন খদ্দের রয়েছে। দোকানটার কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। সস্তা কাঠের একটা বেঞ্চি সামনের দিকে পাতা রয়েছে। সঙ্গে কোন হাইবেঞ্চি বা ডেস্ক নেই। হয় পাশে ঐ বেঞ্চির ওপর রেখে অথবা হাতে করে যা খাবার খেতে হবে। ভেতরে একটা নড়বড়ে চৌকি। তারই সামনের দিকটা দোকানীর গদি, মাল রাখার জায়গা। সস্তা কাঠ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা শোকেসে কমদামী সিগারেটের প্যাকেট, বিড়ি আর দেশলাই সযত্নে সাজানো। তিন-চারটে বয়মে হাতে-তৈরি নোস্তা আর মিষ্টি বিস্কুট। একটা উনুনে গরম জলের হাঁড়ি বসানো। গেলাস, চায়ের ছাকনি, টিনের তৈরি একটা আধা বারকোশ, আধা ট্রে জাতীয় পাত্র।

.উমানাথ দোকানী আর খদ্দের দু-জনকে খুঁটিয়ে দেখলো। খদ্দের দু-জনই মজুর জাতীয়। চেহারার ধরন দেখে আদিবাসী মনে হয়। পায়ের পাতার তলার দিকটা আর হাতের চেটো

হলদেটে ফর্সা। মাঠের জলকাদায় কাজ করলে যেমন হয়। বাদবাকি শরীরের যতটুকু দেখা যায় রোদে পোড়া। পরনে মেটে কোরা ধুতি, মাথার চুলে তেলের অভাবে জটার রঙ। তবে জট পাকায়নি। লোক দুটি বেঞ্চিতে বসেনি। বেঞ্চিটা ছেড়ে গাছের ছায়ায় উবু হয়ে বসে খুব তৃপ্তি সহকারে, মুখ দিয়ে আওয়াজ করে চা খাচ্ছে।

দোকানদারের চেহারা অন্যরকম। রোগা চেহারা। লম্বাটে ধরন। পরনের ধুতি খদ্দেরদের তুলনায় সামান্য ফর্সা। গায়ে হাফ-কলার পাঞ্জাবি। গলায় কণ্ঠির মালা। সরল সপাট চুল টেনে চূড়া করে ঝুঁটি বাঁধা। তার নাক বেঁকে আছে। ঠোঁট দুটো ফোলা। নিচেরটা ঝুলে আছে। এক কথায় অসুন্দর মুখ। কিন্তু লোকটার মুখে একটা মজা পাওয়ার ভাব। উমানাথের চোখে একটা ব্যাপার অস্বাভাবিক লাগলো। লোকটার হাত-পায়ের আঙুল। দোকানী যেভাবে হাত নাড়ছে তাতেও অস্বাভাবিকতা। ঐ অস্বাভাবিকতা নিয়ে ভাবতে গিয়ে ওর চোখ শো-কেশটার মাথায় চক দিয়ে আঁকাবাঁকা লেখা লাইনটায় এসে পড়লো—"নিত্যানন্দ টী স্টল।"

প্যান্ট-শার্ট পরা, ছাঁটা চাপদাড়ি মুখে, কাঁধে ব্যাগ, হাতে অ্যাটাশে উমানাথকে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে খদ্দেররা সমীহের চোখে তাকালো। কিন্তু দোকানদারের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ নেই।

এবারে এপ্রিলের গোড়াতেই গরম চড়ে গেছে। এখন সারাদিনের রোদ্দুরে তেতে থাকা মাঠ, রাস্তা আর চরাচর থেকে তাপ উঠছে। তবে হাওয়া আছে। এখন হাওয়াটা জোরে বইছে। অশ্বত্থের পাতার কাঁপুনি আর শব্দ মনে এক অন্তর্লীন অবসাদ এনে অবেলায় ঘুমের হাতছানি দিচ্ছে। শহরের দিক থেকে রাস্তা ধরে একজন বা দুজন বা তিনজন মানুষ শ্রান্তির আলস্য কাটিয়ে হেঁটে আসছে। মাঝে-মাঝে এক্কেকটা গরু কিম্বা ছাগল রাস্তা ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন কোনটা সোজা রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। কলেজের দিকে বা সেদিক থেকে কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। কলেজ তাহলে আজ ছুটি হয়ে গেছে।

উমানাথ ব্যাগটা আর অ্যাটাশেটা বেঞ্চির ওপর রেখে বসলো। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বললো—"এক কাপ চা হবে?"

—"কাপ নেই স্যার, গেলাসে খেতে হবে।"

উমানাথ উত্তর শুনে কৌতুক বোধ করলো। আজকাল শহরের ধারেকাছে বা ব্যস্ত বাসরাস্তার ধারের গ্রামদেশের দোকানীরাও আর 'বাবু' বলে না, বলে 'স্যার'।

—"গেলাসেই দিন। আমার দরকার চা।'

দোকানী চমকে ওর দিকে তাকালো। ও সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সের যুবক। দোকানীর চোখে প্রশ্নের ইশারা। এমন সময় একটা দমকা হাওয়া মাঠের মধ্য থেকে উঠে রাস্তা ধরে ঘুরপাক খেতে খেতে শহরের দিকে চলে গেলো। হাওয়াটা চায়ের দোকানের সামনে খানিকটা ধুলোর চক্কর তৈরি করে পাক খেলো। দোকানী উমানাথের চা তৈরিতে ব্যস্ত হলো।

দোকানী চা করতে করতে গুন্‌গুন্ করে যাচ্ছে। চামচ, গেলাস, ছাঁকনি—কোন কিছুই সে স্বাভাবিকভাবে ধরতে পারে না। আঙুলগুলোতে কেমন পঙ্গুত্বের লক্ষণ অথচ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। উমানাথের মনে আলাপের ইচ্ছে। এখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ, যাত্রাশেষের স্বস্তি ওকে উদার করে দিতে চাইছে। ও আলাপ জমাবার ভঙ্গিতে বললো—"নিত্যানন্দ কি আপনার নাম?"

দোকানীর মুখ তুলে তাকানোর ভঙ্গিতে চমকানোর লক্ষণ। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। একটা টান টান ভাব। এক মুহূর্ত। তারপর ফিরে এলো তার মুখের স্মিত হাসি। নিকট জনের মত করে বললো—"ঠিক ধরেছেন স্যার। তবে সবাই ডাকে নিতে বাউল।"

—"আপনি কি বাউল গান করেন নাকি?"

—"একটু-আধটু গাই স্যার।" একটু থেমে পাল্টা প্রশ্ন করলো— "আপনি এই কলেজে এসেছেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ।"

—"পড়াবেন?"

—"হ্যাঁ। ইংরিজি।" শেষ শব্দটার মধ্যে গর্বের আভাস।

দোকানী আরেকবার উমানাথের মুখের দিকে তাকালো। কোন কথা না বলে ওকে চা এগিয়ে দিলো। ও নিজের কথা হারিয়ে ফেলেছে। চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজের টান দিলো। আদিবাসী খদ্দের দুজন দাম মিটিয়ে চলে গেলো। এখন রাস্তায় একজন দু'জন করে লোক চলাচল বাড়ছে। ও চায়ের দাম মিটিয়ে ব্যাগ আর অ্যাটাশে তুলে নিত্যানন্দকে বললো—"চলি। আপনার এখানে কিন্তু চা খেতে আসবো!"

দোকানী মুখে কিছুই বললো না। ওর ঠোঁটের স্মিত হাসি কি এক গূঢ় অর্থ নিয়ে একটু প্রসারিত হলো।

কলেজে যোগ দেওয়ার পর উমানাথ রোজই দিনে একবার বা দু'বার নিত্যানন্দের দোকানে আসে। টুকটাক নানান কথা হয়। দোকানী কখনও পুরো কখনও দু-চার কলি গান শোনায়। সেটা ওরই আগ্রহে। কথা বলতে গিয়ে উমানাথ দেখেছে নিত্যানন্দ খবর রাখে প্রচুর। সব কিছুরই ব্যাখ্যা, বিচার, বিশ্লেষণে তার গভীরতা আছে, নিজস্বতা আছে। এটা ওকে ধাক্কা দেয়। ও অবাক হয়ে ভাবে গ্রামের দেশের মানুষ কত এগিয়ে গেছে। এখানে এসে বুঝতে পেরেছে কলকাতার মানুষের কাছে গ্রামের চেহারা এখনও পঞ্চাশ সাল পেরোয়নি।

নিত্যানন্দের দোকানে চা খেতে এসে উমানাথ লক্ষ্য করেছে ওর সহকর্মীরা কেউ সেখানে কখনও আসে না। ছাত্রদের কেউ কেউ মাঝে-মধ্যে এসে ওকে দেখে আর বসে না, চলে যায়। গ্রামের লোকদের মধ্যে খুব গরিব বা আদিবাসীরাই ওর খদ্দের। অন্যরা যেন এড়িয়ে চলে। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক। অথচ লোকটা ভালো। ওর মনে হয়েছে তার শুধু বাইরের ব্যবহারটাই মধুর তা নয়, মনটাও পরিচ্ছন্ন। আবেগ আর আবেদনে শিল্পীসুলভ। তার একটা প্রেমিক মন আছে। তাহলে নিত্যানন্দ সবাইকে কেন টানে না?

এ প্রশ্নের উত্তর ক'দিনের মধ্যেই পেলো। কলেজে বাংলার সুধাসিন্ধু ওর রুমমেট। সে এই জেলারই লোক। অন্য মহকুমা থেকে এসেছে। প্রায় দিনই রাতের বেলা ওরা হোস্টেলের ছাদে গিয়ে বসে। তারাভরা আকাশ দেখে। দূরের গাছপালার ঝুপঝুপি অন্ধকার আর এলিয়ে-থাকা মাঠের দিকে তাকিয়ে ওদের একজন গান গেয়ে ওঠে, অন্যজন চুপচাপ শোনে বা তাল ঠোকে। কবিতা, সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে কথা বলে। সুধাসিন্ধু বড়, বিবাহিত। ক'দিনেই ওদের সম্পর্ক জমে গেছে।

একদিন ছাদে বসে সুধাসিন্ধু হঠাৎই প্রশ্ন করলো—"আপনি কি কোন রাজনীতি করেন?"

উমানাথ হকচকিয়ে বললো —"না তো!" তারপর সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো—"এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

—"নিতে বাউলের দোকানে আপনার যাতায়াত নিয়ে কথা উঠেছে। ওর দোকানে কেউ যায় না।"

—"কেন?"

—"কেন।" সুধাসিন্ধু কেমন এক নিগূঢ় অর্থ আরোপ করে কথাটা বললো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো—"নিতেকে এখানকার ভদ্রলোকেরা ভালো চোখে দেখে না। শুনেছি খুব বিপজ্জনক লোক। জেল-হাজত ফেরত।"

—"জেল-হাজতে গেছে? ও কি ক্রিমিনাল?"

—"না।"

—"তবে?"

—"নকশাল।"

উমানাথ আর খুঁটিয়ে জানতে চাইলো না। সুধাসিন্ধু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে বললো—"আপনার তো একেবারে নতুন চাকরি। এখুনি ঝুঁকি না নিলেই ভালো।"

উমানাথের ভেতর থেকে একটা প্রতিবাদ বেরিয়ে আসতে চাইছিলো—না না মশাই, আমি রাজনীতিতে নেই। কিন্তু ওর মুখ ফুটে কিছু বেরোলো না। অথচ ভেতরে সুধাসিন্ধুর ভুল ধারণাকে ঘিরে অস্বস্তি থেকে গেলো।

সহকর্মীর সতর্কবাণী সত্ত্বেও উমানাথ নিত্যানন্দের চায়ের দোকান যাওয়া বন্ধ করেনি। তার জন্য কোনো ঝামেলার সম্মুখীন ওকে হতে হয়নি। শুধুমাত্র কলেজের গোটা কয়েক ছেলের আচরণে কেমন নিজের মানুষ বলে মনে করার ভাব। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ও নিত্যানন্দের দোকানেও দেখেছে।

উমানাথের আলোড়নহীন দিন যায়। সপ্তাহের শেষ তিন দিন সাধারণত ওর কোন ক্লাস থাকে না। তখন কলকাতায় চলে যায়। কফি হাউস, উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক আর নীতার সান্নিধ্য নিত্যানন্দকে আবছা করে দেয়। ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে আসে। ছুটি পড়বে শনিবার থেকে। তাই এ সপ্তাহে উমানাথকে শুক্রবার অবধি থেকে যেতে হবে। ওর অবশ্য মতলব আছে ম্যানেজ করে শুক্রবার সকালেই কেটে পড়ার।

এবার গরমটা প্রথম থেকেই গা-জ্বালানো। গত কদিন ধরে বিকেলের দিকে আকাশ ঢেকে মেঘ আসছে। বৃষ্টি হচ্ছে না। ঝোড়ো হাওয়া উঠে তাড়িয়ে দেয়। বুধবার মেঘটা বেশ জমেই রইলো। হাওয়ার জোরে ভেসে গেলো না। আগে-ভাগেই কলেজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে এ কদিন। হোস্টেলে সুধাসিন্ধুও নেই। এই মেঘলা দিন ওর মনকে বাইরে টানতে লাগলো। উমানাথ গুটিগুটি হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলো।

খোলা জায়গায় এসে ওর মন সত্যিই ময়ূরের মতো নেচে উঠলো। চারধারে গাছের মগডালগুলো অন্য দিন ঝেড়ো হাওয়ার মাতনে কি যে করতে থাকে! আজ তারা ধীর মন্থর লয়ে পায়ে নাচের ছন্দ তুলে দু-হাত বাড়িয়ে আঁজলা ভরে পানি চাইছে। নিচে মাটি যেখানে ঘাসে ঢাকা সেখানে দূর্বাদল উন্মুখ তাকিয়ে আছে কখন বৃষ্টিধারাকে স্বাগত জানিয়ে মাথা নোয়াবে। আর যেখানে মাটি উদোম সেখানে তার প্রতিটি রোমকূপ হাঁ করে আছে কতক্ষণে বৃষ্টির শেষ ফোঁটাটুকুও টেনে নেবে কোন অতলে।

উমানাথের ইচ্ছা নিরাবরণ প্রকৃতির বিস্তারের মাঝে বছরের প্রথম ঘনঘটাকে বরণ করার। কিন্তু শেষ অবধি সাহস হলো না। শহুরে ভয় ধরে গেলো। প্রথম বৃষ্টির জলে শরীর খারাপ হতে পারে। তবু, বৃষ্টিটাকে যতদূর কাছ থেকে উপভোগ করা যায়। চলতে চলতে কলেজের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। এমন সময় চড়বড়িয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করলো। ও প্রবৃত্তিবশে কাছাকাছি আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়ে নিত্যানন্দের দোকানে এসে হাজির হলো। দোকান ফাঁকা। একা দোকানী তার জায়গায় বসে সামান্য আওয়াজ করে সুর ভাঁজছে। ওকে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো—"এই বর্ষার মধ্যেও বেরিয়ে পড়েছেন স্যার?"

উমানাথ পাল্টা প্রশ্ন করলো—"গান বন্ধ করলেন কেন?"

—"গাইছিলাম না। সময় কাটাবার জন্য সুর ভাঁজছিলাম। আপনি এলেন, দুটো কথা বলি। চা খাবেন তো?"

—"হ্যাঁ। বৃষ্টিটা খুব সুন্দর লাগছে, না।"

বৃষ্টির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে-থাকা উমানাথের মুখ থেকে উচ্ছ্বসিত শব্দগুলি শুনে নিতে বাউল স্নেহের চোখে তাকে একবার দেখলো। চা বসিয়ে দিলো। নিতে আজ কেমন উদাস। সব কিছুই করছে বড় মন্থরভাবে। তেমনি ধীর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলো,

—"স্যার কি গান বাঁধেন?"

—"না,না। আপনার হঠাৎ এরকম মনে হলো কেন?"

—"আপনার মধ্যে একটা বাউল আছে কি না! সুন্দর দেখলেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।"

নিত্যানন্দের কথার বাঁধুনিতে উমানাথ আবার চমকে উঠলো। এই মানুষটা এমন কথা শিখলো কোথায়? ও কৌতূহল দমন করতে পারলো না। ও জিজ্ঞাসা করলো,

—"আপনি কি বরাবরই এই চায়ের দোকান চালাচ্ছেন?"

ততক্ষণে চা হয়ে গেছে। গরম জলে একটা গ্লাস ভাল করে ধুয়ে প্রায় ভর্তি করে এগিয়ে দিলো ওর দিকে। আরেকটা গ্লাস ভরে নিলো নিজে। উমানাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে দোকানী হেসে বললো—"এটা কারবারের চা নয় স্যার। আমার অতিথি আপ্যায়ন।"

চুমুক দিয়ে টের পেলো চা-টা হয়েছেও অন্য দিনের তুলনায় অনেক ভালো। প্রশংসা করবে বলে দোকানীর দিকে তাকাতে উমানাথ দেখলো সে সামনের দিগন্তবিস্তারী মাঠ গাছপালা আর গ্রামের বুকে নেমে-আসা বাদলের ধারায় হারিয়ে গেছে। জলে ধোয়া কালো পিচের রাস্তা সুনসান। ঢেলে দেবার এক আকুল আবেগ চরাচরে। উমানাথের মনে হলো—অনেকগুলো কবিতা শুনলে এখন ভাল লাগবে।

এমন সময় কোন এক দূর থেকে নিত্যানন্দের গলার সুর ভেসে এলো—"অনেক কথা শুনেছেন, না স্যার। অথচ আমার কথা কত আলাদা।"

উমানাথ উৎকর্ণ হলো।

নিত্যানন্দের দেশ হুগলী জেলায়। ছোট বয়স থেকেই ওর স্বভাব ছন্নছাড়া। ঘরে মন নেই। খালি মাঠ, বাদার, নদী ওকে টানে। গান গাইতে গাইতে কোন বাউল গাঁয়ে এলে তার পিছু পিছু ও কত দিন কত দূরে কোথায় চলে গেছে। তার জন্য বাড়ি ফিরে কত দিন বাপের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছে। বাপ কেষ্টদাস গাঁয়ে মুদি দোকান চালাতো। সামান্য বিক্রি। তায় ধার বাকি। তবু নিত্যানন্দ হাইস্কুলে ক্লাস এইট অবধি উঠেছে। তারপরেই বাবা মারা গেলো, আর বাড়ির কর্তা হলো দাদা। দোকানে বসা নিয়ে মারধোর। একদিন এক বাউলের সঙ্গে ঘরছাড়া হয়ে গেলো সে। পথে ঘাটে বাউলের ডেরায় তার সঙ্গে থেকে গান শিখলো। হয়ে গেলো নিতে বাউল।

—"জানেন স্যার, ছোট বয়স থেকে সব কিছুই সুন্দর দেখতে চাইতো আমার মন। এখন বুঝি কেন ওরকম মাঠ, বাদার, নদীর ধারে ছুটে ছুটে যেতাম। মানুষের সংসার, ধর্ম আমাকে টানতো না। স্পষ্ট করে বুঝতাম না তবু মনে হতো ওর মধ্যে বড্ড নোংরামি। কিন্তু আমার গুরু নবনী বাউল চোখ খুলে দিলো। মানুষের চেয়ে সুন্দর জিনিস আর নেই। তার জীবন সব সময় কাদা-মাখানো কিন্তু ধুয়ে পুঁছে নিলে সোনার মূর্তি বেরিয়ে পড়ে।"

গুরু নবনীদাসের এই শিক্ষা নিত্যানন্দকে আবার পথে টেনে নিলো। ঘুরতে ঘুরতে ও পৌঁছালো মেদিনীপুরের এক আদিবাসী গাঁয়ে। সেখানে ওর ঠাঁই হলো।

—"পথে পথে গান গেয়ে পাওয়া পয়সা থেকে হাতে কিছু জমেছিলো। তাই দিয়ে গাঁয়ের কাছাকাছি গঞ্জে ছোট একটা চায়ের দোকান দিলাম। সেটা হলো আমার ডেরা। গুরুর সেবা করতে গিয়ে চা বানাবার হাত হয়ে গিয়েছিলো খাসা। ফলে আমার দোকান জমে উঠতে সময় নিলো না।"

সেই প্রথম জীবনে থিতু হলো নিত্যানন্দ। কারবার করে, গান গায়। গঞ্জে-আসা গাঁয়ের মেয়ে-মদ্দ ওর দোকানে দল বেঁধে চা খায়। বাবুদের ভিড় নেই। ভিড় নেই আদিবাসীদের ছোট নজরে যারা দেখে তাদের। সে এতে খুশি। গতরখাটা মানুষগুলো মনে সুন্দর। প্যাঁচ-ঘোঁচ কম।

—"এমনি করেই হয়তো আমার জীবন চলে যেতো স্যার। হয়তো বিয়ে করে নিতাম আদিবাসী মেয়ে লক্ষ্মীকে। কিন্তু হলো না। ঐ আদিবাসী অঞ্চলে একদিন আপনার মতোই পড়াশুনা-জানা কিছু ছেলে এলো। তাদের কথায় আর চোখে স্বপ্ন। ভালো করে ডানা গড়ে ওঠার আগেই পাখা মেলে উড়তে চায়। স্যাঁতসেতে ভিজে কাঠে একবারেই আগুন ধরাতে চায়। অথচ ছেলেগুলো কী সুন্দর! ওদের কথায় আমার মনে হলো—সত্যিই তো মানুষের জীবন সুন্দর করার কাজের চেয়ে বড় বাউলপনা তো আর কিছুই নয়। মানুষ দেখে বলেই চারিদিকের এত লীলার এত বন্দর। আমার গুরু নবনীদাসও তো এই একই মানুষকে সুন্দর দেখার সাধনা করেছে। আমি ওদের কাজে লেগে গেলাম।"

নিত্যানন্দের দোকান হলো ঐ ছেলেদের যোগাযোগের ঘাঁটি। খুব শিগগিরই ঐ অঞ্চলে মানুষে মানুষে ভাগাভাগি হলো। যাদের জমি-জিরেত নেই তারা একদিকে, আরেক দিকে বেশি আছে যাদের তারা। এদের ওপর ওদের হামলা, ঘর জ্বালানো, বাড়ি জ্বালানো, লুঠ, খুনখারাপি হতে লাগলো। শান্ত, নির্জীব, নিজেদের নিয়ে থাকা আদিবাসীদের কালো শরীরে হঠাৎ যেন হাজার হাজার শিমূল আর কৃষ্ণচূড়া ফুটে উঠে আগুন রঙে রাঙিয়ে দিলো মাঠ পাথার বন জঙ্গল। ঐ ছেলেগুলো তাদের রক্তে যে নেশা ধরালো সে তো এক আদিম নেশা। জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলার নেশা।

কিন্তু যাদের সম্পত্তি থাকে তাদের সহায় থাকে। গ্রামে পুলিস পাহারা বসলো। তাতে লড়াই আর লড়াইয়ের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। পুলিসের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। ছেলেগুলো আর ওদের দলের গরিব-গুর্বোদের হাতে সর্বসাকুল্যে দুটো কি তিনটে বন্দুক। ছেলেগুলো লুকিয়ে বেড়ায়। প্রথম রাতের অন্ধকারে নিত্যানন্দকে একজন খবর দিয়ে যায়, শেষ রাতের অন্ধকারে আরেকজন খবর নিয়ে যায়। ও তাদের সেতু।

"বুঝলেন স্যার, এ তো ধৈর্যের লড়াই। কারিগর কতদিন ধরে কত কষ্টে একটু একটু করে মূর্তি গড়ে বলুন! কিন্তু ছেলেগুলোকে সে কথা শেখায়নি কেউ। শেষ দিকে দেখেছি ওরা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে।"

এমনি এক সময়ে একদিন পুলিস এসে নিত্যানন্দকে ধরে নিয়ে গেলো। গারদে সেই ছেলেদের অনেককেই সে দেখতে পেলো। তাদের কেউ কেউ কেমন বিভ্রান্ত, স্বপ্নহারা। বেঁচে থাকার তাগিদে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। আবার অনেকে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—"পুলিস আমাকে স্যার ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলো। পারেনি। তাই রাগে ওরা আমার হাত-পায়ের প্রতিটি গাঁট ভেঙে দিয়েছে। আমাকে ঐ অঞ্চলে আর ঢুকতে দেয়নি। এখানেও কারা যেন থাকতে দিতে চায় না। এখন আর গুপীযন্ত্র হাতে নিতে পারি না। তবু স্যার খালি গলায় গান গাই। আর ঐ যে ছেলেগুলো স্বপ্ন দেখিয়েছিলো তাদের কথা বারবার ভাবি আর বসে থাকি আবার যদি সেরকম স্বপ্ন দেখা যায়।"

নিত্যানন্দের গলায় বিষাদ আর প্রত্যাশার এক সুতীব্র সুরের রেশ মিটতে না মিটতে বাইরে কড়্‌কড়্ করে বাজ পড়ার আওয়াজ হলো। আকাশ থেকে জল নামার শব্দ আরো প্রবল। একটা দমকা ঝড়ের মাতনে গাছপালা উদ্দাম। উমানাথ নিঃশব্দে নিতে বাউলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাহাদুরের বাজনা

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

এই নিয়ে পর পর তিন দিন। ঠিক একই সময়ে একই রকম অদ্ভুত বিস্ময়কর এই ব্যাপারটা ঘটছে। রোদটা একটু পড়ে এলে, বিকেলের দিকে ঠিক যখন পেছনের চড়াইটার সবচেয়ে লম্বা ইউক্যালিপটাসের ছায়াটা আমাদের বাংলো টপকে চলে যায়— সেই তখন থেকেই ভারি মিষ্টি গা-জুড়োনো একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করে। সন্ধ্যা নামে হিসেব করে তার ঠিক একটু পরেই। ঠিক নামে না —বলা যায় ওপর থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে যেন। সেই সময়ে বেড়াতে বেরোনো এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ আমাদের। আমাদের বাংলোটাই যথেষ্ট উচুঁতে, পাহাড়ের মাঝামাঝি—কিন্তু আরো ওপরে এই পাহাড়ের চূড়ার প্রায় কাছাকাছি, যেখানে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সঙ্গীহীন ইউক্যালিপটাস, তারই পাশে ওই গাছটারই মতো অদ্ভুত একটা বাড়ি। একেবারে একা। বিকেলে বেরিয়েই আজ আমরা ঠিক করলাম, ওখানে যেতে হবে— ওই বাড়ির সঙ্গে দেখা করতে। লোকজন নেই— এ রকম আশ্চর্য নির্জনতায় একটা অদ্ভুত বৃক্ষ আর ওই শব্দহীন আবাস কার জন্য কতকাল ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে? এখানে আসার পর থেকে এই নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে, হাঁফিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে সেখানে পৌঁছে ঘুরে-ফিরে দেখেও কৌতূহল যেমন ছিল তেমনই রইল। ফেরার সময়ে অকারণ গাছটার দু'একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এলাম আমরা। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। রান্না শেষ করে কাজ গুছিয়ে, ততক্ষণে আমাদের বেয়ারা-কাম-কুক ফিরে গেছে। বাড়ি ঢুকে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়েই আর দেরি করিনি। বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেছি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

....কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। অকস্মাৎ পিঠের কাছে আঙুলের খোঁচা লেগে আমার ঘুম ভাঙল। প্রায় কানের খাছে স্বাতির ফিশফিশানি শুনতে পেলাম— এই, এই, শুনছ— এই যে, শোনো....। কী হল—বলতে বলতে চোখ খুলে তাকিয়েই আমি সজাগ হলাম। এবং বুঝতে পারলাম স্বাতি ভুল বলেনি। বাঁ হাতের রিস্টওয়াচ জানিয়ে দিল এখন বারোটা। গতকালও ঠিক এই সময়ে আমায় জাগিয়েছিল স্বাতি। এবং তার আগের দিনও। প্রথম দিন গভীর রাত্রে ঘুম-ঘুম চোখে এই অদ্ভুত সীমাহীন নির্জনতায় স্ত্রীর শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের লোভ আমি ছাড়তে পারিনি— এত রাত্রে এই রকম অদ্ভুত মিষ্টি শব্দের ডাকে তোমার ঘুম ভাঙে— স্বাতি, তুমি কী সাহসে আমাকে জাগালে? স্বাতি ভ্রু-ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিল।

এবং আজও ঠিক ওই একই রকম শব্দে শুনতে পেলাম। ঠিক শব্দ নয়, তরঙ্গ একটা। বিছানা ছেড়ে দ্রুতপায়ে আমি জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম এবং গত দু'দিনে যা দেখেছি. আজও তার ব্যতিক্রম হল না। জানলার বাইরে, এই বাড়ির সামনের দিকে খোলা মাঠের মতো একটুখানি জায়গা। সেখানে ঘাস নেই। দু'-একটা ছোটোখাটো ঝোপঝাপ এদিক-ওদিক। সেটুকু পেরিয়ে গেলে ওপাশে নানারকম গাছগাছালি মিলিয়ে একটা আধা-জঙ্গল

গোছের জায়গা। আয়তনে সেটা খুব বড়ো নয়। তারপর বসতি। মানে, এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো খাপরার চালের ঘর কতকগুলো। পাহাড়ের গা কেটে একটা বিস্তীর্ণ জায়গা ঘর বানানোর উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা বলে জংলাপাড়া। নিচের শহরে যারা থাকে তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। মধ্যবিত্ত অফিসের কেরানি। ছোটোখাটো কিছু দোকানদার, অল্পস্বল্প কিছু জমি আছে— এমন সব লোক। সেইসব বাড়িতে প্রয়োজন হলে গতর খাটার কাজ করে এরা, এই জংলাপাড়ার লোকজন। ওদেরই মধ্যে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে কেমন করে জানি না গড়ে উঠেছে এই বাংলো। সরকারি কাজে, বনবিভাগের জরিপ বা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার কাজে অফিসাররা শহর থেকে এলে এখানে থেকে যান দু'-এক দিন। তাঁদের দেখাশোনার জন্যেও লোক আসে ওইখান থেকে। গণ্যমান্য অতিথিদের আব্রু রাখার জন্যই বোধ হয় মাঝখানের ওই জঙ্গল। তার এদিকে আমরা, ওদিকে ওরা।

জানলায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পেলাম এবার। ওখান থেকেই ভেসে আসছে একটা মৃদু শব্দ। অদ্ভুত বিচিত্র তালের টুংটাং আওয়াজ একটা। সুর বোঝা যায় না। কিন্তু ভালো লাগে। শুনতে ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে। জঙ্গলটুকু পেরিয়ে যে ছোটো ছোটো প্রায় ভেঙে-পড়া খাপরার চালের ঘরগুলো তার প্রথমটায় কেউ থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয়টা আমাদের চেনা। কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছিল। জানলা থেকে সরে এসে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, স্বাতি বিছানা ছেড়ে এসে হাত ধরল— কোথায় যাচ্ছ?

এক মুহূর্ত তাকিয়ে আমি বললাম— দেখি...

— না।

— তুমিও চলো-না...

স্বাতি চুপ। বাইরের নির্জন অন্ধকার ভেদ করে গভীর রাত্রের উদাসীন পর্যটকের মতো বাতাস বইছে। অজস্র গাছ থেকে ঝরে-যাওয়া শুকনো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে পাহাড়ের উঁচু মাথা থেকে। বাতাসের সেই অদ্ভুত ঘূর্ণিজাল ভেদ করে কেটে কেটে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে রহস্যময় একটা অদ্ভুত সুর। স্বাতির হাত আলগা হয়ে এল। মুখ তুলে মৃদু স্বরে বলল— চলো।

এখানে আসার পর দেখতে দেখতে পাঁচদিন পার হয়ে গেল। নিছক বেড়াতেই আসা বলা যায়। স্বাতির স্বাস্থ্য উদ্ধারও একটা কারণ। প্রথম যেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আমি ঘোষণা করলাম— আর কেউ আটকাতে পারল না, বেড়াতে যাচ্ছিই এবার। স্বাতি অবাক দু'চোখ বড়ো বড়ো করে মেলে ভ্রু কুঁচকে জানতে চেয়েছিল— কে? কে বেড়াতে যাচ্ছে?

— শ্রীমতী স্বাতী।

ছোট্টো করে হেসে আমার স্ত্রী কপট মমতায় বলেছিল——ইস্, কাজের চাপে তোমার মাথাটাই যাচ্ছে খারাপ হয়ে—সন্ধ্যেবেলায় ভুল বকছ। একটু শুয়ে বিশ্রাম নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। বেসরকারি সংস্থাগুলো সব ব্যাপারেই দেখছি সরকারের চেয়ে বেশি দক্ষতা দেখায়, পটু হয়—এমনকী স্তোকবাক্যেও...।

অনেক সময় লাগল স্বাতিকে বোঝাতে যে এবার আর নিছক স্তোকবাক্য নয়। সত্যি সত্যি বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। এবং তারপর পরবর্তী সমস্যা। কোথায় যাচ্ছি, জায়গার নাম কী——এসব প্রশ্নের জবাবে প্রথমে আমি কিছু বলতে চাইনি। চাইনি, কারণ জায়গার নামটা মোটেই বিখ্যাত বা লোভনীয় নয়। কিন্তু জায়গাটা নির্জন এবং ভালো। ভালো মানে চোখ কান ও মনের পক্ষে আরামের। খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করে আমি বলেছিলাম—

আসলে ডিমাপুর থেকে...। ব্যস্! মুহূর্তের মধ্যে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল স্বাতি—কী? কী বললে— কী পুর...

আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত অমিতাভ গুপ্ত। অফিস থেকে ফেরার পথে চৌরঙ্গিতে মিছিলে রাস্তা বন্ধ। বাস ট্রাম ট্যাক্সি নানা ধরনের গাড়ি সব মিলিয়ে বিরাট জট একটা। আমাদের দেশে মোট সমস্যা কত এবং সপ্তাহে অন্তত একটা করেও যদি সমাধান করা যায়, তাহলেও কত বছর লাগে সবটা মিটতে—এইসব গুরুত্বপূর্ণ কথা একা একা ভাবতে ভাবতে আমি পা ফেলছিলাম। অকস্মাৎ আমার সামনে একটা গাড়ির দরজা সশব্দে খুলে গেল এবং তা থেকে বেরিয়ে এল লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারার একজন পুরুষ। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। চিনতে দেরি হল না। অমিতাভ গুপ্ত। পুরোনো অভ্যেস। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাড়া ও কথা বলত না। পিঠের ওপর দারুণ একখানা চাপড় মেরে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল—তুই! এখন কলকাতায়? রাস্তার ভিড়ে দাঁড়িয়ে অতঃপর অমিতাভ আর আমি দশ বছরের অতীতের ওপর দিয়ে বার কয়েক দ্রুত হেঁটে গেলাম ও ফিরে এলাম। স্বাতির খবর দিলাম। ও দিল আমন্ত্রণ। এবং ঠিক হয়ে গেল কয়েকদিন ছুটি নিয়ে আমরা বেড়াতে যাব ওর ওখানে। ডিমাপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল উত্তরে এক পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে অমিতাভ আসাম সরকারের ফরেস্ট অফিসার। আমাকে বলল, কাজের চাপে ওকে হামেশাই ঘুরে বেড়াতে হয় এদিক-ওদিক। কিন্তু আমাদের অসুবিধে হবে না। থাকার জন্য মনের মতো একটা বাংলো আর কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দেবে ও-ই।

দরজার খিল খুলে রাস্তায় পা দিলাম আমরা। স্বাতি দ্রুতপায়ে গিয়ে টর্চটা নিয়ে এল। কোনো শব্দ না করে আলতো করে দরজার পাল্লা টেনে দিল। যেন কারুর ঘুম ভেঙে যাবে। সামনের মাঠটুকু পেরোলেই সেই জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পা টিপে টিপে সেই অদ্ভুত রাত্রির আবছা আলোয় সেই পথ ধরে আমরা এগোলাম। আওয়াজটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছিল। অপূর্ব একটা ঝংকার। চেনা কোনো বাজনা নয়। কীসের আওয়াজ কিছুতেই বুঝতে পারছি না—এই রহস্যময় শিল্পীই বা কে? তাও বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় সম্মোহিতের মতো আমরা এগিয়ে গেলাম। ভাঙা ঘরটা কীরকম অসহায়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়। তা থেকে সামান্য একটু এগিয়েই সেই সুর। কোথাও একটুও আলো নেই। অন্ধকারে, আবছায়ার মধ্যে শুধু বিচিত্র একটা সুর ভেসে আসছে মাটির দেয়াল দেওয়া কোনোরকমে দাঁড়ানো ওই ভুতুড়ে ঘর থেকে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এবং তারপরই অবাক বিস্ময়ে সেই আধখোলা কাঠের পাল্লার ভেতরে দৃষ্টি চালিয়ে যা দেখতে পেলাম, তা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। আমাদের দিকে পেছন ফিরে ছেঁড়া কী যেন একটা মেঝেতে বিছিয়ে বসে আছে বাহাদুর। তার সামনে ছোটো হাঁড়ির মতো কী যেন একটা। বাহাদুরের মোটা মোটা আঙুল সেটারই মুখে লাগানো তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই অদ্ভুত শব্দতরঙ্গ তুলছে। স্বাতি কী যেন বলতে যাচ্ছিল....ঠোঁটে আঙুল রেখে আমি ওকে থামালাম।

অমিতাভ ভাবছিল স্টেশনে থাকবে। আমরা ভোরবেলা যখন নামলাম, সূর্য সবে উঠেছে। একটু একটু আলো চারদিকে। আমাদের কামরাটা ছিল পেছনের দিকে। ট্রেন ছেড়ে যাবার পর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, স্টেশনের ওই প্রান্ত থেকে অমিতাভর ভরাট গলার আওয়াজ

ভেসে এল— বউদি—। অমিতাভ হাত নাড়ল। তারপর দ্রুত এগিয়ে এল। একমুখ হেসে বলল— বউদি, আসুন। ওর জীপে চড়ে বসলাম আমরা। এখানে পৌঁছোলাম প্রায় ন'টায়। সমতল রাস্তায় বেশ কিছুটা পথ গিয়ে অমিতাভর গাড়ি পাহাড়ি পথ ধরল। আসার পথে অমিতাভ আমাদের জায়গাটা চিনিয়ে দিচ্ছিল। নানারকম গাছ, পাখি দেখিয়ে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। স্বাতির মুখে কৌতুক। বাড়িতে পৌঁছেই অমিতাভ বলল, একটা জরুরি কাজে তাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে অফিসে। পরে এসে দেখা করবে। আমাদের জানাল— কোনো অসুবিধে হবে না, সব ঠিক করা আছে। তারপর কী যেন ভেবে দু'পা এগিয়ে গিয়ে দু'হাত মুখের কাছে তুলে চিৎকার করল— বাহাদুর— বাহাদুর...।

কাকে ডাকছিস, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোর সামনে তো মাঠ আর তারপরে জঙ্গল। অমিতাভ জবাব দিল না, হাসল। স্বাতিকে বলল— বউদি, ওইদিকে রান্নাঘর, জিনিসপত্রের সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের সরু পথের ওপর দিয়ে একটা মূর্তিকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। লম্বায় একটু খাটো, শক্ত গড়নের একটা ছেলে— পরনে একটা খাকি হাফ-প্যান্ট, আর একটা গেনজি। দু-এক মিনিটেই বাহাদুর কাছে এসে দাঁড়াল। অমিতাভ বলল— বাহাদুর, এই সাহেব মেমসাহেব কয়েকদিন এখানে থাকবেন, তুমি দেখাশোনা করবে।

— জি— ।

ব্যস, আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অমিতাভ। দৌড়ে গিয়ে জিপে উঠেই স্টার্ট দিল। মুখ বাড়িয়ে বলল— পরে আসব।

বাহাদুর ঘরের ঠিক সামনেটায় দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ মাটিতে। অমিতাভর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে আমি ডাকলাম— বাহাদুর। এক মুহূর্তের জন্য সে মুখ তুলে তাকাল শুধু। তারপরই চোখ নামিয়ে নিল আবার। বেঁটেখাটো চেহারা। টান-টান পেশিতে জোয়ান। কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর মুখ আর চাউনি। যত্ন করে পাথরে খোদাই করা যেন। সারা মুখ জুড়ে বেশ কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন। কপালে খাঁজ, টান-টান চামড়ায় অনেক ঝড়ঝাপটার ছাপ। সবচেয়ে বিস্ময়কর তার দুটি চোখ। শীতল চাউনি নিয়ে যখন চোখ তুলে তাকায় বড়ো সরল মনে হয় ছেলেটাকে।

স্বাতি জিজ্ঞেস করল— বাহাদুর, তুমারা নাম কি বাহাদুরই হ্যায়, না অন্য কিছু? এমনি সবাই বাহাদুর বলে ডাকতা হ্যায়?

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বাহাদুরের মুখে কোনো ভাবান্তর হল না। চোখ মাটিতে রেখে সে বলল— জি।

স্বাতি সন্তুষ্ট হল না। বললে— জি? অ্যাঁ, জি কী?

আমি জিজ্ঞেস করলাম— বাহাদুর, তুমি বাংলা বোঝ তো?

— জি।

— তুমি আমাদের কাজটাজগুলো করে দেবে তো? কাজ আর কী? দু'বেলা রান্নাটা শুধু। এখানে বাজার-দোকান কোথায় সব জান তো?

— জি।

— তাহলে তুমি আমাদের একটু চা খাওয়াও...।

বাহাদুর মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে চলে গেল ওদিকে। স্বাতি ভ্রু কুঁচকে বলল— লোকটা যেন কেমন! না গো? যা-ই তুমি বল— সেই জি। যেন ভূ-ভারতে জি ছাড়া আর কোনো কথা নেই...।

আমি সকৌতুকে স্বাতিকে টেনে নিয়ে বললাম— জি।

বাহাদুরকে বিরক্ত করলাম না। সেই অদ্ভুত সুরঝংকার বাতাস কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ইথারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলতে থাকল। কালো পাথরের মূর্তির মতো পিঠ সোজা করে বসে বাহাদুর বিচিত্র নেশায় মগ্ন। আমরা ফিরে এলাম। স্বাতি বলল— কী অদ্ভুত— না?

পরদিন ভোরে বাহাদুর এসে দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিতেই দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকে এল ঘরের ভেতরে। বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে এক কাপ চা টেনে নিলাম, ডাকলাম— বাহাদুর। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল সে।

— বাহাদুর, রোজ রাত্রে একা একা তুমি যে বাজনা বাজাও, তা কোনোদিন বলনি তো।

— জি। বাহাদুর চোখ নামিয়ে নিল।

— তুমি কী বাজাও? কোনো গান? তোমাদের দেশের কোনো সুর? নাকি এমনিই...?

— জি।

— বাহাদুর, আজ বিকেলে আমরা তোমার বাড়ি যাব। দেখব তুমি কী দিয়ে বাজাও...।

— জি।

বাহাদুর শূন্য কাপডিশ নিয়ে চলে গেল। স্বাতি চেঁচিয়ে বলল—'বাহাদুর, রান্নার কাঠ ফুরিয়ে গেছে। নিচের বাজার তো বসবে সেই বিকেলে। কী হবে?' সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরে ঢুকল বাহাদুর। স্বাতি বলল— 'কাঠের একটু ব্যবস্থা না করলে তো খুব মুশকিল হবে।' যাকে বলা হল, সে মাটি থেকে চোখ তুলল না। বলল— 'জি'। বলেই বেরিয়ে গেল। স্বাতি মুখঝামটা দিয়ে বলল— ধ্যুৎ তেরি তোমার জি। কী হবে, কাঠ কোথা থেকে আসবে, কোথায় সেসব ব্যবস্থা করবে, তা না, যা-ই বল— সেই জি, জি আর জি।

আমি দাড়ি কামাবার উদ্যোগ করছিলাম। স্বাতিকে খেপালাম— সক্কালবেলা অত খাই খাই করছ কেন? তোমার মাথার গোলমাল আছে নিশ্চিত। রাত্তির জেগে সেতার শুনলে... সেই শিল্পীকে এখন বলছ কাঠ আনতে....।

স্বাতি রেগে আমাকে বালিশ ছুঁড়ল। বলল— ইস, সেতার না ছাই! হাঁড়ির মুখে গুচ্ছের তার বাঁধা! তার আবার শিল্পী!

আমি লক্ষ করলাম, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাতির মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। খানিক পরে বাইরের বারান্দায় চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। স্বাতির হাতে উল আর কাঁটা। চুপচাপ পেছনের দীর্ঘ গাছটার দিকে তাকিয়ে আমি নানা কথা ভাবছিলাম। স্বাতি হঠাৎ চেঁচাল— দেখো, দেখো। ঘুরে তাকালাম। একটু দূরের সেই জঙ্গল থেকে পাথরে কোঁদা মুখ নিয়ে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে-পড়া ভীষণ সরল চাউনির একটি মূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। পিঠে বিরাট একটা বস্তায় সদ্য-কাটা কাঠ, হাতে ধরা একটা কুড়ুল। বারান্দার কাছে এসে বোঝাটা নামিয়ে রেখেই খুব লজ্জিতভাবে তাকাল বাহাদুর। বললাম— এ কাঠ কোথায় পেলে বাহাদুর? কেটে আনলে নাকি জঙ্গল থেকে?

— জি। বলেই রান্নাঘরে ঢুকে গেল সে। আমাদের সকালের জলখাবার বানানো বাকি।

বিকেলে আমরা গেলাম বাহাদুরের সংসারে। সে বিশ্বাসই করেনি এ রকম একটা ব্যাপার ঘটবে। ব্যস্ত হয়ে উঠল আমাদের দেখেই। সকৌতুকে স্বাতি বলল— বাহাদুর, তোমার বাজনা শোনাও। বাহাদুর তাকাল না, নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল একইভাবে।

— কই শোনাও। স্বাতি অধৈর্য।

— বাহাদুর, তোমার বাজনা কই?

মুখটা তুলে ঘরের এক কোণে ভাঙা বাক্সের পেছনে রাখা একটা হাঁড়ির দিকে তাকাল বাহাদুর। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম— পুরোনো এই বাংলোরই ব্যবহার-করা একটা হাঁড়ি।

তার মুখের কানাতে অনেকগুলো ফুটো করে তার মধ্যে দিয়ে সরু সরু তার ঢোকানো। হাঁড়ির মধ্যে খানিকটা জল। এই ওর বাজনা। স্বাতি জিজ্ঞেস করল— এতে জল কেন?

— অভিজ্ঞতায় ও বুঝেছে জলের পরিমাণের কম-বেশিতে শব্দের মাধুর্য, গাম্ভীর্য, স্বরে ওঠা-নামা পালটায়।

যন্ত্র দেখে স্বাতি মোটেই খুশি হল না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। খুব যত্ন করে একটা একটা করে ফুটো করে এই তার ঢোকানো হয়েছে। বেঁধেছে খুব শক্ত করে। পরিত্যক্ত হাঁড়ি— কিন্তু এই বাজনাটির ওপর শিল্পীর মায়া-মমতা উপছে পড়ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— বাহাদুর, এ বাজনা তুমি নিজে তৈরি করেছ?

— জি।

— খুব সুন্দর। একটু বাজাও না। এসো।

বাহাদুর চোখ তুলল না। আমি আবার বললাম— রাত্রে ছাড়া তুমি বাজাও না, না?

— জি।

বাহাদুর আমাদের সঙ্গে এল। রাত্রের রান্না সেরে উঠল প্রায় ন'টায়। এবং তারপর চুপচাপ এসে দাঁড়াল আমাদের দরজায়। রোজ রাতেই যাবার আগে এইভাবে সে জানিয়ে যায়।

বাহাদুর চলে যাবার পর আমাদের খাবার পালা। স্বাতি বলল— তোমার বন্ধুর তো পাত্তাই নেই। একটু খোঁজ-টোজ নাও। এখানের দিন তো হয়ে এল। সত্যি কথা বলতে কী, অমিতাভর অফিস কোথায়, কেমন করে সেখানে যেতে হয় কিছুই আমার জানা নেই। আলতো করে আমি বললাম— দেখি।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় এসেও স্বাতি শুল না। আমি দু'-একবার বলাতে শুচ্ছি শোব করে কাটিয়ে দিল। এবং রোজকার মতো সেই রাতেও স্বাতি যখন আমাকে জাগাল আমি ঘুম-ঘুম স্বরে প্রথমটায় বললাম— জানি, বাহাদুরের বাজনা তো?

— না, না, শুধু তা-ই না— তুমি শোনো কান পেতে... শুধু বাহাদুর না...

— কী উলটোপালটা বকছ? আমি উঠে বসলাম। স্বাতি রীতিমতো উত্তেজিত। বলল— দেখো, আজ মনে হচ্ছে— একটা না, একসঙ্গে অনেকগুলো বাজনা বাজছে দূরে দূরে... মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। শোনো না...

— প্রতিধ্বনি। আমি বললাম, চতুর্দিকে পাহাড়, একটা উৎসের শব্দই মনে হয় চতুর্দিক থেকে আসছে...।

— না প্রতিধ্বনি নয়, অমিতাভ বলছিল— বউদি ঠিকই বলেছেন। এই পাড়ায় অল্পবিস্তর প্রায় সব ঘরেই রাত্রের দিকে ওই বাজনা বাজায় এরা। ভারি সুন্দর লাগে কিন্তু শুনতে।

ভোরবেলায় আমরা সবেমাত্র উঠে চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি, বাইরে জিপের আওয়াজ শোনা গেল। স্বাতি সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে অমিতাভকে নিয়ে এল।

ভেরি সরি বউদি, ভেরি সরি— বলতে বলতে অমিতাভ ঢুকেই চেঁচিয়ে বলল— বাহাদুর, চা। এবং তার কথা শেষ হবার আগেই চা নিয়ে ঢুকল বাহাদুর। 'ভালো আছ?' — অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে বাহাদুর মাথা নাড়ল।

নানান গল্পে গল্পে সকালটা কাটল আমাদের। বাহাদুরের রান্নার চাপ আজ বেশি। অমিতাভ প্রাণোচ্ছল পুরুষ, হাসিতে গল্পে হইচই করে আমাদের তিন জনের সময় সে একাই শেষ করে দিল। আমাদের এখানের মেয়াদ আর একদিন। কাল ভোরে অমিতাভর জিপ এসে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর স্বাতি বাহাদুরের সেই রহস্যময় বাজনার কথা অমিতাভকে জানাল। গতরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতেই অমিতাভ বলল, স্বাতি ঠিকই শুনেছে, তারপর বলল— ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্য। অনেক বছর আগে শোনা যায় এক

স্থানীয় জমিদারের আওতায় ছিল এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তোমাদের এই বাড়ির পেছনে পাহাড়ের ওপরের ওই পরিত্যক্ত বাড়িটাই এখনো তার সাক্ষ্য। জমিদারের দাপটে আশে-পাশের অনেক গ্রামের মানুষ মুখ বুজে সহ্য করত সবকিছু। এমনি একটা গ্রাম ওই জংলাপাড়া। আসলে ওরা যে কোথাকার মানুষ, এখন আর তা জানা মুশকিল— পাহাড়ি আদিবাসী হতে পারে— চেহারায় অনেকটা মঙ্গোলিয়ান ছাপ দেখতে পাবে। কিন্তু এই রীতি ওদের মধ্যে চলে আসছে অনেক বছর ধরে। এই সাংকেতিক বাজনা। সারাদিন মুখে রক্ত তুলে এরা মনিবের জন্য খাটত। প্রতিবাদ করার কোনো উপায় ছিল না। এমনকি, দিনের বেলায় ওদের নিজেদের মধ্যে কথাও বলতে দেওয়া হত না কোনোদিন। তাই এই অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের মধ্যে কথার আদান-প্রদান হত ওদের। গভীর রাতে ওদের একজনের হাতে তারের বাজনা বেজে ওঠে। সাড়া দেয় অন্য কেউ দূর কোনো প্রান্ত থেকে, ওই তারের বাজনা বাজিয়েই। এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে খবর, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। এই হল ওদের প্রস্তুতি। শেষ পর্যন্ত এই রকম প্রস্তুতি চলতে চলতে একদিন শেষ সংকেত বাজবে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে সবাই। এবং সমস্ত নীরবতা ভেঙে সদম্ভে ঘোষণা করবে নিজেদের। পাগলামি আর কী... অমিতাভ মন্তব্য করল।

কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। পরের দিন ভোরেই যদিও আমাদের চলে যেতে হবে, তবু সেই রাতে কিছুতেই তাড়াতাড়ি শোওয়া হল না। স্বাতি আজ বেশ গুছিয়ে বসল বাজনা শুনবে বলে। কিন্তু রাত গড়িয়ে গভীর হল, বাহাদুর নীরব। সে রাত্রে কোনো আওয়াজই এল না কোনোদিক থেকে। শেষ অবধি শুয়ে পড়লাম আমরা।

পরের দিন ভোরে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। অমিতাভ গাড়িতে বসেই চা খেল। সাড়ে আটটায় আমাদের ট্রেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা গাড়িতে উঠছি, তখনো বাহাদুরের দেখা নেই। এমন নয় যে বাহাদুরকে আসতেই হবে, তবু আমরা আশা করেছিলাম সে আসবেই। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে অমিতাভ বলল— বউদি, উঠে পড়ুন, আর দেরি করলে বিপদে পড়তে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্বাতিকে বললাম— চলো, যাওয়া যাক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বাতি গাড়িতে উঠে বসল। অমিতাভ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতেই, আমার চোখ পড়ল জঙ্গলের সেই সরু রাস্তায়। প্রায় ছুটতে ছুটতে ভোরের অন্ধকারের বুক চিরে একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে। এক হাতে একটা আলো, অন্য হাতে কী একটা জিনিস— এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না।

— স্বাতি, দেখো, দেখো— অমিতাভ দাঁড়া— আমি চিৎকার করে উঠলাম। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির কাছে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল বাহাদুর, হাতের লণ্ঠনটা রাখল মাটিতে। তারপর পাথরে খোদাই-করা সেই মুখ— ভীষণ সরল চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিল স্বাতির দিকে। তার দু'হাতে ধরা একটা হাঁড়ি, তার মুখে একটা একটা করে নিখুঁতভাবে অনেকগুলো তার জড়ানো।

— বাহাদুর, এ কী করেছ? এ আমরা কী করব? তুমি সারারাত আমাদের জন্য এই বাজনা তৈরি করেছ?

— জি।

বাহাদুরের দু'চোখে অসীম মিনতি। হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে হাঁড়িটা নিয়ে আমি স্বাতির হাতে তুলে দিলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে পেছন ফিরে ছোটোখাটো চেহারার একটা মানুষ হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে।

অনেকদিন হয়ে গেল, সেই বাজনা আজও আমার ঘরে সযত্নে তুলে রেখেছি। একেবারে ঘনিষ্ঠজন ছাড়া অন্য কারুর কাছে তা বার করিনি। এখনো মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে জানলার কাছে দাঁড়ালে সামনে সেই উদ্দাম আকাশের নিচে আবছা আলোয় আমি ঘাসহীন সাদা মাঠ দেখতে পাই। উত্তাল বাতাস কেটে কেটে কাঁপা-কাঁপা অদ্ভুত সুর ভেসে আসছে কোন্ সুদূর থেকে... বাহাদুর বাজনা বাজায়...

তারপর আস্তে আস্তে বাজনা মৃদু থেকে দ্রুত হয়... ক্রমশ অনেকগুলো বাজনার অজস্র ঝংকার ছেয়ে যায় আকাশে বাতাসে। স্পষ্ট বুঝতে পারি, শুধু বাহাদুর একা না— অজস্র, অসংখ্য বাহাদুর গোপনে নির্জনে এই এক সাংকেতিক বাজনা বাজিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। খবর পাঠাচ্ছে ঘর থেকে অন্য কোনো ঘরে। প্রস্তুতি চলছে, শেষ পর্যন্ত এক উৎসবের রাত্রিতে ঘর ছেড়ে বাইরে আসার...।

খুব যত্ন করে নিঃশব্দে আমি সেই বাজনার তারে হাত রাখি। স্বাতি ঘুমোয়। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে সেই পাথরে খোদাই মূর্তি ভীষণ সরল দুটি চোখ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়— ফিশফিশ করে বলি— আমি... আমি কি কোনোদিন সুর তুলতে পারব এই তারে... তোমার সংকেত ধরতে পারব কোনোদিন? খবর এলে জানতে পারব, পাঠাতে পারব অন্য কোথাও... কেউ কি কখনো উন্মুখ বসে থাকবে আমার সংকেতের প্রত্যাশায়... বাহাদুর, এ রকম কঠিন একটা দায়িত্ব কেন আমার ওপর চাপিয়ে দিলে তুমি...

রাক্ষসায়ন

বারিদবরণ চক্রবর্তী

নাটকীয় মুহূর্তটাই তাহলে শেষ অব্দি এল।

কম্পিউটর-স্ক্রিনে চোখ কি-বোর্ডে আঙুল রেখেই শমিত মজুমদার ঐশীর উপস্থিতিটা আন্দাজ করছিল, তবু মনোযোগের ভান নিয়েই অনড় হয়েছিল, কেননা তার তো উচ্চবাচ্য করার কিছু নেই—নিতান্তই তৃতীয় পক্ষ। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে ঘেরাটোপের দেওয়ালে বাতাসে রণিত হয়ে যে শব্দসংকেত তার কাছে পৌঁছেছে এবং যা থেকে সিদ্ধান্তটা টেনেছে, সবটাই ভুল, ওই যে কী বলে না! স্নেহাধিক্য অনিষ্টের আশঙ্কায় অনেক ক্ষেত্রেই তিলকে তাল করে নেয়।

ঐশীর গলা খসখস করে ওঠে,

'বাপি, চা খাবে?'

না ভুল নয়। স্বস্তির বাতাস টেনে ফুরফুরে হবার সুযোগ থাকে না শমিতের। গলার ওই খসখসানিটাই বলে দিচ্ছে সেও স্বস্তিতে নেই. যতই রোখা চোখা বস্তুবাদী হোক না কেন, যুক্তিতর্কের বুনোট নিয়ে নিজের নিবেদনকে উপস্থাপিত করার ভরসা পাচ্ছে না, তাই আলোচনার একটা মেদুর পরিবেশ রচনা করতে চাইছে।

কয়েক সেকেন্ড কোন কথা না বলে খুটখাট করে প্রোগ্রামটা 'সেভ' করে রিভলবিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে সরাসরি চোখ তুলে তাকায়।

'বসো। চা'এর দরকার নেই। কী বলতে এসেছ মন খুলে বলো। যেটুকু সিগন্যাল পেয়েছি তাতে তোমার আর রণিতের ব্যাপারটা নিয়ে কয়েকদিন আমি গভীরভাবে ভেবেছি— মন তৈরি হয়েই আছে, বলো।'

'না। মানে মা এখনও দু'মাসও হয়নি-- এ অবস্থায় আপনাকে নতুন করে বিব্রত করতে চাইছি না। কিন্তু জানেন এইভাবে আস্তে আস্তে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মানে অনেক ধরনের বেড়ি—মানে বুকের ভেতরে নানান ধরনের আর্দ্রতা—মানে, পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল একভাগ স্থল, আমাদের অস্তিত্বেও তেমনই সবসময়ে একটা কুলকুলে ভাব আছে না—মানে যদি প্লাবন এসে--'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় ঐশী। না দাঁড়ালে আবেগের দমকটা বোধহয় ঠিকমত সামলাতেই পারত না।

অদ্ভুত একটা মমত্ব বোধ করে শমিত ঐশীর জন্যে। উত্তেজনায় তার সুন্দর চোখজোড়া জ্বরো মানুষের মতই লালচে হয়ে উঠেছে।

'বি কোয়াইট প্রেটি লেডি। বি কোয়াইট। আমি তো পালাচ্ছি না। সব কিছু গুছিয়ে সরিয়ে রাখলামই তো তোমার কথা শোনার জন্যে--ধীরেসুস্থে বলো না, তাড়াহুড়ো করছ কেন?'

ঢোক গিলে গিলে গলা-তালু-ঠোঁটজোড়াকে বলাকওয়ার চলনসই করে নিয়েই বলে ওঠে ঐশী,

'আমার জন্যেই একটু চা দরকার—একটু বসো। দু'কাপ চা নিয়েই আসছি।'

'তা চা'এর জন্যে তুমি উঠবে কেন? বাবুয়া আছে, নিকুঞ্জ, ধরিত্রী আছে—ওই যে গত সপ্তাহে নতুন মেয়েটা এল—ওদের বললেই তো।'

প্রস্থানোদ্যতের ভঙ্গিতেই ঐশী বলে ওঠে,

'ধরিত্রীকে পেছনের ছোট্ট ঘরটায় কিছু কাজ দিয়ে বসিয়ে রেখেছি। বাকি দুজনকে কুকুর দুটোকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনতে বলেছি। আর নিকুঞ্জদাকে—'

শমিত বুঝতে পারে বেশ গুছিয়ে নিয়েই বলার কথাটা বলতে এসেছে—অদ্ভুত সেই মমত্ববোধটা আরও যেন টসটসে হয়ে ওঠে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা থেকেই বুঝতে পেরেছে মেয়েটা আগের মত মজে নেই। মজে না থাকাই স্বাভাবিক, দু'বছর হতে চললো বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চারই বয়স হয়ে গেল দুই, শরীর-স্বাস্থ্যের পারঙ্গমতায় যে যত কৃতবিদ্য হোক না কেন নৈমিত্তিকতায় অবসাদ তো কিছুটা আসতেই পারে, পারস্পরিকতার অন্তবর্তী কিছু স্থান মধ্যেমধ্যে জেগে উঠে তালমিল ভেঙে একটা ক্লান্তির বোধও ছড়িয়ে দিতে পারে— কার না জীবনে ছড়িয়েছে, কার না জীবনে ছড়ায়! না, দাম্পত্য-সম্পর্কের এই সব সাময়িকতা নিয়ে শমিতকান্তি ভাবে না। ভাবে আরও একটু বেশি, যার জড় শুরু থেকেই থেকে গিয়েছিল, তারই যেন অঙ্কুরোদগম দেখছে কিছুদিন ধরে, রোমি তার ফাউন্ড্রিতে মধ্যে মধ্যেই থেকে যাচ্ছে, অর্ডার সংগ্রহের টুকিটাকি নিয়ে এখানে ওখানে ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

মনোরমা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গেই সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার সাতপাঁচ নিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঢেলাকাঁকরে নিড়েন দিয়ে দিয়ে দেখে নেওয়া যেত উদ্‌গত ভাবটির ঠিক চরিত্রটি। কিন্তু তার তো আর উপায় থাকল না—কী অনায়াসে একেবারে কোন জানান না দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সহসাই যেন কিছুটা অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে শমিতকান্তি মজুমদার। আজকাল সহসা সহসাই এমনি ধরনের অনেক কিছু হয়ে উঠছে।

ছোট্ট ট্রেতে দুকাপ চা সাজিয়ে নিয়ে আসে ঐশী। এখনকার চা তৈরির পাটে দুধচিনির বালাই নেই, তাই চামচ দিয়ে নাড়ানাড়ির কোন ঝামেলাও নেই। শ্বশুরের দিকে ঐশী কাপটা বাড়িয়ে দিতে দিতেই একটু বিব্রত হয়ে যায় বাতাসের দমকে—অন্তর্বাসের ন্যূনতাই তার হেতু, হাউসকোটটা একটু বেশি রকমেরই যেন ফাঁক হয়ে যায়। শমিতের চোখে না-পড়ে পারে না, একটু যেন কৃশ কৃশ লাগে— কৃশ হওয়ারই তো কথা, নতুন মা। বাচ্চার ম্যাও ধরিত্রী যতই সামলাক না কেন তবুও তো মা। তার উপরে আবার টিনফুডের ওপর সম্পূর্ণ বরাত দিয়ে নয়, যতদূর জানে ঐশী বুকের দুধই দেয়।

শমিত ভাবে মানুষের জীবনই না নতুন নতুন সম্পর্কের সমাহার। মান্ধাতার আমলের পুরনো সম্পর্কগুলোও নবীভূত হতে চায়। নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির সেই যে আগ্রহ নিয়ে ঐশী যদি এগিয়ে আসে, তবে সেই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? পুত্রবধূর অস্তিত্ব মানেই এক-গলা ঘোমটা নিয়ে সানুনাসিক স্বরের কিছু শব্দগুঞ্জন কেনই বা হয়ে থাকবে? সে তার কাতরতা নিয়ে প্রয়োজনের তাগিদা নিয়ে কেনই বা এগিয়ে আসবে না—সংকট যখন সত্যিসত্যিই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

প্রাচীনেরা পুত্রবধূকে বলত, 'বৌমা'। সাধারণ্যে না হলেও তার কাছে অর্থটা খুব পরিষ্কার। বৌ যখন মা'এর মত আদৃত হয়ে ওঠে, তখনই সে হয়ে ওঠে বৌমা। অন্তত সেইভাবেই তো সর্বজনসমক্ষে ঐশীর পরিচিতি তুলেও ধরেছিল। মনে পড়ে সে দিনটার কথা, মনোরমা শুনেই টিপ্পনী কেটে উঠেছিল—বাক্যবাগীশ! মাস্টারি ছাড়লেও মাস্টারির ধাত কী আর যায়।

জীবনের জটিলতায় ব্যথিত হয়ে মা'এর সেই-সে-দাবি নিয়ে ঐশী এগিয়ে আসতেই তো পারে।

'আমি আবার নতুন করে একটা স্পেল শুরু করতে চাইছি বাপি, মানে নতুন করে আবার একটা অধ্যায়ের সূচনা আরকি।'

বিষম খেতে খেতে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে শমিত, 'মানে।'

'তোমার ছেলেকে আমার আর ভালো লাগছে না বাপি।'

'এখনও কিন্তু আমার কাছে কিছুই পরিষ্কার হল না।'

ধীরেসুস্থে চা খাওয়ার অবকাশই বোধহয় থাকে না। চোখের দিকে চোখ তুলতেই চাপা গুমোটের রুক্ষতাটা আর একটু নজরে এসে যায়। চায়ের কাপটা টেবিলের এক কোণে সরিয়ে রেখে এবার একেবারে সরাসরি হয়ে ওঠে শমিত,

'কী হয়েছে রোমির সঙ্গে?'

'কী আর হবে। বলছি তো ভালো লাগছে না। খাঁটি এবং বিশুদ্ধ একেবারে আগ মার্কা ভালো না-লাগা। সত্যি বলছি একে কোনভাবে দাগাতে চাই না। ভালো লাগছে না বলেই কী তেড়েফুঁড়ে কোন নালিশ করতে হবে বা জবরদস্ত কোন অভিযোগ রাখতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ বাপি, আমি অনেক ভেবে দেখেছি তোমার ছেলে রণিত সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগই নেই সেইভাবে—কিন্তু তবু আমি নিজের কাছে সৎ থাকতেই বলতে বাধ্য হচ্ছি ওর সান্নিধ্যে সাহচর্যে দিনে দিনে আমি যেন কেমন গুটিয়ে যাচ্ছি, আমি অব্যাহতি চাইছি—ডিভোর্স।'

বলেই অগ্নিদগ্ধ মানুষের জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত করেই ধিকিয়ে ধিকিয়ে ধোঁয়া ওঠা বাকি চা'এর সবটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে দু'হাতে গলা বুক ঘষতে থাকে ঐশী।

কিছুদিন আগে শমিতের আই-ক্লিনিকে একবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথাই মনে আসে--যাওয়ামাত্রেই ডাক্তারের একজন সহযোগী একটা তরলের কয়েক ফোঁটা চোখে দিয়ে গিয়েছিল, যাতে চোখের মণিজোড়া বড়ো হয়ে ওঠে, ডাক্তারের চোখ দেখার সুবিধা হয়। ডাক্তারের কী সুবিধা হয়েছিল জানে না কিন্তু সেই বড়ো বড়ো মণিজোড়া নিয়ে আশপাশের দিকে তাকাতে তাকাতে সে একটা উত্তেজনার নিবিষ্টতায় পড়ে গিয়েছিল, কেবলই মনে হয়েছিল চলতি সময়ের সব কিছুকেই সে বড়ো বড়ো আকারে দেখছে তা নয়, চলতি মুহূর্তটাকে গড়েছে অতীতের যেসব সেইসব পল অনুপলগুলোর কর্মকাণ্ডকেও যেন সে দেখতে পাচ্ছে। সেই-যে দেখার মহাযোগটি যেন এখন আবার এসে পড়ে। ঐশীর অসম্বৃত বেশবাসের মধ্যে দিয়ে তার মাতৃদুগ্ধের আধার স্তনদুটিকে দেখতে পায়—কীভাবে কখন থেকে গুটি বাঁধলো, কুঁড়ির রূপ নিলো, তারপর কত কিছুর যোগাযোগে আজকের এই রূপে বিকশিত হল। না দেখতে চাইলেও ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকল তার মাতৃমূর্তিটি, কীভাবে মিলন-নৈমিত্তিকতার মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে দল মেলতে মেলতে তার আজকের এই আকারপ্রাপ্তি।

'ডিভোর্স। একেবারে ডিভোর্সের সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলি।'

আগে কোন দিন ঐশীকে শমিত তুই তোকারি করে সম্বোধন করেনি। এই প্রথম করে। এই নতুনত্বটা ঐশীরও কানে লাগে। এই কারণেই বোধহয় পরক্ষণেই তার গলার স্বরটা আরও একটু সোহাগি মোচড়ে মুচড়ে ওঠে.

'তা নাহলে নতুন স্পেলটা শুরু করতে পারব কী করে।'

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মনটা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত করেই বলে ওঠে,

'কিন্তু ডিভোর্স পাওয়ার আগেও তো অনেকগুলো পর্যায় আছে। অনেক খুঁটিনাটি অনেক কাঠখড় পোড়াবার হ্যাপা আছে।'

'জানি--জানি সব জানি। কিন্তু সেই সব আইনি হ্যাজার্ডগুলোই কী সব কিছু কনট্রোল করবে? পার্সনের ভালো না-লাগা, আরও ভালোভাবে জীবনটাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কী কোনও দাম থাকবে না। আমি তো বলছি বাপি, রনিতের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই, স্বামী হিসেবে--সে দিক দিয়ে দেখলে চমৎকার--চমৎকার। সে আমাকে সব কিছুই দিয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে এটাও ঠিক তার আর কিছু দেওয়ার নেই। আমি আরও কিছু পেতে চাই--সামথিং মোর।'

চাওয়া পাওয়ার ঠিক স্বরূপটা বুঝতে না পারার জন্যেই যেন কিছুটা হালকাভাবে বলে ওঠে শমিত, 'দিল মাঙে মোর।'

'আঃ বাপি! কাকতালীয়ভাবে বিজ্ঞাপনের ভাষাটার সঙ্গে আমার কথাটা মিলে গেল বটে--কিন্তু আমার কথাটার ডাইমেনশনটাকে বুঝবার চেষ্টা করো।'

শমিত বুঝতে পারে ঠিকই! বদ্ধ হয়ে গেলে চলবে না, ফুসফুসে বাতাস চলাচলের রাস্তাটাকে খোলা রাখতে হবে!

'বল্ না মা বল্। কেন রাগারাগি করছিস। সবটুকু বলতে পারবি না। তোদের স্বামী-স্ত্রীর সেই সে কাজিয়ার মধ্যে যেতেও চাই না, তবু যেটুকু বলতে পারিস তাই বলে খোলসা হ--দেখি কী করতে পারি।'

'উঃ! আবার সেই পুরনো খাঁচার মধ্যে থেকে সবটা দেখছ তো। বলছি তো তোমার ছেলে রোমিকে কোনও ভাবেই দোষ দেওয়া যায় না--তার কিছুই খারাপ নেই--আমি তার থেকে যথেষ্ট পেয়েছি--কিন্তু আর পাচ্ছি না--'

আবার শমিতের মণিজোড়া বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ সেই সে চোখের দিকে চেয়ে থাকে ঐশী। তারপর নিজের মতন করে অর্থোদ্ধার করে নিয়ে নতুন ভরসায় বলে চলে,

'হ্যাঁ বাপি হ্যাঁ তুমি যুক্তিবাদী। তুমি বোঝবার চেষ্টা করো। তুমি ঠিকই ক্রাইসিসটা বুঝতে পারবে, দিল মাঙে মোর বলে হালকা করে দিতে পারবে না। আচ্ছা--আচ্ছা আমাদের বিয়ের আগে তুমি যে চোদ্দশো স্কোয়ারফিটের ফ্ল্যাটটায় ছিলে--'

বলতে বলতেই ঐশী কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থামে--যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে যে মীমাংসায় সে পৌঁছতে চাইছে তার পথটা ঠিক হচ্ছে তো! মনে মনে তর্কটা করে নিয়েই নিজেকে যুক্তিযুক্ত করতেই বলে যায়,

'হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, ওই ফ্ল্যাটে তো তুমি ভালই ছিলে তবু তুমি বাসাবদল করে কেন এলে এখানে? না, মোর প্লেজার--'

'কী যা তা তুলনা টানছ? তুমি এলে--সংসার বাড়ল, আরও ফেলে ছড়িয়ে থাকার দরকার হল, তাছাড়া আরও কিছুটা স্পেসের দরকার—'

'ওই দরকার বোধটা মনের বাপি! সত্যি করে বলো তো ওই স্কোয়ার ফিটে আমাদের কী সত্যি কুলতো না।'

'মাথার মধ্যে এই রকমের সব ছাইপাঁশ নিয়ে এসব তুই কী বলতে চাইছিস যা।'

'ঠিকই বলছি। আচ্ছা বাদ দাও ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গটা। মারুতিটা বেচেবুচে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি এসটিমটা কিনলে কেন? না, মন চাইছিল। মনের চাহিদা, তৃপ্তি-অতৃপ্তির বোধই তাহলে আসল জিনিস না। অবশ্য উপায় যদি থাকে--সঙ্গতি যদি থাকে। আমার তো সে

সঙ্গতি আছে। আমি চাকরি করি, আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে--আমার বয়স আছে, তবে আমি আমার সে-মনকে অগ্রাহ্য করব কেন? ফর নাথিং মানসিক পীড়নকে মেনে নেব কেন?'

দ্বিগুণ উৎসাহে বলেই চলে,

'প্লিজ বাপি প্লিজ। তুমি যুক্তিবাদী। তুমি মানুষকে ভালবাস--তাই তোমাকে এভাবে খোলাখুলি কথাটা বলতে পারলাম--তুমি যেভাবে পার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা করে দাও।'

এবার পুরোপুরিই থামে ঐশী। কেমন যেন মনে হয়, সামনের যে মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলি বলছে সে মমির মানুষ নয় তো, নাহলে সাড়াশব্দহীন হয়ে এ ভাবে ঠায় বসে থকেতেই বা পারে কী করে! বিচলিত ভাবটা কাটাতেই আবার বলতে থাকে দম নিয়ে,

'বুঝতে পারছি বাপি, তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে আমি ছিলাম অনেকখানি। মানে আমাদেরকে নিয়ে তোমার জীবনটা আবার থিতু হয়ে উঠেছিল। আমার এই নতুন ভেনচারে তুমি একেবারে ছত্রখান হয়ে পড়বে। কিন্তু প্লিজ বাপি, নিজের দিকটা থেকে না দেখে আমার দিকটা থেকে আমাকে একটু মানবিকভাবে দ্যাখো--মানে এখনও তো আমি বহুত দিন বাঁচব না।--তোমার কষ্ট হলেও সেটা ভুলে--'

'নো। নো মোর! আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে না, তুমি তোমার কথা বলে যাও।'

শমিতের অভাবনীয় চিৎকারেও কিন্তু টলে না ঐশী। বসা অবস্থা থেকে শুধু উঠে দাঁড়ায়। তারপর এক চক্কর পরখ করে নিয়ে নত নম্রস্বরে বলে ওঠে,

'তাই তো বলতে চাইছি।'

'হ্যাঁ ক্যাটাগরিক্যালি বলে যাও, আমার থেকে কী ধরনের সাহায্য পেতে চাইছ?'

'আমি তো তোমাকে সবই বললাম, এখন তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে এক দুই করে জানতে চাও, আমিও এক দুই করে করে উত্তর দিচ্ছি।'

'তুমি কী কোন নতুন পার্টনার চুজ করেছ, মানে নতুন অ্যাফেয়ার্সে—'

'এখনও নয়।'

'তবে কোথায় গিয়ে উঠবে, তোমার বাপদাদারা তো—'

'প্রশ্নই নেই সেখানে গিয়ে উঠবার। আমি কম মাইনের তো কাজ করি না। দীর্ঘ মেয়াদি ঋণেধার নিতেই পারি ফ্ল্যাট কেনার জন্যে। ব্যাঙ্কট্যাঙ্ক ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো তো বসেই আছে টাকার বান্ডিল নিয়ে। সে সবের কোন অসুবিধে হবে না।'

শমিতের বুকের ভেতর থেকে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবার মতন কী যেন একটা হয়ে যায়। কী ভাবেই না প্রস্তুতি নিয়ে কত ভাবনাই না ভেবে রেখেছে এবং উত্তাপহীন দৃঢ়তায় কী স্বাভাবিক ভাবেই না সে-সব কথাগুলি বলে চলেছে। একে কী কথাই বা সে বলবে! মাথার ভেতরটা ক্রমশ কেমন যেন ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে শমিতের। শুধু এরই মধ্যে চলকে চলকে যায় তাদের নাটকীয় বিবাহপর্বটি। নাটকীয়তার পরিসমাপ্তি কী নাটকীয়তাতেই! যে নাটকীয়তাতে একদিন বিবাহটি সংঘটিত হয়েছিল। সেই নাটকীয়তাতেই যে উল্টোযাত্রার রথটি ছুটলেও ছুটতে পারে এই রকমের একটা সম্ভাবনার কথা ভাবলেও তার চেহারা যে এ ধরনের হবে তা যে কোনভাবেই ভাবতে পারেনি।

আবার ঐশী শমিতের সামনে গিয়ে বসে। দুলালি মেয়ের বায়না নিয়েই গুনগুনিয়ে ওঠে,

'প্লিজ বাপি, গত দুবছরে তোমার সঙ্গে যে ক্লোজ রিলেশ্যানে পৌঁছেছি তারই জোরে তোমার কাছে এভাবে নিজেকে খুলে ধরতে পেরেছি। খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে একটা সুষ্ঠু অনাটকীয় ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।'

কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না শমিত। তবে বোঝে এত তাড়াতাড়ি এলে দেওয়া যায় না। জীবনে তো কম চড়াই-উতরাই ভেঙে ভেঙে চলছে না, আর একটু দেখলে ক্ষতি কী। ম্লান হাসির একটা রেশ নিয়েই বলে ওঠে,

'এমন ভঙ্গিতে তুমি কথাগুলো বলছ যেন রবীন্দ্রসদনের কাউন্টারে মাথা ঝুঁকিয়ে অনুরোধ করছ বুকিং ক্লার্ককে—কাটা টিকিটগুলোর সিট নম্বর যেন পাশাপাশি হয়। জানো আমাকে তুমি ঠিক কী কাজটা করতে বলছ?'

'জানি।'

আবার! আবার সেই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। কিন্তু এখন যে নিজেকে শক্ত রাখতেই হবে। নির্লিপ্তির কঠোরতা নিয়েই বলে ওঠে শমিত,

'কদিনের জন্যে এবার রোমি দিল্লি গেছে?'

'ঠিক জানি না—মনে হয় আয়রন ওরের পারমিটটা রিনিউয়্যাল করার ব্যাপারেই — যাওয়ার সময় সব কিছু খুলে বলে যায়নি তো।'

নিজেকে কথাটা বলতে গিয়েও বিড়বিড়িয়ে ওঠে শমিত,

'তার মানে সমস্যাটা বেশ পেকেই উঠেছে।'

'হ্যাঁ। তবে এখনও কালিঝুলিতে নোংরা হয়ে যায়নি। প্লিজ বাপি, এই অবস্থাতেই ড্রপ সিনটা ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি বলছি বাপি, তোমার ছেলে বা আমি কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হব না। ব্রেকটায় ভাল বই মন্দ হবে না। আমি জোর দিয়েই বলছি, তোমার ছেলের আমাকে ভরিয়ে তোলার আর কোন রসদ না থাকলেও যে কোন মেয়েকেই ভরিয়ে তোলার ওর অনেক রসদ আছে। হ্যাঁ তোমার ছেলেও বেশিদিন একা একা থাকবে না।'

নিজেকে আর দমন করতে পারে না শমিত, চিৎকার করে ওঠে,

'তখন তোমাকে বললাম আমার কথা ভাবতে হবে না, এখন তার সঙ্গেই জুড়ছি রোমির কথাও তোমাকে ভাবতে হবে না।.তুমি তোমার কথা ভাবো। বলো, তোমার আর কিছু থাকলে বলো। এই পরিবারের এখনও আমি হেড—আমার একটা—'

শমিতের আতপ্ত চোখে সোজাসুজি দুচোখ রেখেই বলে ওঠে ঐশী, 'বললামই তো রোমির অবর্তমানে তোমার মরাল সাপোর্টটা নিয়ে এগিয়ে থাকতে চাই।'

'ওই যে এক্ষুনি বললাম এটা বুকিংকাউন্টারে হাতগলিয়ে টিকিট কাটা নয়। কতটা জড়াবো, কী ভাবে আমাকে ভাবতে হবে। এখন তুমি এসো।'

'তা আসছি। কিন্তু বেশি সময় দিতে পারব না।'

'বাপি,আসব?'

দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় ঐশী।

সম্বিৎটা ফিরে পায় শমিত। কালকের সারাটা দিন—আজকেও দিনের অর্ধেকটা, থেকে থেকে আচ্ছন্নতার এই বোধটায় ডুবেছে আবার ভেসেছে—তার জীবদ্দশায় নিরবচ্ছিন্ন এই ধরনের কয়েকটা ঘণ্টা আর কী কখনও এসেছে! কম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তো হল না এই একটা জীবনেই। প্রথম পর্বে চাকরিটাকে ঘিরে রাজনৈতিক আবর্তটা তো আছেই। তারপরে সেই-সে-দিন ঘটে গেল মনোরমার মৃত্যুটা। কী রকম আচম্বিতে একটা প্রত্যক্ষতা এসে যেন তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে গেল এরই নাম মৃত্যু— এই মুহূর্ত থেকে তোমার জীবন থেকে শুধুই নয়, জগৎসংসারের ধারা থেকে মনোরমা মাইনাস হয়ে গেল।

তবু সেই সব বড়ো বড়ো ঘটনাগুলোও গত দেড়দিনের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ।

যদিও কাল ছিল মুসলিম পরবের দিন এবং আজ রবিবার, স্বাভাবিক কারণেই বুঁদ হয়ে থাকবার অবকাশটা পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবকাশটা না পেলেই কী নৈমিত্তিকতার স্রোতে ভেসে চলতে পারত? প্রথমটা তো তাই ভেবেছিল—ছুটিছাটার এইসব দিনগুলো যেভাবে কাটায় সেভাবেই কাটাবে। কম্পিউটর-স্টক থেকে ডেবিট-ক্রেডিটের ফাইলগুলো বার করবে। ফাইনাল প্রিন্ট আউটটা বার করে নেওয়ার আগে বিশেষ বিশেষ আইটেমগুলো দাগাবে, রিমার্কস কলামগুলো পূরণ করবে। সামনে আবার অডিট, নাহলে অডিটরের সামনে বেইজ্জত হতে হবে। অফিস আছে, অফিসের কর্মচারীরা আছে ঠিকই, কিন্তু সবার উপরে আছে তার এই কড়া নজরদারি। প্রথম জীবনের সেই চাকরিটা ছাড়ার পর থেকে শরীরের কোষকণায় কণায় কারবারের এই নৈমিত্তিকতাকে মিশিয়ে নিয়েছে। নাহলে তার কারবার সেই-সে-দিনের সেই একরত্তির অন্নসংস্থানের মাধ্যমটি শাখাপ্রশাখায় এইভাবে পল্লবিত হতে কী পারত? এক হিসেবে দেখলে রণিতের ইস্টার্ন ফাউন্ড্রি তো এরই সহযোগী বিস্তার। পরিস্থিতি পাল্টাতে পাল্টাতে প্রতিমুহূর্তে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ যেভাবে এগিয়ে আসছে সময় থাকতে সব কিছু খতিয়ে নিয়ে দৃঢ় অবস্থান না নিতে পারলে একেবারে ভেসে যেতে হবে।

তা সত্ত্বেও কি বোর্ডে আঙুল রেখে স্ক্রিনে ঠিকমত চোখ ধরে রাখতে পারেনি, কেবলই শরীরকে শিথিল করে দিয়ে মাথার মধ্যে ভেসে-ভেসে এসেছে ঐশীরই নানান বাচনভঙ্গি, কেবলই অলৌকিক স্ক্রিনে খটখটিয়ে উঠেছে তার কথাগুলি, যেন সুস্থিত প্রাজ্ঞতায় মানব অস্তিত্বের নিশ্চিত স্থান নির্দেশ করে দিতে চায় সে। শীত শীত ভাবটা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।

এখনকার ঐশীর উপস্থিতিটা চাপা সেই কাঁপুনিটাকেই হাড়ের ঠকঠকানিতে বুঝি বা বাজিয়ে তোলে। তবু ব্যাপারটাপার জড়িয়ে নিজেকে সামলে-সুমলে নেবারও যেন একটা অবলম্বন পেয়ে যায়। ঐশীর কোলে মেয়ে ফ্রুটি। হাত বাড়াতেই ঝাঁপিয়ে আসে নাতনি। নিজের মতো সে এক প্রস্থ সম্ভাষণ ও কুশল জিজ্ঞাসাদি করে নিয়েই তরতরিয়ে নেমে যায় নিজের লক্ষ্যে।

আবার দমবন্ধ পরিবেশটা ফিরে আসে। শমিত বুঝতে পারে এ-মেয়ে ছাড়ার পাত্র নয়। কালকের সেই অমীমাংসিত প্রসঙ্গটা ওঠালো বলে! আজকের সূচনাটা তো সে-ই করতে পারে। বিশেষত হাতের সামনে আয়ুধটা যখন পেয়েই গেল।

'কাল তো অনেক কথা বললে। মেয়ের কথা ভেবেছ—মেয়ের কথা ভাবা আছে?'

'কেন থাকবে না!'

'কী রকম ভেবেছ—শুনি।'

'এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক সঙ্গত সেই রকমই। এখন আমার কাছে থাকবে। তারপর চুজ অ্যান্ড পিক পর্যায়ে এলে সে তার পছন্দের জায়গা বেছে নেবে। যদি মনে ধরে তার বাবাকে--আর রোমিও মনে করে সে-ই তার সব দায়দায়িত্ব নেবে তাহলে সে-ও এগিয়ে আসতে পারে, আমার তাতে কোন ইমোশ্যন নেই।'

'তোমার দিকটা ভেবে নিয়েই তুমি বলে যাও।'

'আপাতত আমাকেই তো পালনপোষণ করতে হবে, ধরিত্রীকে নিয়ে যেতে হবে। অন্তত তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে।'

'ধরিত্রী মানে তো আয়া—কাজের মেয়ে—নোকরানি।'

'এখানেও তো তাই থাকে। তুমি থাক তোমার জগৎ নিয়ে, ওর বাবা থাকে তার মতন, আর আমারও য়ুনিভার্সিটি-গবেষণা ছাত্রছাত্রীরা আছে। এখানেও তো সেই ধরিত্রী বাবুয়া আর এই সব বারবি-টয়েজ এটসেটেরা এটসেটেরা।'

বলতে বলতেই গলায় অন্য সুর নিয়ে ঝাঁকিয়ে চলে ঐশী,

'প্লিজ বাপি—প্লিজ। ইমোশ্যনালি ব্যাপারটা দেখো না, রিজনএব্‌ল হও। আমাদের মতন ঘরের শিশুরা এখন থেকে এইভাবেই বড়ো হবে। কাজের মেয়ে রঙচঙে ছবির বই নানান রকমের পুতুল—তার ওপরে একটু বড়ো হলে কম্পিউটর তো আছেই—সঙ্গে সঙ্গে যদিও পড়াশুনোর জগতও তৈরি হয়ে যাবে।'

আবার সেই পরিবেবার ভাষা। কালই বিজ্ঞাপিত হয়েছে বলেই এতটা টাটকাটাটকি মনে আছে শমিতের—ওয়েবটেক কম্পিউটর সংস্থা এবার শুরু করতে চলেছে কিছু নতুন কোর্স। 'গাইডেন্স থ্রু মালটিমিডিয়া' কোর্সটি তৈরি করা হয়েছে সদ্য কথা বলতে শেখা শিশুদের মজার গল্প ছড়া ও গান শেখানোর জন্যে। অতীতের দাদু-দিদিমারা যে ভূমিকা নিয়েছে, এখন থেকে তাই করবে কম্পিউটার।

'কম্পিউটার!'

চোয়াল জোড়াই যেন খুলে যাবার উপক্রম হয়।

'হ্যাঁ, কম্পিউটার। তুমি কম্পিউটার নিয়ে এভাবে পড়ে থাক, অথচ জান না টিনিদেরও কম্পিউটর কীভাবে সঙ্গ দিতে পারে। কত ছবি আঁকা যায়। কত—কত হাঁসজারু ধরনের মূর্তিদের আনাগোনার মধ্যে দিয়ে কত রকমের ডিং ডং বাজনা বাজানো যায়। আর ধকল সহ্য করবার শক্তিও না কত তার। জান না বুঝি আজকাল কীভাবে কচিকাঁচাদের কম্পিউটার প্রয়োজনীয় সঙ্গী হয়ে উঠছে। কীভাবে নিঃসঙ্গতার ফাঁক ভরিয়ে দিচ্ছে।'

ডুকরে কেঁদে ওঠার এক মূর্চ্ছনা নিয়েই এবার শমিত উচ্ছ্বসিত হাসিতে খানখান হয়ে যায়,

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস্‌। বেশ তো সুন্দর সুন্দর কথা বলছিস—অনেক কিছু জানতে পারছি।'

মধ্যে মধ্যেই 'তুমি' থেকে 'তুই তোকারির' গণ্ডিতে নেমে আসে শমিত। এটাই তার কথনমুদ্রা।

ঐশী মুখোমুখি বসে। অনেকক্ষণ ধরেই তার চোখে চোখ রাখে, তারপর খপ্‌ করে হাতদুটো ধরে বলে ওঠে,

'বাপি!'

'বল্‌ না শুনছি তো!'

'তুমি কিন্তু তোমার মন থেকে খিঁচটা এখনও সরাতে পারছ না।'

'খিঁচ!'

শমিত থামে। ভেবেছিল প্রথমটায়, আজ ডিভোর্স-সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতাগুলো বলবে। ইংরিজিতে যাকে কাউন্সেলিং করা বলে সেইরকম ভাবেই বোঝাবে। এখন মত বদলায়--সে-সব বলে বুঝিয়ে কিছু হবে না। দৃষ্টিভঙ্গির যেদিক থেকে ঐশী সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিয়েছে, সেইদিক থেকে তাকে সমঝাতে গেলে অন্য পথের সন্ধান করতে হবে। সেই-সে-পথের সন্ধানেই যেন বলে ওঠে,

'হ্যাঁ সত্যি তাই। কেন জানিস?'

'না। বলো।'

'তুমি হয়ত জান না, তোমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে তোমার বাবা যখন এসেছিলেন তখন সব শুনে আমি বলেছিলাম এ বিয়েতে আমাকে যদি অংশ নিতে হয় তবে সবার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে—বলেই আমি রোমিকে বলেছিলাম তোমাকে ডাকতে। পরের দিনই বোধহয় তুমি এসেছিলে—মনে আছে?'

'বলো না বলো কী বলতে চাইছ।'

'আমি ভ্যানতাড়া ভ্যানতাড়া করে অনেক কথার মধ্যে দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম আমার ছেলেকে তোমার পছন্দের কারণ কী। তুমি তোমার মতন করে উত্তর দিয়েছিলে— কিন্তু তাতেও আমি ছাড়িনি, তোমাকে বিব্রত করেই চলেছিলাম। কেন জান? বুঝতে চেয়েছিলাম তোমার নির্বাচনের মধ্যে কোন ভেতর-বস্তু আছে কিনা— যাতে সম্পর্কটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাময়িক কোন সম্মোহনে বা ভাললাগার ঘোরে—'

'বাপি-ই-ই।'

ফুঁসে ওঠে ঐশী। প্রথমে ফোঁসানির তাড়সে দাঁড়িয়েই পড়ে। তারপরে বিবেচনা ফিরে এলে ধীরে ধীরে বসে। তবু কথার সুরে থেকে যায় সেই-সে-জেহাদই, যেন কথা বলছে না, ধারালো ঠোঁটে ঠুকরে ঠুকরে যাচ্ছে।

এখানেই তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য। তোমার ওই দীর্ঘস্থায়িত্বের কনসেপ্টটাই ভুল। ট্রানসিয়েন্ট সোসাইটিতে কেন মানবো তোমাদের ওই বস্তাপচা থিয়োরি! তাহলে কী যা করেছি-—যা পেয়েছি তাতে কোন অতৃপ্তি আছে, গ্লানিবোধ আছে——না। আমি পরিষ্কার বলছি বাপি, তোমার ছেলে আমাকে টইটুম্বুর আনন্দ দিয়েছে, সুখ দিয়েছে। আজকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছি বলেই গালাগালি করার মতন কিছু কথা বলব না। বুঝতে পার না, মেয়ের নাম কেন রেখেছি ফ্রুটি। সে আমাদের মিলনের সুস্বাদু ফল—সে আমাদের গৌরব, সে আমাদের আনন্দ।'

বলতে বলতেই আবার থেমে যায় ঐশী। দমের ঘাটতিতে নয়, তার ওই 'আনন্দ' কথাটির উচ্চারণে শমিতকান্তির চোখেমুখে যে জ্বলন ঝলসে ওঠে তারই ঝলসানিতে। কিন্তু কোনওভাবেই সে পশ্চাদপসরণ করবে না, তার কাম্যবস্তু সে অর্জন করে নেবেই। ঘূর্নিচোখে শমিতকে আগাপাশতলা আরও একবার দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে চলে,

'বাপি, কাল তোমাকে তোমার ফ্ল্যাট বদলানো নিয়ে গাড়ি পালটানো নিয়ে একটা সরল যুক্তি দিয়েছিলাম, তুমি দারুণভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিলে। দোহাই আজ আর তুমি ওইভাবে উড়িয়ে দিয় না। আজ আর একটা ক্রুড দৃষ্টান্ত আনব। ক্রুড হলেও কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করো। তোমাকে কিন্তু আঘাত করার জন্যে কথাগুলো কোনভাবে বলছি না।'

'বলো না বলো। তুমি একদিনেই আমার বোধশক্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছ!'

ঝকঝকে হাসি নিয়েই বলে ওঠে ঐশী,

—'মনে আছে আমাদের এই ফ্ল্যাটের ফ্লোরিং নিয়ে তুমি কত কী করেছিলে!'

শমিত প্রমাদ গোনে,

'বুঝতে পারছি না প্রসঙ্গটাকে তুমি কীভাবে জুড়তে চাইছ!'

'এই কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ ফ্ল্যাটের ফ্লোরিং কিন্তু মোজাইক। কিংবা এখন হলেও হতে পারে আমাদের মতই কারও কারও মার্বেলের। যাক গে যাক সে-সব। আমি বলতে চাইছি প্রথম দিকে কথা ছিল প্রত্যেকের ঢালাওভাবে মোজাইকই হবে——তুমি ভীষণভাবে আপত্তি জানালে মোজাইকে, যে যার প্রয়োজনমত, অভিরুচিমত যা ইচ্ছে তা করুকগে, তুমি করবে মার্বেল টাইলস। মনে আছে, তখন মার্বেল টাইলসের আমদানি একেবারে বন্ধ। রাজস্থান থেকে মাল একেবারেই আসছে না। 'রাজনগর' ব্রান্ডের যদিও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে 'ডুমরি' একেবারেই নয়। অথচ ডুমরিই তোমার মনপসন্দ— এক নম্বর। শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার লিংকেজগুলো কাজে লাগিয়ে সেই-সে-রাজস্থান থেকেই আনালে।'

'হ্যাঁ আনিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কী হল—অন্যায়টা কোথায় ছিল!'

'ন্ না। ন্যায় অন্যায়ের কথাই বলছি না। বলছি তোমার ওই তৃপ্তি-অতৃপ্তির বোধের কথা। বলো না বলো, মোজাইক 'ফ্লোরিং'এ কী এমন অসুবিধা হত! কিন্তু তুমি মানতে

পারনি। তুমি মার্বেল টাইলসের তৃপ্তিটা পাচ্ছিলে না ওই মোজাইকে। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট ডাডি। এই তৃপ্তিবোধ থেকেই তুমি তোমার ফ্ল্যাট বাড়াচ্ছ, নতুন গাড়ি কিনছ, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের রদবদল করছ--নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসপত্তরের ব্রান্ড বদলাচ্ছ। আর আমার বেলাতেই মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে। কেন বুঝছ না বাপি জীবনধারার টোটাল অ্যাঙ্গলটা! আরও ভোগ--আরও তৃপ্তি।'

আর্তনাদে চিৎকার করে উঠতে চেয়েও চিৎকার করার জোরটা যেন খুঁজে পায় না শমিত। অপাঙ্গে নয়, সোজাসাপটা চেয়ে থাকে ভয়কাতর শমিতের দিকে, শুরু যখন করেছে তখন কিছুতেই পিছু হটবে না। বলেই চলে ঐশী,

'বাপী, তোমাকে আমি আড়াইটে বছর ধরে দেখছি--খুঁটিয়েই দেখছি। তুমিই জান না, তুমি কীভাবে দিনে দিনে পালটে পালটে যাচ্ছ। মোর অ্যান্ড মোর সফিসটিকেটেড অ্যামিনিটিসগুলোর দিকে ঝুঁকছ। একালের যা হওয়া উচিত সেই-ভোগ সেই-তৃপ্তির নতুন ভ্যালুজকেই তুমি----প্লিজ বাপি, প্লিজ তুচ্ছ আমার কারণে সেই-সে-ইমেজটাকে তুমি ভেঙে ফেল না।'

'চুপ, চুপ। একেবারে চুপ। অনেক বাচালতা করেছ, আর নয়।'

'ঠিক এই কারণেই তোমাকে বিশ্বাস করেও ভয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকছি বাপি। তুমি আইন নীতি নৈতিকতা সামাজিক এটা-সেটার কথা বলে আমাকে থামাবে। কিন্তু আমি সত্যি বলছি--আমাকে কেউ থামাতে পারবে না। আমি শেষ পর্যন্ত দরকার হলে মানবাধিকার কমিশনের কাছেও যাব।'

বলতে বলতেই থেমে যায় ঐশী। বারান্দা পেরিয়ে তারই দরজার কোনটায় ধরিত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে--তারই নজর কাড়বার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ফ্রুটির এখন একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসার সময়। বাড়িতে থাকলে মেয়েকে সাজিয়েগুজিয়ে দেয়, এ বিষয়ে আবার তার খুঁতখুঁতুনি আছে। ধরিত্রী সবই পারে। কিন্তু তার সাজানোগোজানো জামাকাপড় নির্বাচনের সব কিছুতেই একটা জবরজঙভাব। যদি এ-সবের প্রভাবে এই ছেলেবেলাতেই মনের মধ্যে স্থূলতা একবার চেপে বসে তবে সারাজীবন জায়গাবিশেষে উপহাসাস্পদ থেকে যেতে হবে। যদিও সারাটা জীবন ভাবার অর্থ হয় না। আজ যা রুচিকর, কালই তা অরুচিকর। তবুও এ-সব বিষয়ে শেষ নজরদারিটা করে ফিনিশিঙ-টাচ্‌টা দিতে সে-ই চায়।

প্রসঙ্গটা মুলতুবি রেখে ছুটতেই হয় ঐশীকে।

শমিত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ভৃত্য বাবুয়াকেও জিমজিমিকে আনার জন্যে ছোট্ট ঘরটার দিকে যেতে দেখে। অনেকক্ষণ ধরে তাদের কুঁইকুঁই শুনছিল। তাদেরও বেড়াবার সময় উপস্থিত। এই সময়টা তারাও ঘুরেফিরে আসে। বড্ড ভাল জাতের কুকুর দুটো। ধীর স্থির সহবত জ্ঞানে টনটনে। কীভাবে যেন বুঝে গেছে বাবুয়া তাদের যতই দেখভাল করুক না কেন এই সংসারের সর্বময়কর্তা শমিতকান্তি মজুমদারই। তাই ছাড়া পেলেই বিচিত্র স্বরে এবং শরীরীমুদ্রায় তার কাছে এসে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে আদর কাড়বার জন্যে----বিশেষত সন্ধ্যের এই বেড়াতে যাওয়ার অব্যবহিত আগে এবং পরে।

চেন ধরা বাবুয়াকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে আসে জিমজিমি। কিন্তু আজ আর সেভাবে নৈমিত্তিক সোহাগজ্ঞাপনটা করতে পারে না শমিত। বড্ড বুদ্ধিমান কুকুর। কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় মনিবের মন ভাল নেই----ভেজা নাকের ফরফরে বাতাসে পায়ের পাতা দুটোয় একটু ঘষটানি দিয়ে দুই ঠ্যাঙের পাশ দিয়ে দুবার চক্কর খেয়ে লেজ দোলাতে দোলাতে চলে যায়।

খারাপ লাগে শমিতের কুকুরদুটোকে আদর করতে না পারায়, যদিও জানে সারমেয় যুগলের সে-ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে—সন্ধ্যার এই সময় কমপ্লেক্সের পার্কে তারা যখন চক্কর দেবে আশপাশ দিয়ে ঘুরতে ফিরতে থাকা গাদাগুচ্ছের শিশুদের হাতের ছোঁয়ায়, নানান স্বরের ডাকাডাকিতে—আদরের অছিলায় একটু আধটু পীড়ন হলেও বা।

বড্ড ভালো স্বভাবের কুকুর। কী অদ্ভুত ভঙ্গিতেই না মুখ উঁচু করে তাকিয়েই যেন বুঝে গেল তার মন ভাল নেই—বিব্রত হয়ে আছে। গা বেয়ে উঠতে গিয়েও না উঠে লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল। আর ঐশী মানবী হয়েও বুঝতে পারছে না কোন অতল খাদের ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে, শুধু দাঁড় করানোই নয়, থেকে থেকে কী ভাবেই না তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলেছে, ভেবেও দেখতে চাইছে না পরিণামটা কী হতে পারে।

কত কথাই না মনে পড়ে যায় শমিতের। বিয়েটা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখনও বিস্ময়টা তার কাটতে চায়নি। স্বগতোক্তির ঢঙেই প্রশ্ন করেছিল স্ত্রী মনোরমাকে,

'কী ব্যাপার বলো তো মেয়েটা আমাদের রোমিকে চুজ করল কী করে। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ানো কিছু বড়ো কথা নয়, ওর থেকে ছোটো বয়সেও অনেকেই পড়ায়। বড়ো কথা ওর সিরিয়াসনেস, যে কারণে এই বয়সেই ছাত্রছাত্রীমহলের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে —সেই মেয়েই কিনা এই রকমের একটা রোমান্সে একেবারে—'

'কেন যুগযুগ ধরে প্রেমভালবাসার শক্তি সামর্থ্যের এই রকমের কথাই তো শুনে আসছি।'

'না সে-সব ঠিকই আছে। তবু মিনিমাম বেসিস একটা থাকবে তো।'

হাসিপরিহাসের পর্দাটা একটানে সরিয়ে দিয়ে খইখই করে উঠেছিল মনোরমা, 'কেন, তোমার ছেলের মিনিমাম সেই-মানটা নেই, তা তুমি কী করে ভাবলে? যতদিন পড়াশুনো নিয়ে থেকেছে, ভালভাবেই করেছে। তারপরে লোহালক্কড়ের এই ব্যবসা করছে। কমটা ওর কোথায় দেখছ?'

'না, মানে লোহালক্কড়ের ব্যবসা মানে তো ওই সব জানলা দরজার গ্রিল—এটাওটা — কোলাপসেবল গেট—'

'এইগুলো তোমার কাছে কম হল! তর্কের খাতিরে তাই না হয় মেনে নিলাম। এবার অন্য দিকটার কথা বলি। কখনও ভাল করে দেখেছ ও যখন স্যান্ডো গেঞ্জি পরে গলায় বুকে ঘামের দরানি নিয়ে মুখের কাছে ওয়েলডিঙ-মাস্ক্ তুলে ঝালাই করে যায় তখন একেবারে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা-বিশ্বকর্মা লাগে। মেয়েদের চোখ দিয়ে সে মূর্তি তুমি দেখনি— আমি দেখেছি। শ্যাওড়াগাছের পাকানো কাণ্ডের মত চকচকে কাঁধ হাত। তোমার সেই-সে-বয়সের সেই রকমের ভসকাটসকা নয়।'

হেসে উঠে নিষ্ক্রান্ত হতে চেয়েছিল,

'তাহলে ঠিক আছে।'

কিন্তু আধাখেঁচড়া ভাবে প্রসঙ্গটাকে ফেলে দিতে চায়নি মনোরমা, চিরদিনের মত প্রহেলিকাটার ইতি টেনে দিতেই বলে উঠেছিল,

'মেয়ে খুব বড়ো খেলোয়াড়। অনেক কিছু তলিয়ে দেখেছে। শরীর সুখের ব্যাপারটা তো আছেই। তোমার গ্রেইং ব্যবসা—আমার চাকরি— মানে অন্যরকমের অ্যাসেটগুলো। জীবনকে যা একশোয় একশো ভাগই নিশ্চিন্তি দেয়— বুঝলে না!'

'তার মানে বলছ শুধু প্রেম নয়, হিসাবনিকাশ আছে।'

'হিসাবনিকাশ থাকলেই যে প্রেম থাকে না এমন নির্দয় কথা কী বলছি? বলছি মেয়েটা অনেক তলিয়ে ভেবেছে। বিশেষত তোমাকে নিয়ে অনেক হোমওয়ার্ক করেছে—'

'আমাকে নিয়ে মানে—'

'বাঃ! তোমার সাবজেক্টের লোক। সে জানবে না তার সাবজেক্টের বড়ো বড়ো স্কলারদের। দেখো না দেখো— তোমাদের ওই সব কোয়ান্টাম থিয়োরি-ফিয়োরি নিয়ে কত না তর্কাতর্কি জুড়ে দেয় তোমার সঙ্গে— বিয়েটা হতে দাও না। দেখবে তোমার সঙ্গেও মেয়ের কেমন পটে যায়। মেয়েদের এমনি পটীয়সী বলা হয় না। বরের সঙ্গে ঘরও তারা দেখে। স্বয়ংবরা হোক আর যাই হোক।' ...

পুরনো সে-সব কথা মনে পড়তেই কেমন যেন একটা অভিমান উথলে ওঠে মনোরমার প্রতি। মনোরমার এবয়সে এ-ভাবে মরে যাবার কোন অর্থ হয়— সংকেত বা পূর্বাভাষ গোছের কিচ্ছুও নেই। হঠাৎ একটা 'ম্যাসিভ'— উঃ! কতগুলো শব্দ গোলাগুলির মত কী ভাবেই না এগিয়ে এসেছে আজকালকার যাপিত জীবনের পরিমণ্ডলে। যে শব্দগুলো সাধারণভাবে শব্দই— কিন্তু যার জীবনবৃত্তে সেই-সে শব্দগুলি তার রুদ্রমূর্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই শুধু জানতে পেরেছে কী তার ফলশ্রুতি কয়েকটা দিনের মধ্যে একটা মানুষের সামগ্রিক বিলুপ্তি! ব্যস্।

আজ নিয়ে একত্রিশ দিন মনোরমা মারা গিয়েছে। বেশ কয়েকটা দিনের পর আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছেই শুধু নয়, একটু যেন রাগ-রাগ ভাবও চলকে-চলকে উঠছে। বিশেষত আজকে সে তো থাকলে একটা বড়ো ভূমিকা নিতে পারত। মেয়েদের মন গড়াভাঙার ব্যাপারস্যাপারগুলো মেয়েরাই তো স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি রকমের বুঝবে। দাগিয়ে দিতে পারবে কার কতখানি ভূমিকা।

যদিও তার কী বিশেষ ফল ফলত। ঐশী তো তারই দিকে প্রকারান্তরে আঙুল তুলল। তারই জীবনযাপনের পদ্ধতিপন্থা তাকে পথ দেখাচ্ছে। ভোগ্য বা কাম্যবস্তু প্রাপ্তির প্রাবল্য এই মুহূর্তে যেভাবে অন্ধ জৈবিক শক্তির বেগে ছুটে ছুটে চলেছে, সমাজে পরিবারে ব্যক্তিগত প্রয়াসে রকমারি বিভঙ্গ তুলেই চলেছে, তারই মূর্তরূপ দেখেছে আমাদের সংসারে আমারই মধ্যে। আমিই তার প্রেরণা। আমার যা একটু বাধোবাধো ভাব আছে সেটা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক কনট্রাডিকসনের রকমফের। ঐশী তাই বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসছে— আমার সেই বাধোবাধো ভাবের বাধাটা-উপড়ে ফেলে দিতেই।

শমিতকান্তি মজুমদার বিচলিত বোধ করে। সত্যিই কী ভোগ আকাঙ্ক্ষার জগৎই তার অস্তিত্বের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। একটা মোক্ষম দৃষ্টান্ত দিয়েছে বটে তার ওই চোদ্দশো স্কোয়ার ফিটের জায়গায় ওই আঠারোশো ফিটের ফ্ল্যাটটা নিয়ে।

এটা কী তার বিলাস— অতিরেক! না, প্রয়োজন। অবশ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এই ক' বছরের মধ্যে তার বিজনেজলোড যে ভাবে বেড়েছে, তাতে একটা অ্যান্টিচেম্বার গোছের ঘর দারুণভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে না! কম্পিউটরই তো তার দুটো, তারা তো শো-পিস স্ট্যাটাস সিম্বল নয়, তাদের নিয়ে কাজ করতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের একটা পরিসর তো দরকার। বাড়তি হিসেবে তো এই বারান্দার জায়গাটা। আর কুকুর দুটোকে রাখার মত ওই একচিলতে ঘুপচিটা।

কুকুর তো তার জীবনযাপনের অঙ্গ। যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে বলতে গেলে তখন থেকেই সে কুকুর নিয়ে আছে। প্রথম প্রথম তো রাস্তার কুকুর নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করত— সত্তার সঙ্গেহ জড়িয়ে গেছে। দু দুটো দেশি কুকুর পটপট করে মরে যাওয়াতেই না জিম নামের অ্যালসেশিয়ানটা সে রাখতে বাধ্য হল, আর এই তো ক' বছর তার দোসর জুড়িটা এনেছে— বিচার বিবেচনা না নিয়ে কী সংসারে তিষ্ঠনো যায়। আর এখন, মানে এই মাসখানেক সময়ই মোক্ষমভাবেই জানান দিচ্ছে এই দুটো কুকুর তার জীবনের পক্ষে কতখানি জরুরি ছিল।

গাড়ির প্রসঙ্গটাকে খুব স্পর্শকাতরভাবে তুলেছে বটে ঐশী। কিন্তু হলফ করে বলতে পারবে এ-ব্যাপারেও কোন ভোগাকাঙ্ক্ষা বা বাহুল্যকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রয়োজন ছিল তার একটা নতুন গাড়ির— যার একটু বেশি স্পেস থাকবে, ঘাড় গুঁজে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে যাতে ঢুকতে বেরুতে না হয়। আর্থারাইটিসের অসুখবিসুখ যেভাবে বাড়ছে— ছেঁকে ধরছে। তাতে আঘাতজনিত সে-সব রন্ধ্রগুলোকে সে ঢাকবে না।

আর ওই-যে মোজাইক ফ্লোরিং- এর জায়গায় যে মার্বেল টাইলসের কথাটা পেড়েছে— অল বোগাস! শুধু অভিযুক্ত করার জন্যেই অভিযুক্ত করা। সে কী জননেতা, প্রত্যক্ষ রাজনীতি করছে। দরিদ্র জনগণের সঙ্গে ভাগ করে অন্নপানীয় নেবার কড়ার করেছে!

তবে হ্যাঁ মূলে— আরও মূলে গিয়ে একটা জায়গায় ঐশী তাকে ধরতে পারত। সেই অতীতটা ঠিক জানে না ঐশী। জানত মনোরমা, মধ্যে মধ্যে যে-কারণে নির্বিষ টিপ্পনীও কাটত।

নড়েচড়ে ওঠে শমিতকান্তি মজুমদার। এই তো সেদিনের কথা। শঙ্কর ঘোষ স্ট্রিটের একফালি বাড়িতে তখন বসবাস। নতুন বিয়ে করলেও মন পড়ে থাকত পাড়ার রকে ঘোঁটে জটলায়, আদর্শ বিশ্বাস নিয়ে সমবয়সীদের প্লাবিত করে দেবার মনোভাবে সারাটা দিনকে বাধ্য ছাত্রের মতই প্রিয়ডে প্রিয়ডে ভাগ করে রাখত। আজ এ পাড়ায় অমুক সময়ে ওদের নিয়ে বসার একটা নির্ঘণ্ট থাকে তো, কাল ও-পাড়ায় তমুক ঘণ্টায়! বড়ো রাস্তা আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে সেন্ট পলস কলেজের নতুন চাকরি, সেখানে যাওয়ার জন্যে সময় বার করে নিতেও যেন গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়, তবে সেখানেও রুটিন বেঁধে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, চাকরির শর্ত অনুযায়ী ক্লাসের উপস্থিতি ছাড়াও ছিল সেই একই টান— আর সময় বাজে বাজে ভাবে কাটতে দেওয়া উচিত নয়। দেশকাল পরিস্থিতি পরিজন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করে তুলতে হবেই, আজেবাজেদের খপ্পরে কিছুতেই পড়তে দেওয়া যাবে না! কে বা কাকে কার কুক্ষিতে ছেড়ে দিতে চায়! হই হই করে এসে পড়ল কলকাতা জীবনের সেই-সে বহু আলোচিত বাহাত্তর সালের নির্বাচন- পর্ব। শঙ্কর ঘোষ স্ট্রিট থেকে বাস উঠল। কলেজে পোস্টার পড়ল— 'অধ্যাপক শমিতকান্তি মজুমদারের অপসারণ চাই', 'নোংরা রাজনীতির বিষক্রিয়া থেকে সুকুমার ছাত্রছাত্রীকে বাঁচাতে শমিতকান্তি মজুমদারকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করুন।' একদিন কলেজে ঢুকতে গিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া জামা নিয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে আসতে হয়। ফার্স্ট-এড্ নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু জিরিয়ে যে নেবে তারও উপায় নেই, সেই রকমের একটা ডেরা— ঘর বা আস্তানার আশ্রয়ই বা কোথায়? কে কাকে দেয় বরাভয়? কিছুদিনের জন্যে তাকে গিয়ে উঠতে হয় উত্তরপাড়ার মনোরমাদের বাড়ি। তারপরে মনোরমার স্কুল-পাড়া নাগেরবাজার দেবীনিবাসে এসে বাসা ভাড়া করতে হয়। মনোরমার স্কুলের বেতনও তখন ছিল অনিয়মিত, তার ওপরে আহামরি তো নয়ই। অধিকন্তু নতুন অতিথি এক বছরের রোমি!

ভাবলে সেইসব দিনগুলোর এক-একটা পরিস্থিতির টুকরোটাকরা কিছু মুহূর্তের কথা এখনও জেদি মাছির মতো চোখের তারায় ঘুরেফিরে আসতেই থাকে। ধারদেনা করে কদিনই বা প্রয়োজন মেটানো যায়! উপায়ের ফিকির খুঁজতে হয়। সেই-সে-ফিকিরেই তার নতুন জীবনের সূচনা ঘটে যায়।

নাগেরবাজারের সেই-সে হায়ার পারচেজের দোকানটায় 'ফ্রিজ সারাবার মিস্ত্রি চাই' বিজ্ঞাপন-কার্ডটা ঝুলতে দেখেই কীভাবে যেন দুলে উঠেছিল। কেতাবি বিদ্যেটা নিয়ে একটা লাকট্রাই করবার মত করেই এগিয়ে গিয়েছিল, থার্মোডিনামিকসের কুশলী অধ্যাপকের কাছে কাজটা কী খুবই শক্ত! সফল হয়েছিল। দশমিনিটের নাড়াচাড়াতেই পঞ্চাশটা টাকা পেয়েছিল। শুধু পঞ্চাশটা টাকাই নয়, ধন্য হয়ে যাওয়ার মত করেই দোকানের মালিক তার সঙ্গে কথা বলেছিল, নামঠিকানা জিজ্ঞাসা করে মধ্যে মধ্যে আসতে বলেছিল, কেননা 'মানুষের রুচি

পালটাচ্ছে, প্রয়োজন পালটাচ্ছে', প্রয়োজনের মানুষকে খুবই দরকার। পরপর দু-একদিন আসা যাওয়ার যথারীতি মূল্য তো পেয়েছিলই, অধিকন্তু ফিসফিস করে জানিয়েছিল তার নতুন মতলব,'আপনাদের মতন কাজজানা লোক পেলে পাকাপোক্তভাবে একটা রেফ্রিজারেটর সার্ভিসিং সেন্টার করতে পারি, কী মশাই আসবেন না কি? বুকে তোলপাড় তুলেছিল সেই কথাটা—তবে দোকানের সেই-সে-মালিকের সঙ্গে চুক্তিতে নয়, নিজেই তার একটা স্বাধীন বন্দোবস্ত করে তুলতে মতলব এঁটেছিল। সাহায্য পেয়েছিল দুজন অর্ধশিক্ষিত উদ্যোগী যুবকের— রতন এবং মুকুন্দ। স্থানীয় ছেলে, নাম কে ওয়াস্তে একটা ছোট্ট অঙ্কের বরাদ্দে দেবীনিবাসের একটা চিলতে পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড লট্কে দিয়েছিল 'নিয়ো সার্ভিস সেন্টার।'

বুঝতে দেরি হয়নি— মানুষের প্রয়োজন পাল্টেছে, রুচি পাল্টেছে। মানুষ নিজেকে নিয়েই নিজে কীভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইছে। নিত্যকারের জিনিসপত্রের দরদাম বেড়ে চললেও কীভাবে যেন একটা টাকার ঢল নেমে গেছে। একশ্রেণী সেই-সে-টাকা নিয়েই নিজেকে— নিজেদের নতুনভাবে গুছিয়ে নিতে চাইছে, জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে নেওয়া যাবে বলে। তার সেন্টারের ট্রানজাক্সন-গ্রাফই নতুন দৃষ্টি এনে দিয়েছিল, এ-মাসে যদি বিশটা ট্রানজাক্সন হয় তো পরের মাসে একশোবিশটা। এ-বছরে বারোশ'টা যদি হয় পরের বছরে বারো হাজারটা।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা পাল্টাতেই আচম্বিতেই একটা থোক্ টাকাও এসে গিয়েছিল হাতে, যদিও সূচনাটা ঘটে গিয়েছিল যেদিন মার খেয়ে কলেজ যেতে পারেনি সেইদিনই। সেই-সে-দিনই ওই রক্তাক্ত অবস্থায় ডাক্তার রিপোর্ট নিয়ে আদালতে গিয়েছিল নালিশ নিয়ে— বলপূর্বক তাকে চাকরিতে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এতদিন পরে তারই রায় বেরয়— কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে যেন অধ্যাপক শমিতকান্তি মজুমদারকে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সাত বছরের বকেয়া মাইনে সুদসমেত মিটিয়ে দেয়।

রায়ের কপি নিয়েই শমিত তার সেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিল এবং কয়েকদিন পরেই পদত্যাগপত্র দাখিল করে সাতবছরের ওই বেতনের টাকা লগ্নি করে দিয়েছিল তার এই নিয়ো সার্ভিস স্টোরে। নতুন শাখা খুলেছিল— সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ বিক্রির। ব্যবস্থাটাকে আরও নিপাট সুন্দর করে তুলতে মুকুন্দকে একটা স্প্রে-রঙের ট্রেনিং করিয়ে আনিয়েছিল। কোনও দিকে দৃক্পাত করেনি। ক্রমে ক্রমে মনোরমার সঙ্গে পরামর্শও করতেও চাইত না। বরং একদিন মৃদু অসন্তোষ প্রকাশ করলে মনোরমা ঝাঁজিয়ে উঠে বলেছিল,— তুমি আমার শুধু টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাটাই দেখলে! দেখছ না রতন মুকুন্দরা আমাকে ধরে কী ভাবে উঠতে চাইছে! জানো আমাকে খুঁটি হিসেবে ধরেই এই বাজারে এগারোটা পরিবার খেয়েপরে আছে। এই দিকটা না দেখে তুমি সস্তা কাগুজে কথা বলছ। বলতে বলতে যদিও বলার দম হারিয়ে ফেলছিল, কেননা জানত, তার কথাগুলো কত অন্তঃসারশূন্য— এই উন্নয়নের তত্ত্ব কত অসার! যে-মুহূর্তে যে ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এগারোটা পরিবারের সংসারযাত্রা নির্বাহের মোটামুটি সংকুলানের কথা বলছে, সেই মুহূর্তে সেই ব্যবস্থাতেই নিদেনপক্ষে এগারো'শো পরিবার ন্যূনতম প্রয়োজন সংগ্রহের সামর্থ্যের একেবারে বাইরে চলে যাচ্ছে— আগে তো কথায় কথায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে জটলায় এইসব কথাই বলত।

কিন্তু যুক্তির এ ভাষা জানত না মনোরমা। তার পক্ষে যেসব কথা বলা স্বাভাবিক ছিল, সেই কথা নিয়েই মিউমিউ করে উঠেছিল।

'না সে-সব কথা আমি বলছি না। বলছি আমাদের পারিবারিক পরিবেশটাই পাল্টে গেল। সব সময় যন্ত্রপাতি লোহালক্কড় নিয়ে রোমিটা খুটখুট করেই যাচ্ছে। ভীষণভাবে তোমাকে অনুসরণ করে যে।''

'তাহলে তবে যাবে— সত্যি যদি অনুসরণ করতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলার জন্যে পরিশ্রম করে যাওয়া কিছু অন্যায় নয়।'

'তা বলে মূর্খ হয়ে থাকবে?'

'এরই মধ্যে ছেলেকে তুমি মূর্খ দেখে ফেললে! ফর্মাল এডুকেশনের থেকে এসব দিকের মূল্য অনেক বেশি। প্রবণতাটা যদি থেকেই থাকে— থাক না। দমিয়ে দেবার চেষ্টা করবে কেন? দিনকাল খুব খারাপ আসছে।'' ...

স্মৃতি রোমন্থনের রেশটা আচমকাই কেটে যায় ঐশীকে দেখে।

ঐশী সাজবদল করেছে। সন্ধের এই সময়টা অল্পস্বল্প সাজগোজ করে বাইরে বেরয়। বাড়িতে থাকলে চোখেও পড়েছে। মেয়েলি কত টুকিটাকি জিনিস কেনাকাটার থাকে, সব জিনিস কী কাজের লোকজনদের মাধ্যমে আনানো যায়! চোখ মেলে শমিত এসব কখনও দেখেও দেখেনি। কিন্তু আজ যেন কেমনভাবে চোখে গেঁথে যায়। লম্বাচওড়া বড়ো শরীরের মেয়ে, তার ওপরে আবার মা হয়েছে। চিবুক কণ্ঠা কটির কৃশতা সত্ত্বেও কেমন যেন ভরা ভরা ভাব— সেকেলে লেখক-কবিরা ভরা শরতের নদী-জলাশয়ের উপমা দিয়ে যে-কথাটা বলতে চাইত— যে দিকে তাকালেই মানুষের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে বৃহৎ প্রাপ্তিযোগের স্বপ্নছায়ায়। কিন্তু তা তো হয় না— চোখদুটো কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, বুকের মধ্যে থেকে দমকে দমকে একটা গরগরে ভাবই জেগে ওঠে শমিতের। তিরতিরে বাতাসের কাঁপনলাগা জলাশয়ের মতই কেমন যেন প্রগলভতা শরীরময় ঘুরতে ফিরতে থাকে। শালোয়ার কামিজ পরেছে, বুকে দিয়েছে দোপাট্টা,— দোপাট্টার দোলানো ভঙ্গিতে স্তনদ্বয়ের সুস্পষ্ট ডৌলটাই যেন আরও দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসার মধ্যে দিয়েও কেমন যেন ছন্দিত হয়ে চলেছে ভোগদখলের চিরস্বত্বদাখিলদারির, কোথাও এতটুকু গ্লানিবোধের জড়তা নেই— নেই নতুন সিদ্ধান্তগ্রহণের কম্প্রতা।

কী যেন ঘটে যায় শমিতকান্তির শারীর অস্তিত্বে! কেমন যেন তার মনে হয় সে ফেটে যাচ্ছে, খণ্ডে খণ্ডে কণায় কণায়। অথচ কী অলৌকিক প্রক্রিয়াতে যেন একই কাঠামোয় চামড়ার আস্তরণে সে বাঁধা পড়ে আছে। সেই অসহনীয় অবস্থাটা কাটাতেই ঘর থেকে পা বাড়াবার উপক্রম করে।

'কোথায় পালাচ্ছ?'

'পালাচ্ছি।'

'হ্যাঁ পালাচ্ছ! বলছিলাম তোমার আমি সাহায্যপ্রার্থী। তুমি আমার আইডল। এই দু-আড়াইবছর তোমাকে দেখে দেখেই আমি তৈরি হয়েছি — নিজেকে তৈরি করেছি।'

বোবা আর্তনাদে ফ্যাঁসফেঁসিয়ে ওঠে শমিতের গলা।

'কী বলছ তুমি?'

ধারালো খোলা ছুরিতেই যেন আলো পড়ে— যথাসম্ভব স্ফুরিত সেই হাসিকে দু দাঁতের পাটিতে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেই খপ্ করে শমিতের ডান কব্জিটা ধরে নিয়েই ঐশী এগিয়ে আসে লাউঞ্জে।

'কী করতে চাইছ তুমি?'

'দ্যাখো তো এটা কী?'

'কী আবার!'

সচরাচর যে-ভাবে যে-চোখে মানুষজন দেখে সেই ভাবেই শুরু করলেও পলকের মধ্যে থমকে গিয়ে অন্য চোখে দেখতে থাকে লাউঞ্জের সেন্টার-টেবিলটা— পায়াবিহীন স্ফটিকউজ্জ্বল কাচের টেবিল, ওপরের টপটা ধরে রেখেছে তলায় একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া।

ভাল করে বুঝে ওঠার আর না অবকাশ দিয়েই ঐশী তর্জনী উঁচিয়ে বলে ওঠে,

'ঐদিকে তাকাও এবার!'

'কোন দিকে?'

'ওই যে তোমার ওই— সাধের ডাইনিং টেবিল।'

এই টেবিলটাও আগের ওই সেন্টার-টেবিলের মতই ইটালিক স্থাপত্যের। একই রকম স্ফটিকোজ্জ্বল কাচের পাটাতন। তলায় সাদা পাথরের উড়ন্ত রাজহাঁস—উড়াল ডানাতেই ধরে রেখেছে ভারী পাটাতনটি।

'মনে আছে কী বলেছিলে?

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠের কোনও বাক্যস্ফূর্তির আগেই বলে ওঠে ঐশী,

'বলেছিলে আমার একটা মাত্র ছেলে তার বিয়ে— এমন সুন্দর আমার বৌমা হচ্ছে— আমি ঘর সাজাব না— আমোদ আহ্লাদ করব না— আশা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটাব না। মানুষেরই না এটা ধর্ম।'

'পুরানো সে-সব কথা এভাবে কেন তুলছিস মা?'

'এখনও বুঝলে না! না কিছুতেই বুঝবে না? এবার তাকাও তুমি তোমার ঠিক সামনের দেওয়ালটায়।'

তাকাতেই ঝকঝকিয়ে ওঠে উত্তরের দেওয়ালের রবীন্দ্রনাথের বিশাল অতুলনীয় অয়েল পেন্টিংটা। ইন্ডিয়ান ক্যানভাস ডটকমের ওয়েবসাইট প্লাক্ করে হুসেইনের এই ছবিটা আনিয়েছিল গত পঁচিশে বৈশাখই।

এবার কান্নার তোড়ে যাতে গলার স্বর বুঁজে যায় সেই জন্যেই ঐশী নিজের গলাটা নিজের হাতেই চেপে ধরে বলে চলে,

'বাপি কখনও প্রয়োজন, কখনও শিল্প সৌন্দর্য্য রুচি, কখনও স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা, কখনও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কখনও তুচ্ছ সাধআহ্লাদের নাম করে নিজেকে শুধু আস্ত রাক্ষসই করে তোলোনি— তোমার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসেও ওই রাক্ষুসে—'

আর নিজেকে রুখতে পারে না, লুটোনো কান্নাতে গুঁড়িয়ে গিয়েই বলে চলে, 'কিন্তু আমি বাঁচতে চাই বাপি। আমাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিয়ো না। আমাকে রক্ষা করো— আপনি আচরি ধর্ম, আমাকে শেখাও।'

পতনের পর

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল শমিতার।

এত নির্লজ্জ যে কোনো মানুষ হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি রণেনের, মুখচোখের ভাব পাল্টায়নি একতিল—হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আলাপ করিয়ে দিই, আমার বান্ধবী চিত্রাণী, আর চিত্রাণী—ইনি আমার আদি কৃত্রিম স্ত্রী শমিতা।'

চিত্রাণী, মানে ওনার রং-চং মাখা নেকি বান্ধবী পর্যন্ত ব্যাপারটা ভালো হজম করতে পারেনি, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে শমিতা। ভুরু কুঁচকে, একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকানোতেই বোঝা গিয়েছিল ওদের এতক্ষণের আলাপে অন্তত রণেন তার স্ত্রী নামক জীবটির অস্তিত্ব ওকে জানতে দেয়নি। কিন্তু ওর সেই বিস্ময়ের তোয়াক্কা না করে এবং শমিতার সঙ্গে এভাবে অতর্কিতে দেখা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকেও একেবারে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলেছিল, 'চিত্রাণীর সঙ্গে কাজের কথাগুলো সারতে আমার আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে। তুমি বরং মিছিমিছি দেরি না করে'—

এমন নির্লজ্জভাবে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে নিজের স্ত্রীর কাছে! গোপন অভিসার করছ তাতে লজ্জা নেই, স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছ তাতে লজ্জা নেই—তারপরও ধরতে গেলে স্পষ্টভাষায় বউকে বলছ, তুমি যাও, তুমি থাকলে আমার পরকীয়া প্রেম করতে অসুবিধে হচ্ছে।

কোনো মেয়েই রণেনের ওই কথার পর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, অন্তত আত্মসম্মানজ্ঞানের ছিটেফোঁটা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকলে। শমিতাও পারেনি। দীর্ঘ ঘণ্টাদুয়েক নিজের সঙ্গে লড়াই করে যখন বিধ্বস্ত, বাড়ি ফিরে আশ্চর্য শান্ত আর সহজভাবে রণেন এগিয়ে এসে কথা বলেছিল ওর সঙ্গে, যেন কিছুই হয়নি, কোনো ঘটনাই ঘটে নি আজ সন্ধেবেলা।

না, এটা যদি ওর জীবনের একমাত্র 'অ্যাফেয়ার' হত, এতটা ভেঙে হয়তো পড়ত না শমিতা। ভুল মানুষই করে, সহানুভূতির সঙ্গে সেই ভুলটা মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে একদিন না একদিন সে ভুল ভাঙবেই—এ জোর শমিতার ছিল। কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন-চার মাস পর থেকে ক্রমাগত যে কথাগুলো কানে আসতে শুরু করেছে, কানের ভেতর সাপের ছোবলের মতো আছড়ে পড়েছে—তার পরেও নিজেকে ঠিক রাখবে কী করে।

প্রথম প্রথম বিশ্বাস করেনি। ওনারশিপ ফ্ল্যাট, গায়ে গা দিয়ে বাস করা অনেকগুলো পরিবার। মিসেস আচারিয়া, মিসেস বাসু, বেনু, সুতপা—ছুটকো-ছাটকা উপলক্ষ নিয়ে সবাই ছুটে আসছে, গলায় গলায় ভাব দেখাচ্ছ। অথচ ভেতরে ভেতরে একজন যে,

আর একজনের নিন্দে ঘাঁটতেই বেশি উৎসাহী সে ওদের সামান্য দু-চারটে কথাবার্তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই প্রথম যখন শুনেছিল ওদের ব্যাঙ্কের কাছাকাছি এক রেস্টুরেন্টে প্রায় প্রত্যেকদিনই রণেন টিফিন সারছে একটি অবাঙালি মেয়েকে নিয়ে, বিশেষ পাত্তা দেয়নি শমিতা। বাইরে কাজ করে যে পুরুষ মানুষ, অনেক মেয়ের সংস্পর্শেই তাকে আসতে হয়, এভাবে সন্দেহ করতে গেলে তো তার কাজকর্মই বন্ধ করে দিতে হয়।

কিন্তু এই উড়িয়ে দেওয়া ভাবটা রাখা যায়নি যখন রণেন রাত করে ফিরতে শুরু করল। ওনারশিপ ফ্ল্যাটের গেজেট মিসেস বাসু খবর দিয়ে গেলেন একটি অষ্টাদশী মেয়েকে যাদু করেছে রণেন—সন্ধের পর সিনেমা রেস্টুরেন্ট সব কিছুই চলছে। খবরটি দেবার পর চোখমুখ ঘুরিয়ে এ-ও বলে গেলেন, 'এবার একটু কড়া হও শমিতা, নইলে কিন্তু স্বামীকে আর বশে রাখতে পারবে না।'

বিয়ের তখন সবে ছ'মাস, কী বলবে শমিতা। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে কড়া হাতে শাসন করবে! সবচেয়ে বড় কথা, কী বলবে কি ও রণেনকে? বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘরে ফেলে কেন তুমি অন্য মেয়ের পেছনে ছোট! বলা যায়? কোনো মেয়ে এ কথা বলতে পারে তার স্বামীকে!

তবু শমিতা বলেছিল, লাজলজ্জার মাথা খেয়েই বলেছিল। না, ঠিক ও ভাবে কখনোই নয়, বলেছিল একটু ঘুরিয়ে—'এত রাত করে আসো তুমি—আমার ভালো লাগে না, এক্কেবারে একা—'

'ভয় করে বুঝি!' রণেন একরাশ আদর ঢেলে দিয়ে বলেছিল, 'আমি কাছে না থাকলেই আমার কচি বৌটাকে কেউ গপ্ করে গিলে ফেলবে?'

'যাঃ, ঠাট্টা কোরো না! সন্ধের পর বুঝি আর একা থাকতে ভালো লাগে।' 'আমারই বুঝি খুব ভালো লাগে!' উলটে বলেছিল রণেন—'আসলে কাজকর্ম অনেক সারতে হয় এখন সন্ধেবেলা। এপ্রিলটা যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এপ্রিল গিয়েছিল, সব ঠিক হয়ে যায়নি। বরং বেড়ে গিয়েছিল উৎপাত। এবার ডায়মন্ডহারবার রোডের এমন সব হোটেলের খবর কানে আসতে শুরু করেছিল যেখানে নাকি কয়েকঘণ্টার জন্য প্রমোদ-সঙ্গিনী পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে স্বামীর খোঁজখবর করার মতো প্রবৃত্তি শমিতার হয়নি। কেবল একটা গোটা রাত যেদিন বাড়ি ফেরেনি সেদিন নিজেকে আর সামলাতে পারেনি ও। না, বলবার মতো কেউ ছিল না, বলবার মুখও ছিল না ওর। বিয়েটা বলতে গেলে বাড়ির সকলের অমতে একেবারে পুরোপুরি নিজের সিদ্ধান্তের ওপরই করেছিল—বাড়ির প্রত্যেকটি লোক এরকম একটি চালচুলোহীন ভবঘুরে মানুষকে বিয়ে করতে বারণই করেছিল। আলাপটাও তো অত্যন্ত অল্পদিনের। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা তুলতে গিয়ে প্রথম আলাপ। দু-চারটে কথাতেই বেশ আপন করে নিয়েছিল, একসঙ্গে চা খেতে ডেকেছিল রেস্টুরেন্টে। পরিচয়টা তখনই জানা গিয়েছিল—তিন কুলে কেউ নেই, ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা মরা। মামার কাছে মানুষ হয়েছে, পড়াশুনা করেছে নিজে টিউশনি করে। ব্যাঙ্কের চাকরিও পরীক্ষা দিয়ে জোগাড় করা। থাকে কোথায় জিজ্ঞেস করতে হেসে বলেছিল—'না, ঘর অবশ্য একটা আছে—ওনারশিপ ফ্ল্যাটের চাবি পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু ঘরণী বলতে কেউ নেই।'

কথাটা বলতে সবচেয়ে চটেছিল বাবা, বলেছিল, 'আজকালকার দিনে উইদাউট রেফারেন্স, এভাবে বিয়ে করাটা খুব রিস্কি খুকি, এরকম ভুল তুই করিস না।' শমিতা শোনেনি, ভেবেছিল মানুষটা তো ভালো—খোলামেলা! তা ছাড়া শ্বশুর নেই শাশুড়ি

নেই, কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই, একটা মানুষকে মানিয়ে নেবার মতো ক্ষমতা আমার হবে না!

সেদিন প্রত্যেকের সেই আপত্তি, সতর্কতা বার বার ধাক্কা দিচ্ছিল বুকের মধ্যে। না পেরে রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ ফোন করেছিল জ্যেঠুকে। একা মানুষ, বিপত্নীক। দুই ছেলেই বিয়ে করে প্রবাসী, ছেলেবেলার অনেকখানি সময়ই কেটেছে জ্যেঠুর কাছে।

খবর পেয়েই জ্যেঠু ছুটে এসেছিল। সমস্ত শুনেছিল শমিতার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রায় সারা রাত জেগেই কেটেছিল দুজনের। কারণ ওকে একা রেখে কোথাও খোঁজ করতে যাওয়া জ্যেঠুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কয়েকটা ফোন শুধু করেছিল—লালবাজার, জি-আর-পি, বড় বড় কয়েকটা স্টেট হাসপাতাল।

অথচ সকালে ফিরে এসেছিল রণেন একেবারে নির্বিকার ভাবে। বলেছিল, 'আশ্চর্য তো! চারদিকে লোক—একটা রাত্তির না ফিরতে পারলে তোমায় বাড়ি থেকে লোক ডেকে আনতে হবে!'

'না, তা নয়, হঠাৎ তুমি একদিন আটকে পড়তেই পার'—জ্যেঠু গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'কিন্তু আসতে যে পারছ না এ খবরটা ফোনে জানাতে পর্যন্ত পারবে না, এটা আর একটু বেশি আশ্চর্যের নয় কি!'

একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা উত্তেজক গল্প বলেছিল রণেন। কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিল ওরা দুজন। শেষ মুহূর্তে ও টয়লেটে যায়, সঙ্গীটি বুঝতে না পেরে বেরিয়ে যায়। দারোয়ান গেট বন্ধ করে দেয়। সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে সকালে কোনোরকমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারোয়ান ওই বাড়িতেই থাকে, দরজা খুলে দেয়।

জ্যেঠু মন দিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনেছিল, শুনে বলেছিল, 'তোমার এই গল্প সত্যি কিনা সেটা যাচাই করা আমার পক্ষে খুব শক্ত নয়, ভিজিল্যান্সে পুরো বারো বছর কাজ করেছি আমি। তবে এতে আমার প্রবৃত্তি নেই। মেয়েটাকে তুমি ওইরকম করে কষ্ট দিয়ো না, তাহলেই আমি সুখী হব।'

দিনকতক বোধহয় কমেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু রক্তে যার লাম্পট্য, তাকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা তো শক্ত ব্যাপার! তাই পুরনো অভ্যেস আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল—সেই রাত করে বাড়ি ফেরা, একটা সুখী সুখী ভাব শরীরে জড়িয়ে নিয়ে ফেরা, কৃত্রিমভাবে শমিতাকে ছুঁড়ে দেওয়া, দু-এক টুকরো আলতো আদর। মিসেস বাসু বলেছিলেন রেস্টুরেন্টটার নাম, এও বলেছিলেন মাসখানেক ধরে একটি নতুন মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে রণেন।

সেই কারণেই এসেছে শমিতা, আসতে হয়েছে ওকে!

একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। আর সহ্য করা যায় না। দরকার হয়, সেপারেশনের ব্যবস্থা করে দিক। ছুঁতে পর্যন্ত এখন ঘেন্না করে ওকে। কেউ না থাকুক জ্যেঠু আছে, আর আছে ইংরেজির একটা এম. এ. ডিগ্রি। ব্যবস্থা একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে।

দ্বিতীয়বার অর্ডার দেওয়া চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাতে গিয়ে শমিতার মনে হল মিসেস বাসু বোধহয় ভুল খবর দিয়েছেন, রণেন আজ এখানে আসবে না। যা স্বভাব, পালটে গিয়েছে মনে করার কোনো কারণ নেই। হয়তো অন্য কোনো জায়গায় চলে গিয়েছে—চাই কি ডায়মন্ডহারবার রোডের সেই নরকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শমিতা আসতে পারে আজ, এ খবরও পৌঁছে যেতে পারে। ওর মতো দুর্বৃত্তের পক্ষে সব খবর জোগাড় করাই সম্ভব।

বিস্বাদ পানীয়টা এক চুমুকে গলায় ঢেলে উঠে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎই চোখ পড়ে গেল দূরে একেবারে কোণের টেবিলটায়।

মেয়েটাও তাকিয়ে আছে, ওরই দিকে। একদৃষ্টে।

স্মৃতির এলোমেলো কিছু পাতা উড়ে গেল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বাগবাজার মাল্টিপারপাস্। হালকা বেগুনি-সাদা স্কার্ট। দুদিকে ঝোলানো বেণী। পিকনিকে পটল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলা। ক্লাস টেনে বাবা বদলি হওয়ায় চলে যাওয়া। সারাদিন কান্নাকাটি।

কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছে শমিতা, খেয়াল করেনি। টেবিলগুলোর পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই টেবিলের সামনে। ফিসফিস করে বলে উঠেছে—'কেয়া!' 'শমিতা!' এবং একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা—'কী আশ্চর্য, এতদিন পরে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে'—

'বোস বোস'—শমিতা নিজেই আগে বসল, 'যদিও মনের অবস্থা ঠিক কথা বলার মতো নেই আমার! কিন্তু তবু এ্যাদ্দিন পরে একটা নিজের লোক পেয়ে'—

'এগ্‌জ্যাক্টলি!' কেয়া বলল—'অসম্ভব বিচ্ছিরি অবস্থায় আছি আমিও। লোকটাকে পেলে এই মুহূর্তে বোধহয় খুন করে ফেলতাম আমি। তুই এসে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিস আমায়।'

'কারো জন্যে অপেক্ষা করছিস তুই? ভদ্রলোক কি—'

'ভদ্রলোক!' থামিয়ে দিয়ে কেয়া বলল—'জানোয়ার বললেও খুব কম বলা হয় ওকে। ভণ্ড, প্রতারক, লম্পট—একটা—একটা নরকের কীট—'

'কেয়া, কেয়া প্লিজ—একটু শান্ত হ!' নিজের দুঃখ ভুলে শমিতা ওকে জোর করে বসিয়েছিল, বলেছিল, 'আমাদের সমাজে এইরকম ছদ্মবেশী লম্পট অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুই কি তা জানিস না?'

'একদম বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস কর! এমন চমৎকার ব্যবহার, এমন পলিশড্ কথাবার্তা, এরকম একটা সাবমিসিভ ভঙ্গি—মাত্র ক'দিনের মধ্যেই লোকটা কেমন করে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল। বুঝতে যখন পারলাম, ইট্‌স্ অল ওভার! দু-হাতে মুখ ঢেকে কেয়া বলল, 'আর আমার কিছু করবার নেই।'

'মানে! কী বলছিস তুই!' দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগল ওকে শমিতা—'করবার নেই মানে কী!'

'মানে আমি ভিখিরি হয়ে গেছি—কিছু নেই রে আমার।' ফুঁপিয়ে উঠল কেয়া। চুপ করে গেছে শমিতাও। সত্যিই কিছু বলার নেই এখন। নিজের দুঃখেই ছটফট করছিল, নিজের ঘরের মনুষ্যরূপী শয়তানটাকে নিয়ে। এখন নতুন একটা উপসর্গ জুটল। পৃথিবীতে শয়তানের অভাব নেই।

'কী করে যে এমন একটা ভুল করলাম—' হাত থেকে মুখ তুলতে তুলতে যেন আপন মনেই বলছিল কেয়া, 'আসলে ব্যাঙ্কে কাজ করে, দিব্যি ভদ্রসভ্য মানুষ—তার মধ্যে যে এরকম একটা জঘন্য জানোয়ার লুকিয়ে আছে—'

আমারও তাই, আমারও তাই। মনে মনে বলছিল শমিতা—ক'টাকে আর তুই চিনিস কেয়া! ক'টাকে আমরা চিনি! জামা-কাপড় পরা জানোয়ারে কলকাতার জঙ্গল ভরে গেছে।

'আগেই এসে যায় অন্যদিন'—কেয়া আপনমনেই বলেছিল, 'এসে দেখতে না পেয়ে একটু খটকা লেগেছিল। এখন তো স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার কাছে ওর দরকার শেষ—মৌমাছি এখন নতুন ফুলের সন্ধানে ছুটেছে।'

মুখ নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে একটা নাম উচ্চারণ করল কেয়া, অবশ্য স্কাউন্ড্রেল শব্দটা যোগ করে।

শব্দটা একখাবলা হিমশীতল জলের মতো আছড়ে পড়ল শমিতার মস্তিষ্কে।

প্রথমটা মনে হল শমিতা কিছু বুঝতে পারছে না। অথবা ও একেবারেই বিছিন্ন একটা দর্শক। সামনে রেস্টুরেন্ট, অনেক লোক, টেবিল, চামচের টুং টাং, ওর বন্ধু কেয়া, রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার—

দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে হল শমিতা কিছু যেন অনুভব করতে পারছে। কেয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। কিছু একটা যেন বলছে ও, শব্দগুলো শমিতার কানে এসে পৌঁছচ্ছে না।

অথবা পৌঁছচ্ছিল, অর্থহীন কিছু ধ্বনিতরঙ্গ হয়ে, তার কোনো সুস্পষ্ট অর্থ ওর কাছে ধরা দিচ্ছিল না। এই মুহূর্তে ধ্বনি-তরঙ্গগুলো যেন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রশ্নটা বুঝতে পারল শমিতা। নিজের আড়ষ্ট ঠোঁট দুটো নাড়ার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'চিনিস তুই। ওই রকম একটা লম্পট স্বার্থপর জানোয়ার—'

'আমার স্বামী।' কথা বাড়তে না দিয়ে বলে ফেলল শমিতা।

এবার কেয়ার পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছিল শমিতা। অনুভব করতে পারছিল, অনুভব করার শক্তি ওর ছিল এখন।

যন্ত্রণায় নীল হয়ে গিয়েছিল কেয়ার ঠোঁট। সমস্ত মুখ পাংশু। চোখ দুটো মুহূর্তে কেমন সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত।

'আয়'—দৃঢ়স্বরে ডাকল শমিতা, যেন মনে মনে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এই ভাবে বলল, 'আমার বাড়িতে চল।'

'মানে?'

'থাকবি আজ, ফিরবি না। দরকার হয় চল, তোর বাড়িতে জানিয়ে আসব।'

'যেতে হবে না, ফোন করে দিচ্ছি। কিন্তু কেন যাব?'

'কারণ কাজটা আমি একা করতে পারব না। দুজনে মিলে আমাদের কাজটা করতে হবে। আমি জানি, তুই নিজেও এটা মনেপ্রাণে চাইছিস।'

'কিন্তু কথাটা কী?'

'লোকটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। বেঁচে থাকলে আরও বহু মেয়ের সর্বনাশ ও করবে। দ্যাট সন অফ আ বিচ, রণেন মুখার্জি! ইয়েস, হি মাস্ট ডাই।'

'হি মাস্ট ডাই। হি মাস্ট ডাই।' কথাগুলো ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার পরেও আরও বেশ ক'বার বলেছিল শমিতা। অদ্ভুত এক প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে গিয়েছিল ওর মুখের পেশি। শান্তশিষ্ট মেয়েটাকে বড় বেশি কঠোর এবং নৃশংস দেখাচ্ছিল।

তখনও ফেরেনি রণেন, এখনও না। ঘড়িতে এখন দশটা বাজতে দশ। তার মানে আজকেও বোধহয় সেদিনকার ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে, ব্যাঙ্কে ভীষণ কাজকর্ম করতে করতে আটকে পড়েছে রণেন। আজকের কাজকর্মটা কোথায় সেটা শমিতা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। সেই মধুচক্র ছেড়ে সারারাত ও আসার সময় পাবে কিনা সেটাই শুধু এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

যত সময় যাচ্ছিল, অস্থির হয়ে পড়ছিল কেয়া। ছটফট করতে করতে বলছিল, 'ওঃ, কখন যে আসবে সেই স্কাউন্ড্রেলটা—হাত পা নিশপিশ করছে আমার।'

'কেন, কী করবি তুই?'

'ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর—কামড়ে ধরব ওর টুঁটি, ছিঁড়ে ফেলব ওকে কুটিকুটি করে!' —চোখ জ্বলছিল কেয়ার বাঘের মতো।

'না, ওই জঘন্য মানুষটার জন্যে আমরা কিন্তু কোনো রকম সাফার করব না, কক্ষনো না'—উত্তেজিত ভাবে বলছিল শমিতা। এসে থেকে চেঞ্জ করেনি, কিচ্ছু খায়নি, এমন কি বসেনি পর্যন্ত একবার। জোর করে বসিয়ে দিয়েছিল কেয়াকে সোফার ওপর। সেই দিকে চেয়ে বলল, 'একটা ছুঁচোকে খুন করলে কি মানুষের কোনো শাস্তি হয়, না হওয়া উচিত?'

'কিন্তু আইনের চোখে তো ও একটা সাধারণ মানুষ। আর মানুষকে খুন করলে—'

'সেই জন্যেই তো আমরা ওকে খুন করব না, ও আত্মহত্যা করবে।

'মানে?' এবার কেয়ার অবাক হবার পালা।

'খুব সহজ। অনেক কারণেই তো মানুষ আত্মহত্যা করে. আমরা এই খুনটাকে খুন বলে বুঝতেই দেব না।'

'আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না'—কেয়া ভুরু কুঁচকে বলেছে, 'কীভাবে মারার কথা ভাবছিস তুই?'

'যে কোনো ভাবে! একসঙ্গে অনেকগুলো স্লিপিং পিল খেয়ে ও আত্মহত্যা করতে পারে।'

'খাওয়াবি কী করে?'

'রাতে একগ্লাস দুধ খাওয়া ওর বহুদিনের অভ্যেস। অন্য কোথাও খেয়ে এলেও এটা ওর চাই। আজকাল বেশিরভাগ দিনই একটু বেসামাল হয়ে ঢোকে. কাজেই সন্দেহ করার কোনো প্রশ্ন নেই।'

'কিন্তু'—কেয়া কথা বলতে পারল না কিছু, শুধু একটু থেমে বলল, 'আমার অবশ্য কিছু এসে যায় না, আমি তোর কথাই ভাবছি। কাজটা একটু কাঁচা হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'কেন?'

'এ ভাবে মরলে তার কিছু প্রমাণ খুঁজে পাওয়াই যায়। ধর অফিসের কোনো কলিগের কাছে মানসিক অশান্তির কথা বলা, ডায়েরি-টায়েরিতে কিছু লিখে রাখা. নিদেন একটা সুইসাইডাল নোট'—

'ঠিক বলেছিস। একটা সুইসাইডাল নোট ওর পকেটে থাকবে।'

'কেমন করে? ওর হাতের লেখা এক্সপার্টরা মেলাবে না?'

'মেলাতে পারবে না বলেই তো সেটা হবে একটা ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ—টেবিল থেকে প্যাড নিয়ে খস খস করে ইংরেজিতে কয়েকটি লাইন লিখে ফেলল শমিতা. তারপর সেটা কেয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ তো. চলতে পারে?'

এক পলক দেখে নিয়ে কেয়া বলল, 'চলতে তো খুব ভালোই পারে, কিন্তু এটা হঠাৎ ও টাইপ করতে যাবে কেন?'

'মনে অশান্তি ছিল বলে! আর সহ্য করতে পারছিল না বলে! হাতের কাছে ব্যাঙ্কে টাইপরাইটার ছিল বলে!' —শমিতা রীতিমতো পোক্ত মেয়ের মতো বললে, 'তুই এক্ষুনি এটা টাইপ করিয়ে আন। বারোটা অব্দি লিফ্‌ট চালু থাকে।'

'তাই বলে এখন! এত রাত্তিরে? পাব কোথায়?'

'হাউজিং-এর গেট থেকে বেরিয়েই পাবি। সাড়ে দশটার আগে ওঠে না। আমাকে চেনে, নইলে আমিই যেতাম।'

কেয়া বেরিয়ে যাবার পর ঘড়ি দেখল শমিতা। দশটা বেজে গেছে। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

ফিরবে না আজ রণেন, সেইটেই ঠিক মনে হচ্ছে। তার মনে এত জল্পনা-কল্পনা, এত ফন্দি-ফিকির সব মিথ্যে হয়ে যাবে।

হয়তো ব্যাপারটা কালও করা যায়, অথবা অন্য কোনো দিন। কিন্তু যে রাগ আর প্রতিহিংসায় সমস্ত শরীর জ্বলছে—সেটা তো আর অন্য কোনো দিন থাকবে না। তখন হয়তো মনে হবে মানুষটা অত খারাপ নয়, চেষ্টা করলে মানুষটাকে হয়তো এখনও ফেরানো যায়। হয়তো—

না!!

চাপা গোঙানির মতো শব্দটা বেরিয়ে এসেছে শমিতার মুখ দিয়ে। লোকটা জাত-লম্পট। আজকে লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া মানে যে সর্বনাশ ওর হয়েছে, কেয়ার হয়েছে, আরও অনেক মেয়ের সেই সর্বনাশ হওয়া। এবং তার পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্যই থাকবে শমিতার ওপর, কারণ সমস্ত জেনেশুনেও মানুষটাকে আটকাবার কোনো চেষ্টা সে করেনি।

ভাবছিল, দরজায় প্রায় দড়াম করে ধাক্কা দিয়েই ঢুকে পড়ল কেয়া।

রীতিমতো হাঁফাচ্ছে ও। সমস্ত মুখ ঘেমে গেছে—চাপা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে সারা মুখ।

'কীরে, হল না?'

কেয়া ঘাড় কাত করল একদিকে, অর্থাৎ হয়েছে। কথা বলতে পারছিল না। অনেক কষ্টে একটু শ্বাস নিয়ে বলল, 'ভেতরে ঢুকতে দে আমায়, ও এসেছে।'

'কে, রণেন!' বুকটা ধ্বক করে উঠল শমিতার—'দেখেছে নাকি তোকে?'

'দেখবার অবস্থায় ছিল না, ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বচসা করছিল। আমি কোনো রকমে এসে লিফটে উঠে পড়েছি।'

'এক্ষুনি আসবে তো তাহলে?'

'এক্ষুনি আসবে। তুই এক্ষুনি আমাকে—'

কেয়ার কথা শেষ হবার আগেই দরজার কাছে চেনা পায়ের শব্দ এগিয়ে এসেছিল। ইঙ্গিতে ওকে ভেতরে যেতে বলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শমিতা।

'দারুণ, দারুণ! দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে আছ'—সামান্য একটু জড়িয়ে যাচ্ছিল রণেনের কথা, 'আজও একটা বিশ্রী ঝামেলায়'—

'এসো, ভেতরে এসো'—দরজা বন্ধ করে প্রায় ধরে ধরেই ওকে শোবার ঘরে নিয়ে এল শমিতা, 'খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়েই এসেছ মনে হচ্ছে?'

'বাঃ, ঠিক ধরেছ তো!' জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রণেন বলল—'ভীষণ খিদে পেয়েছিল, থাকতে পারছিলাম না বলে কিছু আনিয়ে নিলাম। তুমি খেয়ে নাও।'

'খেয়ে নিয়েছি আমি'—শমিতা বললে, 'অনেক পুরনো এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা—তাকে টেনে এনেছি বাড়িতে, আটকে দিয়েছি। সকালেই আলাপ কোরো, নাকি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, গল্প করো ওর সঙ্গে প্রাণ ভরে—আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ছি।'

'দুধ খাবে না?'

'ও নো, লিভ ইট। ঘুমে আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। গুডনাইট ডার্লিং!'

দরজা ভেজিয়ে চলে এল এ ঘরে।

কথাবার্তা কেয়াও শুনতে পেয়েছিল, বললে, 'তাহলে?'

'ভাবতে হবে'—মুষ্টিবদ্ধ হাতে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শমিতা, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'ভালোই হল এটা।'

'কোনটা?'

'এই ঘুমের ওষুধ না খাওয়ানোটা। পোস্টমর্টেম একটা হতই, আর একটু হলেও সন্দেহটা আমাদের দিকে আসত।'

'কিন্তু কাজটা হবে কী করে তাহলে?'

'হবে। দারুণ প্ল্যান এসেছে মাথায় একটা'—শমিতা বললে, 'আমাদের এই ফ্ল্যাটটা কত তলায়?'

'সাততলা।'

'সাততলা থেকে পড়লে মানুষ বাঁচে?'

'অসম্ভব।'

'তবে? রণেন সাততলা থেকে লাফিয়ে পড়বে নিচে।'

কেয়া থিতিয়ে গিয়েছিল কথা শুনে একটু, অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে বলল, 'তার মানে? আমরা ফেলে দেব ওকে?'

'ভেরি ইজি। আমরা দুজন আছি। কাচের জানলা, কোনো শিক নেই। বিছানাটা একেবারে জানলার পাশে। এমন ড্রাঙ্ক হয়ে আছে যে কেটে ফেললেও কিছু জানতে পারবে না ও।'

'না না, তুই বুঝতে পারছিস না—শেষ পর্যন্ত তো জেগে উঠবেই, বাধাও দেবে। যদি আমরা ওর সঙ্গে জোরে না পারি—'

'অসম্ভব। সেরকম হলে তো চ্যাঁচামেচিও হবে একটা, তাতেও তো ভয় আছে? আমি বলছি সেরকম কিচ্ছু হবে না।'

'তবু। আমার মনে হচ্ছে একটু রিস্ক থেকে যাচ্ছে।'

'এত বড়ো কাজে একটু রিস্ক তো নিতেই হবে, উপায় কী বল! নাও, টেক ইট ইজি। দেখি, টাইপটা কেমন করল!'

না, শমিতার মনে কোনো ভয় ছিল না, কোনোরকম সঙ্কোচও নয়। ঘণ্টাখানেক পরে যখন দরজাটা আলতো করে ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকল, রণেনকে তখন সত্যিই কেটে ফেললেও সাড়া পাওয়া যাবে না। কেয়ার হাত থেকে টাইপ-করা কাগজটা ভাঁজ করে বুক-পকেটের ভেতর দিকে যখন ঢুকিয়ে দিল তখনও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে রণেন।

'তুই পায়ের দিকটা ধর'—সামনে এগিয়ে গিয়েছে শমিতা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, 'আমিই সামনের দিকটা জানলা দিয়ে আগে বার করব, ধরার কিছু পাবে না তাহলে। তোর কাজ ঠেলে দেহটা বাইরে বের করে দেওয়া। একদম ফাম্বল করবি না। মনে রাখিস, কাজটা আমাদের করতেই হবে, যেমন করেই হোক—উই মাস্ট।'

প্রথম ধাক্কাতেই খানিকটা নড়ে চড়ে উঠেছিল রণেন। টেনে জানলার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘুমটাও ঈষৎ ভেঙে গিয়েছিল যেন। 'কী হল আবার'—গোছের দু'একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল ওর মুখ থেকে। 'কিছু না, বৃষ্টি—সরিয়ে দিচ্ছি একটু'—

অক্লেশে বলেছিল শমিতা। তারপর যে মুহূর্তে শরীরটা হিঁচড়ে বার করেছে বাইরে, ঘুমটা ভেঙে গেছে রণেনের। অদ্ভুত একটা ভয়ার্ত মুখ। কোনো কথা বলতে পারছিল না, বুঝতেই পারছিল না ব্যাপারটা। শুধু হাত দিয়ে জানলার পর্দা চেপে ধরার চেষ্টা করছিল আপ্রাণ।

আর ঠিক সেই সময়ই ভেতর থেকে কেয়ার প্রবল ধাক্কা।

একটা আর্ত চিৎকার শুধু ভেসে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই জানলার পর্দা মুঠোয় নিয়েই সবেগে দেহটা নামতে শুরু করেছিল নিচে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দূর থেকে ভারী জিনিস পতনের সুনিশ্চিত শব্দ।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শমিতার বুক থেকে।

কেল্লার ভেতর শুয়ে বহুদূরের দরজায় আঘাত করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল যেন। এটা যে নিজের দরজারই শব্দ, ভাবতে একটু সময় লাগল শমিতার। বুঝতে পেরে ধড়মড় করে উঠে বলল।

সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠল।

সেই সুনিশ্চিত পতন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এলোমেলো চেহারাটা একটু ঠিক করে নেওয়া—নইলে মনে হতেই পারে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে। সব কিছু ঠিক করে দরজা ভেজিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে আসা, কয়েক মিনিটের ব্যাপার। নিচে যথারীতি উত্তেজনা, গন্ডগোল, দাপাদাপি—মানে এত ওপরে যতটুকু এসে পৌঁছায় আর কি। যদিও মিনিট পনেরোর মধ্যেই লোক চলে এসেছিল ওপরে দুঃসংবাদ বহন করে। সঙ্গে পুলিশের উর্দি পরা একজন লোক ছিলেন, তিনিই শমিতাকে বাধা দিয়েছিলেন নিচে যেতে, বলেছিলেন—'ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। হি ইজ অলরেডি ডেড। জায়গাটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে, আপনাদের কাউকেই যেতে দেবে না। ডেডবডি আমরা নিয়ে যাচ্ছি পোস্টমর্টেমের জন্যে। যে ঘর থেকে উনি নিচে লাফিয়ে পড়েছেন সেটা আমরা তালাবন্ধ করে যাচ্ছি। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যিনি আসবেন তিনিই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, কেন উনি সুইসাইড করলেন সেসব ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন। তার আগে আপনারা রেস্ট নিতে পারেন, কিন্তু ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

পুলিশের লোকটিকেই ধন্যবাদ দিতে হবে, ওর জন্যেই প্রবল উৎসাহী প্রতিবেশীরা কেউ উঁকিঝুঁকি দিতে সাহস পায় নি। আরও একটু আশ্বস্ত হওয়া গেছিল রণেন যে আত্মহত্যাই করেছে, এ ব্যাপারে কথাটা ওকেই মুখ ফুটে বলতে শুনে। এতটুকু অনুশোচনা হয় নি শমিতার, একটুও না। কেয়া একটু মিইয়ে পড়েছিল, তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিল, 'একদম নার্ভাস হবি না। আয়, একটা করে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে নিই। ওদের আসতে এখনও ঢের দেরি।'

আড়চোখে ঘড়ি দেখল শমিতা। ইস্, সাড়ে দশটা বেজে গেছে! এতক্ষণ ঘুমোচ্ছে!

দরজায় নক্‌টা হয়েই যাচ্ছিল। কেয়াকে আলতো ঠেলায় জাগিয়ে দিয়ে মুখেচোখে একটু জল দিয়ে নিল শমিতা। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পুলিশি ইউনিফর্মে মাঝবয়সী যে লোকটিকে দেখা গেল তাঁকে দেখে বেশ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই মনে হয়। সঙ্গে রাতের দেখা পুলিশের সেই লোকটিও ছিলেন।

'ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন?' ভদ্রলোক বললেন—'মানে ডেকে তুলতে যেরকম সময় লাগল—'

'বড্ড আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন'—শমিতা কেয়াকে দেখিয়ে, বললে, 'আমার বাল্যবন্ধু। কত গল্প-টল্প বললাম তিনজনে। তারপর হঠাৎ যে এই কাণ্ড করে ফেলবেন উনি'—

'স্যাড, ভেরি স্যাড'—ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এখানকার থানার ও.সি। হাউজিং-এর অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। আমার যেরকম ইম্প্রেশন, ভদ্রলোক—আই.মিন রণেনবাবু খুব সোশ্যাল লোক ছিলেন না—'

'না, মানে বিশেষ মিশত টিশত না কারোর সঙ্গে, তবে মানুষ হিসেবে কিন্তু—'

'হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই তাই বলবেন'— ও.সি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তবে ওঁদের মতে উনি ফরম্যাল এটিকেটও খুব একটা মেনে চলতেন না, এবং যতটুকু খবর এর মধ্যে জোগাড় করতে পেরেছি, আপনার প্রতিও ওঁর খুব সিমপ্যাথি ছিল না—আই মিন, আরও অনেক ভদ্রমহিলা সম্বন্ধেই উনি রীতিমতো দুর্বল ছিলেন।'

এসব কথার উত্তর হয় না। শমিতা মাথা নিচু করল।

'নাও দা পয়েন্ট ইজ'—ও.সি বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি হবার কথা আপনার, ওঁর নয়, হি ওয়াজ নট দ্যাট টাইপ। দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন, লাইফটা নিজের মতো করে এন্‌জয় করছেন—হোয়াট হেল হি হ্যাড টু ডু উইদ দিস সুইসাইড! এই ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার কিছু বলার আছে এ নিয়ে? মানে কোনোরকম আলোকপাত করতে পারেন আপনি?'

'আমি কি বলব বলুন! হয়তো এই নিয়ে যেরকম অশান্তি করা উচিত ছিল সেটা আমি করিনি—সেটাই আমার দোষ।'

'না না, দোষ-গুণের কথা নয়, কথা হল ভদ্রলোক আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন?'

'যাবেন কেন মানে?' কথাটা প্রায় বুক ঠেলে বেরিয়ে এল শমিতার—'আপনি কি বলতে চান আত্মহত্যা উনি করেন নি? অন্যভাবে কেউ মেরেছে ওকে?'

'আরে দূর, তা কেন, সে কথাই বা আমি বলব কী করে! পোস্টমর্টেম তো হয়ে গেছে ওঁর। স্টম্যাকে কিস্‌সু পাওয়া যায়নি। সামান্য অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল, সম্ভবত কাল একটু নেশা করেছিলেন।'

'প্রায়ই করতেন।'

'তার ওপর রক্তাক্ত জামার পকেট থেকে একটা চিরকুটও পাওয়া গেছে। রক্তের ছোপ লাগা সত্ত্বেও পড়া যাচ্ছে সেটা, তাতেও উনি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করছেন এমন কথাই লিখেছেন।'

'তাহলে?'

'মানে, কাগজটা ছিল টাইপ করা। সেটাই একটা সমস্যা। হাতে না লিখে হঠাৎ টাইপই বা কেন করতে গেলেন'--

'ব্যাঙ্কে হরদম টাইপিং মেশিন নিয়ে বসে থাকতেন, কখন কী মনে হয়েছে'—

'হতেই পারে, হতেই পারে, তবে বুঝতেই তো পারেন—হাতের লেখা গোপন করতেও তো মাঝে মাঝে লোকে টাইপিং-এর আশ্রয় নেয়। তো সেই জন্যে আপনাদের হাউজিং-এর সামনে কয়েকজন টাইপিস্টকে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করছিলাম। একজন বলল, ওই ধরনের জিনিস নাকি সে কাল রাত্তিরে টাইপ করেছে।'

'কী বলছেন আপনি!' বুকের ধ্বক ধ্বক শব্দটাকে চাপা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে শমিতা বললে—'পানুবাবু আমাকে খুব ভালো করে চেনেন। ডেকে জিজ্ঞেস করুন তো একবার আমি কাল ওঁর কাছে গিয়েছিলাম কিনা!'

'হাঁ, সেই জন্যেই তো সঙ্গে এনেছি ওঁকে'—পাশের পুলিশের লোককে ইঙ্গিত করতেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে টাইপিস্টকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। শমিতা বললে, 'কী পানুবাবু, ইনি যা বলছেন, আমি নাকি'—

'ছি ছি, কী বলছেন বৌদি, আপনাকে আমি চিনি না!' —পানুবাবু অপাঙ্গে বেশ সন্দেহের চোখে কেয়ার দিকে চাইছেন বুঝতে পেরে শমিতা আগেভাগেই বলে ফেলল, 'দেখবেন, আমার বন্ধু গিয়েছিল আপনার কাছে, এসব উল্টোপাল্টা কথা যেন বলে বসবেন না! একদিনের জন্য এসেছে—এমনিতেই যা চলছে, তার ওপর যদি আবার এইসব কথাবার্তা শুরু হয়'—

'না না, সে কথা থাক, সে কথা থাক'—ওসি বললেন, 'তার চেয়ে ঘরটাই বরং একবার ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। মুকুলবাবু, তালাটা খুলুন দিকি।'

রাত এগারোটার পর প্রথম ঢুকল আবার শমিতা এই ঘরে। যেমন রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি। ধ্বস্তাধ্বস্তির কোনো চিহ্ন নেই। বিছানার চাদর শুধু সামান্য কোঁচকানো। আর কিছু নেই-ই ঘরে দেখবার মতো। তবু ও.সি-র ভুরু কুঁচকে উঠল, বললেন—'আপনারাও ঘরে গল্প করছিলেন?'

'হ্যা তাই তো।'

'এ ঘরে দরজা ভেজিয়ে উনি শুয়ে পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলেই তো শুতে গেলেন।'

'কিছুক্ষণ পরেই জানলা খুলে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েন?'

'তাই তো মনে হয়! আমরা কিছু শুনিনি, ওই উনি—মানে মুকুলবাবুই বোধহয়, আমাদের খবর দিতে আমরা'—

'দাঁড়ান দাঁড়ান'—ফিরে তাকালেন ওসি, 'আমাকে মাপ করবেন, একটু কষ্ট আপনাদের দিতে হবে, আপনাদের দুজনকেই।'

'মানে?'

'আমাদের সঙ্গে একটু লালবাজার যেতে হবে।'

'সেকি! বলছেন সুইসাইড কেস, তা সত্ত্বেও'—

'অতটা জোর দিয়ে বলতে পারছি কই আপনার মতো?' —ও.সি হঠাৎ কী মনে করে একটু মুচকি হাসলেন, তারপর জানলার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন,

'জানলাটা ওরকম পরিপাটি করে বন্ধ হয়ে গেল কী করে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আত্মহত্যা করার পর জানলা বন্ধ করার জন্যে কেউ'—

মুহূর্তে সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল শমিতার।

ছি ছি ছি। কে বন্ধ করল জানলাটা, কে?

তখনও কী সব বলে চলেছিলেন যেন ও.সি, কিন্তু কথাগুলো কানে ঢুকছিল না শমিতার। সমস্ত শরীর ওর অবশ হয়ে আসছিল।

ময়না তদন্ত

উদয় ভাদুড়ী

এক

"কিছু পেলেন?"

"আজ্ঞে না।" কানাইবাঁশি সরখেল মাথা চুলকে জবাব দিলেন। কিছু পাওয়া উচিত ছিল অথচ পেলেন না—এই অপরাধবোধে কানাইবাঁশি কিছুটা লজ্জিত, সন্ত্রস্ত, বোধহয় ভীতও। কারণ, যে সে লোক নয়, হাইকমান্ডের জ্যোতির্বলয়ের দেদীপ্যমান নক্ষত্র--সামনের এই মেদবহুল, কৃষ্ণকায়, কেশবিরল মানবসন্তানই তার নেতা। তার ইহকাল, পরকালও কিনা কে জানে। কানাইবাঁশি জনগণমন অধিনায়ক জয় হে গানটি মনে মনে গাইবার চেষ্টা করেন।

নেতা, যে সে নেতা নয় রীতিমতো কেন্দ্রীয় নেতা, কামতাপ্রসাদ সিংহ গর্জন করে উঠলেন। "কী বিড়বিড় করছেন তখন থেকে, তিনটে দিন ধরে তিরিশটা লোক মিলে কিছুতেই বের করতে পারলেন না।"

"আজ্ঞে না"—কানাইবাঁশি সরখেল একইভাবে মাথা নাড়লেন, না পারার দুঃখে কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ হলেন।

নেতা কামতাপ্রসাদ কেশবিরল মাথায় হাত বোলালেন, তারপর চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। বললেন, "এখন কী হবে? একটু পরেই খোঁচড় রিপোর্টারগুলো আসবে—আমি যে স্টেটমেন্ট করে দিলাম। মুকুন্দ চাকলাদার আমাদের পার্টির শহিদ। তার কী হবে?" কানাইবাঁশি কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত। হাইকমান্ডের জ্যোতির্বলয়ের কাছাকাছি অবস্থান করে তার রাজনৈতিক জ্ঞান প্রায় প্রজ্ঞার কাছাকাছি চলে গেছে। গদগদ হয়ে বললেন, "আপনি যা বলেছেন, মানে ইনসিডেন্টের দিন যা বলেছেন, সেটাতেই স্টিক করবেন স্যার!"

নেতা কামতাপ্রসাদই এখন খানিকটা বিহ্বল, হতবুদ্ধি। তিনি বললেন, "তার মানে?"

এই প্রশ্নটায় স্বভাবসিদ্ধ দাঁতখিঁচুনি ছিল না। বরং একটা মানে কানাইবাঁশি বের করলেও করে ফেলতে পারে, এমনতর পেলবতাই, আশ্বাসের জন্য আগ্রহাতিশয্যই প্রকট হয়েছিল।

কানাইবাঁশি কথাটিকে, "তার মানে" শব্দদুটিকে নিয়ে লোফালুফি করেন। তাঁর দুচোখ আবেশে ছোট হয়ে আসে। বিরোধী দলের গুহ্যদ্বারে আছোলা বংশদণ্ড দেবার কাল্পনিক তুরীয়ানন্দে কানাইবাঁশি কখনও কখনও কামজ উত্তেজনা ও সুখ অনুভব করেন। জনশ্রুতি এই যে, কামতার সঙ্গে তার দক্ষিণহস্তস্বরূপ কানাইবাঁশির সমকামী সম্পর্ক আছে।

নেতা অকৃতদার, কানাইবাঁশি বিবাহিত। কিন্তু স্ত্রী বছর দশেক ঘর করার পর একটি বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধি সন্তানকে কানাইবাঁশির ঘাড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। কানাইবাঁশি

মর্মাহত হয়েছিলেন খুব। সেসময় তার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাদের দলে হোলটাইমার হিসেবে মাসমাহিনা প্রথা তখনও চালু হয়নি সেভাবে। কিন্তু কানাইবাঁশি নিজেকে আশ্বাস দিতেন —এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। বাংলায় যেমন গীত হয়, "চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়" গাইতেন।

কানাইবাঁশি স্বগত, আত্মস্থ 'তার মানে' শব্দদুটিকে নিয়ে খেলাতে চান, নাচাতে চান যেন কিন্তু নেতাদের ধৈর্যচ্যুতির স্বাভাবিক সময়সীমা পার করে কামতাপ্রসাদ খিঁচিয়ে ওঠেন, "তখন থেকে ক্যালাচ্ছেন কেন? মানেটা কী সেটা বলুন?"

কানাইবাঁশির সম্বিৎ ফেরে। নেতাকে তিনি দেখেন, অবলোকন করেন। তাঁর মুখে রহস্যময় একটা হাসি আলগা ঝুলে থাকে। "আপনি স্টিক করে থাকুন, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। মুকুন্দ আমাদের দলের শহিদ।"

নেতাদের অধৈর্য হবার কারণ আছে। তিনদিনে তিরিশটা লোক সারা জেলা তোলপাড় করে ফেলেছে, কলকাতা গেছে, ফিরে এসেছে, আবার গেছে। আর এই কম্ম করতে পার্টি তহবিল থেকে হাজার পাঁচেক আর নিজের গাঁট থেকে আরও ছ-সাত হাজার টাকা গলে গেছে। একটা পিস এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যাতে প্রমাণ করা যায় মুকুন্দ চাকলাদার তার দলের সমর্থক ছিল। সক্রিয় না হলেও নিষ্ক্রিয় সদস্য ছিল। আর শেষ বিচারে, তাই—বন্ধুগণ, মুকুন্দ চাকলাদার আমার দলের শহিদ তেমন জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

নির্দল শহিদ পুলিস রেকর্ডে কিংবা খবরের কাগজে পাওয়া যাবে কিনা সেটা নেতার ব্যক্তিগত সচিব শ্রীমতী নন্দিনী যোশী না ফিরে আসলে বোঝা যাবে না। সে সবকটি ন্যাশনাল ডেইলিকে যোগাযোগ করার জন্য কলকাতা গেছে। প্রশ্ন একটাই —কোনও নির্দল ব্যক্তি পুলিসের গুলিতে মারা গেলে তাকে শহিদ বলা যাবে কিনা? অথবা পুলিসের গুলিতে মারা গেল, অর্থাৎ গুলিতে মারা গিয়ে শহিদ হল—এমন লোকটি নির্দল হিসাবে গণ্য হতে পারে কিনা? আদৌ তাকে নির্দল বলা চলে কিনা?

এক্ষেত্রে যস্মিন দেশে যদাচারঃ। পশ্চিমবাংলায়, শহিদ অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলায় তথা কলকাতায় এ প্রশ্নের যদি কোনও উত্তর না থাকে তবে পৃথিবীর কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর নেই। কামতাপ্রসাদ এ কথাটাই তার ব্যক্তিগত সচিব শ্রীমতী যোশীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। যোশী নেতার কথার মর্মার্থ ঠিকই বুঝেছিল। বলেছিল. "রাইট স্যার—পুলিসের গুলিতে একটা লোক মারা গেল, তাকে তো শহিদ হিসাবে কাউন্ট করতেই হবে। বুলেট মেকস্ হিম ম্যার্টার। যুক্তিটা কানাইবাঁশির কাছে ঘোলাটে লেগেছিল। আমতা আমতা করে তিনি বলেছিলেন, "তাহলে চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী সকলেই কী শহিদ? সবাই পুলিসের গুলিতে মরেছে বলেই শহিদ হয়ে গেল!"

নেতা বিরক্ত হলেন। সন্ত্রাসবাদী আর চোর ডাকাত এক হল! সন্ত্রাসবাদের যদি রাজনৈতিক দল থাকে, মতাদর্শ থাকে—তাহলে বুলেটে মৃত সন্ত্রাসবাদী আলবাৎ শহিদ। নেতা বলেছিলেন,"ছি ছি কানাইবাঁশি! গণতান্ত্রিক সংবিধানের অধীনে চার দশক কেটে গেল। এটুকু গণতান্ত্রিক চেতনা হল না আপনার।"

কানাইবাঁশি লাইসেন্স পারমিট—মিটিং, মিছিল এগুলো মোটামুটি বোঝেন। তাই এতকাল বুঝে এসেছেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাকার বিষয় নিয়ে আবছা ধারণাও আছে, এগুলো নিয়ে বিভিন্ন পার্টির বক্তব্যও যে একটু আধটু না বোঝেন তা নয়। কিন্তু নির্দল হলে বা না হলে শহিদ হতে অসুবিধা কোথায় এটা বুঝতে তাঁর সত্যিই অসুবিধা হচ্ছিল।

শ্রীমতী নন্দিনী ঝকঝকে, স্মার্ট —উত্তর-তিরিশ না চল্লিশ বোঝা দায়। দিল্লিতে হাইকমাণ্ডের কারও কী যেন সুপারিশে এখন তাঁর নেতার সচিব, ব্যক্তিগত। কানাইবাঁশি সচিবকেও সমীহ করেন নেতারই মত। শ্রীমতীর সব কথার অর্থ না বুঝলেও, তিনি গেলেন, গিলে হজমের চেষ্টা করেন।

শ্রীমতী বিষয়টিকে বিশদ করে, "পুলিস মানে কী স্যার? পুলিস মানে রাষ্ট্র। 'ল অ্যানড অর্ডার' যেহেতু রাজ্যের, সুতরাং যে কোনও পুলিস এমনকি কেন্দ্রীয় পুলিসও, অন্তত গুলি ছোঁড়ার পয়েন্টে রাজ্যের পুলিস। সেই পুলিস গুলি করল। পুলিস গণতান্ত্রিক দেশে নিরপরাধ লোককে গুলি করে না, এটা যদি অ্যাকশন হয় স্যার, তাহলে বুলেটে যে মারা গেল সে নিশ্চিত অপরাধী, সে রাষ্ট্রদ্রোহী, নিদেনপক্ষে রাজ্য সরকারবিরোধী। রাজ্য সরকার কে স্যার?"

শ্রীমতী উজ্জ্বল যেন বা জটিল অঙ্কের সমাধানসূত্রে তাঁর চোখ চকচকে, "রাজ্য সরকার মানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল। বুলেটে মৃত মুকুন্দ চাকলাদার সেই রাজনৈতিক দলের বিরোধী। বুলেট যদি সত্যি হয়, তাহলে মুকুন্দ নির্দল হতে পারে না। সে সরকার-বিরোধী দলের সমর্থক।"

বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ শেষে শ্রীমতীর গালে পাউডারের পাফ্। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়নায় মুখ দেখল, লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে ঘষল। বলল, "তবু আপনি যখন বলছেন, আমি কলকাতা যাচ্ছি, নির্দল অর্থাৎ পার্টিলেস কিংবা অ্যাপলিটিক্যাল কোনও ব্যক্তি বুলেটে মৃত হলে শহিদ হিসেবে তার দাবি থাকে কিনা, আই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট।"

মুকুন্দ চাকলাদারকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের দলের শহিদ হিসেবে ঘোষণা করার দাবিতে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে কিনা, তা নিয়ে হাইকমান্ডের মতামত চাওয়া হবে, জানার পর কামতাপ্রসাদের অনুগামীরা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরার পথ ধরল।

দুই

কামতাপ্রসাদ উদ্বিগ্ন অবস্থায় পায়চারিরত। শ্রীমতী যোশী কলকাতা থেকে ফিরে আসেনি। হাইকমান্ড মুকুন্দর স্ত্রীকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও দপ্তরে চাকরির অফার দিতে বলেছে। কিন্তু স্পষ্টভাষায় মুকুন্দকে, পুলিসের বুলেটে মৃত মুকুন্দকে দলীয় শহিদ বলা যাবে কিনা, তা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি।

কামতাপ্রসাদ কানাইবাঁশির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন। কানাইবাঁশির ইদানিংকালের কাজকর্মে কামতাপ্রসাদ এবং তিনি মারফত হাইকমান্ডও খুব খুশি। আগামী নির্বাচনে কানাইবাঁশি যাতে জেলা পরিষদের টিকিট পান, কামতাপ্রসাদ দেখবেন। অনেকটা কানাইবাঁশির একগুঁয়েমির জন্যই কামতাপ্রসাদ মুকুন্দের অর্থাৎ শহিদ মুকুন্দের বা বলা ভাল মুকুন্দকে শহিদ করে নেবার গুরুদায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন, কানাইবাঁশি বলেছেন, "কালেভদ্রে একটা শহিদ পাওয়া যায় স্যার। আমরা শহিদ মুকুন্দকে নিয়ে আগামী মাসতিনেকের জন্য আমাদের মিটিং মিছিল—অবরোধ, অনুরোধ, উপরোধ সব চালিয়ে যাব। এমনকি একটা জেলা বন্‌ধ, পশ্চিমবাংলা বা ভারত বন্‌ধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। শহিদের পোটেনসিয়ালিটি তো আপনি জানেন স্যার।"

' কামতাপ্রসাদ জানেন, খুব ভাল করেই জানেন, সবকটা ন্যাশনাল ডেইলিতে তিনদিন ধরে শুধু মুকুন্দ চাকলাদার। পুলিসের বন্দুক তোলার ছবি, ট্রিগারে আঙুল রাখার ছবি, বুলেটে বিদ্ধ পতনশীল মুকুন্দর ছবি, ভূপতিত মুকুন্দর রক্তাক্ত দেহের ছবি—আর সঙ্গে

যুতসই হেডলাইন। কামতাপ্রসাদ হাইকমাণ্ডের জ্যোতির্বলয়ের প্রায় অন্তবর্তী নেতা হয়ে উঠেছেন সম্প্রতি। তবুও ন্যাশনাল ডেইলির প্রথম পাতায় তার বিবৃতির হেডলাইন, ওঃ ভাবলেই গা শিরশির করে, কতবার বেরিয়েছে এ পর্যন্ত? প্রথম পাতার হেডলাইনে থাকা — সে তো সব নেতার স্বপ্ন। দলের প্রথম সারিতে থাকতে হলে হেডলাইনে থাকতেই হবে। মুকুন্দকে নিজের দলের শহিদ হিসাবে ঘোষণা করে কামতাপ্রসাদ হেডলাইনে ছোট বড় নানা অক্ষরে তিনদিন ধরে আছেন। কিন্তু যদি গোটা ব্যাপারটাই ফ্লপ করে? তাহলেও হেডলাইন —কাল অথবা পরশুর কাগজে। কিন্তু সেটাই হয়ত আগামী পাঁচ-সাত বছরের জন্য শেষ হেডলাইন। হাইকমান্ড কী এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতির জন্য কষে পেছনে একটা লাথি মারবেন না? আর সেই লাথি খেয়ে কী প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে কিংবা হেডলাইনে!

কানাইবাঁশি নেতার সঙ্কট ভালই উপলব্ধি করেছেন। তিনদিন অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন জোর দিয়ে বললেন, "আপনি যা বলেছেন, মানে ইনসিডেন্টের দিন যা বলেছেন, সেটাতেই স্টিক করবেন স্যার!"

কামতাপ্রসাদের আগ্রহাতিশয্যে, উৎকণ্ঠায় কানাইবাঁশি বিশদ হলেন। বললেন, "আমরা তো বলছি মুকুন্দ আমাদের দলের কর্মী ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটের দিনে একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সে ভোটকেন্দ্রের রিগিংয়ে শাসকদলের সমর্থকদের বাধা দিতে গিয়েছিল। পুলিস তাকে গুলি করে মেরেছে।"

কামতাপ্রসাদ বললেন, "এটা তো আমরা বলেই দিয়েছি। কিন্তু এভিডেন্স?"

কানাইবাঁশি মৃদু হাসলেন, বললেন, "আমরা তো দাবি করছি স্যার। আমরা যে ভুল বলছি, মানে অন্যায় অন্যায্য দাবি করছি সেটা অপোজিট পার্টি প্রমাণ করুক। সাংবাদিকরা প্রমাণ করুক।"

খুব মনঃপূত না হলেও, কামতাপ্রসাদ যেন একটু আলো দেখতে পেলেন। অন্তত ভরসা পেলেন যে শহিদ মুকুন্দ চাকলাদার, যিনি সম্ভবত এখনও মর্গে, সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কামতাপ্রসাদের কথায় কন্ট্রাডিক্ট করবেন না।

কামতাপ্রসাদ একটা লার্জ পেগ হুইস্কির জন্য আদেশ দিলেন, বললেন, "শহিদ মুকুন্দ চাকলাদার অমর রহে।"

তিন

মুকুন্দ চাকলাদার, এত লোক থাকতে, শহিদ হওয়ার উপযোগী সমাজসচেতন ও সমাজবিরোধী দুয়েরই যখন এ শহরে অভাব নেই, —শেষপর্যন্ত মুকুন্দই কেন যে শহিদ হতে গেল? এ নিয়ে সরকারপক্ষের নেতা, আমলা, পুলিসের কর্তারা তিনদিন ধরে কুলকিনারা করে উঠতে পারলেন না। উদ্যোগ যতটা গভীর এবং ব্যাপক হতে হয় হয়েছে, কিন্তু মুকুন্দ একটা ধাঁধার মতই রয়ে গেছে, অন্তত উদ্যত বন্দুকের সামনে তার দাঁড়িয়ে পড়াটা।

শেষ রিপোর্টে জানা গেছে, মুকুন্দ মর্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তার হৃৎপিণ্ডে না ফুসফুসে —বুকের বাঁদিকে না ডানদিকে কিংবা দুদিকেই দুটো সীসের গুলি বিঁধে আছে। কাগজগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশিত ইতিমধ্যে। তিনদিনের প্রথম পাতা গরম রীতিমত। দূরদর্শনের হামদো কামেরাম্যান কিভাবে যেন ওই ভয়াবহ দৃশ্য দেড় মিনিটের বিস্তৃত অনুপুঙ্খে পর্দায় ভাসিয়ে তুলেছে।

জেলার গঞ্জ, স্টেশন, দোকানপাটে অঘোষিত বন্‌ধ নেমে এসেছে—ঝুপ করে দুপুরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার মত। আর এরই মধ্যে সরকারের বিরোধীপক্ষ মুকুন্দ চাকলাদারকে তাদের দলের সমর্থক হিসাবে দাবি করেছে। মৃত মুকুন্দকে শহিদ হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ইট গেঁথে শহিদবেদীও তৈরি হয়ে গেছে। দলীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়ে মসৃণ দণ্ডের ওপর শোভা পাচ্ছে। বুকে কালো ব্যাজ এঁটে গোটা পাঁচেক মৌন শোকমিছিল হয়ে গেছে। মর্গ থেকে শহিদ মুকুন্দর লাশ বের হওয়ার পর আরও গোটাকতক মিছিল হবে। অন্তত শ্মশানঘাট পর্যন্ত যে একটা বড়সড় মিছিল হবে, গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে সে খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছে দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে সরকারপক্ষ একটা প্যাঁচে পড়ে গেছে। মুকুন্দকে শহিদ হিসাবে বিরোধী পক্ষের শিবিরে তুলে দেওয়ার অর্থ স্বেচ্ছামৃত্যু। মৃত্যু না হোক সরকারি দলের পক্ষে তা হবে এক মর্মান্তিক আঘাত। ভিত, জনগণের মনে যে ভিত শনৈঃ শনৈঃ গড়ে উঠেছে গত এক দশক ধরে —সেই ভিত চৌচির হয়ে ধসে না পড়লেও তাতে ফাটল ধরা কোনও কৌশলেই আর আটকানো যাচ্ছে না।

সরকারপক্ষের সাংবাদিক সম্মেলনে এক উঠতি নেতা তো মুকুন্দ চাকলাদারকে নিজেদের দলীয় কর্মী হিসাবে সোচ্চার দাবিই করে বসেছিলেন। কোনরকমে বর্ষীয়ান এক নেতা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে সামাল দিয়েছিলেন, তাইতে রক্ষে। নাহলে মুকুন্দ চাকলাদারকে শহিদ বানাতে গেলে গোটা মিউনিসিপ্যাল ভোটের হিসেবেটাই গড়বড় হয়ে যেত। পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত কাগজওলারা চিৎকার করে জানান দিত সরকারপক্ষ ভোটে রিগিং করা, বুথ দখল করার জন্য মুকুন্দকে পাঠিয়েছিল। পুলিস কর্তব্যের খাতিরে শাসকদলের পোষা সমাজবিরোধীকে গুলি করে মেরেছে', সে আরেক কেচ্ছা হত।

সরকারপক্ষের রাজ্যস্তরের জনৈক তাত্ত্বিক নেতা জানালেন যে তিনদিন চেষ্টা করে মার্কস-এঙ্গেলস গ্রন্থাবলী ঘেঁটে কিংবা মাও-এর রচনাবলী থেকে তিনি এধরনের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির কোনও উদাহরণ পাননি। কারণ সম্ভবত ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামো মার্কস-এঙ্গেলস কিংবা মাও-এর চিন্তাধারায় স্থান পায়নি।

সরকারপক্ষ বস্তুত তার নাতিদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে এরকম বিটকেল পরিস্থিতির মুখোমুখি আর কখনও হয়নি। পুলিশের গুলিতে কেউ মরলে সে স্বাভাবিক নিয়মেই শহিদ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এতে সরকারপক্ষ বা বিরোধীপক্ষ শহিদের মালিকানা নিয়ে বাদানুবাদ করলেও, শেষপর্যন্ত একটা রফায় পৌঁছানো গেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণে দলীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার মুকুন্দ চাকলাদার শাসকপক্ষকে রীতিমত ফেরে ফেলে দিয়েছে।

সরকারি প্রশাসন যতটুকু খবর নিয়েছে তাতে মুকুন্দ চাকলাদারের কোনও পলিটিক্যাল আইডেনটিটি পাওয়া যাচ্ছে না। আর এইখানেই যত রাজ্যের গণ্ডগোলের সূত্রপাত। মুকুন্দ যে বিরোধীপক্ষের সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় কোনও ধরনেরই সমর্থক ছিল না, এটা স্থানীয় বিধায়ক বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও মুকুন্দর মৃত্যু সম্পর্কিত রাজনৈতিক আবিলতা কাটছে না। মুকুন্দ শহিদ নয়—তাহলে কি?

রাজ্যস্তরের একদল বলেছে এটাকে একটা বিছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হোক। অন্যদল বলেছে, ক্ষমতায় থেকে একথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনও নজির অন্তত মার্কসবাদ লেলিনবাদে নেই। সোবিয়েত রাশিয়া এবং চীনের তথা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি —বিশেষ এই পৌর

নির্বাচনে মুকুন্দর মৃত্যুজনিত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক বিচার আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে দলের বিভিন্ন স্তরে জেলা, রাজ্য এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিতেও।

স্থানীয় মন্ত্রী বিচারবিভাগীয় তদন্তর জন্য ঘোষণা করতে দলকে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ এটা না হলে পৌর নির্বাচনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীর এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এখন বিচারবিভাগীয় তদন্তর নির্দেশ দিলেই পুরভোটের গোটা ব্যাপারটাই বিচারবিভাগের হাতে চলে যাবে। তাতে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করা শক্ত। পুর-প্রশাসন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং ওপরতলা থেকে নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছে। পুর-প্রশাসনের আমলার বাপান্ত করে সরকারি দল এখন গোটা বিষয়টা নিয়ে পর্যালোচনার পর্যায়ে এসে পৌছেছে। কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

পুরনির্বাচন আধিকারিক—ঢ্যামনাটা আবার শুধু নির্বাচন আইনের ধারা-উপধারা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—কাগজ ও দূরদর্শন প্রসঙ্গ তুলে জনমত রিপিট জনমত বলে পরিস্থিতিটাকে, তার সরকারি মেসেজটিকে অনেক বেশি ঘোরালো করে তুলেছে।

সরকারপক্ষের উচ্চপর্যায়ের মিটিংয়ে প্রশাসনের হোমড়াচোমড়া, বিশিষ্ট নেতা ও মন্ত্রীমণ্ডলী উপস্থিত। স্থানীয় বিধায়ক যে প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছে, গোয়েন্দা রিপোর্টের সঙ্গে তার অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। তবু রিপোর্টটি আবার বিশদভাবে পরীক্ষা করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হল।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় হাইকম্যান্ডই বলুন অথবা কামতাপ্রসাদই বলুন, মুকুন্দ চাকলাদার যে ওঁদের সমর্থক ছিল তার একপিস এভিডেন্সও এঁরা আনতে পারবেন না।

স্বরাষ্ট্র জানাল, মুকুন্দ বন্দেমাতরম্ গান করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা বীরচন্দ্রপুর প্রাইমারি ইস্কুলে চার বছর। মুকুন্দ সেখানে ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। আর ডি পি আই—শিক্ষাবিভাগের নির্দেশে তখন জাতীয় সঙ্গীত কম্পালসারি ছিল ইস্কুলে সিনেমাহলে। ফলত এ থেকে প্রমাণ হয় না, মৃত মুকুন্দ প্রো বন্দেমাতরম ছিল। অর্থাৎ বিরোধী দলের সমর্থক ছিল।

শাসকদলের একজন বললেন, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না? মুকুন্দর বয়স পঁয়ত্রিশ। তার স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনা যদি তার আঠার বছরেও বিকশিত হয়ে থাকে, তো পরবর্তী আঠার বছরে সে কিছুই করল না? কোনও মিটিংয়ে গেল না, মিছিলে গেল না—ছাত্র-যুব হিসেবে কোনও দল করল না, রীতিমত অদ্ভুত তাই না? মুকুন্দ তাহলে কি?

চার

মুকুন্দর বায়োডাটা থেকে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে সে নিতান্তই নিরীহ মামুলি ছাপোষা গেরস্ত। এমন ঘর থেকে যে কেউ বেরিয়ে এসে শহিদ হয় না, তা নয়। চারের থেকে শুরু করে সাতের দশক পর্যন্ত পারিবারিক এই প্রেক্ষাপট থেকেই রাজনীতি বেরিয়েছে—শহিদ বেরিয়েছে অকুতোভয়। পুলিসের গুলি খেয়েছে, শহিদ হয়েছে—এটাই সোজা হিসেব। এই হিসেবে মুকুন্দর পুলিসের গুলি খাওয়া পর্যন্ত আছে, শহিদ হওয়াটা যেন কেমন ঠেকে সরকারি দলের নেতার কাছে।

তিনি তৎপরতার সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ককে মুকুন্দর বাড়িতে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। ত্রাণ তহবিল থেকে বিনা দ্বিধায় দশহাজার টাকার চেক দিয়ে পাঠিয়েছেন এক প্রথম সারির নেতাকে। তিনি মুকুন্দর বাড়ির সামনে গেট মিটিংয়ে দলীয় সমর্থক ও স্থানীয় অধিবাসীদের সামনে মূল্যবান ভাষণ রেখেছেন। তিনি বলেছেন একটি প্রাণ অমূল্য। সে প্রাণের দাম দশহাজার টাকা নয়। কিন্তু কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ও সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার কথা স্মরণে রেখে জনগণ দশহাজার টাকার এই সামান্য অনুদানকে অনুমোদন করবেন এ বিশ্বাস তিনি সোচ্চারে ব্যক্ত করেন। এরই মধ্যে তিনি প্রয়াত মুকুন্দর স্ত্রী বিশাখা চাকলাদারকে দিয়ে চাকুরির জন্য একটি স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র মুসাবিদা করিয়ে নেন এবং বাড়িতে বসেই সরকারি সংস্থায় বিশাখার জন্য নিয়োগপত্র দেন। বিশাখা, সদ্যবিধবা, স্বামী মর্গে এখনও ময়না-তদন্তের অপেক্ষায় হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বিশাখার কান্না দেখে মুকুন্দর মা, অবিবাহিত—ছোট বোন সবাই একযোগে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে যেসব মহিলারা সমবেত হয়েছিল আরেক প্রস্থ সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য তারাও মরাকান্নায় সুর মেলাল।

শুধু একজন অভিজ্ঞ দলীয় কর্মী বিশাখাকে বলল—"এখনও অনেক কাজ বাকি" সে বিশাখার চোখ মোছার জন্য রুমাল এগিয়ে দিল, স্থানীয় সরকারি দলের একজন সম্ভাব্য মহিলা কর্মীকে বিশাখার মধ্যে সহসাই আবিষ্কার করে অভিভূত হল। শোকসন্তপ্ত বিশাখা মূর্তিমতী পবিত্রতা, এখন এঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেই হল। কর্মীটি নেতার দেওয়া নিয়োগপত্রর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ভেঙে-পড়া বিশাখার পিঠে আলতো করে হাত রেখে এককোণায় নিয়ে গেল। বলল, "আপনাকে লড়াই করতে হবে বৌদি। লড়াই করে বাঁচতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা সাবধানে রেখে দিন।"

মুকুন্দর বাবা, বৃদ্ধ জয়রাম চাকলাদার কিছুটা বিব্রত। এতসব মান্যগণ্য হোমড়া-চোমড়া নেতাদের সান্নিধ্যে কিছুতেই তিনি সহজ হতে পারছেন না। দুফোঁটা চোখের জল মেলাতে পারছেন না পুত্রশোকাতুরা স্ত্রী, পুত্রবধূর সঙ্গে। কান্না আটকে আছে গলার কাছে। একসঙ্গে দু'দুটো চাকরির নিয়োগপত্র বাড়িতে। জয়রামের ভায়রা বলছিল, "গণতন্ত্রের কী মহিমা দেখুন। এতদিন মুকুন্দ আর বৌমা মোটামুটি একটা চাকরির জন্য কী না করেছে। দরখাস্ত করেছে, সুপারিশের জন্য এখান-ওখান ছুটোছুটি করেছে। আর এখন—"

বৃদ্ধ জয়রাম বললেন, "গতবছরই মুকুন্দর পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। বলতে গেলে চাকরির বয়স আর রইল না। আর এখন দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।"

জয়রাম চাকলাদারের ভায়রা তাঁকে শক্ত হতে পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলেন।

মুকুন্দ একটা ছোটোখাটো চাকরি করত। মাস গেলে দুশ টাকা মাইনে, পুজোয় একমাসের বোনাস—একটা কাপড়ের দোকানে খাতালেখার কাজ কিভাবে যেন জুটে গিয়েছিল। সরকারপক্ষ জেনে গেছে, বলাই বাহুল্য বিরোধীপক্ষর শিবিরও জেনে গেছে পৌর এলাকার মধ্যে কাপড়ের দোকানের কর্মচারীদের তিনটি ইউনিয়ন আছে। মুকুন্দ তিনটি ইউনিয়নেই মাসে দুটাকা করে চাঁদা দিত। মুকুন্দর কী রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ছিল? মুকুন্দ কী একশভাগ অরাজনৈতিক নাগরিক? নাকি যেটা কানাইবাঁশি বলেছে, মুকুন্দ চাকলাদার রীতিমত ধড়িবাজ, তিন দলের বদলে পাঁচ দল হলে মুকুন্দ হয়ত পাঁচ দলকেই চাঁদা দিত—চাঁদা দিয়ে টিকে থাকতে হয় বলে টিকে থাকত। এক্ষেত্রে অবশ্য মুকুন্দ বেঘোরে মারা পড়ল —এবং পুরোপুরি শহিদ হলে সে যতটা অমরত্ব লাভ

করত, তা তার কপালে জুটল না। বিরোধীপক্ষ মুকুন্দ চাকলাদারকে শহিদ বানাবার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব থাকলেও মুকুন্দর, শহিদ মুকুন্দর বুলেটবিদ্ধ লাশের দাবি থেকে তারা এখনও সরে যায়নি।

বিশাখা, মুকুন্দর স্ত্রী, দশবছর আগে টাইপ শিখেছিল। তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মত স্পিডও ছিল। পৌর এলাকায় আগামী দশবছরে যতজন টাইপিস্ট দরকার হবে, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে তার পঁচিশগুণ টাইপিস্ট এখনই তৈরি হয়ে গেছে। দশবছরে যতজন টাইপিস্ট এই এলাকায় তৈরি হবে, সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তত টাইপিস্টের শূন্যপদ দশবছরে হয়ত তৈরি হবে না। এমনি আশঙ্কায় বিশাখা কাপড়, জামা, ফ্রক, পেটিকোট সেলাই-এর কাজ শিখতে শুরু করেছিল। ভালই শিখেছিল বলা যায়। মাস গেলে সেলাই থেকে আড়াইশ, সাড়ে তিনশ টাকা ঘরে আসে। বিশাখার কাজ হাওড়া হাটে, শ্যামবাজারের কাছে হরি সায়ের বাজারে শোভা পায়।

বিরোধীপক্ষের কামতাপ্রসাদের নেতৃত্বে ছোট দলটিই প্রথম বিশাখার জন্য চাকরি বয়ে আনে বাড়ি পর্যন্ত। বলতে কি তখনও মুকুন্দর রক্ত, শহিদের রক্ত রাস্তায় চাপ চাপ পড়ে আছে, পুলিস জায়গাটিকে কর্ডন করে রেখেছে। প্রাথমিক দৌড়ঝাঁপ, থানা-পুলিস শেষে মুকুন্দ যখন মর্গে ঢুকে গেল লোহার বিশাল ট্রেতে চেপে তারপরই বিশাখা বাড়ি ফিরেছিল। আর তার পিছন পিছনেই প্রায় "মুকুন্দ চাকলাদার অমর রহে" ধ্বনি দিয়ে বিরোধীপক্ষের জন্য পঞ্চাশ।

তিনদিনে এ পরিবারের দিশাহারা ভাব অনেকটাই কেটে আসছে। ভবিষ্যৎ তত অনিশ্চিত নয়, অন্তত সংসার ভেসে যাওয়ার মত নয় এমত অবস্থায় বিশাখা, তার শ্বশুর অর্থাৎ মুকুন্দর বাবা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুলিসের সাংবাদিককে, সরকারি ও বিরোধীপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে—না, মুকুন্দ চাকলাদার কোনওদিন কোনও দলের রাজনীতি করত না। সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় কোনভাবেই নয়।

পাঁচ

তাহলে মুকুন্দ করতটা কি?

এ প্রশ্নটা সাংবাদিকদের কাছেও খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরভোট এবং সেই ভোটে রিগিং, বুথ দখল, ফল ঘোষণা স্থগিত সমস্ত কিছু নিয়ে যা যা সংবাদ সম্ভাবনা সব উথালপাতাল হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় সংবাদ মুকুন্দর শহিদ হওয়ার ঘটনাটি—বিশেষ সে ঘটনা এক রণাঙ্গনের ইঙ্গিত দেয়, ভোটযুদ্ধ প্রকৃতই সশস্ত্র যুদ্ধের আকার নেয়। মুকুন্দর শহিদ হওয়ার ঘটনা শুধু সংবাদ নয়, রীতিমত সচিত্র সংবাদ। অরাজনৈতিক ভ্যাবলা মুকুন্দ একা, নিরস্ত্র, সামনে পুলিস বন্দুকে তাক করছে। মুকুন্দ নির্বিকার, বন্দুকের ট্রিগারে পুলিসের আঙুল। এক শ্বাসরোধী সচিত্র সংবাদ। এত সত্য যেন মনে হয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুরভোটের প্রেক্ষাপটে মুকুন্দ আর পুলিস বিস্তৃত রাজপথের সেটে অ্যাক্টিং করছে।

কত প্রত্যাশা ছিল কাগজের, খবরের সেইসব চনমনে সাংবাদিকদের। এখন তারা কিঞ্চিৎ দিশাহারা। আগামী সাতদিনের অন্তত দুকলম হিসেবে চোদ্দ কলমের সম্ভাবনা, তিনদিনের মাথায় এসে প্রায় নিঃশেষিত। মুকুন্দকে শহিদ হিসেবে বাঁচানো না গেলে, এরপর বন্ধ, অবরোধ, বিক্ষোভ, ভাঙচুর লুটপাটের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হবে না। মুকুন্দর

পদাঙ্কে পৌর এলাকায় আরও আরও শহিদ তৈরি হবে না। দাবি পাল্টা দাবিতে দেওয়ালগুলো গরম হয়ে উঠবে না। সংসদে উত্তাল টেবিল-চাপড়ানি ধ্বনিত হবে না। তাহলে কি হবে শেষপর্যন্ত।

সে ভাবনা সরকারপক্ষ তৎপরভাবে ভেবে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। তাঁরা জেনে গেছেন মুকুন্দ পৌর এলাকায়, সেদিনের প্রাসঙ্গিক ভোটপর্বের ভোটার পর্যন্ত ছিল না। মুকুন্দ পৌর এলাকার সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। সুতরাং পুরভোট বা সেই ভোট সম্পর্কিত ব্যাপারে মুকুন্দ পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। সে জালভোট দিতে কিংবা জালভোট দেওয়া আটকাতে ওখানে আসেনি। অরাজনৈতিক মুকুন্দ কোনও গোলমাল বাধাবার জন্যও আসেনি। মুকুন্দ সমাজবিরোধীদের সুপরিচিত তালিকাতেও পড়ছে না। তাহলে মুকুন্দ দুটো বুলেট খেল কেন? মুকুন্দ তাহলে কি?

সরকারপক্ষের ওপরতলার নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন, মুকুন্দের মৃত্যু রাজনীতি বহির্ভূত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র, বলা যায় অ্যাকসিডেন্ট।

আর এ ধরনের বিচ্ছিন্ন অ্যাকসিডেন্ট সর্বত্রই ঘটেছে, তার ভূরি ভূরি নজির খবরের কাগজ খুললেই পাওয়া যাবে। জনৈক নেতা মন্তব্য করলেন মুকুন্দ তো গাড়ি চাপা পড়েও মরতে পারত, ধরুন কোনও সরকারি গাড়ি, তাহলে তাকে কী আপনারা বিরোধীপক্ষের শহিদ বলতেন?

শেষপর্যন্ত পুলিসের জেলাকর্তাকে গুলিচালানার ব্যাপারে বিশদ তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন কনস্টেবলদের গুলিচালানার ঘটনার একক এবং বিচ্ছিন্ন দায়দায়িত্বর পরিমাণ নির্ধারণ করে, প্রয়োজনে বিভাগীয় শাস্তি দিয়ে মুকুন্দ চাকলাদারের ফাইলে উপসংহার টেনে দেওয়ার আদেশ জারি হয়ে গেল।

ছয়

"কিছু পেলেন?"

"আজ্ঞে না" কানাইবাঁশি সরখেল পুরোপুবি হতাশ গলায় উত্তর দিলেন। বললেন, "সরকাবপক্ষের চাকরির অফারটা নাকি ওরা নিয়ে নিয়েছে। ত্রাণ তহবিলের টাকা অবশ্য আমরাও দিয়েছি, ক্যাশে। সরকার দিচ্ছে চেকে।"

"দুটো টাকাই নিয়ে নিয়েছে?"

কানাইবাঁশি একথার কোনও উত্তর দিলেন না। শ্রীমতী যোশী এখনও কলকাতা থেকে ফেরেননি। নেতা কামতাপ্রসাদ রীতিমত বিব্রত। হাইকমান্ড তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজে বেজায় অসন্তুষ্ট। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুকুন্দকে দলীয় শহিদ হিসেবে প্রমাণ না করতে পারলে, হাইকমান্ড কামতাপ্রসাদকে দিল্লি ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীমতী যোশি এখনও ইতি অথবা নেতিবাচক কোনও খবরই আনতে পারল না। কামতাপ্রসাদের আশঙ্কা শ্রীমতী তাকে বিপাকে পড়তে দেখে কলকাতায় হয়ত তার বিরোধী শিবিরের দলীয় এক নেতার সঙ্গে আমড়গাছি করছে, কামতাপ্রসাদ নির্ঘাৎ আরও গাড্ডায় পড়বে।

তবু শেষ উদ্যোগ হিসেবে কানাইবাঁশিকে নিয়ে তিনি মর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মহকুমা হাসপাতালের এদিকটায় জনসমাগম খুবই কম। মর্গের সামনের ছোট বারান্দায় ডোমদের দুজন সম্ভবত চুল্লুর বোতল নিয়ে বসেছে। চতুর্দিকে সম্ভবত বাসী লাশের গন্ধে

ওষুধ আর পচনশীল মরদেহের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আসছে। কামতাপ্রসাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

কানাইবাঁশি বলল, "যাই বলুন স্যার, শহিদদের জন্য মর্গে একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকা উচিত স্যার।"

কামতাপ্রসাদ এ কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। এই সময়েই দুজন কনস্টেবলসহ ডাক্তার পাকড়াশীকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তিনিই সম্ভবত ময়না তদন্তের কাজ সারবেন। কামতাপ্রসাদ এ অঞ্চলে খুব একটা অপরিচিত নন।

ডাক্তার পাকড়াশী কামতাপ্রসাদ এবং তার গুটিকয় অনুগামীকে সহসা এখানে দেখে একটু যেন বিচলিত। মুকুন্দর লাশ নিয়ে কামতাপ্রসাদের দলের দাবি তাঁর অজানা নয়। একটু জোরেই চিৎকার করে ডোমদের উদ্দেশ্যে বললেন, "কীরে, সব রেডি—"

কামতাপ্রসাদ ময়না তদন্তেও কেন যে আগ্রহী বোঝা মুশকিল। বস্তুত কানাইবাঁশিও কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "স্যার পোস্টমর্টেম থেকে কিছু কী পাওয়া যাবে?"

কামতাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কী আবার পাওয়া যাবে?"

"এমন কিছু যাতে প্রমাণ করা যায়, মুকুন্দ চাকলাদার আমাদের দলের শহিদ, মুকুন্দর রক্তে, শিরায় বা হৃৎপিণ্ডে ডি এন এ বা আর এন এ-তে দলের কী, আমাদের পার্টির কী এরকম কিছু থাকতে পারে, ময়না তদন্তে যেটা পাওয়া যাবে?"

ডাক্তার পাকড়াশী অযাচিত, কামতাপ্রসাদের মুখোমুখি একটু শুকনো হাসি হাসলেন। বললেন, "বুঝতে পারছি আপনারা খুব উদ্বেগের মধ্যে আছেন। কিন্তু ময়না তদন্ত না হলে তো কিছু বলতে পারছি না।"

হাতে রবারের গ্লাভস্ গলাতে গলাতে ডাক্তার পাকড়াশী দুজন কনস্টেবল আর পুরোপুরি মাতাল দুজনকে সঙ্গে নিয়ে লাশকাটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজা খুলতেই একটা প্রচণ্ড ভ্যাপসা পচা গন্ধ। কামতাপ্রসাদ বমির ওয়াক তুললেন। কানাইবাঁশিও কাপড়ের কোঁচা তুলে নাকে চাপা দিলেন।

মর্গের ঘরে আলো জ্বলল। অতি ধীরে লাশকাটা ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

কানাইবাঁশি বলল, "ময়না তদন্তে কী কিছু পাওয়া যাবে মনে হয় স্যার?"

নাজমা মা হোল

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

আবদুলের মা বারকয় ঘরবার করল।

নাঃ। ছেলেটার দেখা নেই। মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি হোল না এখনও। সেই কবে গেছিস, একবারও বাড়ীমুখো হবার নাম নেই; আমাকে না হয় কষ্ট দিলি, এই সময় ঘরে বৌটার এখন তখন, এই সময়েও একবার টুঁ' মেরে যেতে পারলি না। মনে মনে আবদুলের মা গজর গজর করছিল, নাঃ। পোলাডার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আর হবার নয়।

আবদুলের মা পুকুর ঘাট থেকে ফিরে আসবার সময় আর একবার রাস্তার দিকে চাইল।

গেঁটে বাতের ব্যথাটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। উঠতে বসতে বেশ কষ্ট হয়। তা, বয়স তো আর কম হোল না?

আবদুলের মা কোমরে হাত দিয়ে, ডান পা'টা একটু টেনে টেনেই ঘরের ভেতরে ঢুকল।

একটা চাপা অন্ধকারে ঘরের ভেতরটাও অন্ধকার; চৈত্রের শেষ; কিছুক্ষণ আগের প্রখর সূর্যটা বিরাট কালো একটা মেঘের চাপে পড়ে তির্যক একটা রশ্মি ছড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে একটা দমকা বাতাস মাঠের মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে সমস্ত শুকনো ঘাস, লতা, পাতা, ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলি নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাচ্ছিল।

আবদুলের মা'র এ সমস্ত দেখবার মত খেয়াল নেই, মানসিক অবস্থা নেই। বস্তুতঃ সেই কবে যে আবদুলের মা এ সমস্ত দেখবার মত চোখ দুটো হারিয়ে ফেলেছে তা এখন তার নিজেরই খেয়াল নেই; আবদুল যদি এখন ঘরে থাকতো, তা হলে ঐ প্রচণ্ড পাক-খাওয়া বাতাসে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে-যাওয়া ধুলো কাগজগুলি দেখতে মাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসতো। না আসতে চাইলে পাঁজা কোলে নিয়ে এক দৌড়ে উঠোনের মাঝখানে; আবদুলের মা'র বুকের মধ্যে তখন আই-ঢাই, ভয়ে আবদুলের গলা ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে হোত, 'এই ছাড়ান দে, ছাড়ান দে কইতেছি, মরব তো, মরবো রে মুখপোড়া, মারতে চাস নাকি তুই আমারে?'

এবং তখন আবদুলের বৌ, নাজমা, খিল খিল করে হেসে উঠত, বারান্দার খুঁটিটা ধরে।

পাশের ইস্কুলের মাঠের বুকে পাকানো বাতাসটা যখন উপরে ধূলোবালি নিয়ে উঠে যাচ্ছে আবদুলের মা তখন অস্পষ্ট আলোয়, ঘরের মধ্যে গুমরানো কান্নার মত শুনে তাকিয়ে দেখলো নাজমা, আবদুলের বৌ, আসন্ন সন্তানসম্ভাবনার সমস্ত লক্ষণ নিয়ে, বেড়ার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে।

আবদুলের মা আবার বাইরে এলো। বুঝতে পারলো না এক্ষুণি তার কি করা উচিত।

এ ধরনের একটা অবস্থায় আবদুলের মা পড়েছিল যখন আবদুলের আব্বা মারা যায়। একটা শব্দশূন্য, চিন্তাশূন্য অবস্থা। সেই ছোট বয়েসে পানিতে ডুবে যাওয়ার মত, দমবন্ধ করা। তবুও ক্রমশঃ সময়ের মলম সব ঘা মুছে নেয়, আবদুলের মা, আবদুলকে নিয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের মধ্যে ইচ্ছে হোত, আবদুল দারোগা হবে, বড় দারোগা; তারপর ভাবত বড় মিলিটারী হবে, মাঝে মধ্যে এস ডি ও হোক এ ধরনের স্বপ্নও দেখতো, কিন্তু আবদুল শেষ পর্যন্ত হোল মাষ্টার।

না, আবদুলের মা তাতে খুব একটা দুঃখ পায়নি। কেন না আবদুল কেমন করে যেন সব অঞ্চলটার হয়ে গেল; সবাই আবদুলকে ডাকে, ভালোবাসে। না, আবদুলের মা দুঃখ পায়নি, তবে একটু অবাক হোল যখন আবদুল বলেছিল, 'তুমি কি মা, পুলিশ, মিলিটারী কি ভদ্রলোক হয়?'

এ ধরনের কথা শুনে আবদুলের মা'র একটু ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ভদ্রলোক নয়! হায় আল্লা! কত টাকা পয়সা, গাড়ী সম্মান, ইমান, ইজ্জত— পোলাডা কয় কি! তবু উচ্চবাচ্য করে নি। যে ধরনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। কে জানে, শেষ পর্যন্ত ঘরে থাকবে তো?

আবদুলের মা বুঝেছিল কাল পাল্টে গেছে। রা করে নি। একদিন তবু বহুদিনের ভয়টাকে আবদুলের কাছে প্রকাশ করেছিল, আবদুল সাদীটা সারবি নাকি। নাজমার আব্বাকে তো কইছি! তুই রাজী হ।'

নাজমা। নাজমা আবদুলেরও পছন্দের। নাজমা তার অনেক একক সময়ের সঙ্গী। নাজমার চোখ দুটো আবদুলকে ভয়ানক দোলায়। চাপা কালো রঙের শরীর, চিকন। আবদুল ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ওর কানের রিং নাড়ানো, নাকচাবির পাথরের 'পর আলোর ঝিলিক দেখতে,— আবদুল রাজী হয়ে গেল। সাদীটা হোক।

নাজমা বোবার মত শুয়ে আছে। নাজমা এখন প্রায় শুয়েই থাকে। মাঝে মধ্যে অনেক সাধ্য সাধনার পর কিছু একটা মুখে দিতে উঠে, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে তখন আবদুলের মা চিরুণিটা দিয়ে মাথার জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে চায়।

নাজমার চোখের দিকে আবদুলের মা এখন আর তাকাতে পারে না। চোখ দুটো বসে গেছে। এমনিই কালো মণি দুটো আরো যেন চকচকে হয়েছে, অনেকটা ছুরির ফলার মতো।

নাজীর এসেছে। নাজীর আবদুলের ছাত্র। এখন দূত। নিশ্চয়ই খবর নিয়ে এসেছে। শহরের সাথে গ্রামের খবর এখন ওরাই আনা নেওয়া করে। সব বন্ধ। বন্ধ চলবে। ওরা বাংলাদেশ বানাবেই। ওরা মিলিটারী মানে না। ওরা স্বাধীনতা আনবে— আবদুলের মা সব বুঝতে পারে না, আবদুল বলতো আগে আগে— অনেক অনেক কিছু— আবদুলের মা অর্ধেক বুঝতো, অনেকটাই বুঝতো না— বুঝত একটা তীব্র আলো জ্বলে আবদুলের চোখে, নাজীরের বিস্ময় স্তব্ধ চোখ দুটো আবদুলের দিকে— আবদুল তখন একটা ভয়ানক অপরিচিত।

নাজীর এসেছে। খবর এনেছে মাস্টারমশাই আসতে পারবে না এখন। কেন? নাজীর তা জানে না। নাজীর তা বলবে না।

নাজমা নাজীরকে একা ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিল, বুঝেছিল বিপদ আসন্ন। আর সেই থেকে ও চুপ।

নাজমা এখন সুস্থ নয়। নাজমা মা হতে চলেছে। নাজমা এই প্রথম মা হতে চলেছে। এই হবে প্রথম সন্তান। বিয়ের বছর তিন পার হয়ে গেলেও যখন নাজমার মা হবার লক্ষণ আবদুলের মা বুঝতে পারছিল না তখন মনে একটা ভয়ানক ভয় হোত। তারপর সেই যেদিন নাজমা আরক্তিম লজ্জায় জানিয়েছিল সেদিনের মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে বলে এসেছিল দোয়া কর বাপজান। দরগায় মানত করেছিল; আবদুল জানলে হাসবে, গাল দেবে, তাই তাকে না জানিয়ে ফকিরের মাদুলী এনে দিয়েছিল।

আবদুলও কম খুশী হয় নি। কিন্তু আবদুল প্রকাশ করে কি করে। মা বুঝত। নাজমা বুঝত।

অথচ আবদুল, মাস দু'য়েক হয় আস্তে আস্তে কেমন যেন গুটিয়ে গেল। এখন, যখন সব সময় আবদুলের বাসায় থাকা দরকার, এখন, যখন নাজমা'র সময় হয়ে এলো তখন কিনা খবর পাঠায় এখন আসতে পারবো না।

আবদুলের মা অবাক হয়। কি টান! কিসের কি? কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, সব দায় যেন আমারই!

নাজমা কিছু বলে না। কি বলবে? কি করতে পারে ও। নাজমার বোজা চোখ দুটোর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। একটা গাছ, গাই— গরু— বাছুর কিছু নেই— সব ফাঁকা।

তিনদিন হয় কেরোসিনের ভীষণ অভাব। তেলের অভাবে আলো জ্বালানো যাচ্ছে না। চেয়ারম্যান গেছে সদরে তেল আনতে, গতকাল, এখনো ফেরেনি। অফিসটার সামনে একটা জটলা— নাজীর যেন কি বুঝাচ্ছিল, সব বন্ধ থাকবে, ভাইসব কিছু দেব না, কোন শালা খানের পুতের দালান কোঠা বিবির জন্য আমাগো ভাত দেব না, বাংলাদেশ আমাগো, আমাগো বাপদাদার, হয় আগাগোড়া আমাগো দাও নইলে সব বন্ধ, সমস্ত কিছু, শেখ সাহেব কইছে তৈরী হও— তৈরী হও— উত্তেজনায় নাজীরের গলা কাঁপছিল, আবদুলের মা দেখছিল নাজীরের চোখ দুটো কেমন আবদুল হয়ে গেছে।

আবদুলের মা তেল আনতে গিয়ে আস্তে আস্তে খালি ভাণ্ডটা নিয়ে ফিরে এলো। নাজমাকে বল্ল, বুঝতেছিনা কিছুই, কেমন সব চুপচাপ, সব বলে বন্ধ, কি কয় জানি নাইজর‍্যাটা।

নাজমা জানে সব বন্ধ থাকবে। তাই বলে একবার দেখা করে গেলে কি হোত? ঘরের লোকটাকে কি একবার মনেও পড়ে না। অন্য সময় না হয় না হোল কিন্তু এই সময়? এখন? তোমার সন্তান আসার সময় হোল, তারজন্য কি একটা ভাবনা নেই? সব বন্ধ— সব, তাই বলে আমার সন্তান কি অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করবে তোমার সময় সুযোগের জন্য?

নাজির আবার খবর আনে। না। দেবে না ইয়াহিয়া। দিতে পারে না। দেয় নি। তার বদলে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ঢাকায় রক্তের নদীতে সাঁতার কাটছে পাক সেনারা। আমরাই তো পাকিস্তানী, এতদিন তো সবাই বলেছে, আজ আমাদের রক্তে ওরা ডুবে থাকতে চায় কেন? আবদুলের মা'র মনে একটা প্রশ্ন। আবদুল কোথায়? নাজির আবদুল কোথায়?

ইয়াহিয়া যুদ্ধ করছে। কাদের সাথে? একদিকে আমরা, আমি, তুমি, আর একদিকে সব সেনারা। ওরা ঘর জ্বালাচ্ছে, সব লোক মারছে, মেয়েদের লুট করছে, ওরা বাংলাদেশে কাউকে রাখবে না। যদি থাকতে হয় তবে মরতে হবে— মরতে হবে, তৈরী হও।

আবদুলের মা হাঁসগুলিকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ঘরে এসে ডাকলো— নাজমা!

নাজমা অন্ধকার থেকে শুধুমাত্র জবাব দিল। এখন নাজমার তলপেটটা চিনচিন করে ব্যথা করছিল। সমস্ত শিরায় শিরায় কে যেন খামচে ধরছিল।

কোন বাড়ীতে আলো নেই। জানালা দিয়ে চেয়ারম্যানের অফিসের আলোও দেখা যাচ্ছে না। ওরা সব এক হয়ে গেছে এই অন্ধকারে। বিকেলের সময় থেকেই ওরা যেন কি এক প্রতীক্ষায় একত্রিত। এখন ওরা এই রাতের প্রথম দিকে হাতে যে কি সমস্ত নিয়ে খবর শুনছে। ওরা কে কে ওখানে? একটা জড়ো হওয়া মানুষের দল— কোন আলাদা অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না— যখন নড়ছে সেই ভীড়টা নড়ছে যখন বসছে ভীড়টা বসছে— নাজমা শুয়ে শুয়ে অন্ধকারের আলোয় ওদের উপলব্ধি করছিল।

গভীর রাতের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত পদ্মার ঝড়ের মত— সমস্ত অস্তিত্বে নাড়া দিয়ে নাজমার গর্ভের ভ্রূণ উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

নাজমা এক অভূতপূর্ব ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষমান। আবদুলের মা তখন উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে আজন্মলালিত শব্দটা উচ্চারণ করছিল— আল্লা! বাইরের রাস্তার দিকে দুটো বৃদ্ধ চোখ সমস্ত অন্ধকার ছেদ করে একটা ধাইয়ের অপেক্ষায় স্থির। মাথার উপরে অসংখ্য নক্ষত্র। চতুর্দিকের নারকেল, সুপারী, আমগাছগুলি একটি স্তব্ধ ফকীরের মত নিশ্চুপ।

আবদুলের মা হঠাৎ দেখতে পেল পুব দিকটা লাল। আবদুলের মা তার চোখে দেখাটা অস্তিত্বে অনুভব করে হঠাৎ বলে ফেল্ল, ইয়া আল্লা! আ-গু-ন।

আ-গু-ন, আ-গু-ন। হঠাৎ সমস্ত পাড়াটা প্রতীক্ষিত সম্ভাবনার জন্য অপেক্ষমান জনতা যেন এক সাথে চিৎকার করে উঠল। একটা খট-খট শব্দ, আগুন, এই অন্ধকারের মধ্যে এই বিপন্ন জীবনের মধ্যে, ঐ সন্তান সম্ভাবনাময় নারীর রুদ্ধ দ্বারের বাইরে এক বৃদ্ধার অবোধ্য চেতনার সামনে সমস্ত আকাশটায় আগুন এবং ঐ আগুনের অস্পষ্ট ছায়ায় আবদুলের মা দেখতে পেলো উদ্যত হাতে কি যেন উঁচিয়ে বাইরের দরজাটা ভেঙ্গে ঢুকছে— কে কে?

— চুপ রহো শালী! ভায়া, ইয়ে শালা আবদুল মাস্টারকো ঘর হ্যাঁয়।

মা, আবদুলের মা ঠিক উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। মাথার উপর অগণ্য নীরব নক্ষত্র, পূর্বাকাশ একটি জ্বলন্ত আগুন, আবদুলকে চায়, আবদুল কি করছে— আবদুল বাড়ী নেই— হাতে ওদের ওগুলি কি— ওরা ঢাকা জ্বালাচ্ছে— ওরা সব মারছে— ওরা আমাগো মারতে চায়— নাজমা ঘরডার মধ্যে ওর তো পোলা হবে আবদুলের পোলা— আবদুল আইয়ে না কেন—

সেই লোকগুলো ওকে খোঁচা মারে— বোল বুঢ্‌টী—

—হ। তীব্র যন্ত্রণায় আবদুলের মা চিৎকার করে উঠে, হ, এইডাই আবদুলের বাড়ী, আবদুল তো নাই, আবদুল ঘরছাড়া— আবদুল নাই—

নাজমা বাইরের শব্দে, আগুন আগুন শব্দে, খটাখট শব্দে আবদুলের মা'র তীব্র যন্ত্রণাবিদ্ধ চিৎকারে, আবদুলের নামে উঁকি দিয়ে দেখলো।

দেখলো একটি মা'কে ঘিরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে, হাতে তাদের উদ্যত কি যেন, বন্দুক— যা দিয়ে হাঁস মারে? যা দিয়ে বাঘ মারে, যা দিয়ে মা— আবদুলের মা-কে ঘিরে রেখেছে।

আবদুলের মা যেন তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার একটি সম্পূর্ণ সত্যের মুখোমুখী যে ওরা মারতে এসেছে। ওরা মারবে। ওরা আবদুলকে মারবে, ওরা আবদুলের অনাগত সন্তানকে মারবে, এই বাড়ীর সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দেবে। ওরা নাজমাকে দেখলে টানবে— ওরা নাজমাকে দেখে আগুনে ছেড়ে দেবে; ওরা ঢাকা বানাবে।

তাই একটা আদেশের মত, এই অন্ধকারের সমস্ত স্তর ভেদ করে আবদুলের মা চিৎকার করে বলতে লাগলো— আবদুল তুই পলাইয়া যা— আবদুইল্যারে তোগো মারতে আইছে— আবদুইল্যার পুত তুই পলা— পলা—পলা...

নাজমা যেন কেমন হয়ে গেল। নাজমা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সচেতন। নাজমার তলপেটে তখন একটি মানবশিশু গুমরানো অবাধ্য। নাজমা পেছনের দরজার মুখোমুখী। নাজমার মাথার চুলগুলো পিঠটায় ছড়ানো, নাজমার চোখদুটো যেন নক্ষত্রের মত তীব্র, হলদে।

নাজমা হাঁটতে চাইল। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য নাজমা একটুও দায়ী নয়। নাজমার পেছনে তখন আগুনটা ক্রমশঃ বাড়ছে। নাজমার চোখদুটো তখন দেখছিল না। নাজমা কেন হাঁটছে? কোথায় হাঁটছে— এভাবে দ্রুত হাঁটা কি উচিত— এত ছপল ছপল কইরগা হাঁটব না— এই সময় এমন কইরগা হাঁটে না— নাজমা হাঁটছিল না, নাজমা দৌড়াচ্ছিল— আবদুলের বাড়ী এটা— ওরা খোঁজ করছিল— আবদুলের সন্তান এই গর্ভে— এই সংবাদ ওরা জানে কি? জানে ওরা নিশ্চয় জানে; অথচ আবদুল না থাকলে এই নাজমার সন্তানের কোন মূল্য থাকবে কি?

না। নাজমা আর পারবে না। নাজমা বসলো। এটা কোন জায়গা? কত পথ? এটা কোথায়? তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তোমরা কি আবদুলের কেউ হও? তোমরা কি আবদুলের মা, আবদুলের বৌ, আবদুলের সন্তান? তা হলে তোমরা এই ভোররাতে কোথায় চলেছ, কেন চলেছ?

আমি পারছি না, আমি আবদুলের নাজমা, আমার যেন কি হবে— আবদুল বলেছিল পোলা হবে— আবদুল বলেই খালাস— আবদুল শহরে গেছিল, ঢাকায় নাকি রক্তের ঢেউ— সেই ঢেউ এই গাঁয়ে এসেছে অথচ আবদুল এলো না— আবদুল বলেছিল কি স্বাধীন হবে— আমার পোলা হবে— সব মাঠে নাকি ফুল ফুটবে— তোমরা যাইয়ো না যাইয়ো না— এখন সময় কত— সমস্ত অসংযত বাক্যস্রোত মনের মধ্যে নিয়ে নাজমা— আবদুলের স্ত্রী এখন এই মুহূর্তে একটি অপরিচিত স্থানে একটি শত পল্লবিত গাছের তলায় কোন অপার্থিব চেতনায় বসে পড়ল— নাজমা শুয়ে পড়ল— এবং নাজমা জানে না কি ভাবে— নাজমা মা হয়ে গেল—।

ওরা চলছে। ওরা ছুটছে। ওরা দাঁড়াতে চায় না। হঠাৎ শুনতে পেল একটি নব জাতকের কান্না। একটি বৃক্ষমূলে।

তখন ক্রমশঃ পূর্বের আকাশটা সূর্যের সম্ভাবনায় আলো হয়। তখনো সমগ্র পূর্বাঞ্চলে আগুন ও ধোঁয়া, তখনও সমস্ত মানুষ চলমান, এবং ঠিক তখন কি করে নাজমা, একটি সৈনিকের বৌ অন্ধকারে অনির্দিষ্ট একটি বৃক্ষতলে মা হয়ে গেল। নাজমা মা হোল।

চারজন

প্রবীর ঘোষ

— তোমার কি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই?
— বলতে পার জ্যোতিষী নই।
— তোমার বুদ্ধি আছে ঘোড়ার ডিম।
— তোমারই বা কী বুদ্ধিটা আছে শুনি?
— কেন?
— তুমিই বা কি করে এলে?
— আমি কি করে জানবো যে—
— আমারও তো সেই কথা। — কথাটা বলেই সুদর্শনের মনে পড়ে গেল অশ্ব রায়ের কথাটা। — উ-ফ্; বইটা যা হয়েছে না; রগরগে জিনিস।

সোমা তাকাল খোকার দিকে। খোকা হাত পা নেড়ে কি যেন বলে যাচ্ছে তনুকে। তনু হাসছে। জোরে জোরে দুলে দুলে হাসছে। তনু খোকার বয়সী প্রায়। খোকার ষোল। তনুর বছর পনের।

— এ ছবি ছেলের পাশে বসে দেখি কি করে? — সোমার স্বরে কিছুটা অস্বস্তি।
— ছেলের পাশে বসে দেখতে হবে না।
— তনুর পাশে বসেই বা দেখি কি করে?
— তনুর পাশেও বসতে হবে না, আমার পাশে বোসো।
— আমার কিন্তু লজ্জা করছে।
— লজ্জা তো আমারও করছে।
— তবে টিকিট বিক্রি করে ফিরে যাই চলো।
— ক্ষেপেছো?
— ক্ষেপার কি হলো?
— খোকা, তনু কি ভাববে?
— তনুকে তুমি না আনলেই ভাল করতে।
— কথাটা আগে মনে করলেই পারতে।
— আগে কি জানতাম?
— তা-ও, তনু পরের মেয়ে।
— খোকার বন্ধুতো!
— বান্ধবী বলো।
— ওই বন্ধু, বান্ধবী একই ব্যাপার।
— খোকার সঙ্গে ওকে এই বই দেখালে—

— আরে ধুর— এইটুকু মেয়ে—। — সম্ভাবনাটুকু নিতান্ত অবহেলাভরে উড়িয়ে দিল সুদর্শন।

— চল একটু চা খেয়ে নিই। — কথাটা বলেই ভারিক্কি গেজেটেড অফিসার সুদর্শন মুখার্জী মুখটা সোমার কানের কাছে নিয়ে এসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো, বইটা দেখতে দেখতে আমরা না হয় বিশ'টা বছর পিছিয়েই যাব। পিছিয়ে যাব আজ রাতে বিছানায়ও।

সোমা অস্বস্তি বোধ করলো। এদিক ওদিক তাকালো। কেউ ওদের কথা শুনছে বলে মনে হয়না। ভীষণ ভিড়, সবাই ব্যস্ত। সুদর্শনের কথাটা সোমার ভালই লাগলো। সোমা হঠাৎ ছট্‌ফটিয়ে বললো, ওদের ডাকি, এক সাথেই খাব।

সোমা এগিয়ে গেল খোকা আর তনু'কে ডাকতে। সুদর্শন সিনেমা হলের দেওয়ালে আঁকা জিনতের বিরাট ছবিটার দিকে তাকাল। অতি স্বল্প বেশবাস। শরীরের চড়াই উৎরাইগুলো বড় বেশী স্পষ্ট। দারুণ একটা আবেদন আছে। তনু'র দিকে তাকাল। পরনে বেলবটস্ আর কুর্তা। তনুর বুক, কোমর আর পাছা জিনত - জিনত। মাঝে মাঝে একটা ব্যানলনের গেঞ্জী পরে বেলবটসের সঙ্গে। বুক দুটো আরো ফুলে থাকে। দারুণ এট্র্যাক্‌টিভ।

— চারটে চা। —সোমা বললো।

— না, তিনটে। —তনু বললো।

— কেন, তুই চা খাবি না? —গলার ঘাম মোছা বন্ধ রেখে খোকা জিজ্ঞেস করলো।

— কোকাকোলা। —তনু খোকার দিকে তাকাল।

— আমিও। —খোকা তনুর দিকে তাকাল।

— তিনটে কোকাকোলা একটা চা। —সুদর্শন পর্যায়ক্রমে তনু, খোকা, সোমা আর স্টলের লোকটার দিকে তাকাল।

— বাঃ বাঃ তিনজনেই কোকাকোলা আর আমি—

— নেবে কোকাকোলা?— সুদর্শন সোমার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলো।

— যাই বলো চা'য়ে যা আরাম কোকাকোলায় তা—

—কোকাকোলায় যা দেয় চায়ে তা পাওয়া যায় না।—দাঁত ছড়িয়ে সুদর্শন সোমার দিকে চেয়ে হাসল।

— কোকাকোলায় একটা এনাসিন্ ফেলে খেলে দারুণ মজা হয়। —মা বাবার কান বাঁচিয়ে তনুকে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললো খোকা।

— জানি।

— কি হয় বলতো?

— বললাম তো জানি।

— কি করে জানলি?

— অমনি জেনেছি।

— খেয়েছিস?

— তুই খেয়েছিস?

— নাও ধর।— সুদর্শন কোকাকোলার বোতল এগিয়ে দেয় তনু আর খোকাকে।

— আমিও আরম্ভ করছি কি বল?

— কর।— সোমা সুদর্শনের দিকে চাইল। দেখলো খোকা আর তনু'কে। তনু বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে। তনু'রা যখন এ বাড়ীতে ভাড়া আসে তখন ওর বয়স আর কত? ছয়—সাত হবে। বেশ লম্বা হয়েছে। ওর বাবার ধাত পেয়েছে। মা মাঝারি লম্বা। ওর মায়ের মতো গায়ের রঙটা পেলে ভাল হ'তো। খুব হাসি-খুশি, মিষ্টি স্বভাবের। খোকার

সঙ্গেই ওর বেশী বন্ধুত্ব। খোকা ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে। তনু ক্লাস টেনে। খোকাটা রেজাল্ট্ ভাল করলে ডাক্তারী পড়বে। বছর সাতেক লেগে যাবে ওর চাকরী পেতে। চাকরী পেলে তনুর মা'কে কথাটা পাড়লে মন্দ হয় না। তনুর বেশবাসগুলো একটু, এই বেলবটস্ না পরে শাড়ি পরলে কত সুন্দর দেখাত।

চা'য়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে সোমা চুমুক দিল আয়েস করে। সোমা হাসলো— তোমাদের কোকাকোলার চেয়ে অনেক ভাল।

ওরা কোকাকোলা খাচ্ছে। তিনজনের ঠোঁটেই স্ট্র। সুদর্শন সোমার দিকে চাইল। স্ট্রটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে দাঁত বার করে হাসলো।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। একটানা বেল বেজে চলেছে।

—চল ঢোকা যাক। — খালি বোতলটা ষ্টলের লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো সুদর্শন।

— হ্যাঁ চল।— কাপটা এগিয়ে দিল সোমা।

— চল্। খোকা তনু'র হাত থেকে বোতলটা নিতে নিতে বললো।

তুই আগে ঢুকবি, আমি তোর পেছনে পেছনে যাব।— বলল তনু।

— কেন রে?

— না বাবা, অন্ধকারে আমি আগে ঢুকবো না।

— কেন?

— অন্ধকারে যার তার হাত এসে গা'য়ে পড়ে।

— পড়েছিল বুঝি?

— জেনে কি হবে?

— না; বলছিলাম আমার হাতটাও তো—

— একটি ল্যাং খাবি।— এগুতে এগুতে চোখ পাকাল তনু।

টর্চের আলোটা কয়েকটা সিটের ওপর লাফালাফি শেষ করতেই সোমা ফিস্‌ফিস্ করলো সুদর্শনের কানের কাছে, আমি বাপু খোকা বা তনুর পাশে বসে এইসব অসভ্য বই দেখতে পারবো না।

— খোকা ভেতরে ঢোক।— অন্ধকারে সুদর্শনের গলা শোনা গেল।

— খোকা ভেতরে ঢুকলো। খোকার পেছনে তনু, তারপর সুদর্শন, অবশেষে সোমা।

সুদর্শন নিবিষ্ট। জিনত খুব ফ্রি এক্‌টিং করছে। জিনতের পোষাক-আসাকগুলো খুব সংক্ষিপ্ত। জিনতের স্কার্টের নীচে জাঙ্গিয়া দেখা যাচ্ছে। জিনতের কলাগাছের খোরের মতো পুরুষ্টু ধব্‌ধবে সাদা উরু দেখা যাচ্ছে। তনু এমনি সর্ট স্কার্ট পরলে জিনতের মতোই দেখাবে। তনুর উরু'ও এমনি পুরুষ্টু এমনি মসৃণ। সুদর্শন তনুর দিকে তাকাল। তনু খোকার দিকে চেয়ে আছে। তনু যখন জোরে জোরে হাসে, তখন ও শরীরটা দোলায়। দুলে দুলে হাসে। ওর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর বুক দু'টো দোলে। জিনত স্তন দু'টো প্রায় অনাবৃত রাখা লেসের ব্রা পরেছে। জিনত হাসছে। জিনত দুলছে। জিনতের স্তন দুটো দুলছে। তনু'ও লেসের ব্রা পরলে ওকেও বোধহয় এমনিই লাগবে।

সোমা চিম্‌টি কাটলো সুদর্শনের উরুতে। সোমার চোখে চোখ রেখে হাসলো সুদর্শন। অন্ধকারেও সুদর্শনের সাদা দাঁতগুলো দেখতে পেল সোমা।

হাফ্ টাইম। সুদর্শন বেরুল। তলপেটটা খুব ভারী ঠেকছে। ল্যাট্রিনটা ঘুরে চীনাবাদামের ঠোঙা আর পটেটোচিপস্ নিয়ে ঢুকলো। সোমার কোলে রাখলো পটেটোচিপ্‌সের ঠোঙাটা। সোমা পটেটোচিপ্‌স ভাল খায়। বাদামের ঠোঙাটা তনুর কোলে। তনু ভালবাসে চীনাবাদাম।

হলের আলো নিবলো। অন্ধকারে তনু'র ঠোঙা থেকে একটি একটি করে বাদাম তুলে নিতে লাগলো সুদর্শন, খোকা আর তনু। কুট্‌কুট্‌ করে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগলো সুদর্শন, খোকা আর তনু। সুদর্শন কোলের ঠোঙাটায় এক সময় হাত দিয়ে বললো, ফুরিয়ে গেল। আরো আনলে হতো।

— না, না। — তনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

— বাবা মহা পেটুক।— খোকার গলা শোনা গেল।

সুদর্শন তনুর কোলে ডান হাতটা এলিয়ে দিয়ে ঠোঙাটা দলা পাকাল। জিনত নাইটি পরেছে। বড় বেশী স্বচ্ছ। ঠোঙাটা হাত থেকে গড়িয়ে দিল। পাশে নায়ক শুয়ে, খালি গা। এলিয়ে দেওয়া হাতটাকে টেনে নিয়ে তনুর উরুর ওপর রাখল সুদর্শন। বেলবটস্‌টা খসখসে; খাদির; টেরিলিনের হলে—

সোমা আবার চিমটি কাটলো। বাঁ হাত'টা দিয়ে সোমার হাতটাকে ধরে একটু চাপ দিল সুদর্শন। সোমা সুদর্শনের চোখের দিকে চেয়ে হাসছে। সুদর্শনও হাসলো। সুদর্শন আবার সোমার দিকে চাইলো।

খোকা বোধহয় কিছু বলেছে। তনু হাসছে। চাপা হাসি। ও নিশ্চয় দুলছে। ওর পিঠটা নিশ্চয় উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বুকদুটো তলার দিকে ঝুলে পড়ছে। সুদর্শনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

আলোগুলো জ্বলে উঠলো। সবাই উঠছে। সোমা এগুলো। পেছনে সুদর্শন, তনু আর খোকা।

খোকা ফিস্‌ফিস্‌ করলো, — বেশ জমাটি।

— ঘোড়ার ডিম। — তনু ভেঙচে উঠলো।

— তোর থাইয়ে হাত রাখলাম, তুই আমার হাতটা ধরলি না কেন?

— তুই ধরেছিলি ডান উরু, তোর বাবা বাঁ উরু। কোনটা ধরবো? ধু-র, তাই কোনটাই ধরিনি।

উর্মি

কণা বসু মিশ্র

উর্মি বসে বসে খাতা দেখছিল। ওর ভুরু দুটো ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে মাঝে মাঝে যখন লাল পেন্সিলের কড়া দাগে খাতার প্রায় প্রতিটি পাতাই ভরে যাচ্ছে। এত ভুল লেখে মেয়েরা। আলেকজাণ্ডার কালিন্দী পর্বত অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। হিন্দুকুশ লিখতে লিখেছে কালিন্দী। আর ওদিকে আকবরের সভায় নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন যদুভট্ট। কোথায় তানসেন লিখবে, তা না, লিখেছে যদুভট্ট; এসব কথা পড়ে উর্মি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। স্কুলে আর পড়াতে ভাল লাগে না। দু দিন পর পর শুধু উইক্‌লি টেস্ট আর মান্‌থলি টেস্টের ঘটা। গাদা গাদা খাতা দ্যাখো। আর তারপর যদি একটাও ভাল খাতা হয়। অথচ ক্লাসে পড়ানোর সময় ওরা এমনভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মিস্ যা বলছেন, সব বেদবাক্যের মতন শুনে যাচ্ছে। উর্মির মনে হয়, প্রেম করে করেই মেয়েগুলোর এই অবস্থা হয়েছে। অল্প বয়েসে পাকামী করলে যা হয়। আজকাল সেভেন এইটের মেয়েরাও যা পাকা। এই তো সেদিন সুগতর সঙ্গে বাঁধ দেখতে গিয়ে উর্মি কয়েক ডজন ছাত্রীর মুখোমুখি হয়েছিল, যাদের সঙ্গে রয়েছে অতিআধুনিক হিপিমার্কা যুবকেরা। উর্মিকে দেখেও ওদের কোনরকম সঙ্কোচ হয়নি। বরং অজস্র গুড ইভনিং শুনিয়ে ওরা মিসকে পাগল করে তুলেছিল। হলের অন্ধকারে ওদের চাপা হাসি আর ফিস্‌ফিসানির জ্বালায় উর্মি অস্থির হয়ে উঠেছিল। সুগতকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির পর এখন একটু রোদ উঠেছে। অবশ্য বাতাসে বাদলার ছোঁয়া এখনও রয়েছে। তবুও ঘরে ফ্যান চলছে। উর্মির গরম বোধটা একটু বেশী। তারপর আবার এই খাতার বোঝা ওকে রীতিমত কাহিল করে ফেলেছে। মনে মনে ছটফট করছে, কখন এই দায় থেকে সে উদ্ধার পাবে। কলেজে একটা কাজ পেলে হত। প্যানেলে ইণ্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু কোন লাভই হয়নি। সুগতরও কোন একটা হিল্লে হল না। সমানে ইণ্টারভিউ দিয়েই চলেছে। চাকরি আর হচ্ছে না। এখন দিল্লিতে গেছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াতে একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে। কাজটা ওর হবে বলে মনে হয় না। একটা পাকাপাকি কাজ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারছে না সে উর্মিকে। এদিকে বিয়ের অজস্র সম্বন্ধ আসছে ওর। বাবা-মার কথার অবাধ্য না হয়ে পাত্রপক্ষের কাছে দু-একটা ইণ্টারভিউও দিয়েছে উর্মি। তার মধ্যে একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ারও আছেন। তিনি এখন মাইথনে। আর সব সম্বন্ধগুলো নাকচ হয়ে গেছে। শুধু এইটেই ঝুলছে। কেননা, পাত্রের বড় বেশী ভাল লেগেছে উর্মিকে। মা বাবারও ইচ্ছে এখানেই হোক। বেকার এঞ্জিনিয়ার সুগতর হাত থেকে তাঁদের মেয়েটা অন্তত রেহাই পাক। অথচ উর্মির পছন্দ নয় সেই পাত্রকে। সুগতকে তার জীবনের কোন একটা সমস্যা বলে মনেই করে না উর্মি। ওকে যে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন দাসখতও লিখে দেয়নি সে। আসলে ভদ্রলোককে ওর খুব উন্নাসিক মনে হয়েছিল। খাবার প্লেট সামনে রেখে মা যখন তাকে বললেন, খাও বাবা, লোকটা তখন চাবির রিঙ দোলাতে

দোলাতে বলেছিল, অন্‌লি এ কাপ অব টি। — ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ লেগেছিল ঊর্মির। সাধারণ এক বাঙালী বয়স্কা মহিলার এই আন্তরিকতাটুকু প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আর যাই হোক, বাহাদুরী কিছু নেই। টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

ঊর্মির ইচ্ছে করছিল না। হলঘরে গিয়ে ফোন ধরতে হবে। সিম্‌কুটা করছে কি? ফোনটা ধরতে পারছে না? কিছুক্ষণ আগে তো ওর কলরব শোনা যাচ্ছিল, ডায়ভুকে নিয়ে পিংপং বল খেলছিল সিম্‌কু। এখন বেলা দুটো। এই অসময়ে ফোন করলই বা কে? সুগত সাধারণত এই সময় ফোনটোন করে। কিন্তু সে তো এখন কলকাতার বাইরে। ফোনটা বেজেই চলেছে। বেজে বেজে থেমে গেল ফোন। আবার নতুন করে রিঙ হতে থাকল। ঊর্মি ততক্ষণে আরেকখানা খাতা টেনে নিয়েছে। ও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, সিম্‌কু, সিম্‌কু!

সিম্‌কু বাইরে গাড়িবারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন পিসি, ষাঁড়ের মতন? —ঊর্মি থমকে গেল। অতটুকু ছেলের মুখে কী কথা! ও বলল, এই, খুব পেকেছিস তো। যা, ফোনটা ধর।

সিম্‌কু তবুও ফোন ধরল না, দরজার কাছে এসে বুড়ো আঙুল দেখালো। তারপর ডায়ভুর চোখের সামনে পিংপং বলটা নাচাতেই থাকল। ডায়ভুর ঘেউ ঘেউ বাড়ছে। প্রচণ্ড জোরে লাফালাফি করছে। ওদিকে টেলিফোনের আর্তনাদ। ঊর্মির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ও দ্রুত গিয়ে ফোনটা ধরল। ঊর্মি বললো, হ্যাল্‌লো।

— ও-পাশের পুরুষ কণ্ঠ বলল, আপনি মানে ঊর্মি, ঊর্মি তো?

— চিনতে পারল না ঊর্মি। তবু বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

— আমি। আমায় চিনতে পারছেন না? আমি মানে ...। ততক্ষণে চিনে ফেলেছে ঊর্মি।

কিন্তু চিনতে পেরেও ও না-চেনার ভান করলো। ওর বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে তখন। ওর পায়ের তলা ঘামছে। হাত কাঁপছে। ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রিসিভার কানে চেপে ও তাকিয়ে আছে। ঘরের সিলিং দেখছে। ফ্যানটা বন বন করে ঘুরছে। ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে ফরফর করে উড়ছে সিম্‌কুর ছেঁড়া ঘুড়িটা। দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে থমকে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা অনেকক্ষণ। আজ চাবি দেওয়া হয়নি। জয়ন্তানুজ সেন এতদিন পরে কি মনে করে ফোন করছে? ঊর্মি ভাবছে। সেই লাজুক মুখচোরা যুবক, পাপড়ির দাদা। ঊর্মি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এতদিন পর শেষ পর্যন্ত ফোন করল! এই সাহসটুকু সঞ্চয় করতে ভদ্রলোকের পাঁচ বছর কেটে গেল! মনে হয় যেন একটা যুগ! আশ্চর্য!

ডায়ভু অসম্ভব গোলমাল করছে। এই মুহূর্তে সিম্‌কুটা কি একটু চুপচাপ থাকতে পারছে না? — আমি জয়ন্তানুজ সেন। — ও পাশের ভরাট গলায় বেজে উঠল নামটা। ঊর্মি বলল, কি ব্যাপার? (ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না ওর গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল কিনা) জয়ন্তানুজ বলল, আপনাকে বড় প্রয়োজন।

— সেকি! কেন?

— সব কথা কি ফোনে বলা যায়? — একটু যেন বাধো বাধো গলায় জয়ন্তানুজ বলল।

— বুঝতে পারছি না, এতদিন পরে আমার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে?

ওদিকের কথা থেমে গেল। তারপর দু পক্ষেরই কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে বাজলো ঊর্মির। ওর বলতেইচ্ছে হল, কাপুরুষ। কিন্তু ও বলতে পারলো না। জয়ন্তানুজ বলল, আসুন না বিকেলে গড়িয়াহাটের মোড়ে? আপনাকে খুব দরকার।

— দরকারটা কি হঠাৎ আজই হয়ে পড়ল? — কৃত্রিম কাঠিন্যের সুর ঝরে পড়ল ঊর্মির গলায়। ও তরফের কোন জবাব নেই। ঊর্মি বলল, হ্যালো! হ্যাল্‌লো!

— শুনছি, বলুন।

— আমার সময় বড় কম। স্কুলের মেয়েদের খাতা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

— বিরক্ত না করে উপায় নেই। আসবেন ঠিক ছটায়? ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে—

কথা শেষ হল না। লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলো উর্মি। টেলিফোন বিভ্রাটটা যেন আজকাল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবল জয়ন্তানুজ কে জানে! হয়তো ভাবতে পারে উর্মি ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দিয়েছে। ছি, এতখানি অভদ্র সে নয়; ওর বুকের মধ্যে যেন ভারী একটা রোলার চলে যাচ্ছে। অসহ্য একটা চাপা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে উর্মি। উর্মি ভাবছে, এতদিন পর ও কেন এলো? বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। এতদিন যে লোক তার কোন খোঁজখবর রাখেনি, তার নরম মনটা নিয়ে খেলা করেছিল পাঁচ বছর আগে, সেই লোকটার আজ দুম্ করে টেলিফোন না করলেই কি চলত না? ওর ঘাড়ে এই যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দেবার কি অধিকার ছিল? লোকটা জানতে পারল না, সে ওর কতখানি ক্ষতি করেছিল। ওর সমস্যাহীন জীবনে সে যে নতুন করে সমস্যা তৈরি করল।

বাইরে বৃষ্টির আকাশ। আকাশে এখন স্লেটের মতন মেঘ। উর্মি ভাবছে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসটা কি খুব বেশী দূরে? বাড়ির সামনে সদর রাস্তা। অসংখ্য বাস ছুটছে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়। এ সময় বেরুনো খুব কষ্টকর হবে? আজ ট্রাম স্ট্রাইক। একটু না হয় ভিড়ই হবে বাসে। মিনি বাসও তো রয়েছে কিংবা ট্যাক্সি। ছটার আগেই যদি ওর কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়? একেবারে ওর অফিসের চেম্বারে? তারপর ওখান থেকে যদি বেরিয়ে পড়া যায়। ইডেনের নির্জন ছায়ায়, বার্মিজ প্যাগোডার কাছে বেশ নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লে বেশ হয়। কিন্তু কি কথা বলবে প্রথমে? কি কথা দিয়ে শুরু করবে? ঠিক তেমনি মুহূর্তে কি কোন কথা বলা যায়? সিগারেটের আগুনের মত যে লোকটা একটু একটু করে পুড়িয়েছে তার অষ্টাদশী মনটাকে, সেই মানুষটাকে কি ক্ষমা করা যায়? ও হয়ত খুব রূঢ়ও হতে পারবে না। অভিমান, যন্ত্রণা, আবেশ সব মিলে ও যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাকে একসময় প্রত্যেক সকালে, প্রত্যেক সুন্দর সন্ধ্যায় মনে মনে আরতি করেছে, কামনা করেছে, সেই দুর্লভ মানুষটাকে হঠাৎ এভাবে পাওয়াটাকে ওর লটারীতে জেতা ভাগ্যফলের মতন মনে হচ্ছে। ঠোঁট কেটে কেটে হাসল উর্মি। নিজেকে এখন খুব দামী মনে হচ্ছে, কোন একজনের কাছে নিজেকে দুর্লভ ভেবে। হয়ত সেও তাকে অমনি করেই চেয়েছিল, এত বছরেও ভুলতে পারেনি। আশ্চর্য! আমরা যদি একে অন্যের মন দেখতে পেতাম! উর্মি ভাবছে, যদি কোনও ক্যামেরায় সেই মনের ছবি তোলা যেত! কি বলতে চায় ও এতদিন পরে? আবেগ, সেন্টিমেন্টের কথা, নাকি রোমাণ্টিক মনের কয়েক টুকরো ফুলঝুরি? যে জিনিসটা ছেলেদের কাছে দারুণ একচেটিয়া। বড় অসময়ে কেটে গেল লাইনটা। উর্মির আফশোস হচ্ছে ওকে দুটো কথা শোনাতে পারল না বলে। ও মনে মনে আওড়ালো জয়ন্তানুজের সংলাপগুলো, এমন কি তাঁর অসমাপ্ত কথাটাও। ওর খুব ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওকে। ওকে অপমান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ওপর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি আরেকজনকে ভালবেসেছি। আমরা শিগগিরই বিয়ে করছি। অথবা সব থেকে সুন্দর অপমান হয়, যদি ওর সঙ্গে আজ দেখা না করা যায়।

সিম্কুটা সমানে ক্ষেপাচ্ছে ডায়ভুকে। তার চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়ছে। বেড়ালের মতন লেজ ফুলিয়ে ও ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজ তুলছে। খুব অসহ্য লাগছে উর্মির। অন্যদিন হ'লে সেও হয়ত ভিড়ে যেত সিম্কুর দলে। কুকুরটাকে উত্তেজিত করত। কিন্তু আজ আর পারল না ওদের সুরে সুর মেলাতে। ও ঠাস করে একটা চড় মারলো সিম্কুর গালে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সিম্কু। কাঁদতে কাঁদতে বলল— দাঁড়াও, আমি দাদুকে বলে দেব। যা না, বলে দে।

উর্মি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। ও যেন সিম্‌কুর বয়েসী হয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে। সিম্‌কুকে আরেকটা চড় মেরে ডায়ভুর গলায় চেন পরিয়ে বেঁধে দিল উর্মি রেলিঙের সঙ্গে। সিম্‌কু চেঁচালো কাঁদলো। অভিমানী চোখে তাকাল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দাদুর কাছে। উর্মি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর অভিমানী জলভরা চোখ দুটো। অন্যদিন হলে ওর বুক টন টন করত। ও কিছুতেই পারত না সিম্‌কুকে এভাবে কাঁদাতে। কিন্তু আজ যেন ওর পক্ষে সবই সম্ভব। এই তো কিছুক্ষণ আগেও ছিল অন্য জগতে। সিম্‌কু কত বায়না করেছিল, তাকে সব থেকে বেশী প্রশ্রয় দেয় পিসি। কিন্তু টেলিফোনটা আসার পর থেকেই উর্মি কেমন বদলে গেল। ও বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। খাতা দেখায় মন দিতে পারছে না। ওদিকে স্প্যানিয়াল কুকুরটার চেঁচানি বাড়ছে। তার কান্না, সিম্‌কুর কান্না, বাসের শব্দ মিলে ওর কানের মধ্যে বিচিত্র এক অর্কেস্ট্রা বেজে চলল। নিজেকে এত গোলমালের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও একটা মুখ ও ভুলতে পারল না। সে মুখ জয়ন্তানুজ সেনের। কেমন দেখতে হয়েছে? উর্মি ভাবছে, ওর স্বাস্থ্যটা কি আরেকটু ভাল হয়েছে? না, তেমনি রোগাই রয়েছে? চশমার পাওয়ারটা নিশ্চয় আরেকটু বেড়েছে। চোখ দুটো কী দারুণ উদাসীন ছিল। ওই চোখ দুটোই তো তাকে প্রতারণা করেছিল, উর্মির মনে হয়। ওই দু'চোখের এমন ভাষা ছিল, যা উর্মিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ওর দিকে অপলক চেয়ে থেকে থেকে নীরবে ভালবাসা জানিয়েছিল। অথচ সেই চোখের মানুষ কোনদিনই কাছে আসেনি।

তখন কলেজ জীবনের প্রথম দিনগুলো। পাপড়িটা প্রায়ই টানটে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। পাপড়ির পাশের ঘরটাই ছিল তার দাদার পড়ার ঘর। দু ঘরের মাঝখানে একটা খোলা দরজা। হাওয়ায় উড়ে উড়ে যেত ছিটের পর্দা। উর্মির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যেত কতবার। প্যাকিং ব্যাক্স কেটে কোনরকম একটা টেবিল করা হয়েছিল। তার পড়ার টেবিল। সে বসত একটা সস্তা কাঠের চেয়ারে। তার বই থাকত কেরোসিন কাঠের তৈরী বুকসেলফে। নিতান্তই সাদামাটা জীবন। পাপড়ির বাবাকে দেখলে মনে হত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নায়ক। নেহাৎ ভাল ছেলে ছিল বলেই জিওলজি নিয়ে অত পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিল জয়ন্তানুজ, পাপড়ির দাদা। ফি মাসে মাসে সে স্কলারশিপ পেত। বাকী টাকাটা জোগাড় করত টিউশনি করে। নিজের পড়ার খরচ চালাত এতে এবং সেই সঙ্গে বোনেরও। পাপড়ি গল্প করত। তার দাদার গল্প। বইটই পড়ে তার দাদা।

পাপড়ি বলত, তার দাদা গল্প লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা কবিতা লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা ছবি আঁকে।

পাপড়ির মুখে তার দাদার প্রশস্তি শুনতে শুনতে উর্মি একেবারে হাঁ হয়ে যেত। একথা তখন ওর মাথায় আসত না যে, ওই বয়েসে বাঙলাদেশের অনেক ছেলেই কবিতা লেখে, গল্প লেখে। ওটা এমন-একটা বয়েস, যে-সময়ে অ-কবিকেও কবি করে ছাড়ে, অরসিকও রসিক হয়।

পাপড়ির মুখে তার দাদার কথা শুনতে শুনতে এক ধরনের ভালবাসা জন্মেছিল উর্মির মনে। বৈষ্ণব সাহিত্যে একেই তো বলে গুণগত প্রীতি। নলের প্রতি দয়মন্তী আকৃষ্ট হয়েছিল যেমন। দয়মন্তীর মনেও জন্মেছিল এই গুণগত প্রীতি। উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে ওদের এই চোখাচোখির খেলাটা বেশ লাগত উর্মির। মাঝে মাঝে কয়েক পলক তাকিয়েও থাকত ওরা। সে চাউনিতে ছিল কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল, একটু মুগ্ধতা। তখন উর্মির উদ্ধত যৌবন। ভালবেসে দেউলে হবার মতন মন। শরীর মন সব কিছু দিয়েই ও চাইত তাকে। ও কতদিন আশা করেছে ও ঘরের মালিক এগিয়ে আসবে। দু ঘরের মাঝখানে তো সামান্য এক চৌকাঠ।

একটু বেরোন কি সম্ভব হবে না? কিন্তু সম্ভব তো হ'ল না কোনদিনই। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে ঊর্মি। ওর পিপাসা বেড়েছে দিন দিন। তবু সে আসেনি। শেষ পর্যন্ত একটা সলজ্জ চাউনি ছুঁড়ে জয়ন্তানুজ বইয়ের খাতায় মুখ ডুবিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত তো এই করে করেই কেটে গেল। সে এল না। কিন্তু আজ এলো, যখন ওর প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ফার্স্ট ইয়ারের সেই মনটা তো আর নেই। নেই সেই অভিসারে যাবার মতন মনের প্রস্তুতি।

ভাল লাগছে না ঊর্মির। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আজ। ও আবার খাতা দেখায় মন দিল। সুগত দিল্লী গেছে। কাল পরশুর মধ্যেই ফেরার কথা। আজকের এই ঘটনা যদি সুগতর কানে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারে না ঊর্মি। যদিও সুগতর সঙ্গে এমন কোন শর্ত করেনি ঊর্মি যে তাকেই বিয়ে করবে। বরং ও বলেই রেখেছে, মা বাবা জোর করলে অন্য জায়গায় বিয়ে করেও ফেলতে পারে। অবশ্য সুগত সে কথা বিশ্বাস করে না। ও হেসে উড়িয়ে দেয়। ও বলে, তোমার মতন সিনসিয়ার মেয়েরা ওসব বিয়ে-ফিয়ে করে না। আসলে করার মতন হিম্মত নেই।

ঊর্মি বলে, যদি কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করি?

— প্রেম করবে তুমি? আমিই তো তোমায় হাতে খড়ি দিলাম।

— যদি তোমার আগেও আর কেউ দিয়ে থাকে?

— দিয়ে থাকলেও তা ধোপে টিকবে না।

হেসেছিল ঊর্মি। ভেবেছিল, সুগতর এই শেষ কথাটাই হয়ত কাজে লেগে যাবে। ঊর্মির মনে হয় সুগতর ভালবাসাটা যেন এক ধরনের জুলুম। ও জোর করে কেড়ে নিতে চায় ঊর্মিকে। ও দিল্লী থেকে ফিরলেই আবার সেই ছকে বাঁধা রুটিনের জীবন। সকালে স্কুল, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকা, বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তারপর বই পালটানো আর বই নেওয়ার খেলাটা খেলতে হবে অন্তত কিছু সময়, যতক্ষণ না সুগত এসে দাঁড়ায়।

তারপর দুজনে মিলে রসকোয় গিয়ে বসা। নইলে আরেকটা কোন সস্তার রেস্টুরেণ্ট। খুব বেশী দামী রেস্তোরাঁয় যাবার ক্ষমতা নেই ওদের। কারণ, সুগত বেকার। চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে ঊর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তার শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। রেস্টুরেণ্টের বেয়ারাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বখশিস দেয়। তার কারণ যাতে সে অনেকক্ষণ বসার সুযোগ দেয় তাদের এই পর্দা-ঢাকা কেবিনে। শরীরের চাহিদা পুরোপুরি মেটে না বলে সুগত দারুণ যন্ত্রণা পায়। ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। ঊর্মি কিছুতেই পুরোপুরি ছেড়ে দেয়না নিজেকে। তবু সুগতর এই স্পর্শ, ওর উত্তাপ তার মন্দ লাগে না। সে যাকে চেয়েছিল তাকে জীবনে পায়নি বলেই যেন ও নিজেকে আরো বেশী ছেড়ে দেয় সুগতর কাছে। এক সময় শরীরের উত্তেজনা মিটে যায়। তখন এক ধরনের ক্লান্তি আসে ওর মধ্যে। তখন সুগতকে ওর খুব বিশ্রী লাগে। অথচ পরদিন আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। সুগতর জন্যে অপেক্ষা করে। ওর প্রয়োজনটা যেন ঊর্মির কাছে এক ধরনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে যেতে হবে। ওকে সঙ্গ দিতে হবে। আর ওকে এভাবে পেয়ে সুগতরও অধিকারবোধটা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। ও যেন স্বামী-সুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ওর ওপর কর্তৃত্ব খাটায়। প্রায় ওর কথামতই চলতে হয় ঊর্মিকে। এ যেন সেই সীতাকে লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দেওয়া —"এই গণ্ডীর বাইরে গেলেই তোমার ভীষণ বিপদ।" —সুগতর তৈরী গণ্ডীর মধ্যে পরিক্রমণ করতে হয় তাকে। অথচ ওর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। সুগতকে অস্বীকার করতে।

কিন্তু ও পারে না। বিবেকটা ওর মধ্যে যেন বড় বেশী উঁকি মারে। শুধু তাই নয়। উর্মি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছে, সুগতকে ও ভালবেসেছে। দিনের পর দিন ওর সান্নিধ্যে আসার ফলে এই প্রীতির জন্ম হয়েছে। একেই তো বলে বৈষ্ণব সাহিত্যে সাঙ্গিক প্রীতি। সুগত খুব হাল্কা ধরনের চটুল চপল কথা বলতে ভালবাসে। উর্মির প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। ওর ভালবাসা মনকে খুব স্পর্শ করে না উর্মির। তবু ওর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়। খুব গভীর কিছু ও আশা করে না সুগতর কাছে।

ও ঠিকই এসে দাঁড়ায় বিকেলে। না এসে পারল না। বেরনোর আগে ওর মন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, আসবে কি আসবে না। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন ও অন্যমনস্কভাবে শাড়িটা পালটালো। বাড়ি থেকে পৌনে ছটায় বেরিয়ে ও কিছুতেই এসে পৌঁছুতে পারল না সময় মতন। বাস-টাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, আসছে। পাতাল রেলের রিহার্সাল চলছে এখন সারা কলকাতায়, তাই ট্রাম বাসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সব জায়গায় লাইন বসানো হবে সে সব জায়গা থেকে।

গড়িয়াহাটে ভিড়। রোজই যেমন থাকে। ফুটপাতে কাতারে কাতারে মানুষ, দোকান। রঙ-বেরঙের পোশাক আর যুবক-যুবতীর জৌলুস দেখতে দেখতে ও এসে দাঁড়ালো ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে। ও আজ ফরসা রঙের একটা তাঁতের শাড়ী পরেছে। গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউজ, এলো খোঁপা। এই সাধারণ সাজগোজের মধ্যেই ওকে সুন্দর মানিয়ে যায়। ওর মিষ্টি চেহারায় একটা মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। ওর চলাফেরায় রয়েছে আভিজাত্য। এজন্যই সুগত নাকি ওর প্রেমে পড়েছিল। কথাটা ভেবে একটু হাসল উর্মি।

ঘড়ির কাঁটা আরেকটু এগিয়ে চলল। যার জন্যে ওর অপেক্ষা সেই মানুষের দেখা নেই। অতত্রব ওকে আরো কিছু সময় দাঁড়াতেই হ'ল। ও ভাবল, ও কি জায়গা ভুল করল? অথবা সময় ভুল? নাকি আধঘণ্টা দেরী করেছে বলে সে এসে ফিরে গেল? এ সব ভাবতে ভাবতে ক্রমেই হতাশ হতে থাকল উর্মি। কেমন এক বেদনাবোধে ওর বুক ভারী হয়ে উঠল। এবং ও অনুভব করতে পারল, এতদিন পরেও ও জয়ন্তানুজকে ভোলেনি। কিন্তু আজ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয় ওকে তো ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে উর্মি। তবু ওর জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? নিজের কাঠিন্য বজায় রাখতে চেষ্টা করল ও। যদিও ভিড়ের মধ্যে ওর চোখ দুটো খুঁজতে থাকল সেই একজনকেই। ও নিজের মনকে বোঝাতে চাইল,পাঁচ বছর আগে যে লোকটা ওর হৃদয় মন নিংড়ে নিয়েছিল, ওর ফুলের মতন নরম মনে ছুরি চালিয়েছিল, সেই মানুষকে ও ক্ষমা করবে না। ও বোঝাতে চাইল নিজেকে, জয়ন্তানুজকেঅপমান করার জন্যই তাকে ওর দরকার। পুরনো দিনের সেই মোহকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়।

সিক্সথ ইয়ারের শেষের দিকে সুগতর সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকে পরিচয় করেছিল সুগত। ঝড়ে বিধ্বস্ত মন তখন উর্মির। অতএব সুগতর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই থেকে অনেক ঘুরেছিল ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে, মাঠে, করিডোরে। নিজের মনের রুচির সঙ্গে সুগতকে মেলাতে পারেনি প্রথমেই। সুগতর চালচলনে যে স্থূলতা ছিল, তার সঙ্গে ও কিছুতেই ছন্দ মেলাতে পারেনি। তবু সুগতকে ও স্বাগতম্ জানাল। নিজের মনকে জোর করে সইয়ে নিল। ও জয়ন্তানুজকে ভুলতে চাইছিল আসলে। ভুলেও প্রায় গিয়েছিল। যদিও তা সাময়িক। অন্তত এ কথাই আজ মনে হচ্ছে উর্মির। সুগতর মতন ছেলেরা কয়েকটি দুর্বল মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

ঘড়ি দেখতে দেখতে উর্মি খুব ভাঙা মন নিয়ে ট্রাম লাইন পেরোল। সাতটা দশ হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। কিন্তু রাস্তার উলটো দিকে যেতেই ও দেখলে, জয়ন্তানুজ ট্যাক্সি থেকে নামছে। চিনতে ওর এতটুকু ভুল হয়নি। একেবারে হুবহু সেই চেহারাই

রয়েছে। শুধু একটু মোটা হয়েছে এই যা। কোন ভূমিকা না করেই সে বলল, ছ'টা কুড়ি পর্যন্ত আপনার দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গড়িয়াহাট চক্কর দিলাম। তারপর আপনার বাড়ির সামনে তীর্থের কাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এই ফিরছি।

— যাক্, খুঁজেছেন তাহলে? ঊর্মি একটু বাঁকাভাবেই বলল।

— বাহ্, আমার ওপর বুঝি সে বিশ্বাস ছিল না?

— কথা না বাড়িয়ে বলুন আপনার কি বক্তব্য?

— এইখানে হাটের মধ্যে?

— হাটের মধ্যে কথা বলাই তো সব থেকে নিরাপদ।

ট্যাক্সির দরজা খুলে জয়ন্তানুজ বলল, এসো। ... (এসো। একেবারে তুমি। কথাটা কানে বাজলো ঊর্মির) ঊর্মির ভাবতে অবাক লাগছে। আজই ওদের প্রথম আলাপ। অথচ দু'জনেই দু'জনের কত বেশী চেনা। জয়ন্তানুজের পরনে দামী মেরুন রঙের প্যান্ট। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় টাই। দাড়ি কামিয়েছে নিখুঁতভাবে জয়ন্তানুজ। নীলচে ভাব রয়েছে ফর্সা গাল দুটোয়। সেই গভীর চোখ দুটো আগের মতই উদাসীন। ওরা পাশাপাশি বসে থাকল দুজনে। কেউ কারো সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

ঊর্মি বুঝতে পারছে, জয়ন্তানুজ এখন খুব নার্ভাস। ও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ওর কপালে প্রচুর ঘাম জমেছে। তবু ওর উন্নতিই হয়েছে বলতে হবে। সাত বছর আগে তাকে এভাবে কোন মেয়ের পাশাপাশি বসে থাকাটা কল্পনা করা যেত না।

— কোথায় যাবে? — কৃত্রিম স্মার্টনেস বজায় রেখে জয়ন্তানুজ প্রশ্ন করে।

— যেখানে নিয়ে যাবেন। ওদের চোখাচোখি হয়।

— আমি যেখানে নিয়ে যাব, তুমি সেখানে যাবে?

— দেখা যাক, কোথায় আপনার ডেসটিনেশন? ... বলল ঊর্মি। হাসল জয়ন্তানুজ।

ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে এসে জয়ন্তানুজ বলল, ট্যাক্সি রোককে। শান্তিনিকেতনী কাজ করা চামড়ার ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল ঊর্মি। জয়ন্তানুজ বলল, তার কি কোন প্রয়োজন আছে? — জয়ন্তানুজের দিকে তাকিয়ে ঊর্মির কেমন সঙ্কোচ হ'ল।

নিয়নের আবছা আলোয় ঘাসের মধ্যে বসল জয়ন্তানুজ। খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পাশে বসে ঊর্মি। গির্জায় প্রার্থনা হচ্ছে। ওরা চুপচাপ বসে দুজনে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই কি সময় পেরিয়ে যাবে? জয়ন্তানুজ ভাবছে। আজও কি সে কিছুই বলবে না? ঊর্মি ভাবছে, সুগতর কথা। ঊর্মি ভাবছে, দুজনের পছন্দ এত মিল? ঠিক এইখানেই, এই ঘাসের লনে সুগতও তাকে নিয়ে বসেছিল মাত্র কদিন আগেও। ও বলেছিল, জায়গাটা নাকি ওর খুব প্রিয়। ঊর্মি ভাবছে, জায়গাটা তেমনিই আছে, শুধু মানুষটাই বদল হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোডটাকে পেছনে করে ওরা আজ বসেছে দুজনে। গির্জার চুড়োটার ওপর একফালি চাঁদের আলো আর নিয়ন আলো মিলে একটা স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঠিক সেই পরিবেশটা পছন্দ করে সুগতও। সুগত মানুষটার সবটাই স্থূল নয়। সে কিছুটা রোমান্টিকও। কিছু সময় পরে জয়ন্তানুজ একটা সিগারেট ধরায়।

নীরবে সিগারেট টেনে চলে জয়ন্তানুজ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, ভেবে দেখলুম নিজেকে আর প্রবঞ্চিত করব না।

— মানে? — ঊর্মি অবাক হবার ভান করে।

— তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।

— তাই নাকি? কথাটা ভাবতে এত বছর সময় লেগে গেল?

— সময় লাগতো না। আমি ঠিক সাহস পাইনি। ভেবেছি, যদি প্রত্যাখ্যান কর।

— আজই হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠলেন।

ওর ব্যঙ্গের উত্তরে জয়ন্তানুজ বলল, তুমি আমার স্ত্রী হবে এটাই আমি এতদিন কল্পনা করেছি।

— উর্মি বলল, শুধু কল্পনা করেছেন?

— শুধু কল্পনা নয়। বিশ্বাস করেছি।

— কিন্তু সে বিশ্বাসের জন্ম হয়নি বাস্তবে। — বাকী কথাটুকু শেষ করল না উর্মি।

— তোমায় না পেলে আমি মরে যাব। — গভীর আবেগে কাঁপলো জয়ন্তানুজের গলা।

উর্মি ভাবলো, আশ্চর্য, ছেলেরা সবাই এক। ঠিক এই কথাই বলেছিল সুগত সেদিন, যেদিন প্রথম এসে ওরা এখানে বসেছিল দুজনে। উর্মি ভাবছে, এরপর কি ও বলবে, তোমার জন্য কত রাত ঘুমোইনি আমি? — যেমন করে সুগত বলেছিল?

ওর দারুণ জানতে ইচ্ছে করছে, কি মাসে জন্ম জয়ন্তানুজের?

উর্মি বলল, কেউই কাউকে না পেলে মরে না।

মাথা নীচু করল জয়ন্তানুজ। উর্মির জেদী মনটা ক্রমশ ওকে কঠিন করে তুলতে থাকল। ও বলতে চাইল, আজ যদি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিই? যদি বলি, আপনাকে না পেলেও আমি বেঁচে থাকব? ... কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ দেখতে থাকল, ওর লাইনার আঁকা দুটি নিটোল চোখের গাম্ভীর্য। লিপস্টিক মাখা আবেগহীন ঠোঁটে বিদ্রূপ। অনেকক্ষণ ধরেই হাতে সিগারেট জ্বলছে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। জয়ন্তানুজ ভাবছে, আর কি বসে থাকার কোন অর্থ আছে? ওর ফর্সা কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওর মাথার চুল অবিন্যস্ত। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে পড়ছে কপালে। পরাজিত সৈনিকের মতন ও তাকিয়ে আছে। পেছনে ক্যাথিড্রাল রোড। গাড়ির আসা যাওয়ার বিরাম নেই। হেড-লাইটের তীব্র আলো ছিটকে এসে পড়ছে। সেই আলোর বন্যায় জয়ন্তানুজ উর্মিকে দেখছে।

উর্মি তাকিয়ে আছে দূরে। যেখানে মহানগরীর চলমান জীবনযাত্রা। চৌরঙ্গীপাড়ায় আলোর মালা। যানবাহনের বিচিত্র সুর। জনতার কলকাতা। ওর অন্যমনস্ক মন শুনছে, গির্জার বাইবেল পাঠ।

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ওর আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। চামড়াটা পুড়ছে। একটা যন্ত্রণার মাছ হেঁটে যাচ্ছে জয়ন্তানুজের বুকে। বুক থেকে গলায়। তবুও জয়ন্তানুজ বলল, কিছু বল?

উর্মি বলল, কি বলবো?

এই পাঁচ বছরেও কি তোমার কোন কথা জমা হয়নি?

চুপ করেই থাকল উর্মি। ও বলতে পারল না, এক ভদ্রলোক আমায় ভালবেসেছিল। আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। ও বলতে পারল না, আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করতেই এসেছিলাম।

ওর চাঁপার কলির মতন নরম আঙুলগুলোর ওপর নিজের হাতের স্পর্শ রাখলো জয়ন্তানুজ। কোন বাধাই দিল না উর্মি। ও শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন বসেই থাকল। যদিও ও তখন ভাবছে, আমাদের মনটা যেন দেওয়ালঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু দোলে আর দোলে। কোথায় থামতে হয় জানে না।

আপস

অভিজিৎ সেন

প্রশাসনে একধরনের মানুষ থাকে যাদের নিয়ে বড় ঝামেলা হয়। তারা সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে। সবকিছুর মধ্যে কু দেখে। 'ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়' এই ধ্রুপদী সূত্র অনুসারে এইসব কু-কে দূর করার জন্য যত্রতত্র আঘাত হানে। এরা নির্বোধ নয়, কাজেই ঘটনা কতদূর গড়াবে সেসব সহজেই অনুমান করতে পারে, কিন্তু কেয়ার করে না। হয়ত এরমধ্যে একধরনের বীরত্ব আছে, একধরনের আত্মতুষ্টি। অথবা, সেই ইস্কুল বালকের মনস্তত্ত্ব, চোখে পড়ার নেশা। হয়ত আরো কিছু; কিছু মহত্ত্ব। মানুষের, চতুষ্পার্শ্বের বেঁটে-খাটো খর্বাকৃতি মানুষের লোভ ও নীচতার জন্য ক্ষোভ, ক্রোধ এবং দুর্বল মানুষের উপর সবল ও অত্যাচারীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধতা। হয়ত বা, সমস্ত দুর্বল অক্ষম মানুষকে নিজের আশ্রিত মনে করার এক আশ্চর্য সরল মনস্তত্ত্ব।

রুদ্র সেন এরকম এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার তিন নম্বর চাকরীতে পশ্চিমবঙ্গের জিলা সদরে ডেপুটি। আগের দুটি চাকরী বর্তমানেরটি অপেক্ষা অনেক বেশি শাঁসালো ছিল। ধোপে টেকেনি। উভয়ক্ষেত্রেই উপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ করে পদত্যাগ।

অসম্ভব তেজী মানুষ, অসাধারণ আই কিউ। কেরানিবাবুরা ফাইল খোলার আগে রুদ্রপ্রতাপ সমস্যা বুঝে ফেলে। ধমক খেয়ে চেয়ারে বসে সাহেবের সামনে, যা এখনো নিয়ম-বিরুদ্ধ। রাজনৈতিক নেতা, মস্তান, ধান্দাবাজ, মিলমালিক বসতে না বললে বসতে সাহস পায় না। এরকম দাপটের ডেপুটি বহুকাল দেখেনি লোকে। সাধারণ মানুষ খুবই পছন্দ করে। আবার হাবভাব একেবারে কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেছোকরাদের মত। বুকখোলা সাধারণ সুতির জামা, নিচে গেঞ্জি নেই। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। রোগা, পাঁচ ফুট সাত আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মানুষটা অত্যন্ত দ্রুত হাঁটে। গ্রামের লোক কোন কারণে চেম্বারে ঢুকলে বেরিয়ে এসে ভাবে, এলা হাকিম কয়? ছেই ছেই! আবার এইসব মানুষই তার আসল পরিচয় পেয়ে খুব হৃষ্ট হয়। হায় রে বাপু, হাকিম বটে এ্যাটা। বড ধাবুক্ ঝা কোপান্ কোপাল। ঝাঃ সব্বোনাশ।

দৈর্ঘ্য প্রস্থ যাই হোক না কেন, রুদ্র একটু অন্য মাপের মানুষ। বিশেষ করে ৭২ থেকে ৭৬, এই চার বছরে বড় বে-মাপ; বেমানান। কোন সহকর্মীর বিদায় অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তার সহকর্মীরা যখন অত্যন্ত ত্রাসে মেপে মেপে মদ্যপান করে, রুদ্র তখন অতি সহজেই মাত্রা ছাড়ায় এবং ড়ি, এম, থেকে শুরু করে অন্যান্য সহকর্মী পর্যন্ত, যার যার বিরুদ্ধে তার যথার্থ ঘৃণা আছে, অশ্রাব্য বিষোদগার করে। চ-কার, ম-কার ইত্যাদি তার জিবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে, আর সেগুলো ব্যবহারেও তার কোন কার্পণ্য থাকে না।

কাজেই বাহাত্তরে এক জিলা পর্যায়ের মিটিং-এ মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই কয়েকজন এম এল এ-কে সে বেশ নাস্তানাবুদ করে। ঘটনাটা ছিল এইরকম। কোন একজন এম এল

এ. মিটিং চলাকালে কোন একজন এক্সটেন্‌সন্‌ অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ আনে। উক্ত অফিসারও মিটিং-এ ছিল। বয়স্ক লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে। সে শুধু বলতে পারে, এ ধরনের অভিযোগ আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম, স্যার। যদি প্রমাণ হয় স্যার—।

রুদ্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এম এল এ সাহেব, ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবেন? এম এল এ-রা একটু অসুবিধায় পড়ে। রুদ্র আবার বলে, এবার মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে, স্যার, আমরা সবাই চোরের বাচ্চা নয়। তবে আপনার বাঁপাশে যে সব এম এল এ সাহেবেরা বসে আছেন, তার মধ্যে কয়েকজন বেশ পাকা চোর আছেন, এসব চুরির সাক্ষ্যপ্রমাণও আমাদের হাতে আছে।

ফলে গুঞ্জন এবং ক্রমে সোচ্চার গুঞ্জন। রুদ্র ঠ্যাটার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বসে না। ডি এম, এস পি পর্যন্ত বিব্রত। হঠকারিতার একটা সীমা থাকা দরকার। এ ছোকরার হোল কি? হঠাৎ এক আধজন এম এল এ ছিটকে ফেটে পড়ে। এসবের মানে কি? মিটিং-এ ডেকে এনে এসব কি ধরনের অপমান! আমরা জনগণের প্রতিনিধি। সরকারী অফিসারদের স্বভাবচরিত্র কি আমাদের অজানা কিছু? ঠ্যাটা রুদ্র দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, প্রমাণ চাই, প্রমাণ। অন্তত বিশ্বাসযোগ্য পরিমাণ অভিযোগ চাই।

প্রচুর গণ্ডগোল। অফিসাররা সাহস করে উঠে দাঁড়ায় না কেউই, কিন্তু পাশের ব্যক্তিকে সরবে নিজের মনোভাব জানায়। সুতরাং হলঘরে আওয়াজ ভালই হয়। মন্ত্রী টেবিল চাপড়ে "সাইলেন্স, সাইলেন্স" বলে। সবাই থামলে ভ্রূকুঞ্চিত অভিজ্ঞ মন্ত্রী বলেন, লেট আস প্রসীড টু দ্য নেক্‌সট্‌ আইটেম অব্‌ আওয়ার এজেন্‌ডা।

এভাবে বিষয়টা সাময়িক ধামাচাপা দেওয়া হয়। মিটিং-এর পর একজন সহকর্মী রুদ্রকে পিঠ চাপড়ায়, সাবাস রুদ্র, একদম ঝামা ঘসে দিয়েছিস, মাইরি।

উত্তরে রুদ্র বলে, চোপ্‌ শালা, চোর! একটাও কথা বলবি না, তাহলে লাথ্‌ মেরে একদম দাব্‌না ভেঙে দেব। শালা, এতক্ষণ কোন্‌ ইয়েতে মুখ দিয়ে বসেছিলে যে আওয়াজ বেরোয়নি?

ঘরে বাইরে এইভাবে রুদ্রপ্রতাপের শত্রুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ে। সহকর্মীদের মধ্যে যাদের দুর্বল্‌তা ছিল তারা তাকে এড়িয়ে চলত। বাইরের রাজনৈতিক মানুষ, ব্যবসাদার, মস্তান, ইত্যাদির সঙ্গে রুদ্রের যোগাযোগের সুযোগ কম ছিল, কেননা, তখন তার প্রোবেশন শেষ হয়নি। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কোন দপ্তর তার হাতে ছিল না।

কিন্তু চুয়াত্তর-পঁচাত্তরে জাতি ভীষণভাবে এগোতে লাগল আর সরকারেরও কাজ বেড়ে গেল দ্রুত। তখন এই ছোট জেলাতেও সব প্রোবেশনারদের ঘাড়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বসিয়ে দেওয়া হতে লাগল। এ সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ধান সংগ্রহ। সব অফিসারদের ঘাড়ে অতিরিক্ত হিসাবে এই খাদ্যসংগ্রহের দায়িত্ব এসে পড়ল।

রুদ্র তার স্বভাব অনুযায়ী এ কাজে কিছু চমৎকারিত্ব দেখায়। জেলার মিলগুলো চিরকালই নানা কায়দায় আসল সংগ্রহ এবং কাগজে কলমে সংগ্রহের মধ্যে ব্যবসা করে। এটাই তাদের আসল ব্যবসা। জেলার মোট কুড়িটি রাইস্‌ মিলের মধ্যে আঠে ২ মাড়োয়ারীদের। একটি বাঙালীর এবং অন্যটি সমবায় পরিচালিত। রুদ্র এই মাড়োয়ারী মিলগুলোকে যখন তখন পরিদর্শন করে একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে দিল। সব থেকে বড় মিল পুরখচাঁদের তিন নম্বর মিল।

পুরখচাঁদের কি কারণে কেন যেন সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি ছিল। একদিন সহকর্মীদের আড্ডায় রুদ্র তার স্বাভাবিক দাম্ভিকতায় ঘোষণা করল, পুরখচাঁদের আমি

ফাঁসাব। এস ডি ও-র কোন কারণে পুরখচাঁদের উপরে দুর্বলতা ছিল। এফ সি আই-এর জিলা ম্যানেজার এরও তাই।

এস ডি ও বলে, পুরখচাঁদের দু-নম্বর খাতা নেই।

রুদ্র তার স্বাভাবিক নিষ্ঠায় বলে, পুরখচাঁদের যদি দুনম্বর খাতা না থাকে, তাহলে আমার দুনম্বর বাবা আছে।

এবং পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা হঠাৎ একদিন হানা দিয়ে রুদ্র বের করে ফেলে। মিলের কেনাবেচার উপর নজর রাখার জন্য ফুড কর্পোরেশন প্রতি মিলে একজন করে পরিদর্শক পোষ্টিং করে। কেউ কেউ স্বস্তিতে এবং অন্যরা শান্তিতে চাকরী করার জন্য মিলওয়ালাদের ঘাঁটায় না। যারা লাভ খোঁজে এতে তাদের প্রচুর লাভ আছে। মিলের মোট ক্রয়ের উপর সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে লেভি হয়। লেভি বহির্ভূত ধান স্বাধীনভাবে মিলমালিক বাইরে বেচতে পারে। মোটামুটি এই ছিল নিয়ম। কাজেই ধান সংগ্রহের আসল হিসাবটি থাকে দুনম্বর খাতায়। রুদ্র এই দুনম্বর খাতা বের করবার জন্য যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নেয় তা মুদ্রণযোগ্য নয়, তবে ফুড কর্পোরেশনের পরিদর্শকটিকে সে গোটা তিনচার লাথি মেরেছিল এটা ঠিক, কেননা সে লোকটার সহযোগিতা ছাড়া পুরখচাঁদের এই দুই খাতার বিরাট ফারাক সত্ত্বেও সদব্যবসায়ী সুনামটি রাখা সম্ভব ছিল না।

সদরে এসে রুদ্র প্রথমেই এস ডি ও-র চেম্বারে যায় এবং বলে, আমার বাবা একটাই আর পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা আমার বগলে। বলে সে নিজের চেম্বারে চলে আসে। এস ডি ও গম্ভীর হয়।

পরদিন থেকে সদরের চেহারায় কিছু চাঞ্চল্য ধরা পড়ে। পুরখচাঁদের লোক রুদ্রর কাছে বারবার আসে, কোন ফল হয় না। রুদ্র তখন ইস্কুলের ট্রফি জেতা নজর-কাড়া বালক। প্রতিপক্ষীয় রাজনৈতিক পার্টি মেলা হৈচৈ করে এবং রুদ্রের নামে জিন্দাবাদ দেয়। তাদের হিসাবমত জেলার মন্ত্রীর দু-নম্বরী টাকা পুরখচাঁদের ব্যবসার মাধ্যমেই ডিম পাড়ে।

এসব কথা কতদূর সত্যি কে জানে। তবে উপরের আদেশে রুদ্রকে ধান সংগ্রহের কাজ থেকে উঠিয়ে এনে চাকরী-প্রার্থী বালক-বালিকাদের ফটো, মার্কশীট, ইত্যাদি নকল প্রত্যয়িত করার মত একটি মহৎ কাজে বসিয়ে দেওয়া হয়। তার আগে অতি অবশ্যই বাজেয়াপ্ত-করা পুরখচাঁদের দুনম্বর খাতা ও অন্যান্য কাগজপত্র একটি রিপোর্টসহ স্বয়ং ডি এমের কাছে তাকে জমা দিতে বলা হয়। "রিপোর্টসহ" ব্যাপারটা নিয়ম মাফিক ছিল, কিন্তু অতিশয় ট্যাঁটন রুদ্র একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখে, বাজেয়াপ্তের তালিকা বানায় এবং নাজিরবাবুকে ডেকে সব কাগজের কপিতে সই করে তবে নিতে বলে। নাচার নাজিরবাবু এই তরুণ কালাপাহাড়টিকে এতদিনে ভালই চিনেছে। এতদিনের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উপর যে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, নাজিরবাবু তা ভালই জানে। তবুও বলে, আমাকে নিমিত্তের ভাগী করেন কেন, স্যার?

— বাঃ, রিপোর্ট রিসিভ করবেন না?

— আমি একবার বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আসি স্যার।

অবাঙালী ডি এম বলে, দ্য মিনিষ্টার ইজ এনয়ড্ উইথ ইউ।

রুদ্র অতিদ্রুত দুহাত উল্টে বলে, কান্ট হেল্প্। সেজন্যই এসবের রসিদ এবং প্রাপ্তিস্বীকার আমার দরকার।

এরপরে রুদ্রকে এটেসটেশন, এফিডেবিট এবং সরকারী গাড়ির পুল ইনচার্জ হয়ে অফিসে বসে থাকার চাকরি করে যেতে হয় আরো কিছুদিন।

কিন্তু এসব ঘটনা এম এল এ পুরখচাঁদ কিংবা মিনিষ্টার কেউই ভোলে না। রুদ্রের মত লোকের প্রত্যক্ষ প্রশাসনে থাকা খুবই বিপজ্জনক। তার ওপর এসব কাজ করে পার পেয়ে গেলে অনেকেরই ইজ্জৎ ঢিলে হয়।

সুতরাং রুদ্রপ্রতাপ জেলার একটি দুর্গম প্রত্যন্তে একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পে প্রোজেক্ট অফিসার হয়ে বদলি হয়। শুভানুধ্যায়ীরা স্বস্তি পায় এই ভেবে যে খ্যাপা মানুষটা এখানে অন্তত কোন ঝামেলায় পড়বে না, আর শত্রুরা ভাবে, নির্বান্ধব এই দুর্গম জায়গায় বাছাধন এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ভুল, সবই ভুল প্রমাণিত হয়। ঢেউ গুণে ঘুষ খাওয়া যায় আর, হাওয়ার সঙ্গেও বিরোধ করা যায়। রুদ্রপ্রতাপ যেখানে, ঝামেলাও সেখানে। বিরাট প্রকল্প। নিতান্তই নিরক্ষর সরল চাষীগৃহস্থ নিয়ে কারবার। প্রকল্পের প্রধান কাজ সেচের জলের ব্যবস্থা করা। প্রায় আট লক্ষ টাকার একটি সেচব্যবস্থার জন্য প্রকল্প টেণ্ডার দেয়। মহকুমা শহরে এস ডি ও-র ঘরে বসে রুদ্র সীলকরা বাকলে ঠিকাদারদের টেণ্ডার নেবে। কাজ কম নয়। দুশরও উপরে অগভীর নলকূপ হবে, ঐ সংখ্যক পাম্পঘর হবে এবং বৈদ্যুতিক ওয়েরিং। এ হোল এক পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে, ঠিক ঐ সংখ্যক ইলেকট্রিক পাম্প মেসিন। প্রথম পর্বে আট লক্ষ এবং দ্বিতীয় পর্বে ছ'লক্ষ, এই মোট চোদ্দ লক্ষ টাকার কাজ।

কাজটি লোভনীয় কাজেই জেলার ঠিকাদারদের মধ্যে তোড়জোড় সুরু হয়। অগভীর নলকূপ এবং ঘর, কাজটির মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। কেননা, নলকূপ ব্যাপারটা মাটির নিচেই থাকে। ঠিকাদারেরা উৎসাহী, নিম্নতম কোটেশনে টেণ্ডার গ্রাহ্য হবে।

এস ডি ও-র পাশে বসে রুদ্র বৃথাই অধীর হয়। কোন টেণ্ডার জমা পড়ে না। দিনের শেষে একটি মাত্র টেণ্ডার ফরম জমা পড়ে এবং সেটাই গ্রহণ করতে হয়। পরে জানা যায়, নতুন জমানায় জাতি রকেটের গতিতে এগোচ্ছে এবং জনৈক অনিল দাস হাতে রিভলবার নিয়ে অন্যদের সন্ত্রস্ত করে টেণ্ডার ফরম জমা দিতে বিরত রেখেছে। সাধারণতঃ, আজকাল ঠিকাদাররা একটা পারস্পরিক চুক্তিতে কিছু টাকার বিনিময়ে অন্যদেরকে বিরত রেখে একজনকে টেণ্ডার দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও হোল না।

রুদ্র ঘটনাটা শুনল এবং জানল এই অনিল দাস জনৈক ক্ষমতাশালী নেতার শালা। অথচ আইনত কিছুই করার নেই। রুদ্র কিল হজম করার মত চাপা অপমান বোধ করে। মনে মনে ভাবে দাঁড়াও বাপ, কাজ আমার আনডারেই করতে হবে। বিল আমিই পেমেন্ট করব। তপ্ত খাওয়াব রক্ত হাগাব।

কাজ শুরু হোল। রুদ্র প্রোজেক্টের দুই সুপারভাইজরকে বলল, নজর রাখবেন, কাজ কিন্তু আমি বুঝে নেব।

কিন্তু সময়টা ছিয়াত্তর সালের জুন জুলাই মাস। অনিল দাস সর্বভারতীয় ইউনিফরম গুরু পাঞ্জাবী এবং চাপা পাজামা পরে জীপ নিয়ে ঘোরে। দিল্লীর মাপে তার চুল, জুলফি এবং গোঁফ ছাঁটা। সুপারভাইজররা কোন কোন ব্যাপারে খুঁত খুঁত করতে পরিষ্কার বলে দিল, কাজ হ্যান্ড-ওভার করার আগে সাইটে আসবেন না।

রুদ্র বলল, ঠিক আছে, যাবেন না মাঠে, আমি পরে দেখব।

যথাসময়ে কাজ শেষ হোল, বিল জমা পড়ল অফিসে। আট লক্ষ টাকার বিল। প্রতি টিউবওয়েল এবং পাম্পঘর বাবদ চারহাজার টাকা করে দুইশ' টিউবওয়েল এবং ঘর। সুপারভাইজাররা বলল, প্রতি টিউবওয়েল আছে আশি, বিরাশি ফুট করে, কিন্তু বিল হয়েছে স্যার একশ' কুড়ি ফুট করে। চল্লিশ ফুট পাইপের দাম কমকরে ছ'শ টাকা। চল্লিশ ফুট বোরিং চার্জ একশ'কুড়ি টাকা। দুশ'টা শ্যালোতে, এই এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার

টাকা একেবারে মাথায় চাঁটি মেরে নেবে, স্যার! এছাড়া মেটেরিয়ালস্-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম, স্যার। গ্যালভেনাইজড এক নম্বর পাইপের জায়গায় তিন নম্বরি সাধারণ পাইপ, চার প্লাইকয়ারের জায়গায় তিন প্লাইকয়ার ফিলটার।

রুদ্রের মেজাজে বলীয়ান সুপারভাইজর বলে, একি মগের মুল্লুক, স্যার!

রুদ্র বলে,ও যদি মগ হয়, আমি স্প্যানীশ আর্মাডা, হার্মাদ!

রুদ্র বলল, তার ফেলে আপনার টিউবওয়েলের দৈর্ঘ্য মেপে দেখব, অনিলবাবু। অনিল দাস বলে, ওতে কিছু প্রমাণ হয় না স্যার। কোর্টে এস্টাবলিশ করা কঠিন হবে।

— দরকার হয় দুচারটে টিউবওয়েল তুলে দেখব।

কেন ঝামেলা করছেন স্যার? কাজ আজকাল এরকমই হয়।

জলের ফ্লো মেপে নেব। শুনলাম আপনার টিউবওয়েলের ফ্লো পাম্প থেকে তিন ফুটের বেশি যাচ্ছে না? আমার অন্তত ছ'ফুট চাই।

সে তো আন্ডারগ্রাউন্ড লেয়ার-এর উপর নির্ভর করে স্যার।

হ্যাঁ আমরা টেস্ট করে দেখেছি। লেয়ার বেশ ভাল। আর শুনুন, প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ছ'হাজার গ্যালন জল মেপে নেব।

অনিল দাস চেয়ার ঠেলে ওঠে। বলে, আপনি অযথা ঝামেলা করছেন স্যার। আপনার সুপারভাইজাররা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট যাতে দেয় সে ব্যবস্থা আমার। আপনি বিল পাশ করবেন।

রুদ্র চাপা গলায় বলে, মিঃ দাস, কাজ বুঝে পয়সা দেব আপনাকে। সুপারভাইজাররা রিপোর্ট দেবে আমাকে, আপনাকে নয়।

অনিল দাস ছিয়াত্তরের বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকায় রুদ্রের দিকে।

রুদ্রর বোতলের দুর্বলতা সবাই জানত। এরপর এক সন্ধ্যায় অনিল দাসের ভগ্নিপতি একটি দামী বোতল নিয়ে রুদ্রর কোয়ার্টারে আসে।

রুদ্র বলে, এখানে এখন অন্য কেউ নেই, তাই কি আপনার মনে হোল আমাকে অপমান করা সহজ?

আরে না, না। আপনি ব্যাচেলার লোক, একা থাকেন। ভাবলাম আপনার এখানে এসে একটু ফুর্তি করে যাই। এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে।

ফুর্তি তো লোকে রাঁড়ের বাড়িতে করে। মানে মানে বিদায় হন, নাহলে বোতল পেছনে ঢুকাব।

এই হোল রুদ্র। সুযোগ পেলে ছোবল মারবেই। কেউটে সাপের মত, ঘাস নড়তে দেখলেও ছোবল মারবে।

এরপর ছিয়াত্তর সাল-শরীরী হয়। প্রোজেক্টের দুই সুপারভাইজার মার খায় ও অপমানিত হয়। রুদ্র থানা অফিসারকে ফোন করে আসতে বলে। প্রশাসনে না থাকলেও ডেপুটি সে বটে। সুতরাং ও সি-কে আসতে হয়। অনিল দাস ও সি-কে দেখেও সরে যায় না। প্রোজেক্ট অফিসের বারান্দায় দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরিপূর্ণ নির্বাক রেলা নিয়ে। আসলে রুদ্রকে সে উভয়ের ক্ষমতার ফারাকটা বোঝাতে চায়।

ছিয়াত্তরে ও সি-রাও খুব বলবান ছিল। কিন্তু সেসব স্থান-কাল-পাত্র বিশেষ। ও সি-র এমন ক্ষমতা হয় না যে, রুদ্রর আদেশানুযায়ী অনিল দাসকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। সে শুধু বলে, অনিলবাবু, একবার থানায় যাবেন সময়মত।

অনিল ভ্রূক্ষেপ করে না। ও সি চলে গেলে অনিল দাস সোজা ভিতরে চলে আসে, পকেট থেকে রিভলবার বের করে রুদ্রর চোখের সামনে নাচায়। আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যে আমার চেক চাই।

রুদ্ধবাক রুদ্র গুম হয়ে বসে থাকে। অনিল দাস চলে যেতে জীপ নিয়ে সে সদরে চলে আসে। সরাসরি ডি এমের কাছে যায় না। অন্য একজন সহকর্মীর ঘরে বসে থাকে বহুক্ষণ।

ডি এমের ঘরে গেলে ডি এম বলে, আজ রাতটা সদরে থেকে যান। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে তবে প্রোজেক্টে যাবেন।

পরদিন বেলা এগারটায় রুদ্র ডি এমের কাছে আসে। ডি এম তাকে বিদ্যুৎবাণী নির্দেশ হাতে দেয়। কোলকাতা ভায়া জেলাসদর ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট। বদলির চাকরীতে বদলি তো হবেই। না, তাকে আর প্রোজেক্টে ফিরে যেতে হবে না! অ্যাসিট্যান্ট প্রোজেক্ট অফিসারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাকেই চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।

এক সহকর্মীর বাড়িতে বসে রুদ্র সারাদিন মদ খায়। লাথি মেরে মেরে তার চেয়ার টেবিল, রেডিও ভাঙে। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদে। সরকার বড় সদাশয়, অপমানের নির্দিষ্ট সীমানা চব্বিশ ঘণ্টা প্রোজেক্টে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ভোগ করতে হল না। রুদ্রপ্রতাপ এইভাবে প্রথম আপস করে। অথবা পোষ মানে। তাকে দেখতে হয় না প্রোজেক্ট অফিসের চত্বরে হা হা করে গ্রীষ্মের হাওয়া ছুটছে, তার মধ্যে সবুজ, লাল আবির উড়ছে, অনিল দাস যুগ যুগ জিও, ঠাট্টা করে হাসছে অনিল দাস জীপের গায়ে হেলান দিয়ে— হা-হা-হা-হা-হা, ঝুঁকে পড়ে জীপের ভেতর থেকে বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢালছে, ঠোঙা ভর্তি আবির, হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা, নিন, নিন, খান। সুপারভাইজারবাবু, অ্যাসিসট্যান্ট প্রোজেক্ট অফিসার শশব্যস্তে বিল চেক করে চেক তৈরী করছে, চেকটা যেন বেয়ারার হয় মদনবাবু, সে কি? সাতলাখ টাকার চেক বিয়ারার। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলছি করুন, হা-হা-হা— খান মদনবাবু, রসগোল্লা খান, স্পেশাল অর্ডারে মদনবাবু চেক সই করার ক্ষমতা পেয়েছে—চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি— জাতি এগিয়ে চলেছে— দপ্তরে কাজ ফেলে রাখবেন না, চব্বিশ ঘণ্টা সময় কম নয়।

সহকর্মী ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তালা মেরে গেছে। রুদ্র দরজার উপর লাথি মারে। হাতের সামনে ভাঙার মত আর কিছু পায় না, বোতল ছুঁড়ে মারে দেয়ালে, তারপর হাসে প্রচণ্ড আর্তনাদে, হা-হা-হা-হা-হা। রুদ্র সেনের আপস করার বা পোষ মানার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই হাসিটাও তার অন্তর্গত। সে প্রক্রিয়ার। এ সময়ে মানুষ একা ঘরে এমন সব দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে। সাক্ষী থাকে না।

টিনের-টগর

কাজল মিত্র

সোনালি বালিয়াড়ি চিক্ চিক্ করছে। হলুদগোলা জলের মত পাতলা ফিনফিনে রোদ্দুর। বসুধা হেঁট হয়ে মুঠোভর্তি বালি তুলে চোখের সামনে ধরল। তিরিশ বছর আগে বসুধা এই বালিয়াড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। তারও অনেক আগে এমন কী বসুধার জন্মেরও অনেক, অনেক দিন আগেকার গল্প হয়ে যাওয়া একটা সত্য ঘটনা মনে পড়ে গেল। বসুধার পিসির সোনার হার এই বালির চড়ায় পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। পিসির বাবা মানে বসুধার ঠাকুরদাদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পিসি বাপের বাড়ি আসছিল। কাঁদতে কাঁদতে বালির চড়া ভেঙে পিসি নৌকায় উঠেছিল। মুঠোভর্তি সোনা রং বালি চোখের সামনে ধরে রইল বসুধা।

তিরিশ বছর পর প্রিয় নদীকে দেখছে বসুধা। ভরা জৈষ্ঠ্যে হাঁটুজল থাকার কথা। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ক্যানেলের জলে সারা বছরই ভরা নদী। নদীর জলের তলায় চিক্‌চিক্ বালি নেই, বাঁশের লগি ফেলে ফেলে নৌকো বাওয়া নেই। মাঝিরা নদীর জলে লগি ফেলে শক্ত হাতে কাত হওয়া লগি চেপে ধরে নৌকোর এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে যেত। কাত হওয়া বাঁশ থেকে টুপটাপ জলঝরা। জল কেটে সোঁ সোঁ শব্দ করে নৌকো এগিয়ে যেত। নদী উঠত ছলছলিয়ে।

যান্ত্রিক নৌকো ভুটভুটিতে একঘেয়ে শব্দ। নদী তোলপাড় করে বালি তোলা হচ্ছে। ভুটভুটি যখন মাঝনদীতে চোখে পড়ল ওপারে লরী, ট্রেকার, ভ্যানরিক্সা দাঁড়িয়ে। পঞ্চাশের পর বাণপ্রস্থে যাবার কথা বলা হয়েছে। বসুধা সূদূর আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে তার শৈশবের খোঁজে। এখন যেন তার দ্বিতীয় শৈশব। নদীর জলে হাত ডোবায়। নদী হাত চেপে ধরে— এতদিন কোথায় ছিলি বসুধা? নোনাগন্ধ নদী দরদর করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। লগি ফেলে ফেলে দেখতে লাগল— তল পাচ্ছে না এক বাঁও মেলে না দো বাঁও মেলে না। পোশাক-আশাক, দামী শৌখিন ব্যাগ, কেশের বিন্যাস সব নিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত নৌকোয় বসে রইল বসুধা। স্বামীর কর্মসূত্রে আমেরিকা ও কন্টিনেন্টের অনেক দেশে থেকেছে। ছেলেমেয়ের জন্ম পড়াশোনা সব ওখানেই। শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি কলকাতায়। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। তবে আসা হয়নি বাপের বাড়ির দেশ এই গ্রামে। বসুধার জন্মভিটা--- শৈশবের গোল্লাছুট খেলার আঙিনা।

স্টেশনে এসেছিলো খুড়তুতো দাদা চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের হাত ধরে অতিকষ্টে নৌকো থেকে নামল বসুধা। এখনও ছ'মাইল রাস্তা তাদের গ্রামে যেতে। হেমন্ত ফসল কাটার পর থেকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত মেঠো পথে গোরুর গাড়ি চলত। বর্ষায় ধান বোনার পর থেকে হেমন্ত পর্যন্ত সরু আলপথই ভরসা। হেঁটে বড়জোর সাইকেল চলবে ঐ আলপথে। তখন বাবুঘরের মেয়ে বউদের ভরসা পালকী। এ-সব বসুধার খুব ছেলেবেলার

কথা। গ্রামে খুড়তুতো দাদা চন্দ্রনাথ একাই আছে। চাষবাস দেখাশোনা করে। অন্যরা সবাই শহরমুখো। নদীর এ-পাড়ের বাঁশঝাড়গুলো নেই বললেই চলে। তখন ছতরী লাগান গোরুর গাড়ি থাকত। কি ঠাণ্ডা বাঁশবন, বাঁশপাতায় ঝরঝর শব্দ তুলে হাওয়া বইত। এখন স্থায়ী রাস্তা হয়েছে বারোমাস গাড়ি যাবার সুবিধা। ক্যানেলের জলে একফসলী জমি দোফসলী, তিন ফসলী। বৃষ্টিহীন জৈষ্ঠ্যের দাবদাহের মধ্যে মাঠ সবুজে সবুজ।

শৈশব ও কৈশোরের বেশির ভাগটাই এই গ্রামে থেকেছে। তারপর শহরবাসী। মাঝে মধ্যে এসেছে তখন কি এক অমোঘ আকর্ষণে— বুঝত না বসুধা। শেষ আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে— তাও তিরিশ বছর হয়ে গলে। তারপর বিয়ে— প্রবাসে ঘর-সংসার— ছেলেমেয়ে। জীবনের আধখানা শতক পার হয়ে কেমন যেন পিছনে তাকাতে ইচ্ছে হয়। আমেরিকায় সবই ছুটছে— রেসের ঘোড়া। হ্যাঁ— ক্লান্ত বসুধা, অস্তগামী সূর্যের পূর্বাচলের পানে তাকান। পনের দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ির এক বিয়ের উৎসবে কলকাতায় আসা। বাপের বাড়ি আত্মীয়স্বজনও কলকাতায় থাকে। সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। জোর করে একরকম দড়িছেঁড়া হয়ে আজ সকালের ট্রেনে একাই এসেছে— তার জন্মভূমি গ্রামে।

ট্রেকারের ঘড়ঘড়ানি। চোখ বুজে গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচোর কোঁ ক্যাঁচোর কোঁ শব্দের টিমেতাল ধরতে চাইল। এই আধঘণ্টার রাস্তা তখন তিন ঘণ্টা। দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যেত। বাইরে মুখ বার করেই ভেতরে ঢুকিয়ে নিল মুখ। ট্রেকারের চাকায় ধুলোর ওড়াওড়ি। হরি জ্যাঠাকে চিনতে পারল। অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। ফিসফিস করে চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করছেন— ভদ্রমহিলা তোমার কে হন? বসুধা প্রণাম করে পরিচয় দিল। পরিচয় পাবার পরও হরিজ্যাঠা আপনি করে সম্বোধন করলেন বসুধাকে।

গ্রামে ঢোকার মুখে ট্রেকার নামিয়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। হরিজ্যাঠা কোন্ দিক দিয়ে যাবেন আগে আগে পড়া বলার মতো গড়গড় করে বলে গেল বসুধা— কালীতলার ডানহাতি অর্জুন গাছটা পার হয়েই আপনার বাড়ি। আমার মনে আছে।

হরিজ্যাঠা অল্প হেসে সমীহভাবে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। একবার বললেই বসুধা হরিজ্যাঠার বাড়ি ঘুরে আসত।

— তুমি এগিয়ে যাও চন্দ্রদা।

— একা আসতে পারবে?

— কি যে বল আমি এই গ্রামের মেয়ে ভুলে গেলে?

শৌখিন ছাতা মাথায় দুলকী চালে চলল। ভারী শরীর গরমে হাঁসফাঁস করছে। গ্রাহ্য করল না। দেহের অণুতে অণুতে প্রতি রোমকূপে ধূলামাটি রোদ হাওয়াকে গ্রহণ করবে। আর হয়ত জীবনে আসাই হবে না।

ইলেকট্রিক এসে গেছে। বড় বড় শাল কাঠের খুঁটি। স্কুল বাড়ির সামনে হাজার ঝুরি নিয়ে বটগাছ। ঝুরি ধরে দোল খেত ছেলেরা। তলায় দাঁড়ালে পাতার ঝরঝরানি। বিকেলে গাছ জুড়ে দিন শেষে ফিরে আসা পাখিদের কিচির মিচির। যেন গাছটাই গান গাইছে। সব মনে আছে বসুধার। হাটতলায় নির্জন দুপুর এলিয়ে আছে। লোকজন কম। চেনামুখ খোঁজে। সুধাপিসি! অনেক বয়স হয়ে গেছে। — চিনতে পারছ সুধাপিসি আমি বসুধা। সুধাপিসি হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কে বলছিল বটে চন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেত থেকে খুব বড়লোকের বউ একজন গাঁয়ে এসেছে। এ যে চন্দ্রনাথের জেঠতুতো বোন। মধ্যবয়স্কা বসুধার চকচকে খোলস দেখতে দেখতে সুধাপিসি বলল— কে কাকে মনে

রাখে বলো। সুধাপিসির মধ্যে তাপ-উত্তাপ কিছুই নেই। ফিরতে ফিরতে বসুধার কানে এল সুধাপিসি পাশের জনকে বলছে— আদিখ্যেতা বড়লোকী চাল দেখাতে গাঁয়ে এয়েছেন। দুপুররোদে ছাতা ঘুরিয়ে গাঁ ঘুরছেন। সুধাপিসির মাথায় ভিজে গামছা চাপান।

চন্দ্রনাথের বউ খুব খাতির-যত্ন করল। বাবা-কাকাদের অংশ ভাগ হয়ে পার্টিশান করা। কেউ থাকে না। ওপর নীচ বেশির ভাগ ঘরই তালাবন্ধ। লাগোয়া জায়গা হাত বদল হয়ে গেছে। কই খবর পেয়ে কেউ তো এলো না! ছেলেবেলায় মনে আছে মেয়ে বাপের বাড়ি এলে পাড়াশুদ্ধ লোক দেখতে আসত। সেই মেয়েও বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তত্ত্ব তালাশ করতে যেত। সন্ধেবেলায় মন্দিরে আরতি দেখতে যাবো সবাই মিলে। চন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে যাবে ইচ্ছা বসুধার। কিন্তু চন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েরা যেতে পারবে না। তাদের কোচিং ক্লাস আছে। সূক্ষ্ম অপমান চিনচিন করে বসুধার বুকের ভেতর। মাসি-পিসি বাড়িতে এলে বসুধারা বইপত্র তুলে রাখত। অবশ্য বসুধা ঝেড়ে ফেলে দিল এসব। দূরদূর কি বোকা সে! সময় কি তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি! তার ছেলেমেয়ে তো ইণ্ডিয়াতে আসতেই চায় না। কিন্তু মন মানে কই? বলতে গেলে এই নির্বান্ধব পুরীতে কিসের খোঁজে এতদূর আসা। মনের ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি চলে।

ঝাঁ ঝাঁ গলন্ত রোদ্দুর। দরজা জানালা বন্ধ করে ফুলস্পিডে পাখা চালিয়ে দিয়ে গেল চন্দ্রনাথের বউ। পাখার ঝিঁঝিঁ শব্দের মধ্যে অন্য আর একটা শব্দ ধরতে পারছে বসুধা। ক্রমে তা বুকের মধ্যে বাজতে লাগল। ঘুঘুর ঘু-ঘুঘুর ঘু। গ্রীষ্মের নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মতন মনকাড়া শব্দ আর আছে নাকি! শৈশব কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে সেই ঘুঘুপাখি সারাদুপুর ডেকে চলল। ঝড় আসার আগে থমথমে নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে নিথর পুকুরের জলে একফোঁটা বৃষ্টি ছোট্ট একটু কাঁপন তোলে। পুকুরের জলে গোল গোল ছোট বৃত্ত বড় হতে হতে পাড়ে ধাক্কা দেয়— পুকুরের জল যেন শিউরে শিউরে ওঠে। বালিশে মুখ গুঁজে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল বসুধা।

"খেলা ভেঙো না রে বলাই দাদা মারিবে যে"— ছেলেবেলায় শোনা গান। মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় এক একদিন এক একটা গান হত খোল-করতাল বাজিয়ে। হয়ত এখনও হয়। বারবার কেবল এই গানটার কথাই মনে হচ্ছে। দুয়োদুয়ো বসুধা বোকা। প্রকৃতির নিয়মে খেলা তো একসময় ভেঙেই যায়।

চিলে কোঠায় ছাদে ঠাকুরঘরে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা দিল চন্দ্রনাথের বউ। পিদিম জ্বেলে দিচ্ছিল বসুধা। চন্দ্রনাথের বউ বাতাসা প্রসাদ দিল বসুধাকে।

— তোমরা পাটালী দাও না ঠাকুরকে?

— ওমা তুমি পাটালী খাবে! দাঁড়াও বলছি, পাটালীর পাট আর নেই।

চন্দ্রনাথের ছেলেমেয়ে হাসাহাসি করে বসুধার কাণ্ড দেখে। বসুধা অপ্রতিভ হয়। এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে বহুদিন পুরনো একেবারে ক্ষয়ে যাওয়া চন্দন কাঠের ছোট্ট একটা টুকরো হাতে পেল। আসল জিনিস। এতদিনে এতটুকু গন্ধ নষ্ট হয়নি। এদিক ওদিক দেখে চন্দন কাঠের ছোট্ট টুকরোটা বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলল।

— লোডশেডিং হয় না?

— হয় না আবার।

— কই আজ তো লোডশেডিং হল না? হ্যারিকেন আলোয় কেমন পুরনো দিন পুরনো দিন মনে হত।

ননদের কথা শুনে চন্দ্রনাথের বউ ঠোঁট উল্টে ভাবল বড়লোকের আজব খেয়াল।

মাত্র একটা রাত। কাল সকালেই চলে যেতে হবে। ঘুম আসছে না। এর মাঝে কারেন্ট চলে গেল— লোডশেডিং। ঘেমে নেয়ে বারান্দায় বার হয়ে এল। মাঠ-ঘাট জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। আকাশ দেখা যায়, দূরের মাঠ দেখা যায়। পুকুরের জলে মুখ দেখছে চাঁদ। কাক জ্যোৎস্না কাকেরা ভুল করে ডেকে ওঠে আবার ভুল বুঝে যেন লজ্জায় চুপ করে যায়। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নীচে একতলায় চেয়ে দেখল বসুধা। ওটা কী গাছ! ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। সাদা ফুল রাত্রে ফোটে। বসুধার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসছে যেন। কি যেন নাম ছিল গাছটার। সাদা ফুল দিয়ে মোটা মোটা করে মালা গাঁথা হত। ধপধপে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল গাছটা সেই রকমই আছে। একদিকে হেলে পড়া। বেশি লম্বা নয়। ঝাঁকালো হয়ে গেছে ফুলে পাতায়। বাঁকা ডালপালা। বসুধার মনে হল গাছটার তলা খুঁজলে ছেলেবেলার খেলনাপাতির হাঁড়িকুড়িগুলো পেয়ে যাবে। কোনও পরিবর্তন নেই গাছটার। সাদা ফুল নিয়ে বসুধার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বসুধার ভীষণ ইচ্ছা হল চন্দ্রনাথকে এখনই ডেকে জিজ্ঞাসা করে ফুলগাছটার নাম। বাঁশিতে কে যেন সুর তুলল— হাওয়ায় হাওয়ায় মাঠ-ঘাট নদী পার হয়ে ভাসছে সেই সুর— "খেলা ভেঙো না রে, বলাই দাদা মারিবে যে।" টিনের টগরফুল গাছটার নাম টিনের টগর গাছ। বসুধার মনে পড়ল অনেক চেষ্টার পর।

এই স্টেশনে ট্রেন অল্প সময় থামে।

— একটা খবর দিস। চন্দ্রনাথ আজ জেঠতুতো বোনকে তুই করে বলল। টিপ করে প্রণাম করে বসুধা।

— গিন্নিবান্নি হতে চললি এখনও সেইরকমই আছিস। ভাল লাগল। চন্দ্রনাথ যেন নিজের মনেই কথা কটি বলল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে সরে গেল চন্দ্রনাথ, স্টেশনের প্লাটফর্ম—গাছপালা। দূরের যা কিছু সঙ্গে সঙ্গে চলল। বসুধা দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে বসে আছে। কাঁচা তেঁতুল পাকা তেঁতুল— ছেলেবেলার ছড়ার ছন্দেই যেন চলছে ইলেকট্রিক ট্রেন। জলে ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে দূর আকাশ-রেখায় দেখতে লাগল বসুধা। এক কিশোরী মেয়ে, বেড়াবিনুনী বাঁধা— দুই ভুরুর মাঝে কাজলের টিপ— বুকের কাছটিতে ধরা আছে টিনের টগর গাছের একগোছা সবুজ চারা। বুকে চন্দনের গন্ধ নিয়ে সেই কিশোরী সমান তালে ছুটতে লাগল বসুধার সঙ্গে। একে তো বসুধা ফেলে আসেনি— হারায়নি কোথাও।

তুরুপের তাস

তৃষিত বর্মণ

তকতকে উঠোনের মাঝ বরাবর ঘাসের দড়ির চারপাই পেতে বিধানকে অভ্যর্থনা করল অভয় মহাপাত্র। কলকাতা থেকে ঝাড়সুগুদা আসতে ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয়নি বিধানের। কথামত কেসিঙ্গা রেল স্টেশনে মোটর সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল লালু প্রধান। কেসিঙ্গা থেকে ভবানী পাটনা, এই পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা পিচ বাঁধানো। মিনিট চল্লিশের মধ্যে 'পুষ্প লজে'র সামনে বিধানকে নামিয়ে দিল লালু।

ঘড়িতে তখন ঠিক বেলা সাড়ে বারোটা।

অভয় মহাপাত্রর ব্যবস্থা পাকাপোক্ত। কোথাও ফাঁক নেই। গোটা কালাহাণ্ডি জেলা জুড়ে তার মোক্ষম জনসংযোগ। লালু ভেতরে গিয়ে খবর দিতেই পুষ্প লজের মালিক নিজে ছুটে এল বাইরে। গালে ঠাসা পান। নধর গলার ভাঁজে দেড় ভরির চেন ভাদ্রের রোদে ঝিলিক মারছে। দুটো হাত জোড় করে গদগদ হয়ে বলল—আসন্তু আঁজ্ঞা। আজি মোর কেত্তে সৌভাগ্য।

এত খাতিরের কারণ অনুমান করতে বিধানের কষ্ট হল না। এখানে সে প্রাক্তন মন্ত্রী, কালাহাণ্ডির কাছের মানুষ অভয় মহাপাত্রর সম্মানিত অতিথি। কিন্তু তার অন্য কাজ। ভবানী পাটনায় বসে পুষ্প লজের মালিকের উষ্ণ আতিথেয়তা নিতে এখানে সে আসেনি।

কোনও রকমে মুখহাত ধুয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল বিধান। তারপর কাঁধের ঝোলাটা গুছিয়ে নিয়ে লালুকে বলল—চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। তিনটের মধ্যে আমাকে দেপুর পৌঁছতে হবে।

খাওয়াদাওয়ার পর মুখে একখিলি পান দিয়ে সবেমাত্র জম্পেশ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল লালু। বিধানের কথা শুনে বাইরে চনচনে রোদের দিকে তাকিয়ে বলল--অধিক খাইছন্তি। টিকে বিশ্রাম করি....

একটু হেসে বিধান বলল—না লালুবাবু। অভয়বাবুকে বলা আছে আমার। উনি তিনটে নাগাদ দেপুরে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন বলেছেন।

অগত্যা লালুকে উঠতেই হল। এতক্ষণ নিচু গলায় লজের মালিকের সঙ্গে কী একটা আলোচনা করছিল সে। উঠে পড়ে বলল--পাণিগ্রাহী, মু দেপুর টু আসিলে কথথা হব। তমে টিকে পণ্ডাবাবুরে কহিবে, মু তাঙ্কো এঠি রহিবা পাঁই কউচি। বুঝিলে? তারপর বিধানের দিকে ফিরে বলল—চলন্তু।

ভবানী পাটনা থেকে মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে কোনো উপজাতি পল্লী দেপুরে সময়ের আগেই বিধানকে পৌঁছে দিল লালু। তারপর মোটরবাইক ঘুরিয়ে অভয় মহাপাত্রকে নমস্কার করে বলল—মু এবে যাউচি আঁজ্ঞা। কালি সকাল রে চলি আসিবি।

বৃষ্টির কোনও নামগন্ধ নেই এখন। ভাদ্রের চড়া রোদে চারপাশের পাহাড় জ্বলছে। জঙ্গলের আড়ালে টিলার ওপর ইতস্তত বসতির চিহ্ন। ঘর বলতে যা চোখে পড়ল বিধানের, তা

সবই ভাঙাচোরা খোলার ঘর। মাটির ঝরঝরে দেওয়াল। ফগুন মাঝির উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা পিপুলগাছ। কালাহাণ্ডির মানুষগুলোর মতই জরাজীর্ণ। শুকনো খটখটে। তারই ছাওয়ায় পাতা চারপাইয়ে বিধানকে বসতে বলল মহাপাত্র।

উঠোনের এক কোনায় কাঠকুটোর ধোঁয়ায় রান্না বসিয়েছিল ফগুন মাঝির বউ। তার আদুড় গায়ে পিঠে পেটে লেপটে আছে হাড় জিরজিরে দুটো বাচ্চা। সব মিলিয়ে চরম দারিদ্র্যের এক করুণ ছবি।

কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে বসতে বসতে বিধান জিজ্ঞেস করল—কী রান্না হচ্ছে? ভাত?

খাটিয়ার পাশে উবু হয়ে বসেছিল ফগুন মাঝি। পরনে একফালি কাপড়। তোবড়ান গালে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। মহাপাত্র কিছু জবাব দেওয়ার আগেই সে বলে উঠল ভাত? ভাত কৌঠি মিলিব আঁজ্ঞা? ভাত তো বড়লোক মানুষ্ক খাউচি। মোর ঘরকু ভাত ফাত নাহি।

ফগুন মাঝির কথাগুলো যেন হাহাকারের মতো শোনাল। ঘণ্টা দুয়েক আগে ভবানী পাটনায় পুষ্প লজে বসে সে দু'রকম মাছ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছে। চারপাশের এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসে বিধান বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

সে অর্থে তার মতো একজন সামান্য কাগজের লোকের করার কিছু নেই জেনেও বিধান না মহাপাত্র, না ফগুন মাঝি, কারও মুখের দিকেই তাকাতে পারছিল না। নিজেকে খুব লজ্জিত, ছোট মনে হচ্ছিল তার।

মহাপাত্র নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল—কী ভাবছেন?

বিধান মুখ তুলে বলল—ভাবছি, এই যদি কালাহাণ্ডির শুরু হয়, তা হলে এর শেষ কিসে? তারপর একটু থেমে বলল—অভয়বাবু, তা হলে এরা খায় কী? সারা বছর এদের চলে কী করে?

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। তাই এখন আর ততটা গুমোট লাগছে না। কাঠকুটোর আগুন খোলা সাপের ফণার মতো দুলছিল। ফলে ফগুন মাঝির বউ হিমসিম।

বিধান দেখল, অভয় মহাপাত্রের চোয়াল দুটো আস্তে আস্তে কেমন শক্ত হয়ে উঠছে। একপেট খিদে নিয়ে ফগুন মাঝি হাঁ করে তাকিয়ে আছে মাটির হাঁড়িটার দিকে। সেদিকে চেয়ে কেটে কেটে শব্দগুলো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল মহাপাত্র—একে কি চলা বলবেন আপনি? জীবিকা বলতে এদের কিচ্ছু নেই। জঙ্গলে কাঠকুটো-পাতা বাজারে বিক্রি করে যা পায়, তাতে চাল হয় না। বরং আলু কিনলে পরিমাণে বেশি হয়। তাই ফগুনদের মতো সারা কালাহাণ্ডি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ চারেক কোনা-গোণ্ড উপজাতিদের কাছে ভাত হল বিলাসিতা বিধানবাবু। ফগুনের বউ 'রাগি (মাইলো) সেদ্ধ করছে। আজ এই খাবে সবাই।

কথা বলার ফাঁকেই ফগুন মাঝির উঠোনে একফালি ছায়া। পিছনে জঙ্গল। তারও পিছনে পাহাড়ি টিলার মাথায় নেমে এসে সূর্য লুকোচুরিতে ব্যস্ত। কখন যে টুক করে লুকিয়ে পড়ে, তারই বা ঠিক কি! মহাপাত্র চারপাই ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল—চলুন, অন্ধকার হওয়ার আগে ঘুরে আসি।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি বিধান। দুটো সাইকেল পাশাপাশি দাঁড় করানো ছিল ফগুন মাঝির ঝরঝরে দেওয়ালের গায়ে। তারই একটা বিধানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মহাপাত্র বলল—কালাহাণ্ডির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এর পথঘাট। বেশির ভাগ অঞ্চল দুর্গম। যাতায়াতের কোনও রাস্তা নেই। আপনি কলকাতার মানুষ। সাইকেল চালানো অভ্যেস আছে তো?

সাইকেলের সিটে একটা চাপড় মেরে বিধান বলল—তা আছে। তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে মহাপাত্রকে জিজ্ঞেস করল—রোদ পড়ে আসছে। ফগুন মাঝির ফ্যামিলির একটা ছবি তুলতে পারি?

বিধান কলকাতার একটা নামকরা দৈনিক কাগজের রিপোর্টার। কর্তৃপক্ষ খরচ করে তাকে এখানে পাঠিয়েছে। কালাহাণ্ডির দুর্গত মানুষের খবর জোগাড় করা এবং ছবি তোলাই তার কাজ। তবু ফগুন মাঝির উঠোনে পড়ন্ত বেলায় তার অসীম দুর্দশার মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুলে তাকে চিরকালের জন্যে ধন্য করে দেওয়ার বদলে সে কেন মহাপাত্রর অনুমতি চাইতে গেল, বিধান নিজেই তা ভেবে পেল না।

বিধানের কথার ধরনে হাসল অভয় মহাপাত্র। দুর্বোধ্য হাসি। বলল—আপনি কাগজের লোক। তার ওপর আমার অতিথি। আপনার তো সাতখুন মাপ।

ছবি তোলার কথা শুনে ফগুন মাঝি বেজায় খুশি। এমন চমকপ্রদ ঘটনা ওদের জীবনে বেশি ঘটে না। ছেঁড়া কাপড়টাই উদোম গায়ে টেনেটুনে জড়িয়ে নিল ওর বউ। পিছনে জরাজীর্ণ মাটির প্রাসাদ। দুটো উলঙ্গ বাচ্চাকে সামনে রেখে, কালাহাণ্ডির অনাহারক্লিষ্ট মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ফগুন মাঝি তার পরিবার নিয়ে কলকাতার অগণিত পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে বিধানের ক্যামেরার সামনে 'পোজ' দিয়ে দাঁড়াল।

ক্যামেরা গুছিয়ে কাঁধের ঝোলায় ভরে রাখছিল বিধান। মহাপাত্র বলল—কিছু মনে করবেন না। কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে অনেকেই এখন ভাঙিয়ে খাচ্ছে। কালাহাণ্ডির নামের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্য কেমন স্বাভাবিক আর সমার্থক হয়ে উঠেছে, দেখেছেন তো? অথচ কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। না সরকারের। না সাধারণ মানুষের। না রাজনৈতিক নেতাদের।

সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল বিধান। বলল—কিন্তু যতদূর শুনেছি, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর বিরাট একটা সফট কর্নার ছিল কালাহাণ্ডির প্রতি। আর সেটা শুধুমাত্র রাজনীতিগত কারণে নয়। ওঁর 'অ্যাপ্রোচ ফর পভার্টি টার্মিনেশন' স্কিমে কিছু কাজও নাকি হয়েছে এখানে?

এখন সূর্যের তাপ নেই বিশেষ। তাই সম্ভবত ক্ষোভের কারণেই মহাপাত্রর ফরসা মুখ লালচে দেখাল। সরু পায়ে-চলা পথ। পাশাপাশি যাওয়ার কোনও উপায় নেই। মহাপাত্র সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল—কাজ কি হবে? আমি পি এম-কে ধরে কালাহাণ্ডির জন্যে সংবিধানের তিনশ' একাত্তর ধারা অনুযায়ী বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তাতে লাভটা কী হল? স্থানীয় বিধায়ক, সরকারি অফিসার-সুপারভাইজারদের দিয়ে-থুয়ে দশ হাজার টাকার প্রকল্পে কাজ হয় বড়জোর হাজার তিনেকের। ভাবতে পারেন?

অবাক বিস্ময়ে অভয় মহাপাত্রর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল বিধান। বিধবার সাদা সিঁথির মতো রাস্তা। তার বুক থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। তবে বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ঝরে পড়া অজস্র শুকনো পাতার স্তূপে ঢাকা পড়ে গেছে গাছের গোড়া। জঙ্গলের মধ্যেই এদিক ওদিক দু-চারজন আদিবাসী মহিলা চোখে পড়ল বিধানের। গাছের শুখা ডালপালা, কাঠকুটো, পাতা কুড়োতে ব্যস্ত। লজ্জা ঢাকতে গায়ে কাপড়ের নামে যেটা জড়ানো আছে, সেটা ত্যানা ছাড়া আর কিছু নয়। অপুষ্ট শরীরে সঙ্গতি বিশেষ নেই, এই যা রক্ষে। তবু অভ্যেসের বশে চোখটা সরিয়ে নিল বিধান।

রাস্তা ছেড়ে সামান্য ভেতরে রুক্ষ টিলার কোল ঘেঁসে খানিকটা জায়গা জুড়ে কলাইয়ের চাষ। জলের অভাবে গাছগুলো সব হলুদ বর্ণ। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা লোক চুট্টা টানছিল। মহাপাত্র সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—কন্ রে বিসোয়া, আজি মট্টি কাটারো কামেরে তু যাউনি দেখিছু?

বয়সে লোকটা মহাপাত্রর চেয়ে কম করে বছর দশেকের বড় হবে। কালো, রোগা, ঢ্যাঙাটে গড়ন। কাপড়টা লেঙটির মতো ঘুরিয়ে কোমরে জড়ানো। মহাপাত্রকে দেখে তড়িঘড়ি চুট্টাটা ফেলে দিয়ে লম্বা একটা নমস্কার করে বলল—নাই আঁজ্ঞা। মট্টি কাটারো কামে মু কেব্বে যিবিনি। সে কোট পিনি মোট্টা বাবু মানে মোর টঙ্কা-পয়সা সব্বু কাটি নিলে, মোর লাভটা কঁড়? কহন্তু?

রাস্তার ধারে একটা পাথরে পা রেখে সাইকেল সমেত দাঁড়িয়েছিল অভয় মহাপাত্র। বিধান জিজ্ঞেস করল—বিসোয়া কি বলছে মহাপাত্রবাবু?

পিছনে ছাড়া ছাড়া জঙ্গল। বাধা না পেয়ে চোখ চলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। আপাতত কটা কাঠবিড়ালি আর এক জোড়া খরগোশ ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি বিধানের। জঙ্গলের ছায়া ছায়া পরিবেশ কালাহাণ্ডির 'মটির মনিষ' লম্বাচওড়া চেহারার অভয় মহাপাত্রকে সে মুহূর্তে একটা আলাদা মাত্রা দিচ্ছিল।

বিধানের কথার জবাবে বলল——একটু আগে আপনি সরকারি প্রকল্পের কথা বলছিলেন না? বিসোয়া এই দেপুরের কাছেই ডেঙানি গ্রামে 'ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জলাধারে' মাটি কাটার কাজ করত। তা কাজ পেতে গেলে সুপারভাইজারবাবুকে খুশি না রাখলে চলে? সারা দিন মাটি কেটে বিসোয়া যা রোজ পেত, তার থেকে কোট পরা মোটা বাবুকে হিস্যা দিয়ে নিজের আর কিছু থাকত না। ঘরে চার-চারটে উপোসী মুখ। সেই ঘেন্নায় ও আর কাজে যায় না।

বিসোয়া তার ঢ্যাঙা চেহারাটা নিয়ে তখনও কলাইয়ের ক্ষেতে দাঁড়িয়েছিল বুক চিতিয়ে। বিধানের মনে হল, তার প্রতিবাদী মাথাটা বুঝি জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে এখনই আকাশটা ছুঁয়ে ফেলবে।

কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। হাতে বিদেশি ঘড়ি। পরনে দামি জামা-প্যান্ট। তারই মধ্যে সব মিলিয়ে কালাহাণ্ডির অনাহারক্লিষ্ট, দুর্গত মানুষগুলোর প্রতি সমবেদনার নোটিসটা তার হাবেভাবে দিব্যি লটকানো। নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে পড়ন্ত বিকেলে, সেই দেপুরের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে বিধান লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

সেসব ঝেড়ে ফেলতেই যেন সে মহাপাত্রকে জিজ্ঞেস করল, এসব নিয়ে কোন প্রতিবাদ হয় না? সবাই মিলে আন্দোলন করলে তো এ অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হতে পারে?

জঙ্গলের ভেতর আলো খুব তাড়াতাড়ি কমে আসছিল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে মহাপাত্র বলল—প্রতিবাদ? আন্দোলন? কে করবে মশাই? খিদের জ্বালায় যেখানে কান্না পর্যন্ত থেমে যাচ্ছে, সেখানে কাদের নিয়ে আপনি লড়াই করবেন? সদিচ্ছা, তা সে যে তরফেরই হোক্ না কেন, এ ছাড়া এখানকার ছবি বদল হওয়া খুব শক্ত বিধানবাবু।

সাইকেলে যেতে যেতে পেছন থেকে মানুষটাকে দেখছিল বিধান। বছর চারেক আগে ভুবনেশ্বরে মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটে কালাহাণ্ডির প্রতিনিধি অভয়চরণ মহাপাত্রর সঙ্গে পরিচয় হয় তার। জেলার বিশ লাখ উপজাতি আর হরিজন আদিবাসীদের অবর্ণনীয় কষ্টের ছবিটা যেভাবে জীবন্ত তুলে ধরেছিল সে, তাতে বিধান মুগ্ধ না হয়ে পারেনি।

ভণ্ড রাজনৈতিক নেতা আর মেকি জনসেবকদের মাঝে অভয় মহাপাত্রকে একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র বলে মনে হয়েছিল তার। আলাপের পর চার বছরে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। মন্ত্রিত্বের আরামদায়ক গদি ছেড়ে স্বেচ্ছায় মহাপাত্র নেমে এসেছে মাটিতে। অসহায় মানুষগুলোর পাশাপাশি।

চিফ্ রিপোর্টার সুখেন্দুদাও অনেক দিন ধরে তাগাদা দিচ্ছিল বিধানকে। তাই কলমে আর ক্যামেরায় বর্তমান কালাহাণ্ডির একটা সঠিক ছবি তৈরির চেষ্টায় সে দিন দুয়েকের জন্যে অভয় মহাপাত্রর অতিথি হয়ে এখানে এসেছে।

দুই

ডেঙানি গ্রাম ঘুরে ফিরতে-না-ফিরতেই আচমকা জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ফেরার পথে ভাঙাচোরা রাস্তায় কিছু একটা ঢুকে বিধানের সাইকেলের হাওয়া গেল বেরিয়ে।

বাকি পথটা হেঁটে আসতে আসতে মহাপাত্র বলছিল---আপনাকে একটা অনুরোধ করব বিধানবাবু। যদিও এখনও অনেক কিছু দেখার এবং জানার বাকি আপনার। তবু ফিরে গিয়ে কালাহাণ্ডির সঠিক ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। সবাই যেন আসল সত্যটা আপনার প্রতিবেদন থেকে খুঁজে নিতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ।

তারপর একটু থেমে বিধানের দিকে তাকিয়ে বলল---কিছু মনে করবেন না। আপনার আগে কালাহাণ্ডি কভার করতে যাঁরা এখানে এসেছেন, ফিরে গিয়ে সরকারি প্রচারের ঢাকটাকেই তাঁরা আরও একটু জোরে বাজিয়ে দিয়েছেন মাত্র। কালাহাণ্ডির দুঃখের চালচিত্রটা সেখানে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দারিদ্র্য, অনাহার আর অপুষ্টি যেখানে শয়তানের মতো থাবা মেলে সমস্ত উপজাতি আর আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রামগুলোর ওপর চেপে বসে আছে, যেখানে খিদের জ্বালায় মানুষ পোকামাকড় মেরে খায়, সেখানেও শাল-সেগুনের আড়াল ছেড়ে সন্ধেবেলা চক্চকে চাঁদ উঠল টিলার মাথায়।

সেই ভৌতিক চাঁদের আলোয় চমরু জানির বউ আদুড় গায়ে উঠোনে বসে কোলের ছেলেটাকে দুধ দিচ্ছিল। এক দিক ঢাকতে গেলে আরেক দিক উদোম খাঁ-খাঁ। মহাপাত্রদের আসতে দেখে ওরই মধ্যে কাপড় বলে যেটুকু গায়ে জড়ানো আছে, সেটাই টেনেটুনে বসল। নিজের শরীরে পুষ্টি বলে কিছু নেই । বুকের ভেতর ধু-ধু মরুভূমি। ছেলেকে চমরুর বউ তাহলে কী দিচ্ছে? মায়ের স্নেহ? না শুধুই অভ্যেস? বিধানের ভারি আশ্চর্য লাগল।

দেপুর গ্রামে অভয় মহাপাত্রর অস্থায়ী আস্তানা আর পাঁচটা কোনা-গোণ্ড বা শবর উপজাতিদের ঘরের মতই নড়বড়ে আর ভাঙাচোরা। ভেতরে দুটো চারপাই। তাতে বিছানার নামে যা পাতা আছে, তা দেখে আঁতকে উঠল বিধান। জেলার বিশ লাখ মানুষের প্রতিনিধি, মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য যে এমন দৈন্যের মধ্যে অনায়াসে থাকতে পারে দিনের পর দিন, মহাপাত্রকে না দেখলে বিশ্বাস হত না তার।

কলকাতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের চরম বিলাসবহুল জীবনযাত্রা খুব কাছের থেকে দেখেছে বিধান। দেশের কাজ, জনসাধারণের সেবা করার নামে নিজেদের কয়েক পুরুষের আখের গোছানোর কুৎসিত প্রতিযোগিতা দেখে দেখে এখন রাজনৈতিক নেতাদের নামে বমি পায় তার। পেশাগত কারণে প্রতিনিয়ত আবার সেইসব মানুষগুলোরই মুখোমুখি হয়ে দেঁতো হাসি হাসার সে কি যন্ত্রণা!

চিফ রিপোর্টার সুখেন্দু সান্যাল প্রায়ই বলেন বিধানকে— অত ভাবুক, সেনসিটিভ হলে এ লাইনে চলবে না ব্রাদার। আরও শক্ত হতে হবে। সারাটা দিন নোংরা, পূতিগন্ধময় পুকুরে হাঁসের মতো সাঁতার কাটবে। তারপর বাড়িতে ঢোকার আগে ডানা দুটো ভাল করে একবার ঝাপটে নেবে। ব্যস্। দেখবে সব নোংরা ধুয়ে মুছে ঝকঝকে। তারপর একটু থেমে পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলেন---আসল ব্যাপারটা হল গিয়ে তোমার রিয়েলাইজেশন। উপলব্ধি। যে যেভাবে নেয়। ঠিক না?

চারপাইয়ে চিত হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে এইসব কথাই ভাবছিল বিধান। ভাঙা খোলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে চাঁদের আলো ঘরের মেঝেয় নকশা আঁকছে। লাঠির আকারের

মোটা মোটা কতকগুলো কঞ্চি দিয়ে ঝরঝরে দেওয়ালের দু-দিকে দুটো অভিনব জানালা। সেখান দিয়ে এবং দরজার ফাঁক গলে রাতের জঙ্গুলে হাওয়া ঢুকে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। কেরোসিন রীতিমত দুষ্প্রাপ্য এখানে। তবু ঘরের কোণে একটা ভুসো-পড়া হ্যারিকেন। সম্ভবত অতিথির নিরাপত্তার খাতিরে।

নতুন জায়গা। অচেনা পরিবেশ। তার ওপর শ্রীহীন অনভ্যস্ত বিছানা। বিধানের ঘুম আসছিল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মহাপাত্রর খাটিয়ার দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে তার নিশ্বাসের শব্দ। সেই আলোতেই ব্যাগ হাতড়ে সিগারেট আর লাইটার বের করল সে। জানালা এত নিচু যে তার ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ল না বিধানের।

তার পরেই ইচ্ছেটা জেগে উঠল ভেতরে। কলকাতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় ঘোরাফেরা-করা মানুষের মনে একটু অন্য ধরনের অনুভবের টান। চারপাই থেকে নেমে শব্দ না করে আগড়টা খোলার চেষ্টা করল বিধান। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে মাটির এক চিলতে দাওয়ায় বসে সিগারেটটা ধরাল।

কালাহাণ্ডির বিশেষত দেপুর-কেসিঙ্গা অঞ্চলের জঙ্গল অসমের মতো ঘন সবুজ নয়। অভাবী জেলার জঙ্গলেও তার শোচনীয় ছাপ। তবু বিধানের মনে হল, রাতের জঙ্গলের একটা আশ্চর্য রূপ আছে। শান্ত অথচ সম্মোহক।

টিলার মাথা ছাড়িয়ে চাঁদ ঝুলে আছে শুকনো ডালে। কোন্ ঝোপের আড়াল থেকে ডেকে উঠল একটা রাতচরা পাখি। সমস্ত জঙ্গল যেন পাতলা আলোর চাদর গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎই-এসে পড়া এই অচেনা পরিবেশে বিধানের চোখেই শুধু ঘুম নেই।

পরদিন সকালে জঙ্গলের গাছের মাথা থেকে কুয়াশা তার পাত্তাড়ি গোটানোর আগেই ভবানী পাটনা থেকে মোটরবাইকে ফটফট শব্দ তুলে লালু এসে হাজির। ছেলেটা এত সিন্‌সিয়ার! বিধান বের হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে লালুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে।

মহাপাত্রর নিজস্ব ব্যবস্থায় চা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল—কাল রাতের জঙ্গল কেমন লাগল বিধানবাবু?

ক্যামেরার লেন্সের মুখ থেকে ঢাকনাটা খুলে পরিষ্কার করছিল বিধান। বলল—আপনি তখন জেগেছিলেন না কি? বুঝতে পারিনি তো?

দুধবিহীন লাল চা। কাপটা বাড়িয়ে ধরে মহাপাত্র বলল—জঙ্গলে এলে রাতে সাধারণত আমি ঘুমোই না। জেগেই থাকি। আপনাকে তো তিন-চার বছর ধরে দেখছি। রাতের জঙ্গল যে আপনার মতো ভাবপ্রবণ মানুষকে আকর্ষণ করবে, তা আমি জানতুম। দেখলুম, আপনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাই সাড়া না দিয়ে জেগে থেকে শুধু পাহারা দিয়েছি।

'খড়গপুর পার হলেই এদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে' বলে যারা কুৎসা রটায়, বিধানের ইচ্ছে করছিল তাদের ধরে এনে অভয় মহাপাত্রর সঙ্গে একবার পরিচয় করিয়ে দেয়। জঙ্গলে বিধানের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে তার, এ বিষয়ে মানুষটা মাঝরাত্তিরেও সমান সজাগ। উপরন্তু তার অনুভূতি এত প্রবল যে বিধানের ভাললাগাটুকু অনুভব করে সে তাকে বাধা পর্যন্ত দেয়নি। এ রকম একটা মানসিক ঐশ্বর্যের অধিকারী না হলে কেউ কালাহাণ্ডির এইসব অর্ধ-নগ্ন, অশিক্ষিত, অনাহারী মানুষগুলোর দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারে?

মহাপাত্রর আজ অন্য কাজ। তাই আগের ব্যবস্থামত লালুর মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে বিধান জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দেখবে। সরকারি অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। সন্ধেবেলা ভবানী পাটনায় পুষ্প লজে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে মহাপাত্রর।

সাইকেলে উঠতে উঠতে অভয়চরণ লালুকে বলল—মু যাউচি। তমে বিধানবাবুরে নেইকি ডি আর ডি এ অফিসটু যিবা। সেটি কাম হেলে সেমানে যিবা এম আই পি অফিসরে। সেঠি পতিবাবু অছি। কিছি অসুবিধা হেলে কহিবে মু তাঙ্কো পঠাউচি। বিধানবাবু যেত্তে বড়ে যিবাকু চাহিবে, তমে নেই যিবা। বুঝিলে?

মহাপাত্র চলে গেলে বিধান একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরল লালুর দিকে। ভবানী পাটনায় লালুদের নিজস্ব দোতলা বাড়ি আছে। বাবা পেট্রোল পাম্পের মালিক। জমিজায়গাও কিছু আছে।

আজকালকার এমন একটা ছেলে কি করে অভয় মহাপাত্রর নীতি ও বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল, কিছুতেই তা বিধানের মাথায় এল না। পুষ্প লজের মালিকের মতো গলায় দেড় ভরি সোনার চেন ঝুলিয়ে খুব সহজেই সে বাপের গদিতে বসতে পারত দু'বেলা। তার বদলে নিজের পাম্পের তেল খরচা করে, ভাদ্রের রোদ মাথায় নিয়ে, বিধানের মতো কলকাতার এক রিপোর্টারের জন্যে কালাহাণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার কী দরকার ছিল তার?

কৃতজ্ঞতা? না, ভাল লাগা? কিসের যে একটা কলকলানি ঠেস মারছিল ভেতর থেকে! বিধান মোটর সাইকেলের পেছনে উঠে বসে লালুর পিঠে একটা হাত রেখে বলল—এবে চলন্ত লালুবাবু। বলে খুব হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল--কি, ঠিক বলেছি তো?

দেপুরের কাছেই ডেঙানি গ্রাম। এবড়ো-খেবড়ো সরু রাস্তায় খুব সাবধানে বাইক চালাচ্ছিল লালু। দু-পাশে ধানের ক্ষেত জল আর সারের অভাবে মানুষগুলোর মতই বিবর্ণ। বিধান জিজ্ঞেস করল—ধানক্ষেতের আল ছাড়া আর কোন পথ নেই? এখান দিয়ে বাইক চালানো তো রীতিমত বিপজ্জনক!

পেছনে না তাকিয়েই লালু বলল—এটা আল নয়, রাস্তা। বছর খানেক আগে এখানে মোরাম ফেলা হয়েছিল। দেখে বুঝতে পারছেন?

বিধান বলল—এ ভণ্ডামি দেশের সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে কালাহাণ্ডির ডেঙানি গ্রাম, কেউ এর ব্যতিক্রম নয়।

আল-পথ ধরে কিছুটা এগোতেই সামনে টিলা। তার নিচে প্রায় বুজে যাওয়া একটা ডোবা। জল নেই বললেই চলে। বিধান জিজ্ঞেস করল— ছোট্ট এই ডোবার জলে এত বড় ধানক্ষেতের তেষ্টা কি মেটে লালুবাবু? জলের আর কোনো বন্দোবস্ত নেই?

— না। বলে মোটর সাইকেলটা থামিয়ে দিয়ে লালু রাস্তার ধারে একটা বোর্ড দেখিয়ে বলল—যেখান দিয়ে এলেন, সেটা যেমন আল নয়—এটাও তেমনি ডোবা নয় বিধানবাবু। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জলাধার। এই জলের ভরসাতেই চাষীরা ধান রুয়েছে।

এম আই পি-র বোর্ডটাকে লেন্সের সামনে প্রজেক্ট করে ডোবাটার একটা ছবি তুলছিল বিধান। পেছনে পাহাড়ের মাথায় আগুনের হলকা। শুনল লালু বলছে, খরায় জল না পেয়ে ধানের চারা যেমন জ্বলবে— চাষীর কপালও পুড়বে তেমনি। আপনি ঘুরে দেখলেই বুঝবেন. গোটা জেলারই এক ছবি।

আষাঢ় শ্রাবণেও তেমন বৃষ্টি হয়নি এদিকে। এমনিতেই কালাহাণ্ডি পাহাড়ি টিলা আর রুক্ষ মাটির দেশ। তার ওপর বোশেখ জষ্ঠির ফুটিফাটা মাটিতে যেটুকু ঝরেছে, তাতে কালাহাণ্ডি রাক্ষুসীর আকণ্ঠ তেষ্টা বিন্দুমাত্র মেটেনি। খরার সঙ্গে লড়াই শেষ হতে না হতেই এইসব অর্ধনগ্ন, অভুক্ত মানুষগুলোর 'জাড়ার' বিরুদ্ধে শুরু হবে আর এক অসম যুদ্ধ।

শুনতে শুনতে বিধানের মনে হল, এ যেন অন্য কোন জগতের কথা বলছে লালু। যে জগৎ তার চূড়ান্ত মধ্যবিত্ত মানসিকতার ধরাছোঁয়ার বাইরে। লালু বলছিল। অপুষ্টি আর ম্যানেনজাইটিসের মতো কালান্তক রোগে প্রতি বছর কত যে কোনা-গোণ্ড, শবর আর হরিজন আদিবাসী চাঁচেরের হ্যামলেটে মারা যায়, সে নিয়ে কোথাও কোন ঝড় ওঠে না বিধানবাবু। মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিদিন গলাগলি করে এভাবেই বেঁচে আছে শতকরা সত্তর ভাগ ডুসা হরিজন আর সম্বারিরা।

তিন

ভাদ্রের ঠা-ঠা রোদ মাথায় নিয়ে ডেঙানি, থুয়ামুল-রামপুরের পাহাড়ি বস্তি ঘুরে লালু প্রধানের মোটর বাইক যখন রাজ্য সরকারের ডি আর ডি এ প্রজেক্ট অফিসের সামনে দাঁড়াল ঘড়িতে তখন বেলা প্রায় আড়াইটা।

লালুর একটা স্থানীয় পরিচিতি আছে ভাল রকম। মহাপাত্রর বলা ছিল, তবু ভেতর পর্যন্ত সঙ্গে এল সে। শুনল, প্রজেক্ট অফিসার সত্পতি সাহেব ভুবনেশ্বর গেছেন অফিসিয়াল ট্যুরে। লালু বলল---এলাকার উন্নয়নের কাজকর্ম নানা অজুহাতে বন্ধ থাকে। কিন্তু অফিসারদের ট্যুর দেখুন ? সেগুলো যথারীতি চলছে।

রোদ এখন আগুনের গোলা হয়ে গড়াচ্ছে প্রজেক্ট অফিসের মাঠে। বনসৃজন প্রকল্প কি না, কে জানে! বিধান দেখল, রুক্ষ প্রকৃতিতে সবুজের ছোঁয়া আনতে প্রজেক্ট অফিসের কম্পাউণ্ড জুড়ে নানা জাতের গাছ লাগানো হয়েছে. সব কটাই এখন নাবালক।

মানুষ যেখানে খিদের জ্বালায় পোকামাকড় আর বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ করে খায়, সেখানে সবুজ কচি পাতার ছোট ছোট চারাগাছ তো ছাগলগুলোর কাছে অমৃত! মনের সুখে ওরা সেগুলোই এখন চিবোচ্ছে।

অবশেষে কথা বলার জন্যে লালু বিধানকে নিয়ে যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল, তার বাইরের নেমপ্লেটে লেখা ছিল, দশরথ পতি। এক্সটেনশন অফিসার। ডি আর ডি এ প্রজেক্ট, কালাহাণ্ডি।

দরজার ভারী নীল পরদা সরিয়ে লালু ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে বিধান। চেয়ারে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের যে প্রবীণ মানুষটা বসেছিলেন সামনে 'সমাজ'-এর পাতা খুলে, তিনিই যে দশরথ পতি এতে বিধানের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

লালু বিধানকে দেখিয়ে বলল---অভয়বাবু তাঙ্কো পঠাউচি। সে মানে কলিকাতা টু এটি আসিচি কালাহাণ্ডি পাঁই কিছি ইন্‌ফরমেশন নিবাকু অছি। আপন টিকে তাঙ্কো সাহায্য করিলে ভল হব।

কাগজটা গুটিয়ে রেখে দশরথ পতি সামনের চেয়ারটা নির্দেশ করে বললেন—বসন্তু। তারপর সন্দেহের দৃষ্টিতে লালুর দিকে চেয়ে বললেন— মহাপাত্রবাবু মত্তে কহিথিলে সে মানে গুটে রিপোর্টার। কোউ সি রিপোর্টার টু মোর কিছি কহিবাকু নাহি। অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ ফ্যাক্ট, মোর সেমতি এক্তিয়ার নাহি লালুবাবু। সতপতি সাহাব কালি আসিলে কথথা হব।

অধৈর্য লালু বাঁধা দিয়ে বলল— পতিবাবু, মোর কথা টিকে শুনন্তু। বিধানবাবু আপনোক দুই চারিটি প্রশ্ন করিকি চালি যিবে। সতপতি সাহেব না হেলে ভি কিছি অসুবিধা হবনি। তারপর দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলল— মুটিকে বাহার কু বুলি আসুচি।

সরকারি অফিস। মাথার ওপর বনবন শব্দে পাখা ঘুরছে। তা সত্ত্বেও বিধান লক্ষ করল, দশরথ পতির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অভয়বাবু আর লাল মিলে তাঁকে এক কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

বিধান বলল---মিস্টার পতি, কালাহাণ্ডির ওপর একটা কনসোলিডেটেড রিপোর্ট তৈরির জন্যে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। এই জেলায় বিভিন্ন ধরনের সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প তো কাজ করছে। সে বিষয়ে দু-চারটে কথা জানলেই আমার চলবে। বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে প্রবীণ মানুষটা একটু নড়েচড়ে বসে বললেন--দেখুন, কালাহাণ্ডির ব্যাপার নিয়ে হাইকোর্ট-টোর্ট হয়েছে নিশ্চয়ই জানেন? দয়া করে নামধাম কিছু উল্লেখ করবেন না। বুড়ো বয়সে শেষকালে কোন উট্‌কো বিপদে পড়ব?

বিধান হাত তুলে দশরথ পতিকে আশ্বস্ত করে জিজ্ঞেস করল---গতকাল ভবানী পাটনায় দেখলুম প্রচুর হোটেল-টোটেল হয়েছে। সিনেমা হলও চলছে। লোকজনে গমগম করছে চারদিক। অথচ জেলা সদরের বুকের ওপর চাঁচেরে এত অন্ধকার কেন? এত কান্নার আওয়াজ? তাহলে কি ধরে নেব, পিছিয়ে-পড়া এই মানুষগুলোর জন্যে কেন্দ্র বা রাজ্যের কোন দায়িত্বই নেই? প্ল্যানমাফিক কোন কাজই হচ্ছে না এখানে?

বিধানের প্রথম প্রশ্নটা শুনেই একটু থতমত খেলেন মিস্টার পতি। টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে এক ঢোক জল খেয়ে বললেন---শুনুন, কাজ যে একেবারে হচ্ছে না, তা নয়। এই তো দিনকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখানে ঘুরে গেলেন। তিনি 'অ্যাডপ্ট'-এর ধাঁচে বেশ কয়েক কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট জমাও দিয়েছেন। আমাদের রাজ্য সরকারের ডি আর ডি এ প্রকল্পেও ভাল কাজ হচ্ছে। আর 'ইন্দ্রাবতী বাঁধে'র কাজ শেষ হলেই দেখবেন, এ জেলার চেহারা আমূল পালটে গেছে।

একটা রঙিন পেপার ওয়েট উল্টে নিয়ে সেটা টেবিলের ওপর দু-আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বিধান বলল---সবই তো বুঝলুম মিস্টার পতি। কিন্তু ইন্দ্রাবতী প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের যে এত টাকা আসছে, তার তুলনায় কাজ হয়েছে কতটুকু? শুনেছি, 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার'র নামেও অঢেল টাকা আসছে বিদেশ থেকে। কিন্তু কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষকে সামনে রেখে তার বেশিটাই নাকি লুঠ হয়ে যাচ্ছে পরিকল্পিতভাবে?

এধরনের সরাসরি অভিযোগে বোধ করি একটু ক্ষুব্ধ হলেন দশরথ পতি। এ ক্ষেত্রে বয়সটা একটা জরুরি ফ্যাক্টর বলে মনে হল বিধানের। মিস্টার পতি বললেন---আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। কেননা সেরকম কিছু আমার অন্তত জানা নেই। তবে জেলার ছবিটা কাগজে আপনারা যত করুণ করে আঁকেন, অবস্থাটা আসলে ততটা খারাপ নয়।

তারপর হঠাৎ যেন পরিসংখ্যান মনে পড়ে গেছে, এভাবে বলে উঠলেন, জানেন, জেলায় এবার ধানের রেকর্ড ফলন হয়েছে?

দশরথ পতির কথা শুনে হেসে পারল না বিধান। চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে সে বলল---তাই যদি হবে, তাহলে চাঁচের, ডুঙারিয়া, দেপুরের ঘরে ঘরে ভাতের হাঁড়িতে চালের বদলে 'রাগি' কিংবা কলাই সেদ্ধ হবে কেন? লেভির ধান সংগ্রহ সবচেয়ে কম কালাহাণ্ডিতে। সরকারি বন্টন (পি ডি এস) বলতে কিছুই নেই। এ সব সত্যি?

আচমকা প্রশ্নের ধাক্কায় একটু কোণঠাসা মনে হল পতিবাবুকে। প্রবীণ, বয়স্ক মানুষ। বিধান যে কালাহাণ্ডি ঘুরে খবরাখবর সংগ্রহ করে তাঁর কাছে এসেছে, প্রশ্নের ধরনেই তিনি তা বুঝতে পারলেন। সামলে নিয়ে বললেন--- আসল ঘটনা হল, কালাহাণ্ডির বেশির ভাগ ধানজমির মালিকানাই বড়লোকদের হাতে। আর বন্টন ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে নতুন 'পি ডি এস' প্রকল্প আমরা চালু করেছি। দেখবেন, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর একটু থেমে বললেন— আপনারা রিপোর্টার। আশা করব, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখবেন। কেবল চাঁচের কিংবা থুয়ামুল, রামপুর না দেখে ভবানী পাটনা কিংবা কেসিঙ্গার পালটে যাওয়া চেহারাটাও দেখুন? দেখুন কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে কালাহাণ্ডির ছবিটা? এ সব নিয়েও একটু-আধটু লিখুন?

কালাহাণ্ডিতে সরকারি কাজকর্মের পাশাপাশি প্রবীণ এক্সটেনশন অফিসার দশরথ পতিকে বড় বেশি আশাবাদী বলে মনে হল বিধানের। ডি আর ডি এ অফিসের চেয়ারে না বসে কোন একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা হলে তাঁকে যেন ভাল মানাত।

একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বিধান উঠে পড়ল। বাইরে এসে দেখল, অফিসের কমপাউন্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিকালের ছায়া। দিনের শেষ আভাটুকু আলতো করে ছুঁয়েথাকা পাহাড়ের মাথা থেকে এখনই বুঝি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

লালু বিধানকে দেখে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গেটের বাইরে ডি আর ডি এ অফিসের ঢালু রাস্তায় গোটা তিনেক ছাগল। পেছনে অর্ধ-উলঙ্গ একটা আদিবাসী ছেলে হাতে পাঁচনবাড়ি নিয়ে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে গ্রামের পথে।

বিধানের মনে হল, সব যেন একাকার। খাদ্য কে আর খাদকই বা কে, তার তফাত খুঁজতে খুঁজতেই লালুর মোটরবাইক দ্রুত পার হয়ে গেল ওদের ছোট দলটাকে। এরই মাঝে লালু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বিধানকে জিজ্ঞেস করল— কঁড়, কামো হেলে কি?

বিধান হাসতে হাসতে রসিকতা করে বলল— হউচি ম।

পাহাড়ী উঁচুনিচু রাস্তায় চোখ রেখে লালু জোর শব্দ করে হেসে উঠে বলল— বাঃ, এই তো দিব্যি আমাদের ভাষা শিখে ফেলেছেন দেখছি।

গাড়ি আবার জঙ্গলের পথ ধরল। লালু বলল—এ রাস্তা দিয়ে গেলে তিন-চার মাইল সর্টকার্ট হবে। অন্ধকার হওয়ার আগেই আমরা ভবানী পাটনায় পৌঁছে যাব।

ছাড়া ছাড়া জঙ্গল জুড়ে মরা বিকেলের আলো পাতলা সরের মতো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। নিস্তব্ধ সেই প্রায়ান্ধকার বনের মাঝে লালুর মোটরবাইকের ফটফট শব্দ এক অপার্থিব অনুভবের জন্ম দিচ্ছিল বিধানের মনে। তার মনে হল, শুনশান এই জগতের বাইরে সমস্ত কালাহাণ্ডি জেলা জুড়ে মানুষের দারিদ্র্য আর হাহাকারের সে ভয়াবহ ছবি সর্বত্র আঁকা আছে, এ মুহূর্তে তাকে ধরা বা অনুভব করা— দুটোই কত কঠিন।

সাংবাদিকতার লাইনে বিধানের ছ'সাত বছর হতে চলল। তবু বাইরের জগতে এসে নীতিবোধের ছোটখাটো অনুষঙ্গগুলো কেন যে এখনও তাকে ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খায়, সে বুঝতে পারে না। ডি আর ডি এ অফিসে বসে দশরথ পতির সামনে তার সিগারেট খাওয়ার নীতিগত কোন বাধা ছিল না। তবু বয়সের ফারাকজনিত স্বাভাবিক সংকোচটা সে তখন কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভেবে এখন তার ভাল লাগল।

লালুর চওড়া পিঠের আড়ালে খুব সাবধানে লাইটার জ্বেলে বিধান প্রয়োজনীয় সিগারেটটা ধরাল। তার পরেই আচমকা চোখটা তার আটকে গেল জঙ্গলের আধো-অন্ধকারে জেগে-থাকা এক ছোট্ট টিলার পাশে। বিধান চেঁচিয়ে বলল---গাড়িটা একবার থামান তো লালুবাবু।

গাড়ির শব্দ না বিধানের গলার আওয়াজে কে জানে, ওরা দুজনেই এদিকে ফিরে তাকাল। একটা বিশাল শালগাছে পিঠ রেখে রোগাটে মেয়েটা দাঁড়িয়ে। বাঁ পাটা ভাঁজ করে গাছের গায়ে রাখা। আদিবাসী ছেলেটা তার মুখোমুখি খুব ঘনিষ্ঠভাবে শরীরে শরীর ছুঁইয়ে কী যেন বলছিল। সে মুহূর্তে বিধানের মনে হল, ওরা যেন এই দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণাময় পৃথিবীর কোন মানুষ নয়। সৃষ্টির আদিমতম নরনারীর অলৌকিক প্রতিরূপ।

লালু বিধানের বিস্ময়দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল—ওদের দেখছেন? ওরা তো কুন্তি আর মুসিলা শবর। পাশেই চাঁচের গ্রামে থাকে। দুজনের বহুত পেয়ার।

লালুর কথা শুনে বিধান যেন শুকনো মাটিতে আছাড় খেল। ফগুন মাঝির মতো কালাহাণ্ডির লাখ চারেক উপজাতির কাছে ভাত যেখানে বিলাসিতা, যেখানে আকাশের আগুন ধানের বুক থেকে দুধটুকুও শুষে নিচ্ছে নির্মম উল্লাসে, প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় কান্নার শব্দ পর্যন্ত যেখানে থেমে গেছে—সেখানে নরনারীর চিরন্তন প্রেম-ভালবাসা এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে আছে কি দুঃসহ কৌতুকে, ভেবে অবাক লাগল তার।

বিধানের মনে পড়ে গেল, কিছুদিন আগে সে মহারাষ্ট্র গিয়েছিল ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত লাটুরের সংবাদ সংগ্রহ করতে। চারদিকে মৃতদেহের স্তূপ। হঠাৎ সেই স্তূপের মধ্যে সে শুনেছিল এক নবজাতকের কান্না। মৃত্যুর প্রতি জীবনের এক স্পর্ধিত আহ্বান।

দুটো ঘটনার কি আশ্চর্য মিল। গাড়ি থেকেনামতে নামতে বিধান লালুকে বলল —জীবন আর মৃত্যুর কি অদ্ভুত সহাবস্থান দেখেছেন? দাঁড়ান, ওদের একটা ছবি তুলে আনি।

চার

ভবানী পাটনার 'পুষ্প লজে' সন্ধে নাগাদ বিধানের জন্যে অপেক্ষা করার কথা ছিল অভয় মহাপাত্রর। লালু তাকে নামিয়ে দিয়ে সম্ভবত পেট্রোল পাম্পে ফিরে গেছে। কাল সকাল সাতটায় আবার এসে বিধানকে পৌঁছে দেবে কেসিঙ্গা রেল স্টেশনে।

সারাটা দিন ঘোরাঘুরির ধকল আর উঁচু-নিচু রাস্তায় মোটর সাইকেলের পেছনে সওয়ারি হয়ে সে রীতিমত ক্লান্তি অনুভব করছিল। স্নান-টান সেরে ফ্রেশ হয়ে ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নেবে বলে ভাবল সে। তার আগে গরম এক কাপ চা খাওয়া জরুরি মনে হল বিধানের।

এত ক্লান্তির মধ্যেও সে কুন্তি আর মুসিলা শবরের ঘনিষ্ঠ ছবিটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কালাহাণ্ডির মূল বিবরণ থেকে ওইটুকু অংশ বের করে নিয়ে চিফ রিপোর্টার সুখেন্দুদা হয়ত আলাদা কোন স্টোরি করতে চাইবেন। আর সেটা যে একটা আকর্ষণীয় প্রতিবেদন তৈরি হবে, এতে বিধানের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

স্নান করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে। লজের মালিক বিভূতি পাণিগ্রাহী এসে খবর দিল, অভয়বাবু জরুরি কাজে হাসপাতালে গেছেন। বলেছেন, আপনি দেপুর থেকে ফিরলে যেন ওখানেই সোজা চলে যান।

বিধান পাণিগ্রাহীকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কিছু জানেন? প্রাদেশিক ঢংয়ের সঙ্গে হিন্দি মিশিয়ে পাণিগ্রাহী যা বলল—তা অনেকটা এইরকম। দুপুর নাগাদ ডুঙারিয়া গ্রাম থেকে কিছু লোক হন্তদন্ত হয়ে অভয়বাবুর কাছে আসে। ওদের গ্রামের কে একজন নাকি খিদের জ্বালায় বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ করে খেয়েছিল। শেষ সময়ে সবাই মিলে বি ডি ও-কে ধরে-করে লোকটাকে হাসপাতালে দেয়। বিকেলে সে মারা গেছে। পোস্টমর্টেম হবে। মহাপাত্রবাবু তাই হাসপাতালে গেছেন।

স্নান-টান মাথায় উঠল। এটুকু শুনেই বিধান ঝোলা আর ক্যামেরা নিয়ে রেডি। পাণিগ্রাহীকে বলল—চট করে একটা রিকশা ডেকে দেবেন?

পুষ্প লজ থেকে হাসপাতাল মিনিট পনেরো রাস্তা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল অভয় মহাপাত্র। বিধানকে রিকশা থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—আপনার কাজ মিটেছে?

—তা মিটেছে। কিন্তু লজে ফিরে শুনলুম ডেঙারিয়া গ্রামের কে নাকি মারা গেছে? বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খেয়ে? পোস্টমর্টেম কি হয়ে গেছে?

হাসপাতাল করিডোরের আলোগুলোর চেয়েও ম্লান হাসল মহাপাত্র। বলল—পোস্টমর্টেম এখনও হয়নি। আর হয়েও বা কী হবে? ভাত যারা চোখে দেখে না, তাদের পেটে বাঁশের কোঁড় আর শেকড়-বাকড় ছাড়া আর কি মিলবে বলুন তো?

আগ্রহের আতিশয্যে নিজেই লজ্জা পেল বিধান। বলল—তা অবশ্য ঠিক। তবে সে ভাবে আমি কিন্তু বলতে চাইনি। কিছু মনে করবেন না অভয়বাবু।

মহাপাত্র হেসে বলল—আরে মশাই। আপনি অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন? আপনি সাংবাদিক মানুষ। কলকাতা থেকে কষ্ট করে এত দূর কালাহাণ্ডিতে এসেছেন। জানতে তো চাইতেই পারেন। চলুন, ওই চাতালটায় বসে সব বলছি।

হাসপাতাল চত্বরে একটা বড় ইউক্যালিপটাস্ গাছকে ঘিরে লাল বাঁধানো চাতাল। মুখেচোখে আশংকা আর হতাশার লেবেল। চেহারায় দৈন্যের ছাপ। ডেঙারিয়া গ্রামের জনাদশেক গরিব-গুরবো মানুষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। মর্গের দরজাটা এখান থেকেই চোখে পড়ছে বিধানের।

মাথার চুল উস্‌কোখুস্‌কো। মুখে অন্তত দু'দিনের বাসি দাড়ি। মহাপাত্রকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বিধান নিশ্চিন্ত, এ ক্লান্তি শরীরের নয়, মনের। মানুষের প্রতি এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সীমাহীন অবহেলার লজ্জা তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে প্রতিদিনের এই লড়াইয়ের মধ্যে।

মর্গের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ভবানী পাণ্ডা। মহাপাত্রর আর এক নিত্যসঙ্গী, ডান হাত। সেদিকে চোখ রেখে অভয় মহাপাত্র বলল—ডেঙারিয়ায় এর-ওর বাড়ি ছাগল চরিয়ে খেত বদন জানি। ঝরঝরে একটা খোলার ঘরে বোবা বউ পার্বতীকে নিয়ে সে থাকত। মাঠঘাট থেকে ছোলাটা শাকটা তুলে বড় রাস্তার ধারে চকে বিক্রি করত পার্বতী। তাতেও দু'জনের পেট চলত না।

গত তিনদিন পেটে কোন দানাপানি পড়েনি। খিদের জ্বালায় বদন আজ শেষপর্যন্ত পোকামাকড় মেরে খেয়েছে. বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ করে চিবিয়েছে। দুপুরে হাসপাতালে আনার পর বিকেলে মারা গেছে বদন জানি।

বিধানের চোখের সামনে একটা অন্য জগতের দরজা যেন হাট করে খুলে যাচ্ছিল। আর তীব্র অথচ জ্বালাময়ী এক আলোর ছটায় পড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল তার মেকি সভ্যতার লোকদেখানো মূল্যবোধগুলো। কোনক্রমে সে শুধু বলতে পারল—আর পার্বতী?

বিধানের দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি হাসল মহাপাত্র। বলল—পার্বতী বোবা। তার ওপর অপুষ্টির ছাপ সারা শরীরে। তবু ভুলে যাবেন না সে একটা যুবতী মেয়ে। ওদের সাহায্য করার জন্যে আমাদের সমাজে কিছু কিছু হাত অযাচিতভাবে বাড়ানো থাকে। তাই এ-যাত্রা পার্বতী হয়ত বেঁচে যাবে। কিন্তু বদনের মৃত্যুর সমস্যাটা? সেটা তো এর সঙ্গে জিইয়ে রইল বিধানবাবু?

এ কথার কোন জবাব ছিল না বিধানের কাছে। মহাপাত্রও বোধ করি উত্তর আশা করেনি। অন্ধকার ঘন হচ্ছিল হাসপাতাল চত্বরের চারপাশে। গাছগাছালির মাথায়।

মর্গের দরজা খুলে ডাক্তার বেরিয়ে আসতে উঠে দাঁড়াল মহাপাত্র চাতাল ছেড়ে। নিঃস্বার্থ অভয়বাবুর ভাবমূর্তি এখানে কত উঁচু, সেটা ডাক্তারের এগিয়ে আসা দেখে বিধান আবার টের পেল।

মহাপাত্র জিজ্ঞেস করল— সে বদন জানির মৃত্যুর কারণটা কঁড় ডক্টর পট্টনায়েক? আপন কিছি পাইলে কি?

— মু পাউঁচি আঁস্তা। সে মানে যেত্তে পোকামাকড় আর শিকড়বাকড় খাউথিলে, সেতি পাঁই সে মরা যাউঁচি।

মহাপাত্রর গলার স্বর নিঃস্ব মানুষের মতো শোনাল বিধানের কানে— যে সিবার থিলা, সে যাউচি। আপন পি এম রিপোর্টের গুটে কপি মত্তে দেলে ভল হব। মু বিষয়টু নেই কি মুখ্যমন্ত্রী সাঙ্গেরে কথথা কহিবে।

ডক্টর পট্টনায়েক বললেন— কালি সকাল রে মু পঠাই দেবে আঁজ্ঞা।

ভবানী পাণ্ডাকে বাকি করণীয় নির্দেশ দিয়ে মহাপাত্র বিধানকে জিজ্ঞেস করল— আপনার রিপোর্টিং-এর জন্যে বদন জানির ছবি নেওয়ার দরকার আছে কি?

একটু আগের মানসিকতার পাশাপাশি এমন একটা প্রশ্ন মহাপাত্রর কাছ থেকে আশা করেনি বিধান। হাসপাতালের অপ্রতুল আলোছায়ার মধ্যে গোটা দশেক নিরন্ন মানুষের অসহায় মুখগুলো সারিবদ্ধভাবে তার চোখের সামনে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে। তড়িঘড়ি সে বলে উঠল, সাংবাদিক বলে অতটা হৃদয়হীন আমাকে ভাববেন না অভয়বাবু। প্লিজ!

বিধানের গলায় যে সমবেদনার সুর ছিল, তা বোধ করি স্পর্শ করল মহাপাত্রকেও। বলল— আমি কিন্তু আপনার প্রয়োজনের কথাটা ভেবেই বলেছিলুম। চলুন, এ বার যাওয়া যাক্। কাল সকালে তো আবার আপনাকে কলকাতা ফিরতে হবে।

লালুকে আগেই বলা ছিল। পরদিন সকাল আটটার মধ্যে মোটরবাইকে করে সে বিধানকে পৌঁছে দিল কেসিঙ্গা রেলস্টেশনে। সকালের রোদ ঝক্‌ঝক্ করছিল লালুর সারল্যমাখা ঋজু চেহারাটা। বলল— এ দুটো দিনের কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

চলন্ত কামরার মধ্যে থেকে বিধান দেখল, কালাহাণ্ডির রুক্ষ, কঠিন, এবড়ো-খেবড়ো মাঠঘাট, মাঝে মধ্যে শ্রীহীন, বিবর্ণ দু-একটা বাবলার চারা আর গাছপালাহীন ছোট ছোট ধূসর পাহাড়গুলো খুব দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে।

গত দু-দিন ধরে দেখা ফগুন মাঝিআর তার রোগাটে বউ, মাটি-কাটা বিসোয়া, চাঁচেরের প্রেমিকযুগল কুন্তি-মুসিলা শবর, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের দশরথ পতি, লালু-অভয় মহাপাত্র-বিভূতি পাণিগ্রাহী স-অ-ব মুখগুলো একে একে সিনেমার মতো তার চোখের সামনে ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

বছরের পর বছর দেশের রাজনৈতিক নেতারা কালাহাণ্ডির এইসব দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে নির্বাচন বৈতরণী পার হয়ে এসেছে। তারপর গদিতে বসেই ভুলে গেছে দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিরন্ন মানুষগুলোর কাছে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা।

মনে হতেই আস্তে আস্তে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল বিধানের। সে ভাবল, কুন্তি আর মুসিলা শবরের প্রণয়ের ছবি তার ক্যামেরার নেগেটিভেই বন্দী থাক আজীবন। চরম দুঃখ-দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মাঝে ওদের প্রেমকে আর তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার একটা সুযোগ সে সুখেন্দুদার হাতে তুলে দেবে না। কিছুতেই না।

নটী

প্রলয় শূর

নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছে।

এ নাটকের কোথাও কোন ঘটনা প্রায় ঘটছেই না। প্রতিটি দৃশ্যের গতি নির্ভর করছে অভিনয়ের ওপর। যশোদার অভিনয় করছে মণিদীপা। এই নিয়ে দিন চারেক সে রিহার্সালে আসেনি। এই কদিনই রিহার্সালের সময় নাট্যকার-পরিচালক শোভন চৌধুরী মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে ভেবেছে মণিদীপা এক্ষুনি এসে যাবে। কিন্তু না, সে আসেনি।

এর মধ্যে আগের নাটক 'সুদর্শনা'র অভিনয় ছিল দুদিন। দুদিনই হাউসফুল। নাটক আরম্ভ হবার একঘন্টা আগেই মণিদীপা হাজির হয়ে গেছে ড্রেসিংরুমে। আয়নার সামনে বসে নিজের মেক্‌আপ নিজেই করেছে। মুকুটহীনা রানী খোঁপায় জড়িয়ে নিয়েছে জুঁই ফুলের মালা। অন্ধকার মঞ্চের ওপর উঠে এসেছে। তারপর চলেছে কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে ধুলোমাটির দুঃখে।

এ পর্যন্ত পঁচিশটা শো হয়েছে। চারটে বাইরে, একুশটা অ্যাকাডেমিতে। প্রতিটি শোয়ে মণিদীপা দারুণ অভিনয় করেছে। প্রথম শোয়ের দিন চারেক আগে পরপর তিনদিন সারারাত্তির রিহার্সাল হয়েছে। শোভনের ভয় ছিল, এত বেশি রিহার্সাল ওর অভিনয়ের ক্ষতিও করতে পারে। শোভনের স্বপ্নের সুদর্শনা মঞ্চের ওপর রক্তমাংসের জীবন্ত সুদর্শনা হয়ে উঠেছে। শোভন জানে, এর পেছনে আছে মণিদীপার গভীর দৃষ্টিশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম, নাটকীয়তার দিক থেকে সব কিছু সঙ্গত করে তোলার সহজাত ক্ষমতা। মেয়েটির হৃদয় আছে। মেয়েটি বুদ্ধি দিয়ে অভিনয় করে। একে আর ছাড়া যাবে না।

মণিদীপা আবার এসে রিহার্সালে যোগ দেয়। সকলের সামনে শোভনের তিরস্কার সহ্য করে।

'শোভনদা, আমাকে আরো কিছু টাকা বাড়িয়ে দিন।'

'কেন?'

'আমার দরকার।'

'এতই যদি টাকার দরকার, তুমি প্রফেশনাল স্টেজে চলে যাও না।'

যে মেয়েটি রানী সুদর্শনার অভিনয় করে, সে তখন শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ।

'তোমার বাবার তো ভালোই রোজগার।'

'বাবার তো একটা ভাঙাচোরা চায়ের দোকান। বাড়িতে সাতটা লোক। বাজারে প্রচুর দেনা। আড়াই শো টাকা বাড়ি ভাড়া। একটা বোনকে নিয়ে সারা বছর হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। টিউশানি করে কতো টাকা পাই আপনি তা জানেন। আমি আর পারছি না শোভনদা। আমাকে কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতেই হবে।'

'কেন, সুনন্ত কিছু দেয় না?'

'সুমন্ত দেবে কেন?'

'আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না।'

মণিদীপা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে পরিচালক শোভনের আঙুলে হীরের আংটিটার দিকে।

'একটা শো করতে আমাদের কতো টাকা লাগে, জানো?'

'না।'

'বিজ্ঞাপনে কতো খরচ হয় জানো?'

'না।'

'তুমি গ্রুপ-থিয়েটার করতে এসেছো, গ্রুপটা কিভাবে চলছে তার কিস্যু তুমি জানো না। সেট, লাইট, অ্যাকাডেমির ভাড়া একটা গ্রুপ পুরো-লস্-এ রান করছে, আর তুমি বলছো টাকা বাড়িয়ে দিতে। একটা কথা তুমি ভুলে গেছ, যারা অভিনয় করছে, তাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র, যাকে টাকা দেয়া হয়।'

তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে।

বাড়িওয়ালার ছেলে মন্টু একদিন ওদের ঘরে ঢুকে ওর বাবা-মাকে চরম অপমান করে। মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দরজার গোড়ায় মণিদীপার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

'কি ব্যাপার?'

'কি আবার? থেটার করে যদি মাল কামাতে না পারেন, ওসব আর্ট মারিয়ে কোনো লাভ আছে?' মণিদীপা কোনো কথা খুঁজে পায় না। বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে তার চেয়ে পাঁচ সাত বছরের ছোট, বারো ক্লাসে পড়া ছেলেটার দিকে। 'তিন মাসের ভাড়া বাকি আবার চোখ রাঙাচ্ছে' মন্টু আঙুল তুলে ওর বাবাকে দেখায়, 'ঐ যে ঐ বুড়োটা খুরিতে করে চা ব্যাচে, তার আবার লম্বা চওড়া কথা।' মণিদীপার সারা শরীরটা কাঁপছে, ইচ্ছে করছে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়, পারে না, কাল সকালে যদি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে?

তার পাঠ গোটাটাই মুখস্থ হয়ে এসেছিল। কিন্তু পাঠ মুখস্থ হলেই তো চলবে না। এ নাটকে অনেক চরিত্র। প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ তৈরি হওয়া দরকার। নানা ধরনের কম্পোজিশনের মধ্যে সিনেমার আধুনিক কিছু আঙ্গিক প্রয়োগ করতে চান পরিচালক। একটা দৃশ্যে কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সামনে যশোদার একটা বক্তৃতা আছে। এই একটা বক্তৃতা শ্রমিকদের উত্তেজিত করবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে, দর্শকদের মাথার মধ্যে প্রতিটি শব্দ আঘাত করবে, মঞ্চের ওপর থেকে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আবেগ আছড়ে পড়বে। কিন্তু কোথায় কে? কাকে বোঝাবে শোভন? কাকে দেখাবে অভিনয় করে? কয়েকদিন একটানা রিহার্সাল করার পর আবার মণিদীপা কামাই করে। মণিদীপা কেন আসছে না এটা জানার জন্যে দলের এক তরুণ অভিনেতা কমলেশ গিরিকে শোভন ওর পর্ণশ্রীর বাড়িতে পাঠিয়েছিল। সেখানে গিয়েও কমলেশ তার না-আসার কারণটা জানতে পারেনি। শোভনদা সুমন্ত বিশ্বাসকে সন্দেহ করে। কমলেশের ধারণা সুমন্তর প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে মণিদীপা নয়। প্রেম না হয়ে যদি অন্য কিছু হয়? সুমন্ত বড়লোক। তার পক্ষে সবই সম্ভব। টাকার জন্যে মণিদি কি নিজের সর্বনাশ করবে?

এই নিয়ে পরপর সাতদিন সে রিহার্সালে এলো না।

ও কি আর কোনো দল থেকে ডাক পাচ্ছে? পেতেই পারে। কিন্তু এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতা কি ও করতে পারে? তাহলে আসছে না কেন? সুমন্ত বিশ্বাস? ওর অর্থকষ্ট? চাপ দিয়ে আরো টাকা আদায় করতে চাইছে? না কি অহঙ্কার? ও কি বুঝতে পেরে

গেছে দলের পক্ষে ও ইনডিস্পেন্সেবল্? ওকে না হলে এ নাটক চলবে না, এটা বোধহয় ও টের পেয়ে গেছে। কিন্তু সে জানে না নাটকটাই বড় কথা। মণিদীপাকে যদি সে তৈরি করতে পারে, মণিদীপা যদি সুদর্শনা হতে পারে, আর কাউকে দিয়ে সে যশোদাও করাতে পারবে। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই।

প্রথম শোয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তবু একটা অবিশ্বাস্য অবাস্তব চিন্তা গোঁয়ারের মতো তার মাথার মধ্যে দাপাদাপি করে, এমন একটা নাটক অভিনয় করার কথা যদি আমি ভাবতে পারি, মণিদীপাকে বাদ দিয়ে এ নাটক অভিনয় করার ঝুঁকিও আমি নিতে পারব।

'পারবেন, তার কারণ আমাদের দলের আজ নাম হয়ে গেছে, তাই।'

'নামটা হল কি করে?'

'আপনার জন্যে।'

'না, শুধু আপনার জন্যে নয়, সকলের জন্যে। কিন্তু তোমার মণিদির ধারণা তার নামেই নাটক হাউসফুল হচ্ছে।'

কমলেশ বুঝতে পারে 'তোমার মণিদি' কথাটায় একটা খোঁচা রয়েছে। আজ রিহার্সালের শেষে সকলেই বুঝতে পারে শোভনদার রাগ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে দলের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এভাবেই গ্রুপ থিয়েটারে ভাঙন ধরে। বৃদ্ধ তারকবাবু আসেন 'মানকুণ্ডু' থেকে। একদিনও রিহার্সাল শেষ হবার আগে ওঠেন না। শোয়ের দিন এগিয়ে আসার সময় মণিদীপা পরপর সাতদিন এলো না। এর আগেও আসেনি। কোনো পরিচালকেরই এটা সহ্য করার কথা নয়। সুমন্ত বিশ্বাস হায়দ্রাবাদ গিয়েছে। গত সাতদিন মণিদীপাকে কেউ কোথাও দেখেনি। শোভন জানে মণিদীপা কোথায় গিয়েছে।

কী আশ্চর্য, পরদিন ঠিক ছটার সময় মণিদীপা রিহার্সালে এসে হাজির হয়।

পরিচালক মণিদীপার সঙ্গে একটিও কথা বলে না। রিহার্সাল চলতে থাকে, মণিদীপাকে কিছু করতে বলা হয় না। যে যার নিজের সংলাপ বলছে। পরিচালক প্রত্যেকের ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে দেয়ার চেষ্টা করে। কমলেশ বলেছিল, 'না' তুমি তো কালো নও, মেঘলা দিনের বিকেলবেলার মতো তোমার গায়ের রঙ। কমলেশ আজ বারবার ভুল করছে। সে বোধহয় অন্য কিছু ভাবছে। শোভন চিৎকার করে ওঠে.'কমলেশ, এটা অফিস ক্লাব নয়, গ্রুপ থিয়েটার।'

রিহার্সাল শেষ হয়ে আসে। একে একে সবাই বেরিয়ে চলে যায়। মেঝের এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে শুধু মণিদীপা।

'আমি কি বাদ হয়ে গেলাম?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, পাঠ তো আমার মুখস্থ।'

'হতে পারে। কিন্তু কাল থেকে তুমি আর এসো না।'

'যশোদা কে করবে?'

'যেই করুক, তুমি করবে না।'

'আমার অপরাধ?'

'তুমিই জানো।'

'আমি জানি না।'

'হায়দ্রাবাদ কিরকম ঘুরলে?'

'হায়দ্রাবাদ?'

মণিদীপা বুঝতে পারে শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে শোভনদা যা করছে তা অন্যায়। একটা জেদের বশে সে তার মনের মধ্যে যা খুশি বানিয়ে বসেছে। একবার মাত্র সে কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতে বলেছিল। শোভন রাজি হয়নি। একবারও জানার চেষ্টা করেনি কিভাবে তার দিন কাটছে। কিন্তু শোভনদার সব জানা দরকার।

নিস্তব্ধ পাংশু এক মুখশ্রী প্রস্তুত হয় সব কথা বলার জন্যে, আর ঠিক তখনই শোভন জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের এই গ্রুপটা কি করে বলো তো?'

'নাটক।'

'নাটককে তুমি শিল্প মনে কর?'

'করি।'

'তাহলে একটা কথা তুমি জেনে রাখো, শিল্পকর্ম আর বেশ্যাবৃত্তি এক নয়।'

সন্ত্রাসে কম্পিত একটা শরীর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে আসে। এসে, অন্ধকারে স্থির হয়। সামনের দোকানটা বন্ধ হচ্ছে। বড় বড় তালাগুলো লাগিয়ে, কাগজ জ্বালিয়ে দোকানদার আরতি করার মতো আগুনটা তালাগুলোর ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনে।

কি হবে সুদর্শনা আর যশোদার অভিনয় করে। রিহার্সালের দরজা তো বন্ধ হয়ে গেল। শোভনদা তো অন্য কোনো গ্রুপে যেতে দেবে না। ড্রেসিংরুমের আয়নার সামনে আর বসা হবে না। শোভন চৌধুরী কোথাও ঢুকতে দেবে না। সব আলো নিবে গেছে। স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে থাকা লোকটার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে মণিদীপা জিজ্ঞেস করে, 'যাবেন?' ছোট্ট একটা উত্তর আসে, 'চলুন।'

লোকটা গাড়ির দরজা খুলে দেয়। মণিদীপা উঠে আসে। গাড়ি চলতে শুরু করে। কোনদিকে যাচ্ছে মণিদীপা বুঝতে পারে না। রাতের কোলকাতায় সব রাস্তা একইরকম মনে হয়। তাছাড়া সে পথঘাট প্রায় চেনে না বললেই চলে। টাকা পয়সার কথা কিছুই হয়নি। কোথায় যাবে তাও বলেনি। লোকটা নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যেখানে খুশি যাক। এখন আর ফিরে যাবার রাস্তা নেই। দোকানপাট কমে আসছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছে মণিদীপা কিচ্ছু দেখতে পায় না। কিছুক্ষণ আগে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ আর শিয়ালদা স্টেশনটা একবার চোখে পড়েছিল। এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত একটি কথাও লোকটা বলেনি। একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, টিমটিম করে আলো জ্বলছে, কি একটা হকার্স কর্নার। দুটো বড় বড় শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে আসে। এসে ঢুকে পড়ে একটা বিরাট গেটের ভেতর। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা আগাছায় ভরে আছে। জঙ্গল পার হয়ে গাড়িটা আরো ভেতরে ঢোকে। দু-চারটি অভিজাত ফুল এখনও মাঝে মাঝে ফুটে ওঠার চেষ্টা করে, চাঁদের আলোয় রঙের বাহারে কিছু লুপ্ত অহমিকা।

লোকটা গাড়ি থেকে নেমে আসে। এই প্রথম সে কথা বলে, 'আপনাকে কত দিতে হবে?' এর কাছে পাঁচশো টাকা চাইলেই বা ক্ষতি কি? লোকটা তাতেই রাজি। মঞ্চের ওপর উঠে এলেই যার গোটা শরীরটা থেকে সরে যায় মণিদীপা, শরীরের মধ্যে উঠে আসে এক অন্য নারী, সেই মণিদীপা এখন এক অচেনা পুরুষ মানুষের কাছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ক্রীতদাসী বেশ্যা হয়ে গেল।

সারা বাড়িতে ঠাকুর চাকর ছাড়া কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। ওরা যে ঘরটায় এসে ঢোকে সেখানে কারুকার্যকরা দেয়াল জুড়ে মহাকালের বন্ধ খাপে কয়েকটি

তলোয়ার ঝুলছে। মাথার ওপর একটা বহুমূল্য ঝাড়লণ্ঠন। লোকটা মণিদীপাকে যে চেয়ারটায় বসতে বলে, সেটা এককালে ছিল রত্নখচিত। সিংহাসন।

'এটা যে রাজবাড়ি বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রাজত্ব চলে গেছে অনেককাল। এখন রাজা নেই, রানী নেই, সান্ত্রী মন্ত্রী হীরে মুক্তো কিচ্ছু নেই। তবু এই বংশের আমিই হচ্ছি শেষ রাজপুত্র।'

টেবিলের ওপর দুটো বড় বড় রূপোর ফুলদানি। অনেককাল ওতে কেউ একটাও ফুল রাখেনি। রাজপুত্র কাঠের সিন্দুকটার পাশে রাখা রাজকীয় দর্পণের মলিন ধুলোয় একবার নিজেকে দেখে নেয়। পাঁচটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে মণিদীপার হাতের সামনে। মণিদীপা হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেয়। একটুও দ্বিধা করে না। টাকাটা ভীষণ দরকার।

কিন্তু আর কতোক্ষণ? এই শরীরটার জন্যেই তো লোকটা তাকে তুলে এনেছে তার গাড়িতে। তাহলে এত ভান-ভনিতার দরকার কি? আমি ভিক্ষা নিতে আসিনি। আমি তো একটা বেশ্যা এখন, আমার সামনে তোমার লজ্জা কি?

'চলুন আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।' ওরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। গোটা এলাকায় এই একটাই বাড়ি, রাজবাড়ি, খুব কাছাকাছি প্রজাদের বাস ছিল নিষিদ্ধ। বাগানের পাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা চাঁদের আলোয় ধূ ধূ করছে।

'ওটা কি দেখছেন?'

'মনে হচ্ছে একটা স্টেজ।'

'হ্যাঁ, একশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা বানিয়েছিল। ওখানে উঠতে পারবেন?'

'কেন?'

'এই মঞ্চের ওপর আপনি সুদর্শনার অভিনয় করবেন, যে কোনো একটা দৃশ্য, আমি হবো আপনার একমাত্র দর্শক।'

উত্তপ্ত ক্ষুধাতুর শরীরটা নিয়ে সে মঞ্চে উঠে আসে। ধুলোমাটিতে ভরা মঞ্চটার ওপরে আত্মবিস্মৃত মণিদীপা সুদর্শনার অভিনয় শুরু করে। নাটকের শেষ দৃশ্য। তার রক্তের মধ্যে খেলা করে সুদর্শনার রক্ত। অভিনেত্রী তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে রাজপুত্রের হাততালির শব্দ শুনতে পায়। রাজপুত্র দেখতে পায় মণিদীপার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে, সেই চোখ থেকে জোছনা ঝরে পড়ছে।

বারবণিতার সাথে কিছুক্ষণ

চন্দন ঘোষ

অনিন্দ্য ছাড়া পেয়ে যেদিন ফাল্গুনী কেবিনে এসে হাজির হলো সেদিন বাসুদেবের সাথে অনেকেই অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। অনেকদিন আগে একবার অনিন্দ্যর একটা গল্প নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ হইচই হয়। সে সময় বাসু যদি অনিন্দ্যর পাশে না দাঁড়াত তাহলে ওকে মারই খেতে হতো। কে জানত সেই অনিন্দ্য আবার একটা এমন কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়বে যে ওর উপস্থিতিটাই অনেকের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি বাসুকেও মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে।

"বামপন্থী লেখক বারবনিতার সাথে ধৃত"—ছোট চার লাইনের একটা সংবাদ যে অনিন্দ্যকে ঘিরে গড়ে উঠবে এ কথা যদি আগে বাসুর জানা থাকত তাহলে ওর সঙ্গ অনেক আগেই ছিন্ন হয়ে যেত। যদিও সংবাদটা বেরনোর পর বাসু একবার ওর মুখোমুখি হতে চাইছিল। প্রগতিশীল মুখোশের আড়ালে ওর এমন নোংরামির কি জবাব থাকতে পারে ওর মুখ থেকেই বাসু শুনতে চায়। দেখতে চাইছিল অনিন্দ্য কোন যুক্তিকে আজ নিজেকে বাঁচাবে।

অনেকদিন আগে আজিজুলকে ব্যঙ্গ করে ওর লেখার মধ্যে বাসু কোনো অপরাধই খুঁজে পায়নি। আজিজুল-এর সাথে যেসব কমরেড কৃষকরা জেলে পচে মরেছিল বা আজও মরছে সে সম্বন্ধে মিডিয়া কেন নীরব রইবে এটাই যথেষ্ট ছিল অনিন্দ্যর পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু আজ, আজ ওর পাশে কে দাঁড়াবে!

অনিন্দ্য যখন বাসুর পাশে এসে বসল তখন অতুলদা গান ধরেছে শঙ্খ ঘোষের "ঘাস বিচুলি ঘাস।" অতুলদা সাধারণত গানের বেগ আনার জন্য চোখ বুজে নিজেকে গানের মধ্যে সিধিয়ে দেন। অনিন্দ্য আসার আগে অতুলদার প্রথম ক্যাসেটের জন্য গাথানি কেমনভাবে সাহায্য করেছে হেন করেছে তেন করেছে ইত্যাদির ইত্যাদির ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন তখন বাসুর সাথে আর সবাই তা কেমন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল আর ভাবছিল প্রচারের মহত্ত্ব কেমন বামপন্থী সৃষ্টিকর্তাকেও আপ্লুত করতে পারে। ঠিক সেই সময়েই আচমকা ধূমকেতুর মতো অনিন্দ্যর উদয়। অতুলদা চোখ বুজে খুবই আবেগে হাত উঁচু করে সন্ত্রাসের সিকুয়েন্স বোঝানোর জন্য পিস্তলের শব্দের মতো "ঠাস ঠাস" শব্দ করে গানটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবার জন্য বেগ ধরে চোখ খুলেই সামনে বাসুর পাশে বসা অনিন্দ্যকে দেখে ঐ অবস্থায় ফ্রিজ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ অবস্থায় থেকে হঠাৎই হাত নামিয়ে ঝোলাটা দ্রুত নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন।

— না হে আজ আর শোনানো গেল না। অন্য একদিন হবে। বলেই কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সরে পড়লেন। বাসুর বাঁ দিকের চেয়ারে কবি অমলেশের হঠাৎ মুদ্রাদোষটা চাগিয়ে উঠল।

— বুঝলে না... কাল আসবক্ষণ... বুঝলে না... আজ উঠি... কফি হাউসে যাব... বুঝলে না।

উঠে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিতে বাসুকে উঠে বেরনোর জায়গা দিতে বলে ঝোলাটা তুলে বেরিয়ে গেলেন। একে একে সবাই উঠে পড়ল। বাসু মাথা নিচু করে বসেছিল। ওর পাশে অনিন্দ্য। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বাসু মুখ তুলে অনিন্দ্যর মুখের দিকে তাকাল। গত কয়দিনেই অনিন্দ্যর চেহারায় যেন কালির ছোপ পড়েছে। চোখ দুটো কেমন যেন গর্তে বসা। গত দু'দিন আগে 'আজকাল' পত্রিকায় একটা ছোট সংবাদে যখন কফি হাউস তোলপাড় তখনও বাসু বিশ্বাস করতে পারে নি অনিন্দ্য এমন কাজ করতে পারে।

"পুলিশী সূত্রে জানা গেল বামপন্থী তরুণ উঠতি লেখক একজন অসহায় বারবনিতার সাথে দরকষাকষির সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে লকাপে। পুলিশ জানিয়েছে লেখকের নাম....."

সবাই জানে অনিন্দ্যর সাথে বাসুর ঘনিষ্ঠতা। অনিন্দ্য যে এ কাজ করতে পারে না কাউকে বিশ্বাস করানোর আগেই ঘটনাটা নিয়ে তোলপাড়। ফাল্গুনি কেবিনের এক পাশে ওরা বসে আছে, অনিন্দ্যকে কি বলবে বাসু বুঝতে পারছিল না। দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা চারমিনার ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বাসু বলল,

—কবে ছাড়ল?

—কাল।

—ছিঃ।

অনিন্দ্য যেন একটু অবাকই হলো। একভাবে বাসুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর খুবই নিচু গলায় বলল—

—তুইও সবার মতো আমায় অবিশ্বাস করছিস।

—না করার কি আছে বল। তোর সাথে ত সেই শেষ দেখা মেট্রোর সামনে। সই সংগ্রহ করতে রাস্তায় নেমেছিলাম। একসাথে সন্ধে অবধি ত আমরা সবাই ছিলাম। তুই বললি চল বাড়ি ফিরি। আমি পার্টি অফিসে গেলাম, তুই শিয়ালদা মুখে। তার পরের দিন কাগজে এইসব পড়লাম। চারদিন পর আজ তোর দেখা।

অনিন্দ্য চুপ করে বাসুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—মানুষকে বিশ্বাস করা পাপ না পুণ্য জানি না। তবু একটা স্পষ্ট কথাই তোকে বলতে চাই, সত্যিই সেদিন বারবনিতাদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। তার জন্য আমি এতটুকুও লজ্জিত নই। পারলে তোরা আমায় বয়কট করিস। অনিন্দ্য চলে গেল।

প্রতিদিনই কাজের শেষে বাসু ফাল্গুনী ছুঁয়ে বাড়ি যায়। ওর কাজের এক্তিয়ার কলেজ স্ট্রীট। ইতিমধ্যে অতুলদার একটা নয়, দু-দুটো ক্যাসেট বেরিয়েছে। গাথানি থেকে এইচ এম ভি হয়ে জি টিভিতে পা রেখেছেন। শোনা যাচ্ছে কবি অমলেশের উপর কারা যেন একটা ভিডিও করছে। অতুলদা আর ফাল্গুনীতে আসেন না। অনিন্দ্য নামকঃ নিষিদ্ধ লেখকের সঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান কিনা জানা যায় না। হঠাৎ সেদিন অরুণবাবু ঝড়ের বেগে কেবিনে ঢুকে ওর নিজের সম্পাদিত সদ্য প্রকাশিত "এবং এই সময়ের" নতুন কয়েকটা কপি টেবিলে ফেলে বললেন,

—বাসুবাবু, আপনার বন্ধু অনিন্দ্যর একটা লেখা আমি ছাপিয়েছি। আশ্চর্য আপনি ত কোনোদিন বলেননি অনিন্দ্যবাবু আপনাদের সাথে আছে।

অনেকদিন পর অনিন্দ্যর কথা ওঠায় দ্রুত হাত বাড়িয়ে বাসু পত্রিকাটা নিতে যায়। অরুণবাবু বাধা দেন।

—এখন রাখুন, বাড়ি নিয়ে পড়বেন।

—অরুণবাবু, অনিন্দ্যর সাথে দেখা হয়?

—হবে না কেন। ও তো প্রায়ই আমার ওখানে আসে। খানিক বসে। তারপর চলে যায়। মাঝে ও একদিন বলেছিল লেখা-টেখা ছেড়ে দেবে। আমিই জোর করে লিখিয়েছি।

—ওকে বলবেন তো একবার যেন ফাল্গুনীতে আসে।

বাসু উঠে পড়ে। অরুণবাবুর "এবং এই সময়ে"র একটি কপি ওর হাতে। অনিন্দ্যর কথা মনে পড়ে। ভাবে, সম্ভাবনাময় একজন লেখক কি বিচ্ছিরি একটা অপবাদ মাথায় নিয়ে হারিয়ে যাবে। ওকে ফেরানোর একটা চেষ্টা করা দরকার। বাড়ি ফিরে বাসু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বসল পত্রিকাটা নিয়ে। সূচীপত্রটা দেখে লেখাটা বার করে গল্পের নামটা পড়েই চমকে উঠল—

বারবণিতার সাথে কিছুক্ষণ— অনিন্দ্য রায়

বাসুর কথা ফেলা যায় না। ওর প্রজ্ঞার কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করতে ভাল লাগে। সেই বাসুই যখন একদিন কানোরিয়া নিয়ে শুধুমাত্র মুভ না করে একসাথে বন্ধ হয়ে থাকা ইতিমধ্যে আরো যে সব চটকলের শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের যুক্ত করে আমাদের প্রচার চালানো উচিত, এমন একটা ধারণার সপক্ষে যেদিন বাসু যুক্তিগুলো সাজিয়ে দিল সেদিন সত্যি বলছি আমি না করতে পারিনি। সেই বাসুর সাথেই হিন্দ সিনেমার ওখানে যেতে হয়েছিল। একটা ভাঙা হলঘরের মধ্যে অনেকেই এসেছেন। বাসু আমায় এক জায়গায় বসিয়ে জটলার মধ্যে মিশে গেল। এই প্রথম এই ধরনের মিটিং-এ আমার আসা। দু'একজন পরিচিত লেখক বন্ধুদেরও দেখলাম এ মিটিংটার খবর জানেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত একজন সাহিত্যিক যিনি কনভেনার হিসাবে এই মিটিংটা ডেকেছেন তিনি কেন এখনও আসেননি এই কথাটাই মুখে মুখে ফিরছিল। বাসুদেব পার্টির বিভিন্ন ফ্র্যাকসানের প্রতিনিধিরা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জটলার সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। কানোরিয়াকে ঘিরে বিভিন্ন বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক প্রতিনিধি সমেত বামফ্রন্ট বহির্ভূত বিভিন্ন বামদলগুলির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ বুদ্ধিজীবী লেখক-শিল্পীদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যেই এখানে আসা। মিটিং শুরু হবার পর যা যা ঘটল সেই স্মৃতি মন থেকে যত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। সেদিনের সেই সব কথাবার্তার কোনো ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনি। আজও পারি না বলেই কয়েকটা সংলাপের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখছি।

কথাটা উঠেছিল কানোরিয়া সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এক সর্বস্তরের কমিটি গঠন হোক। তাতে রাজনৈতিক কর্মী ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিজীবী লেখক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থাকুক।

কথাটা যেই তুলে থাকুক প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

প্রস্তাব ভাল হলেই যে তা কার্যকরী করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা যখন এ মিটিংয়ে নেই তখন আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে হয় না। আর তাছাড়া প্রস্তাবিত কমিটি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাদ দেওয়া উচিত।

কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্যোগীদের মুখে এমন প্রস্তাব শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই নিস্তব্ধ। বাসু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। একটা হৈচৈ চেঁচামেচি। কে যেন চিৎকার করে বলল — শ্রমিকরা রাজনীতি করতে

চায় না, তারা খেয়েপরে কাজ করে বাঁচতে চায়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী একদল সমর্থন করলেন। বাসু আবার উঠে দাঁড়াল —

—শুনুন শুনুন প্রচলিত পার্টিগুলোর সাথে যদি আপনারা আমাদের মেলাতে চান মেলান। ভবিষ্যৎই বলে দেবে নকশালবাড়ি রাজনীতির সঠিকতা। আমি শুধু বলতে চাইছি আপনারা শুধু কানোরিয়া শ্রমিকদের খিদের কথা কেন বলবেন, কেন অ্যাঙ্গাস, ভিক্টোরিয়া বা অন্যান্য বন্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা শ্রমিকদের কথা বলবেন না।

একগাল দাড়িওয়ালা লোকটি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। কে যেন একবার বলেছিল কানোরিয়া শ্রমিক ওর জীবন। কানোরিয়া ছাড়া উনি কিছুই শুনতে চান না। বাসুর কথায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —আমরা এখানে কানোরিয়া শ্রমিকদের জন্যই এসেছি। কানোরিয়া ছাড়া আমরা কিছুই বুঝতে চাই না। কোনো পার্টি রাজনীতি এখানে চলবে না। আগামীকাল শ্রমিকদের কি খাওয়াব সেই চিন্তা করাই এবং তার উদ্দেশ্যেই এখানে আসা। মিল খুলতে দরকার হলে সবার কাছেই যাব। আমাদের কোনো ছুঁৎমার্গ নেই। দরকার হলে মমতাও আসতে পারে, তবে ব্যক্তি হিসাবে। কিন্তু দয়া করে কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে নকশালী বানাতে যাবেন না।

বাসু এবার ফেটে পড়ল।

—এই যে দাদা, আপনার দেখছি রাজনীতির উপর খুবই অ্যালার্জি। অথচ এটা বোঝেন না কেন, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কখনই রাজনীতি ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে আসতে পারেন না। এই ত এখানে এত বুদ্ধিজীবী গায়ক লেখক জড়ো হয়েছে, ওঁরা কানোরিয়া যাচ্ছেন। এগুলো ছাড়া ওঁদের অস্তিত্বের দাম কি? কানোরিয়ার জন্য আপনি কংগ্রেসের নেতাদের কাছে যাবেন? তাঁরা আসলেও আপত্তি নেই অথচ নকশালরা আসলেই আন্দোলনটা নকশাল হয়ে যাবে— এ কোনো যুক্তি!

হইচই চেঁচামেচিতে বাসুর গলা ডুবে যায়। আমার মতো অনেকে অবাক। সত্যি তো কংগ্রেসের নেতাদের কাছে যাবেন। অথচ নকশাল নেতা থাকলে আপত্তি। অন্যান্য লেখকরাও বোঝা যাচ্ছে বাসুর যুক্তি মেনে নিয়েছে। হঠাৎ দাড়ি গোঁফওয়ালা অচেনা লোকটা বলে উঠল ঃ

—কমিটিতে সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা থাকতে পারেন সেক্ষেত্রে কোনো ছুঁৎমার্গ হলে চলবে না। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই মুহূর্তে বলতে হবে প্রতিদিন কানোরিয়া শ্রমিকদের লঙ্গরখানার জন্য কে কত টাকা দেবেন? শুধু মুখের দরদে কাজ চলবে না।

মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছে। বাসু ইতস্তত করছিল।

—টাকা দেবার কোনো গারান্টির উপর শ্রমিক আন্দোলন নির্ভর করে না। আমাদের যতটুকু ক্ষমতা জনসাধারণের কাছ থেকে তুলে নিয়ে দেব।

এবার দেখা গেল নামকরা জীবনমুখী গায়ক থার্ডফর্মের নাটকওয়ালা থেকে শুরু করে দাড়িগোঁফওয়ালা মানুষটি পর্যন্ত একসাথে দুয়ো দিতে শুরু করেছে। হই হট্টগোল। চারশ টাকার হোলটাইমার, সাতষট্টি থেকে ঘরছাড়া সাতবছর কংগ্রেসী জমানায় জেলখাটা বাসুর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। লেনিন মূর্তি উপড়ে ফেলা ক্রেমলিনের চুড়ো থেকে যে অরাজনৈতিকীকরণের বিষাক্ত ঢেউ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা যে কত মারাত্মকভাবে এই বাংলায় আছড়ে পড়েছে তার বেদনায় বাসু কি বেসামাল হয়ে পড়ছে! মনে হল বাসু যেন রাগে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেল। এখানে না আসলে বোঝা

যেত না পশ্চিমবাংলার সমস্ত সংবাদপত্রগুলো কেন কানোরিয়া নিয়ে এত মাতামাতি করছে। কেন হাজার হাজার বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে তারা নীরব। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির ধারাবাহিক ধান্দাবাজী, বেইমানির, বিরুদ্ধে পাল্টা কোনো জঙ্গী রাজনৈতিক ধারা যাতে না গড়ে ওঠে তার জন্য কি সুকৌশলে শ্রমিকদের নির্জীব করে তুলছে— এটা কেন দাড়ি গোঁফওয়ালা লোকটার মাথায় ঢুকছে না বোঝা গেল না। নীরবে বাসুর সাথে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। অনেক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী যাদের সম্বন্ধে কাগজে প্রতিদিন লেখালেখি হয় তাঁরা বাইরে জটলা করছিলেন। কেউ কেউ করুণার চোখে বাসুকে দেখছিল। একজন ঠোঁটকাটা তরুণ উঠতি জীবনমুখী গায়ক এসে বাসুর কাছে এসে দাঁড়াল।

—বুঝলেন বাসুবাবু, এই আপনারা মার্কসিস্টরা এতদিন আমাদের করুণার চোখে দেখে এসেছেন। এখন আমাদের পালা। আমরা এই শিল্পী সাহিত্যিকরা যারা ধরি মাছ না ছুঁই পানি এইভাবে বাম রাজনীতির স্বপক্ষে একদিন দাঁড়িয়েছি তারাই এখন জনমত তৈরি করব। আর দেখবেন মিডিয়া ঠিক আমাদেরই প্রচার করবে। অরাজনৈতিকীকরণের ঢেউ এখন সারা বিশ্বে। আপনি মশাই ঠেকাবেন কি দিয়ে।

বাসু হাসল। কিছুই বলল না, শুধু নীরবে শুনে গেল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো কথাগুলো ওর কানেই গেল না। ও যেন অন্য জগতের বাসিন্দা। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কি যেন ও বিড় বিড় করে বলছে। শোনার চেষ্টা করি। ... বড় সাহস হয়েছে। ওরা ভুলে যাচ্ছে যে অরাজনৈতিকতার ঢেউয়ের চূড়োয় ওরা বসতে চাইছে সেটাও কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতবাদকেই সাহায্য করছে। ঠিক আছে। বিবেকের কাছে সৎ থাকুন রে ভাই। আর কিছু চাই না। ভাল কথা বলতে এসেছিলাম, শুনল না। আজকাল বুদ্ধিজীবীরাও যে অভুক্ত শ্রমিকের ক্ল্যাসিফিকেশন করছে জানা ছিল না। বাসু আর আমি হাঁটতে হাঁটতেই ফিরেছিলাম। চারপাশটা এত আলো ঝলমল করছে অথচ কি ভয়ঙ্কর প্রাণহীন। ট্রামের তার পেরিয়ে অনেকদিন পর হঠাৎ ধর্মতলা স্ট্রীটের উপরের দিকে তাকালাম। দু'পাশে সারিবদ্ধ বাড়ি। বহুদিন পর যেন আকাশ দেখলাম। উপরে এত জ্যোৎস্না ভাদ্রের আকাশ যে এত পরিষ্কার। নীলচে একটা আলোর আভায় ভরা আকাশ। তারই মাঝে সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আলসেমি ভাবে ভেসে ভেসে চলে যাওয়া। সামনের সোজা রাস্তা শিয়ালদামুখো। বাসু মৌলালী যাবে। আমি শিয়ালদায় যাব বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরতে। হঠাৎই বাসু আমার দিকে ফিরে বলল,

কাল মেট্রোর সামনে আয়। কানোরিয়া সমেত সমস্ত বন্ধ কলকারখানার খোলার দাবিতে সই জোগাড় করি। কমিটিতে নিক বা না নিক কিছুই এসে যায় না। যা সঠিক তা প্রকাশ্যেই বলা ভাল। এছাড়া করার ত কিছু নেই।

বাসু আমার হাত ধরেছিল। ভারাক্রান্ত মনটা আবার আশায় ভরে ওঠে। অনেককিছু বাদ দিয়ে যদি নিজেকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করি মানুষ হিসাবে তোমার ভূমিকা কি? তাহলে এই মুহূর্তে ওর প্রস্তাব না করার কিছুই থাকে না। বললাম, —কাল যাব, তবে এসব ব্যাপারে আমি ত কিছুই জানি না।

বাসু আমায় আশ্বস্ত করে।

—তোর ভাবতে হবে না। বয়ান একটা করে আনব, তুই যদি দু-একজনকে আনতে পারিস ত ভাল হয়। মেট্রোর সামনে দাঁড়াবি।

রোজই একই রাস্তা দিয়ে যাই। কখনও এমন পার্থক্য চোখে পড়ে না। জনাকীর্ণ এই রাজপথ। এই প্রথম নিজেকে সবার থেকে আলাদা বলে মনে হচ্ছে। চারপাশে হকারের

চেঁচামেচি। বহুলোক পেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাতে কলম পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লজ্জা সঙ্কোচ, কাকে ধরব কে কেমন মানসিকতার লোক কি জানি। যদি তর্ক বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। তাহলে? সামনে একটা লোক আসছে। হাতে অ্যাটাচি কেস। পরনে ভাল জিনসের প্যান্ট। পাশে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। ভাবলাম অফিসার-টফিসার হবে। এদিকের ফুটপাথের মুখে লাইট পোস্টের গায় বাসুদের পার্টির নাম ছোট ছোট লাল চাইনিজ কাপড়ের ফেস্টুন দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া রয়েছে। বাসু পটপট সই জোগাড় করছে। মধ্যবয়সী যুবক মহিলা কেউ বাদ পড়ছে না। অথচ আমার কেমন যেন সংকোচ। লোকগুলো এগিয়ে আসছিল। থমকে দাঁড়ালাম ওদের সামনে।

—কি ব্যাপার?

ইতস্তত করে কি যে ছাই বললাম জানি না। শুধু দেখলাম ধাঁ করে আমার হাত থেকে কাগজটা টেনে ঝট করে একটা সই দিয়ে দিল।

—কি হবে এসব করে?

চলে গেল। একজন মোটা লোক আসছে। পায়জামা পাঞ্জাবী পরনে। হাতে একটা ঠোঙা। ঠোঙা থেকে তুলে তুলে কিছু একটা খেতে খেতে আসছে। পাশে কয়েকজন মহিলা। দেখে মনে হচ্ছে মাড়ওয়ারী। লোকটাকে দাঁড় করালাম। প্রথমে ভাবল আমি বুঝি পয়সা চাইছি। শুনে না, না করে উঠি। বললাম,

—পয়সা নয়, ব্যাপারটা শুনুন। লোকটা মনোযোগ দিয়ে শুনল। বলল,

—ব্যাওসা পত্তরের হাল যে কি ভাই আপনারা মালুম করতে পারবেন না। কি কোরে চলবে বলুন তো? জিনিসপত্তরের বিক্রি হোবে, তোবে না পয়সা দিব? ফোরেন মালে তো ভরিয়ে গিয়েছে! কম্পিটিশানে ত হটে যেতে হচ্ছে ভাই। দেন, সই করে দিই একটা দেখেন, যদি কিছু হোয়।

বাসু দূর থেকে হাত নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছিল।

চারপাশে ফ্লুরোসেন্ট লাইটের আলো। সিনেমা ফেরত দর্শক। এ যাবৎ যাদের কাছ থেকে সই নিয়েছি মনের মতো একজন লোকও পাইনি। যাদের সই নিয়েছি সত্যি বলতে কি তাদের সই আমি নিতে চাইনি। মনের মতো লোক পাচ্ছি না যাকে দেখে মনে হতে পারে ঘটনাগুলো সে জানে। যার চরিত্রের মাঝে মেহনতি মানুষের একটা চেহারা জড়িয়ে আছে। এসপ্লানেডের এই অঞ্চল দিয়ে ত বহু মানুষের যাতায়াত। তবু আমারই ভাগ্যে জুটছে হয় অফিসার নয়ত উচ্চবিত্তের মানুষজন। আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্তকেই যেন খুঁজছিলাম। দূরে লক্ষ রাখছি। হঠাৎ এবার পেয়েও গেলাম। একটা মোটা ময়লা টেরিকটের হাওয়াইশার্ট বগলে রেকসিনের ব্যাগ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লোকটা এগিয়ে আসছে। লোকটাকে পাকড়াও করতে হবে। আমার সামনে আসতেই ওকে দাঁড় করালাম। লোকটা আচমকা অনুরোধটা শুনে থমকে দাঁড়াল। বিবর্ণ টেরিকটের হাওয়াইশার্ট। ততোধিক বিবর্ণ প্যান্ট। একটা রেকসিনের চেন-খোলা ব্যাগ। সম্ভবত অফিস-ফেরতা ডেলিপ্যাসেঞ্জার। নিতান্ত সাদামাঠা আটপৌরে।

—আপনি নিশ্চয় কানোরিয়ার নাম শুনেছেন। আপনি যেটা জানেন তা হচ্ছে কানোরিয়ার মতো প্রায় এক হাজার বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকরা আজ কোনোরকমে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছেন। এসব কলকারখানার খোলার দাবিতে ...

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। বাড়তি উৎসাহ পেয়ে ওকে ঘিরে আমরা কয়জন। লোকটা রেসকিনের ব্যাগটা বগলদাবায় করে অবাক বিস্ময়ে আমাদের

আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। তারপর 'বন্ধ কারখানা খুলবে" কথাদুটো স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করে আমার হাত থেকে কাগজটা টেনে নিল। ডটপেনটা বাড়তি উৎসাহে বাড়িয়ে দিয়ে আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লোকটা এবার আমায় অবাক করে দিয়ে সইগুলো দেখল। ঠিকানাগুলো পড়ল। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল তারপর কাগজটা ফেরত দিতে দিতে বলল—

—এসব সইটই দিয়ে কি হবে। এসব সই দিয়ে কারখানা খোলা যায় না। কারা খুলবে? ভিক্ষে করে কি ...

চলে গেল। আমি হতবাক! সন্ধ্যা নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মেট্রোর সামনে ভীড়। ফুটপাথের চোরাগোপ্তা পথে বিকিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় দেহপসারিণীরা। তার সাথে চারপাশে ছড়িয়ে আছে প্রকাশ্যে ইম্পোর্টেড পারফিউম। কথাকয়টি বলে লোকটা মিলিয়ে গেল। সই দিল না। এমনতর ঘটনার জন্য সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই অপ্রত্যাশিত কয়েকটি কথা আচমকা এত বেশি আমায় নাড়িয়ে দিয়েছিল যে এই মুহূর্তে বন্ধ কলকারখানার অভিশপ্ত শ্রমিকদের জীবনের শোচনীয় পরিণতির বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রচার অভিযান যেন অর্থহীন বলে মনে হলো। আচমকা আমার হতভম্ব ভাব দেখে অন্যান্যরা একটু অবাকই হলো।

—ওরকম হৃদয়হীন মানুষ দু-একজন থাকে। ওদের কথায় ত আর সমাজের বিবেক চলে না। নে নে অন্যদের ধর।

যান্ত্রিক অনুভবে সন্ধ্যায় এই আলোকোজ্জ্বল ব্যস্ত মানুষের মাঝে ওদের আবেদনে সাদা পাতাগুলো ভরে উঠল ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যার এই মুহূর্তে লোকটার কথাগুলো আমার বিবেকের অস্তিত্বের গোড়া ধরে টান মারল। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না।

বাড়ি ফিরছিলাম। যাবার কোনো জায়গা না থাকলে মানুষ যা করে। যান্ত্রিক অভ্যাসে আমায় তাই করতে হলো। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে হলে এমনভাবে বলা যেত না বাড়ি যাচ্ছি, যত সহজে আজ বলতে পারি। অসহায় হাজার বন্ধ কারখানার শ্রমিক পরিবারগুলো ধুঁকে ধুঁকে কোনোরকমে বেঁচে আছে আর আমি দিব্যি বাড়ি ফিরছি। গিয়ে দেখব সবাই কেমন তারিয়ে তারিয়ে মেট্রো চ্যানেল দেখছে।

শিয়ালদা চত্বরে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছি খেয়াল নেই। সবাই ছুটছে। যে যার ট্রেন ধরতে ব্যস্ত। আমার কোনো তাড়া নেই। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক দেখছি তো? ভুল দেখছি না তো! ভালভাবে লক্ষ্য করলাম আবার, হ্যাঁ ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না নিজের চোখকে। একটু এগিয়ে দাঁড়ালাম। আবার ভালভাবে দেখছি, হ্যাঁ সেই লোকটা। সেই ময়লা শার্ট, বগলে ছেঁড়া রেকসিন ব্যাগ, হাতে একটা ছোট কৌটো। কাঁধে বিবর্ণ ময়লা ঝোলা। বুকে কি যেন একটা ব্যাজ লেখা রয়েছে। পথচলতি মানুষের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। কৌটোটা ঝাঁকাচ্ছে। কেউ কেউ বিরক্তিতে সরে যাচ্ছে। কেউ দয়াপরবশ হয়ে কৌটোয় কিছু কিছু দিচ্ছে। কারও সাথে ছিনে জোঁকের মতো গায়ে লেপটে থেকে প্লাটফর্মের গেট অবধি গিয়ে ফিরে আসছে আবার সিঁড়ির কাছে। আমি হতভম্ব মেরে গেছি। এও কি সম্ভব! ভাবছি যে লোকটা দু-তিন ঘণ্টা আগেও বড় বড় কথা শুনিয়ে আমার বিবেকের গোড়া ধরে নাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল সেই কিনা এখানে কৌটো নাড়াচ্ছে। কেমন যেন জেদ চেপে গেল। লোকটার মুখোমুখি হওয়া দরকার। একটু এগিয়ে গেলাম ওরই

মুখোমুখি। লোকটা প্রথমে আমায় খেয়াল করতে পারেনি। অভ্যাসবশত কৌটোটা আমার সামনে নাড়িয়ে ধরতে গিয়েই থমকে গেল। ওরিয়েন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাজ। এই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু শ্রমিকের সাথে আমার পরিচয় ছিল। কোম্পানীটা অনেকদিন ধরেই বন্ধ। ওদের আর এখন কেউই নেই, যারা এ ধরনের অভিযানের সাথে যুক্ত। পকেট থেকে এক টাকার কয়েন বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললাম— ওরিয়েন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের আমি চিনি। এভাবে পয়সা তোলার মতো এখন আর কেউ নেই। আজ চার-পাঁচ বছর হলো কোম্পানীটা বন্ধ। আপনি এভাবে পয়সা তুলছেন কেন? কলকারখানা খোলার দাবিতে আপনি সই দিলেন না। আর এখন দাঁড়িয়ে লোক ঠকাচ্ছেন। আর তা বাদে এ ব্যাজই বা কোথায় পেলেন? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।

লোকটা একভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাগ ও দুঃখের কোনো অভিব্যক্তিই ওর মুখে খুঁজে পাওয়া গেল না। হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল: দাদা চেঁচাবেন না। চলুন চলুন ঐ ফোয়ারাটার ধারে, যা বলার ঐখানেই না হয় বলবেন। দয়া করে এখন চুপ করুন।

সরে আসলাম। লোকটা এবার সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— খুব ত' লম্বা চওড়া কথা বলছেন। কি জানেন আমার সম্বন্ধে? না, লোক ঠকাচ্ছি না। বরং বলতে পারেন বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে নিয়েছি।

না, লোক আমি ঠকাচ্ছি না। বরঞ্চ যদি বলি লোক ঠকাচ্ছেন আপনারা?

এক নাগাড়ে হড়হড় করে কথা বলে ও হাঁপিয়ে উঠল। মনে হলো লোকটা সারাদিন কিছুই খায়নি। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। রেলিং-এর গোড়ার আমরা দু'জন বসে আছি। লোকটা চুপ করে আছে। কি মনে হলো পকেট থেকে সেই কয়েনটা বের করে ওর কৌটোটার কাটা অংশটা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম— একটা সত্যি কথা বলুন তো। সত্যি কি আপনি ওরিয়েন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শ্রমিক ছিলেন কোনোদিন।

লোকটা মুখ তুলে হাসল। বলল— হয়ত করতাম। এখন আর ওসব ভাবিনা।

তারপর কি ভেবে ওর ব্যাগটা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বেশ কিছু নানান রঙের ষ্টিকারগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল— জানেন, আমি এই সব বন্ধ কলকারখানায় কাজ করতাম।

আমি অবাক।

—মানে কি বলছেন।

—মানে কাজ করেছি। যখন একটা করে ব্যাজ লাগাই আর এক একটা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াই তখনই ত আমি সেই বন্ধ কারখানার শ্রমিক। লোক দয়া করে কিছু দেয়। তাতে পেট চালাই। এছাড়া ত আর কিছু করার নেই দাদা।

ওর যুক্তির কাছে কেমন যেন অসহায় বলে নিজেকে মনে হচ্ছে। রাগও হচ্ছে এই ভেবে যে, লোকটার কি এতটুকু বিবেক বলে কিছু নেই।

—আপনার নাম কি? কোথায় থাকেন বলুন তো।

লোকটা যেন এবার একটু ঘাবড়িয়ে গেল।

—কি হবে দাদা নামধাম দিয়ে। ছাড়ুন না দাদা, রাত হচ্ছে।

কেমন যেন জেদ চেপে গেল।

আপনার এসব বুজরুকি বন্ধ করতে হবে। গণধোলাই কি বোঝেন?

লোকটা এবার সত্যিই ভয় পেল। তাড়াতাড়ি কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে পা জড়িয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,

—সত্যি দাদা আর এ চত্বরে আর আমি আসব না। আমি... আমি... আর তো কিছু করার নেই। কোথায় কাজ পাব, কেই-বা দেবে...।

লজ্জায় পড়ে গেলাম, লোকটাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, পা ছাড়ুন, পা ছাড়ুন।

ও বিশ্বাস করতে পারছে না, জোর করে পা ছাড়িয়ে বললাম— সত্যি কথা বলুন। আমি কিছুই করব না। আপনি কি সত্যিই কোনোদিন শ্রমিক ছিলেন?

চোখ মুছতে মুছতে ও বলল— সত্যি বলছি দাদা আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর ফ্যাক্টরী বন্ধ।

একটু দূরে একজন পুলিশ অন্ধকারে একটা মেয়ের সাথে কথা বলছিল। পুলিশটা যে এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করছিল এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। পুলিশটা এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা চুপ করে গেল।

—কি হয়েছে দাদা? কোনো গন্ডগোল...

চুপ করে আছি। কি বলব। কৌটোটা তখনও লোকটার পায়ের কাছে। তুলতে পারেনি। পুলিশটা হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে বলল।

—কিরে গান্ডু, কতো হলো?

তারপর নিচু হয়ে কৌটোটা তুলে ওর ওজনটা পরখ করে বলল— আরে শালা। এর অর্ধেকটাও তো এখনও ভরেনি। আরে গান্ডু, এখানে চুপ করে বসে আছিস যে বড়... ওঠ... ওঠ। আমি হতবাক। ভাবতেই পারছি না লোকটার সাথে পুলিশটার কি সম্বন্ধ। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে এবার আমার মুখের দিকে চাইল। আমি ইশারায় লোকটাকে থামতে বলে পুলিশটার দিকে এগিয়ে চললাম। এটাত জি.আর.পি-র আন্ডারে। পুলিশটা কি করছে।

—আপনি একে চেনেন?

পুলিশটা একবার আপাদমস্তক আমায় দেখে নিয়ে বলল।

—কি ব্যাপার বলুন তো দাদা। আপনি এই রাতে এখানে কি করছেন?

ভীষণ রাগ হচ্ছে। পুলিশটা ভেবেছেটা কি। ও কি করবে না করবে তা পুলিশটা নির্ধারণ করবে কেন?

—ও কি করবে না করবে আপনার বলার এক্তিয়ার... কথা শেষ হলো না। খপ করে আমার হাতটা ধরে, —শালা রাতদুপুরে রেন্ডিবাজী হচ্ছে... চল তোকে দেখাচ্ছি আমি আমার এক্তিয়ার কতটুকু। চল শালা, চল।

একটা হইচই চেঁচামেচি। লজ্জায় লাল হয়ে গেছি। কি প্রসঙ্গ থেকে পুলিশটা কোন প্রসঙ্গে চলে গেল। আমি চিৎকার করে উঠি। তার আগেই দুমদাম দুটো চড় সপাটে গালে এসে পড়ল।

—শালা ভদ্রলোকের চেহারা, দেখে চেনাই যায় না। এইসব লোকের জন্যই তো।

চিৎকার করে উঠি। —হাত ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন।

আবার লাঠির ঘা। কলার চেপে টানতে টানতে ফ্লাইওভারের নিচে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অফিসফেরত যাত্রীরা থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে। রাস্তার ধারে একটা ঘরের মধ্যে এনে একপ্রকার ধাক্কা দিয়েই দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কোনোরকমে সামলে নিয়ে উঁবু হয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছি। ঘরের মাঝখানে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে আছে একজন পুলিশ অফিসার। বাঁ দিকের দেওয়াল

ঘেঁষে দুটো বেঞ্চিতে কনস্টেবলদের ফেলে যাওয়া হেলমেট। দেওয়ালের দিকে কতক্ষণ মুখ করে বসেছিলাম জানি না। শুধু চলমান যাত্রীর হল্লা ক্ষীণ হচ্ছিল। রাত্রি হচ্ছে বুঝতে পারছি। অনেকক্ষণ পর পিছনে রুলের গুঁতো দিয়ে দাঁড় করাল। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালাম। নামধাম লেখাতে হলো। খুচরো পয়সা, কয়েকটা টাকা ছিল, টেবিলের উপর রাখতে হলো।

—এবার বলুন, ভদ্রলোকের ছেলে রাত-বিরেতে শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে রেন্ডিবাজী করছিলেন কেন?

কি বলব। কিছু বলা নিরর্থক।

—কিছুই বলতে চাই না। আপনিও জানেন আমিও জানি আমার দোষটা আসলে কি নিয়ে। শুধু একটা কথা আপনারা বলুন তো। যে লোকটা পয়সা তুলছিল তার থেকে আপনাদের প্রাপ্য কতটুকু?

যে লোকটা ডায়েরী লিখছিল সে এবার সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকাল। পাশে দাঁড়ানো পুলিশটা আমার এতটা ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে সপাটে কষাল বুটের লাথি; অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে কখন আবার আমায় যেন ধরে বসিয়েছে জানি না। একটা আলো-আঁধারি ছায়া ছায়া ঘরের মধ্যে যেন বসে আছি। সেই পরিচিত পদ্ধতি। টেবিলের ওপারে কে বা কারা যেন বসে আছে জানি না। তীব্র একটা আলো টেবিল ল্যাম্প থেকে সরাসরি আমার মুখে। মনে হচ্ছে ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে নিঃশব্দে কারা যেন আমার মুখ-চোখের অভিব্যক্তিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

—অনিন্দ্যবাবু, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি জানেন আপনি কি করেছেন?

—হ্যাঁ।

—কি করেছেন বলুন তো?

—কেন? রেন্ডিবাজী।

—না, মিথ্যে কথা বলছেন।

—না, সত্যি কথা বলছি।

—বাজে কথা বলবেন না। ভদ্দরলোকের ছেলে. মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা হয় না আপনার?

—আমি যে ভদ্দরলোকের ছেলে এটা আপনাকে কে বলল?

—আমরা বলছি?

—আপনারা বলছেন? তাহলে ঠিক আছে। আপনারা যখন বলছেন তখন আমার মা-বাবার কোনো ঠিক নেই। ভদ্রলোক তো নই।

আচমকা কোণ থেকে কে যেন বলে ওঠে, স্যার ধোলাইটা একটু বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ভুল বকছে।

—অনিন্দ্যবাবু শুনুন, কেউ যদি পাবলিক প্লেসে পয়সা তোলে, সাহায্য চায়, আপনি তাকে বাধা দিতে পারেন না—ঠিক?

—ঠিক।

আর-এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল, এই তো এইবার ঠিক কথা বলছে।

—প্রথমত ওকে আপনি বাধা দিয়েছেন। রাইট?

—রাইট।

—সংগ্রামরত শ্রমিকদের সংগ্রামে পুলিশ না পাঠানোই ঘোষিত নীতি। এবং যতটা সম্ভব সেই সংগ্রামে আমরা সাহায্য করব, ঠিক?

—ঠিক, আপনার সরকার শ্রমিককে কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলছে পুলিশ ভাই? আর আপনারা কি সাহায্য করছেন। ভিক্ষে ছাড়া তো কিছুই শেখাচ্ছেন না।

—ভিক্ষে করাটাও একটা সংগ্রাম। যাই হোক ওটা আপনি বুঝবেন না। তাহলে আপনি পুলিশের কাজে কেন বাধা দিয়েছেন?

—বাধা?

—হ্যাঁ।

—আমি তো লোকটাকে বাধা দিইনি। বাধা দিয়েছি আপনাদের।

—তার মানে?

—লোকটা যদি এ ধরনের সংগ্রাম করতে চায় আপনি কি পারেন ওকে বাধ্য করাতে?

—বাধ্য বলছেন কেন? এটাই তো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর এই নৈতিকতা থেকেই যদি লোকটা পুলিশকে কিছু পয়সা দিতে চায়, আপনি কি পারেন লোকটার এই কাজে বাধা দিতে?

—মানে?

—এই সহজ সরল সত্যটা বুঝতে পারছেন না বলেই এই রাতে পুলিশ লকাপে চালান হয়ে যাবেন। অন্ধকার ঘরের চারপাশ থেকে সমস্বরে এবার কারা যেন বলে ওঠে। —এবার বলুন এই সহজ সরল সত্যটা মেনে নিয়ে বাড়ি যাবেন, নাকি রেন্ডিবাজী নামে চালান হয়ে যাবেন?

—না, বাড়ি যাব না।

চিৎকার করে উঠলাম। ঘরের মধ্যে নেমে আসে অখন্ড নীরবতা। হঠাৎ সামনের উজ্জ্বল তীব্র আলোটা কারা যেন নিভিয়ে দিল। নিঃসীম অন্ধকার সাগরের মধ্যে আমায় যেন কারা ডুবিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আবার প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই আমার মাথা লক্ষ্য করে কারা যেন লাঠি চালাল। চোখের মধ্যে অসংখ্য তারার ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি যেন ক্রমশ চেতনা হারাচ্ছি। বন্ধ চোখের অন্ধকারের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি। এ কি? আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা করছে কেন? হঠাৎই বন্ধ চোখের অন্ধকার পর্দা জুড়ে অসংখ্য ভেসে ভেসে বেড়ান তারাগুলো ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অভুক্ত হাজারো বন্ধ কারখানার শ্রমিকের মুখ। আমি কি চিনতে পারছি ওদের? আমি কি চিনতে পারছি কানোরিয়া-সহ হাজারো বন্ধ কারখানার শ্রমিক পরিবারে শিশুদের ফ্যাকাসে মুখগুলো? আমি যেন অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ভেসে ভেসে বেড়ানো মুখগুলোকে স্পর্শ করতে চাইলাম। মুখ থুবড়ে কিছু একটা নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম।

বুঝলি বাসু, পুলিশী সূত্রের খবরের ভিত্তি করে যারা নিরাপদ দূরত্ব থেকে আমার সঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান কিংবা গাথানী বা এইচ এম ভি-র চোখের জলের সাথে অভুক্ত শ্রমিকের চোখের জল বিক্রি করে অরাজনৈতিক জীবনমুখী হয়ে কাঁদতে চান, কাঁদুন। আমি বরঞ্চ পুলিশের দেওয়া বদনামে ধন্য হয়ে জেলে যাব তবু অরাজনৈতিক আবেদনের মত "এ্যাও" হইতে পারে আবার "অও" হইতে পারে— এমন জীবনমুখী, শ্রমিকমুখী কাজের সাথে যুক্ত হয়ে এক ঘোলাটে চিত্র আঁকতে পারব না।

পারিস তো আমায় ঘৃণা করিস।

জনতার সন্ধানে

দীপেন্দু চক্রবর্তী

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পালিত হবে যোগেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনে, তাই শিক্ষক ছাত্রদের. ব্যস্ততার শেষ নেই। তিনদিনের ঠাসা কর্মসূচী— গান, আবৃত্তি, নাটক, বিতর্ক, খেলাধূলো, খাওয়া-দাওয়া। স্কুলের সভাপতি, এবং স্থানীয় এম এল এ মোটা টাকা ডোনেশান দিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এম এল এ ছাড়াও আসছেন বাঘা বাঘা কয়েকজন নেতা, স্থানীয় থানার ও সি ও কোর্টের জজসাহেব। মফস্বল শহরে এমন সমাবেশ অনেকদিন হয়নি। সুতরাং স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে এ নিয়ে নানান কথা, নানান রকম প্রস্তুতি।

ক্লাশের পর স্কুলের একটা ঘরে অঘোরবাবু মোটা গলায় 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানটা শেখাচ্ছেন ছাত্রদের। আর এক ঘরে চলছে, আবৃত্তির মহড়া। উঠোনে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা।' ব্যাণ্ডের সঙ্গে চলছে কুচকাওয়াজ। শুধু ইতিহাসের শিক্ষক সত্যব্রতবাবু যে ছাত্রদের নিয়ে কোথায় তার নাটকের মহড়া দিচ্ছেন তা কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলেন, ডিস্টার্ব করুক আমি তা চাই না। নাটক একটা সাধনার জিনিষ। এককালে নাটক করতেন তিনি, কলকাতার অনেক নাটক-করা লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এই কারণে তাঁকে একটু সমীহ করতেই হয়। তার ওপর তিনি একটু রগচটা খ্যাপাটে ধরনের। বিয়ে-থা করেন নি, একজন বুড়ো চাকর ছাড়া তাঁর সঙ্গী বলে কেউ নেই। কথায় কথায় কোথায় যে উধাও হয়ে যান কেউ জানতে পারে না। রাত জেগে প্রচুর লেখালেখি করেন, কিন্তু কখনো ছাপানোর চেষ্টা করেন না। ছাত্রদের যেমন প্রশ্রয় দেন তেমনি পাগল করেন। ইতিহাসের শিক্ষক হয়েও সব বিষয়ে এত পড়াশোনা যে স্বয়ং হেডমাস্টার শ্রীপতিবাবুও ওঁকে খাতির না করে পারেন না। তবে ওঁর সবচেয়ে বড় দোষ স্থানকালপাত্র খেয়াল না রেখেই দুম করে অপ্রীতিকর মন্তব্য করে বসা। মন্তব্যগুলোও এমন সিনিকাল যে সহ্য করা কঠিন। একবার স্কুলের প্রতিষ্ঠা-দিবসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এমন কি শিক্ষককুল সম্বন্ধে এমন সব কথা বলতে থাকলেন যে সহকর্মীরা প্রায় মারমুখি হয়ে ওঠেন। সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেন হেডমাস্টারের মধ্যস্থতায়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবে তাই ঠিক হয়েছে সত্যব্রতবাবুকে কিছু বলতে দেওয়া হবে না। যদিও তাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। অতএব তাঁকে নাটক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে। হেডমাস্টার শুধু জানতে চেয়েছেন নাটকের বিষয় ও বক্তব্যটা। সত্যবাবু বলেছেন, নাটক তাঁর নিজের লেখা, বিষয় দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি, নামটা এখনো মনঃপূত হয়নি তাঁর, হয় 'জনগণমন' নয় 'জনজাগরণ' এই ধরনের হবে। হেডমাস্টার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, ভালোই তো। দেখবেন ছেলেরা যেন ভালো করে পার্ট মুখস্থ করে। কিন্তু সত্যবাবুর শর্ত, নাটকের মহড়ায় কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। সহকর্মীরা এতে সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। হেডমাস্টারের এই পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কাছে

একটু বাড়াবাড়ি ঠেকেছে। তবে সান্ত্বনা এই যে এমন একজন খুঁতখুঁতে সিনিক্যাল লোককে আর সব ব্যাপার থেকে বাদ দেওয়া গেছে। তা না হলে উনি ঠিক অঘোরবাবুর গান থামিয়ে দিয়ে বলতেন, আপনার গলা পর্দায় লাগছে না। বিজনবাবুর ঘরে ঢুকে বলতেন, আবৃত্তির মধ্যে যাত্রার মত এত গলা কাঁপানো হচ্ছে কেন? কুচকাওয়াজ দেখে বলতেন, একসঙ্গে পা পড়ছে না। মাথাগুলো সোজা থাকছে না। সত্যবাবুর আর একটি অপরাধ, তিনি নিজের টাকা দিয়ে ছাত্রদের প্রায়ই এটা ওটা খাইয়ে থাকেন। ব্যাচেলার মানুষ, তাই এই বদান্যতার বাড়াবাড়ি। কেউ কেউ বলে, এটা ঘুরিয়ে ছাত্রদের হাত করা। সত্যবাবুর অবশ্য একটি জবাব ঃ কুয়োর ব্যাঙদের কথায় আমার কিছু এসে যায় না।

সহকর্মীরা নাটক-করা ছাত্রদের ডেকে বারবার চেষ্টা করেছে জানতে কী নাটক লিখেছেন সত্যবাবু। তারাও তেমনি, এটা ওটা বলে পাশ কাটিয়ে গেছে। হঠাৎ শোনা গেলো একটি পোড়ো বাড়ির উঠোনে মহড়া হয়। একজন ছাত্রকে পাঠানো হল। পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে সে যা দেখেছে তাতে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা হয়নি। ফিরে এসে বললো, কী সব বলছে, মশাই এত দেরি করে অফিসে আসেন কেন, আর কিছু বুঝলাম না। শুনে সহকর্মীরা বললেন, নাটকটা ঝোলাবে দেখবেন। এর চেয়ে ভালো হত না ডি এল রায়ের সিরাজদৌল্লা করা?

কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক সত্যবাবু একবার করিয়েছিলেন ছাত্রদের দিয়ে। রিহার্সালের ঠেলায় তো ছাত্রেরা নাজেহাল। মঞ্চসজ্জা আর পোশাক নিয়ে সে কি খুঁতখুঁতনি। ছুটি নিয়ে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে চলে গেছেন সত্যবাবু। সেই সময়কার পোষাক চিনে নেবার জন্য। নাটকের জন্য এত টাকা খরচ হয়ে গেলো যে সবাই বললো, ঢের হয়েছে, আর নাটক নয়।

সত্যবাবুকে অবশ্য দমিয়ে রাখা যায়নি। নাটক বন্ধ হলো। কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত সব আইডিয়া তাঁর মাথায় খেলে। একবার রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তিনি একটা বিতর্কসভার আয়োজন করে ফেললেন, বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। অনেকেই অনেক কথা বললেন, কিন্তু সত্যবাবু যা বললেন তাতে স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির লোকেদের চেয়ারে হেলান দিয়ে হাই তোলা সম্ভব হলো না। একেবারে সোজা হয়ে বসে কান খাড়া করে শুনতে হল— প্রতিটি রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমরা অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার এক সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জন্মদিনে বাঁচিয়ে তুলেই পরের দিন খুন করি। রবীন্দ্রনাথ যে যান্ত্রিক জেলখানা মাফিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে শান্তিনিকেতনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশুবলি দিচ্ছি সাহেবদের পরিত্যক্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। আমাদের কোনো অধিকারই নেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করার, অন্তত স্কুল কলেজে।

আর যায় কোথায়, ছাত্ররা যেমন হাততালি দিয়ে উঠলো, আমন্ত্রিত সভাপতি এক বিখ্যাত বাংলার অধ্যাপক ঘাড়ের চাদর রাগতভাবে ঠিক করতে করতে উঠে পড়লেন। তার সঙ্গে উঠে পড়লেন আরো অনেকে। 'তাড়া আছে' এই বলে সভাস্থল ত্যাগ করলেন তাঁরা। বিতর্কসভা না হলে বোধহয়, বাকযুদ্ধের বদলে সেদিন হাতাহাতিই হত। পরে

হেডমাস্টারকে হাতজোড় করে ম্যানেজমেন্ট ও শিক্ষক প্রতিনিধির কাছে বলতে হয়েছিল, মানুষটা সত্যিই একজন স্কলার, আর অনেস্ট। মানছি, ওঁর কথাগুলো সবসময় মানা যায় না। আর তো কটা বছর আছেন। একটু সহ্য করুন আপনারা। তারপর থেকে সত্যবাবুকে সবাই শুধু সহ্য করেই চলেছে। আর কয়েকটা বছর মাত্র, তারপর ঘটা করে তাঁকে বিদায় জানানো হবে। এর মধ্যেই এসে পড়লো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর। ভাবতে হলো সত্যবাবুকে এই উৎসবে এমন ভূমিকা দেওয়া যাক যেখানে তাঁর মুখ বন্ধ থাকে। হেডমাস্টার বললেন, উনি নাটক করুন। তবে এমন নাটক যাতে খরচ কম হয়। সত্যবাবুও এমন নাটক লিখলেন যার জন্য মঞ্চসজ্জা বা কসটিউমের তেমন খরচা না লাগে। কার্জন পার্কে এককালে যেরকম নাটক হতো সেই ধাঁচে নাটক লিখেছেন তিনি। শুধু বলেছেন, মঞ্চের সামনে ও দর্শকের মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা রাখতে হবে, যাতে সেখানেও অভিনয় করা যায়।

কিন্তু হেডমাস্টার একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, সত্যবাবু, একবার দেখতে দিন ছেলেরা কেমন অভিনয় করছে।

সত্যবাবু বুঝলেন, এটা ঘুরিয়ে পরখ করে দেখা নাটকে আপত্তিকর আছে কিনা। তিনি হেসে বললেন, স্যার, আজই আসুন না। হেডমাস্টার কিছুক্ষণ নাটকটা দেখে আপত্তিকর কিছু পান নি। বরং বেশ মজা পেলেন। পাকা হাতের কাজ। অন্যান্য শিক্ষকদের বললেন, আপনাদের ভয় নেই। দেশের দুর্নীতি নিয়ে একটু আধটু ব্যঙ্গ আছে, তবে কোনো গল্প খুঁজে পেলাম না। ঐ যে আজকালকার যেসব উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্টাল নাটক হয়, সেইরকম।

হেডমাস্টারের ভয় স্কুলের সভাপতিকে নিয়ে। তিনি সত্যবাবুর ব্যবহারে মোটেই প্রসন্ন নন। স্থানীয় এম এল এ-ও তাঁর কাছে অনেকবার অনুযোগ করেছেন— ভদ্রলোক ম্যানার্স জানেন না। আমার পার্টির ছেলেদের সামনে বলে বসলেন, মানুষের বিপদে আপদে আপনাদের মুখ দেখা যায় না কেন বলুন তো?

ঘটনাটা ঘটেছিল গতবছর বর্ষায়। ক্ষুদিরাম কলোনি জলে ডুবে ছিল ক'দিন। সত্যবাবু পাড়ার ছেলেদের নিয়ে রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তা নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলই আপত্তি করেছিল। তাদের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ কেন? সত্যবাবু চোখে মুখে ভয়ংকর অবজ্ঞা ফুটিয়ে বলেছিলেন, কোথায় ছিলে এই তিনদিন? কোথায় তোমাদের নেতা?

নেতা সপরিবারে দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেই তলব করেছিলেন সত্যবাবুকে।

আপনি নিজেকে কি ভেবেছেন বলুন তো? আপনার মুখে যা মানায় না তাই বলতে শুরু করেছেন?

সত্যবাবু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলেছিলেন, সেই বেমানান কথাটাই আবার বলছি, মানুষের বিপদে আপনাদের মুখ দেখা যায় না কেন? আজ এতদিন পরেও আপনি একবার যেতে পারলেন না...

সত্যবাবুর কথা শেষ না হতেই একজন তাগড়াই চেহারার লোক ভুরু কুঁচকে এগিয়ে এসে সত্যবাবুর পিঠে হাত রেখে আস্তে করে বললো, একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না মাস্টার মশাই?

নেতা রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, যান, বাড়ি যান। ক্ষুদিরাম কলোনিতে আপনাকে যেন আর দেখা না যায়।

এরপর সেই লোকটা সত্যবাবুকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে— একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে, সব জায়গায় মাস্টারি চালাবেন না স্যার।

ব্যাপারটা শুনে হেডমাস্টার সত্যবাবুকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, সত্যবাবু, হোয়াই ইনভাইট ট্রাব্‌ল? আপনি একা লড়াই করে পারবেন? আপনার অবশ্য সংসার নেই, চাকরি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি। কিন্তু আমার তো সংসার আছে। সবাই জানে আপনাকে আমি রেসপেক্ট করি। প্লিজ এমন কিছু করবেন না যাতে আমার একটা বিপদ হয়। তারপর থেকেই সত্যবাবু কেমন চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর কথা কমে এলো। ছুটি নিয়ে ঝোলা কাঁধে কোথায় গেলেন কেউ জানতে পারলো না। যখন ফিরে এলেন তখন যেন অন্য মানুষ— বুক পর্যন্ত দাড়ি, গোঁফ আর লম্বা চুলে পুরো দস্তুর এক সন্ন্যাসী। দেখে মনে হয় যেন সেই কটুভঙ্গি বদরাগি বিদ্রোহী মানুষটির চরম রূপান্তর ঘটে গেছে। যাঁরা ভেবে রেখেছিলেন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসরের অনুষ্ঠানে তাঁকে কোনো অংশ নিতে দেওয়া হবে না, তাঁরাও এই অনুতপ্ত মানুষটির প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতি না দেখিয়ে পারলেন না। তবে পুরনো অবিশ্বাস তো সহজে যাবার নয়, তাই সিদ্ধান্ত হলো নাটকের দায়িত্ব দিয়ে সত্যবাবুকে ঠেকিয়ে রাখাই ভালো হবে। সত্যবাবুও মেনে নিয়েছেন এই এক কোণে পড়ে থাকার নির্দেশ। আর তো মাত্র কটা বছর, তারপরেই তো অন্তহীন অবসর।

১৫ই আগস্টের সকাল আটটায় যোগেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনের উঠোনে ব্যাণ্ডের আবহসঙ্গীত সহযোগে তেরঙা পতাকার উত্তোলন করলেন জনপ্রিয় বিধায়ক মহাশয়। পতাকার সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কায়দায় ছেলেরা দেখালো কুচকাওয়াজ। অঘোরবাবুর ছেলের দল গলা ছেড়ে গাইলো 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'। তারপর বক্তৃতার পালা। প্রথমেই সভাপতি মহাশয়, তারপর জজসাহেব, তারপর ও সি। হাজার হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি সব বক্তার মুখে। প্রথম বক্তৃতা— স্বাধীনতা এনেছে দেশের জনসাধারণ, অথচ তারা কী পেয়েছে? এবার গান। বক্তৃতা নং ২— আমরা জনতার সেবক— জনতা যেদিন চাইবে না সেদিন আমরা থাকবো না। এরপর আবৃত্তি। বক্তৃতা নং ৩— জনসাধারণের অধিকার রক্ষাই স্বাধীনতার প্রকৃত রূপায়ণ। আবার গান। বক্তৃতা নং ৪— বৃটিশের পুলিশ ভারতীয়দের মানুষ বলে গণ্য করতো না, আমরা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বন্দে মাতরম।

এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শেষ।

জলযোগের পর দ্বিতীয় পর্ব। এবারে নাটক। মাইকে ঘোষণা— নাটক, 'জনতার সন্ধানে'।

সবাইকে চমকে দিয়ে খোলা মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সত্যব্রত বাবু, কেননা তিনি যে নিজে অভিনয় করবেন তা কেউ জানতো না। তাঁর পরনে কয়েদির পোশাক।

— নমস্কার। আজকের নাটক, 'জনতার সন্ধানে'। জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে তাঁরা যে আমাকে এমন একটা নাটক পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন এজন্য আমি কৃতার্থ। আজ আমি জেলবন্দি। আমাকে রাখা হয়েছে

পাগলদের জেলে। আমি দেখেছি ওখানে অধিকাংশই আসলে ছিল ভবঘুরে বা ভিখিরি। পাগলদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমরা আধপাগল হয়ে উঠেছি। এই নাটকটা একজনের লেখা নয়, আমরা সবাই মিলে লিখেছি। আমরা সবাই মিলে ভেবে দেখেছি—

তাঁর কথা শেষ না হতেই কয়েকজন ছেলে (কয়েদির পোশাকে) দর্শকদের নানান জায়গা থেকে গুঞ্জন ধ্বনি তোলে— জনগণ হারিয়ে গেছে। জনসাধারণ নিরুদ্দেশ। জনতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গুঞ্জন ক্রমশ উচ্চগ্রামে ওঠে। ছেলেরা দর্শকদের কানের কাছে আবার গলা নামিয়ে একই কথা বলে— জনগণ হারিয়ে গেছে। জনসাধারণ নিরুদ্দেশ। জনতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সভাপতি, এম এল এ, জজসাহেব, ওসি প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে তারা পাগলের মত বিড়বিড় করে। ভি আই পিরা কি করবে ভেবে পান না, কোনোক্রমে নিজেদের গাম্ভীর্য বজায় রাখেন।

ইতিমধ্যে সত্যবাবু একটা হুইসেল বাজান। ছেলেগুলো ছুটে মঞ্চে গিয়ে মূর্তির মত সারি দিয়ে দাঁড়ায়। দুজন মঞ্চের মাঝখানে পিঠে পিঠ দিয়ে উইংগসের দুদিকে মুখ করে দাঁড়ায়। মঞ্চের কোণে তিনটে চেয়ারে আঁটা তিনটি লাঠির ওপর একটি গান্ধীটুপি, একটি মুসলমানি ফেজটুপি, এবং তৃতীয়টি একটি সাহেবি হ্যাট। তিনটে ছেলে এসে চেয়ার তিনটিতে বসে। একটা বড় পাত্রে একটা মস্ত কেক রাখা হয় সামনের টেবিলে। সাহেবের হ্যাট পরে যে সে ছুরি দিয়ে কেক কাটতে গেলে গান্ধীটুপি পরা ছেলেটি জোরে মাথা নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের এক কোন থেকে ধ্বনি ওঠে 'বন্দে মাতরম'। আবার সাহেবটি কেক কাটতে গেলে মুসলমান টুপি প্রতিবাদ জানায়, মঞ্চের অন্য কোন থেকে আওয়াজ ওঠে 'আল্লাহ্ আকবর'। বারবার এই ঘটনাটা ঘটে, তারপর শুরু হয় দাঙ্গা এবং তিন টুপিধারী ব্যক্তির কোলাকুলি ও করমর্দন। এরপর সাহেবটি তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে মঞ্চে যেখানে দুটি ছেলে পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা হুইসেল বাজে। গান্ধীটুপি ও ফেজটুপি টানাটানি করে দুটি ছেলেকে আলাদা করে নাচানাচি শুরু করে দেয়।

দর্শকদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল তাঁরা তারিফ করে নানান মন্তব্য করেন। ভি আই পিরাও উপভোগ করেন। কিন্তু তারপরই সত্যবাবু ঢোকেন একটা খবরের কাগজ হাতে। তিনি পড়তে থাকেন— ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় বাজারে সর্বাধিক বিক্রীত বস্তু হল টুপি। টুপি ভর্তি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে একজন ফেরিওয়ালা হাঁক ছাড়ে— টুপি, টুপি চাই। সবাই টুপি কিনতে ঠেলাঠেলি করে— কোনোটা লাল, কোনোটা গেরুয়া, কোনোটা সবুজ, কোনোটা বেগুনি। টুপি পরে সবাই হাতে হাত রেখে কানে কানে কি সব বলে চলে। সত্যবাবু একটা বাঁশি বাজান। সবাই ঘুরতে থাকে। মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলা। প্রথমবার সাদা টুপি জেতে, পরের বার গেরুয়া, তারপর সবুজ, লাল। প্রত্যেকেই চেয়ারে বসে বলে— আমি জনগণের নামে শপথ নিচ্ছি ইত্যাদি। কিছু ছেলে জনগণের ভূমিকায় হাততালি দেয়, তারপর হামাগুড়ি দিতে দিতে টুপিধারীকে প্রদক্ষিণ করে। তাদের আশীর্বাদ করে প্রত্যেককে গাধার টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়।

এবারে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া একটু অন্যরকমের হয়। প্রগতিবাদীদের ভুরু ক্রমশ কুঞ্চিত হয়। ভি আই পিরা কানে কানে অনেক কিছু বলেন। একজন বলেই ওঠেন, এটা কি নাটক? না আছে গল্প, না আছে ডায়লগ।' হেডমাস্টার আশ্বস্ত করেন, এরপর ডায়লগ আছে।

সত্যবাবু এবারে পাগলের ভূমিকায়। রাস্তায় লোক ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা বলতে পারেন জনতাকে কোথায় পাই? মানে, যাকে বলে জনসাধারণ।

— সে তো সবখানেই আছে।

— না, নেই। খুঁজে পাচ্ছি না।

— ঐ দেখুন না।

কিছু লোক 'ভোট দিন ভোট দিন' বলে মিছিল করে চলে যায়। সত্যবাবু ওদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন, 'ওরা না, ওরা না। আমি আসল জনতা চাইছি।'

সভাপতি হেডমাস্টারকে ডেকে কী সব বলেন। দর্শকদের মধ্যে নানান গুঞ্জন। ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল।

মঞ্চে এক ভদ্রলোক সত্যবাবুকে সমর্থন করে বললেন, 'সত্যি বলেছেন। সব কটা ভণ্ড। জনতার কথা কেউ ভাবে না। এই দেখুন কতক্ষণ বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন গিয়ে বাবুরা আড্ডা দিচ্ছে। সরকারি বাস তো।

এরপর ভিড়ে ঠাসা একটা বাস— অভিনেতাদের শরীর দিয়ে তৈরি। সত্যবাবু ও ভদ্রলোক উঠে পড়েন। এবারে ভদ্রলোকের অফিস। তিনি একটা চেয়ারে চাদর রেখে উধাও হয়ে গেলেন। কাউন্টারে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজন চেঁচিয়ে বলে— দেখছেন কাণ্ডটা? আমাদের কি কাজ নেই? পাবলিক সার্ভিস বলে কিছু নেই?

সত্যবাবু ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনিই সেই বাসটার ড্রাইভার না, যেটায় আমি ছিলাম? সে বাসটাও কিন্তু অনেক দেরিতে ছেড়েছিল।

আর এক ভদ্রলোক সত্যবাবুকে সমর্থন করেন। এবার তাঁকে অনুসরণ করেন সত্যবাবু। এবারে হাসপাতালের এমার্জেন্সি। একজন রোগী কাতরাচ্ছে। আত্মীয়রা উত্তেজিত। ডাক্তারবাবু এলেন যখন তখন রোগী মারা গেছে। ইনিই সেই ভদ্রলোক যাঁকে সত্যবাবু এতক্ষণ অনুসরণ করেছেন।

সত্যবাবু হা হা করে হাসে— নেই নেই জনতা নেই। সবাই জনতার কথা বলে। কেউ জনতার হয়ে কাজ করে না। তাহলে কি দাঁড়ালো? জনতা বলে কিছু নেই? ওটা একটা ছুতো, কথার কথা? যদি জনতা বলে কিছু থাকে তবে এসব চলতো? হঠাৎ গোলমাল। হাসপাতালের ডাক্তার স্টাফদের মারধর করছে মৃত আত্মীয়ের লোকজন।

সত্যবাবু— না,না, এ সে জনতা নয়। ওরা নিজের লোক মারা গেছে বলে এরকম করছে। অন্য কেউ মারা গেলে ওরা চুপ-করে থাকবে। নিজের জন্য যারা শুধু ভাবে তারা কি জনতা?

এইভাবে নানান টুকরো টুকরো দৃশ্যের মাধ্যমে দেখানো হয় চারপাশে ভিড় আছে, জনতা নেই, তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ আছে, সংগঠিত প্রতিবাদ নেই, দুর্নীতির সমালোচনা আছে, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ ভোট পেয়ে জিতে যায়, ট্র্যাফিক পুলিশের দুটাকা ঘুষ ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে কোটি কোটি টাকা ঘুষ হয়ে যায় ওপর মহলে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে বন্যাপীড়িত মানুষ রুখে দাঁড়ায় যখন জনপ্রতিনিধিরা এসে নানান পরিকল্পনার কথা শোনাতে থাকে। এতদিন কোথায় ছিলেন? আর কতদিন শুধু কথা দিয়ে চিড়ে ভিজবে? যে লোকটি এই কথাগুলো চেঁচিয়ে বলে তাকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। লোকটি অর্থাৎ সত্যবাবু একটা কাল্পনিক গরাদ ধরে চেঁচিয়ে বলে— আমি পাগল নই। এই ছেলেগুলোও পাগল নয়। আমরা অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন প্রকৃত জনতা হয়ে উঠছি। ছেলেগুলোও পেছন থেকে দর্শকদের মধ্যে নেমে

এসে কানে কানে বলে ওঠে, জনতা বাইরে নেই, জনতা আমাদের ভেতরে। জনতা নিরুদ্দেশ হয়নি, ঘুমিয়ে ছিল, অবশ হয়েছিল। আপনি জনতা, আমি জনতা— বুকে হাত দিয়ে শুনুন এই ডাকটা। এটাই স্বাধীনতা— জনগণ মানেই প্রকৃত স্বাধীনতা।

নাটক শেষ হতেই গম্ভীর মুখে সভাপতি, এম এল এ ও অন্যান্য ভি আই পিরা হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকে যান। সত্যবাবুকে ডাকা হয়। হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে আনা হয় চক্রান্তের অভিযোগ।

এম এল এ মহাশয় ফুঁসে ওঠেন, অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছি, তবু আপনি ওতেই মদত দিয়ে গেছেন। আজ স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে এইভাবে অপমান? তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে এক বছর আগের সেই দিনটার কথা যখন সত্যবাবু তাঁকে পার্টির ছেলেদের সামনে অপমান করেছিলেন বিপন্ন মানুষের পক্ষ নিয়ে। সত্যবাবুকে শাসানো হয়েছিল। আজ তারই প্রতিশোধ নিলেন তিনি।

বলির পাঁঠার মত হেডমাস্টার করুণ চোখে সত্যবাবুর দিকে একবার তাকালেন, যেন বলতে চাইছেন, আপনি কথা রাখলেন না।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সত্যবাবু নাটকের ঐ পাগলটার মতই (কেননা এখনও তার পরনে কয়েদির পোশাক) চেঁচিয়ে উঠলেন,'উনি নির্দোষ। ওঁকে অযথা শাসাচ্ছেন কেন? অপরাধী আমি। শাস্তি আমাকে দিন। তবে সে শাস্তি আমি আগেই নিয়ে নিচ্ছি! এই বলে তিনি একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন— তাঁর পদত্যাগপত্র। তারপর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। থানার ও সি বলে উঠলেন, 'স্বাধীনতা নিয়ে আপনি যা করলেন তাতে আপনাকে জেলে দেওয়া উচিত, বুঝলেন?'

সত্যবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কয়েদির পোশাকটার ওপর হাত রেখে বললেন— আমি তো প্রস্তুত, পোশাকটা দেখতে পাচ্ছেন না?

শেষ রাতের ট্রেন

পীযূষ ভট্টাচার্য

সিংহ রাশির যা সংজ্ঞা, সেই সব কথা এখানে প্রযোজ্য নয়। হিসাব মতন সিংহ দু'ভাগের। এক ভাগ বন্য, স্বাভাবিক। অন্যভাগ, গৃহপালিত; ছাগলের মতন খুঁটি পুঁতে বাঁধা থাকে। ঘাস খায়। সত্যেন শেষোক্ত সম্প্রদায়ের। এই উপলব্ধিতে আসতে তার সাত বছর সময় লেগেছে। খুব ধীরে ধীরে চিন্তাটি সময়ে অসময়ে রক্তের ভিতর ঝাঁকি দিত প্রথম প্রথম। তারপর রক্তের সাথে মিশে যায়। যদিও সমগ্র ব্যাপারটি খুবই আধুনিক ও লক্ষণীয়। জেল থেকে নিঃসর্ত মুক্তি, চাকরী, বিবাহ এবং সর্বোপরি আট শতকের উপর নিজস্ব বাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে যে পূর্ণতা এসেছে তারই একটি পরিতৃপ্ত দিনে সত্যেন বসে আছে। এই নির্জনতা তার এখন প্রাপ্য। সত্তর-বাহাত্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম যার পরিসমাপ্তি ঘটে তিন বছর বিনা বিচারের আটকে; এবম্বিধ কারণেই একান্ত নিজস্ব নির্জনতা উপভোগের স্বাধিকার সে অর্জন করেছে বলে সত্যেনের ধারণা।

এতক্ষণ আকাশে এক টুকরো মেঘ ছিল, তারই ছায়া সামনের মাঠের উপর হামাগুড়ি দিয়ে তাকে স্পর্শ করে আরও পিছনে চলে যায়। সে আরও ঘন হয়ে নাইট কুইন গাছটির কাছে বসে। নাইট কুইনের কলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ফুলের প্রস্ফুটিত হ'বার প্রতিটি মুহূর্তকে সে দেখতে চায়। চাপা মিষ্টি গন্ধ, তার বাড়ি। বাড়ির সংলগ্ন ছোট্ট বাগান সর্বোপরি তাকে আপ্লুত করে এক সময় সেই গন্ধ মাথার ভিতর ঝিম্‌নি মেরে থম্ ধরে। এক-একজন চাষী মানুষের শরীর থেকে নির্দিষ্ট ফসলের ও বীজের গন্ধ বের হ'তো, অনেকটা বিকিরণের মত; এই বিকিরণ অনেকটা আলোর মত। সেই আলোর বর্ণ-ছটায় সত্যেন সেই মানুষগুলোকে চিহ্নিত ক'রত। আজ সেই সব পরিশ্রমী, রাগী অথচ নিপাট সরলতাবদ্ধ মুখ তার চোখের সামনে ছায়া ছায়া অস্পষ্ট ভাবে চলে যায়। নির্জন বাড়িতে এইসব পীড়িত স্মৃতি সিদ্ধান্ত করে, 'ফসলের প্রতি ভালবাসাই মরণ'! নাম আজ মনে নেই তাদের, মুখ চেনা হয়ে আছে, সেই হেতু পরিবেশ কিছু ভৌতিক। ততক্ষণে নাইট কুইনের কলি মুখ আল্‌গা করে জ্যোৎস্না পান করে। বারংবার তার একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়, তার স্মৃতি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে না, মধ্যরাতে পূর্ণচাঁদের প্রতি কুকুর যেমন অহেতুক ছোটে, ঠিক সেইভাবে ছুটতে থাকে।

কিন্তু এক সময় সত্যেন সাবধান হয়, চেয়ার টেনে নিয়ে একেবারে ফুলের সামনে বসে। একাগ্র হয়ে ফুলের পাপড়ি মেলার যন্ত্রণাসুখ দেখতে থাকে। অনুভব করতে থাকে নির্জনতাকে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়, এই রকম একটি চরম মুহূর্তে। খুব চাপা স্বরে সত্যেনের নাম ধরে ডাকে। কে হ'তে পারে এত রাত্রিতে! চিন্তা ও অন্যমনস্কতার অবকাশে ফুল সম্পূর্ণ ফোটে। সে দরজা খুলে, নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ মানুষটাকে দেখে। ফুলের মাদকতা অথবা ঘটনার আকস্মিকতায় সত্যেন'কে একটি বাকরুদ্ধ পরিবেশে স্থাপন করে, সে কিছু না বলে মাথা নীচু করে। এভাবে কিম্বা অন্যভাবে কোনদিন যে নরেশ সরকারের সাথে দেখা হবে সত্যেন ভাবেনি। কিন্তু নরেশ সরকার স্বস্তিদায়ক উষ্ণতা নিয়ে বললো— কী, ভূত দেখছিস নাকি?

ঘরে বসিয়ে, সত্যেন ভিতরে যায়। ঘুরে এসে বলে— নরেশদা হাতমুখ ধুয়ে নিন, কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি।

নরেশ সরকার চোখ বুজে বসে ছিলো। জ্যোৎস্নায় চোখের বসা কোল, হনু'র গর্তে ছায়া ছায়া ভাব। সব মিলিয়ে তাকে বড় ক্লান্ত দেখায়। সত্যেনের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে, স্মিত হেসে হাত তুলে সতোনকে নিষেধ করে। বলে, বস্ গল্প করি। শেষ রাতে ট্রেন দেরী আছে, তুইও ঘুমাসনি দেখলাম, তাই চলে এলাম। একথা শোনার পর সত্যেন স্বস্তিই অনুভব করলো! এবং এই পরিস্থিতিতে কিভাবে মাথা উঁচু করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চিন্তায় তাড়িত হ'তে হ'তে প্রথম দেখার যে ভীতি ও বিস্ময়ের অনুভূতিটা ছিলো, উবে যায়।

প্রায় এক যুগ পর দেখা, সত্যেনরা সশস্ত্র সংগ্রাম করছিল তখনই শেষ দু'একবার দেখা হয়েছে। মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আশ্রয় দিয়েছে, ঝুঁকি নিয়েছে। তখন একটি কথা নরেশ সরকার প্রায়ই বলতো—'আমার জন্ম ও পার্টির জন্ম একই সনে...' সে কথা কি এখনও বলে! বার তের বছরে অনেক পরিবর্তন, চিন্তার অনেকডিগবাজী। তা সত্ত্বেও নরেশ সরকারকে উষ্ণ ও জীবন্ত আত্মবিশ্বাসের নিদর্শন বলে মনে হ'লো সত্যেনের।

সত্যেন একই সঙ্গে দুটি জগতেই বাস করে। একটি তার নিতান্তই নিজস্ব, সেই নিজস্ব ধাঁচের জীবনের নাইট কুইনের গন্ধ বাতাসের একটি স্তরে বিদ্যমান। গত বছর নোনা গাছটি এতদিন পর কাঙ্খিত একটি রাত্রি উপহার দিচ্ছে, এ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়াটাও নিজস্বতা, এবং এখন নরেশ সরকারের উপস্থিতিতে বিচলিত হওয়াটাও নিজস্ব জগতে দেখা-শোনা-উপলব্ধির নামান্তর। অপর একটি যে জগত আছে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হ'তে হ'তে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে—এই জগতটি কোনদিন ছিল না বা থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সে এখন নরেশ সরকারের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে হবে এবং তা কি কথা দিয়ে শুরু করবে স্থির করতে না পেরে বলে— কেমন আছেন?

নরেশ সরকার হাসলে পর, হাসির কারুকাজ বহুক্ষণ পর্যন্ত মুখে লেগে থাকে, আজও সে সত্যেনের কথা শোনার পর হাসে। যখন সত্যেনরা প্রথম নরেশ সরকারের কাছে যায়, তখন হোমিওপ্যাথি, ডিস্পেনসারী খুলে বসেছিল গ্রামে। এই রকম হেসেই অভ্যর্থনা করেছিল। সব শুনেটুনে বলেছিলো, সিদ্ধান্ত ত' নেওয়াই হয়ে গেছে দেখছি, বিশ্বাস যখন আছে তখন তাই কর। একটু থেমে আবার বলেছিলে, আমরা তেভাগা করেছিলাম, মানুষ চাইতো বলে, মানুষ যদি চায় তবে তোরা কর।

—আপনি?

—মানুষ যদি চায় তবে আমিও আছি।

ঠিক হুবহু মনে নেই তবে এই ধরণের কথাবার্তা হয়েছিল। তর্ক হয়েছিল। তাত্ত্বিক আলোচনাও হয়েছিল। যদি নরেশ সরকার এখন বলে ওঠে—"সত্যেন মানুষ চাইছে, চল্।" সত্যেন কি যাবে? যে অবলম্বন ধরে এই সাত বছর সে সাঁতার কাটছে, সেই অবলম্বন যেন ক্রমশঃ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে, অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, কখনও ভেসে উঠছে। এই রকম ভারসাম্যহীন মুহূর্তে সে নাইট কুইনের গন্ধকে অবলম্বন করতে চাইলো। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে গন্ধ অনুভবে অপারগ হয়। অত্যন্ত অসহায় ভাবে নরেশ সরকারের দিকে তাকায়। দেখে, নরেশ সরকারের চোখ দুটো হাসছে।

জেলখানায় সময় ভিন্ন অন্যকিছুর দারুণ অভাব, কোনকিছুই তাড়াতাড়ি হয় না। সেই রকম নিয়নে, কথা এগোয় না, একসময় ট্রেনের সময় হয়ে যায়। নরেশ সরকার হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বলে, চলি। সত্যেন পায়ে পায়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে না, কোথায় যাচ্ছেন বা কোথায় এসেছিলেন।

শেষ রাতের ট্রেনের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে সত্যেন অপেক্ষা করে। এক সময় শব্দ শুনে আশ্বস্ত হয়, পরমুহূর্তে মনে হয় আরও একটি ট্রেন আসছে। তখন রমা'র কথা ভীষণ মনে পড়ে। রমা এখানে নেই, জলপাইগুড়িতে। আর মেয়েরা এ সময়ে বাপের বাড়িতে থাকে সাধারণত। রমা তার স্ত্রী। এই রকম অবস্থার মধ্যেই একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ডাকাডাকির পর অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, ঘুম জড়ানো চোখে দেখে পুলিশের লোকজন। বিভ্রান্ত তবুও সপ্রতিভ হবার চেষ্টায় তৎপর হয় সত্যেন। পুলিশ অফিসারকে ঘরে ডেকে বসায়। মুখ আটকানো পেস্টের টিউবে চাপ দিয়ে বসে নার্ভাস অবস্থায়, এবং চোখাচোখি হয় পুলিশ অফিসারের সাথে।

— ও কিছু নয়। শুধু একটা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা।

যখন থানায় ঢোকে, দেখে কনেস্টবল থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে তটস্থ ভাব। অর্থাৎ ওপরওয়ালার উপস্থিতি। এসব ভেবে মুখের ভিতর তেতো হয়, তখনই মনে পড়ে গত রাতে ফুল ফোটার উত্তেজনায় কিছু খাওয়া হয়নি। ওকে বসিয়ে থানা-অফিসার চলে যায়। অনেকক্ষণ পর অন্য একজন ডেকে নিয়ে একটি ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। সে ঘরে ঢুকে, দেখে, টেকো গোছের একটি লোক প্রচুর অভিজ্ঞতার ছাপ নিয়ে বসে আছে। মুখে একটুকরো পেশাদারী হাসি ঝুলছে।

— বসুন।

তারপরই খুব আন্তরিকতার সুরে বলে, দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঘাবড়ান নি।

সত্যেন কোন উত্তর দেয় না, শুধু হাসার চেষ্টা করে মাত্র। চেয়ারে বসা লোকটি আবার বলে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ আপনার সহযোগিতা চায়।

বিগত দিনে এদের অনেক প্রশ্ন, কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সৃষ্ট ফাঁদ কৌশলে এড়িয়ে গেছে সত্যেন। গোটা দুনিয়া গোল্লায় গেলেও সে উত্তেজিত না হবার প্রতিজ্ঞা করে। যদিও সেদিনের মনোবল ফিরে পাওয়া দুষ্কর তবুও তাকে চেষ্টা করতে হবে, ভেঙ্গে পড়বার পূর্বমুহূর্তে সে স্থির করে; বলে, — কি করতে হবে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি এ ধরণের উত্তর আশা করেনি। তাই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত সত্যেনকে তাকিয়ে দেখে। তারপর কয়েকটি ছবি নাড়াচাড়া ক'রে তাস বাঁটার ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ একটি ছবিকে দেখে সত্যেনের দিকে এগিয়ে দেয়। — চেনেন তো!

সত্যেন দেখে, নরেশ সরকার ও তার ছবি। সে অবশ্য এখন নেই, পাশাপাশি ছিল, তার অংশটি কেটে নেওয়া হয়েছে। তার শীর্ণ হাতখানা শুধু নরেশ সরকারের কোলের উপর আছে। এ ছবি তো কোথাও যাবার নয়। সেই আত্মগোপনের সময় তোলা। সে পরিষ্কার দেখতে পায় রাতের পর রাত জেগে নরেশদা তার চিকিৎসা করছেন, সেবা করছেন। যখন সে সুস্থ হয়ে ওঠে খবর পাঠিয়ে অন্যান্যদের ডেকে এনে সত্যেনকে নিয়ে যেতে বলে। সুধেন্দু তুলেছিল ছবিটা। পরে যখন ইতিহাস লেখা হবে নরেশদা, তখন ডকুমেন্ট হিসাবে লাগবে। ছবিতে এখন সত্যেন নেই, সে বাতিল—ভোগে। কিন্তু সত্যেনের জীবনে আরও একবার ভয়াবহ সংকটকাল উপস্থিত, এই উদ্বেগ ঢাকবার জন্য সে ঝুঁকে পড়ে ছবিটির উপর। এবং 'নম্র ব্যক্তিরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী' এই রকম একটি কথার প্রচলন আছে, তার মনে হয়, সে খুব নম্র ভাবে মাথা নাড়ে। যার অর্থ চিনি।

— আমাদের কাছে খবর, নরেশবাবু এখন এই অঞ্চলে।

-- নরেশ সরকার কোনদিন আমাদের ছিলো না।

— অ্যাঁ, জানি। সেটাই ভাববার বিষয়। তেভাগায় ছিলো, ধরা পড়েনি। পার্টি ফার্টি করত। ব্যাস এই পর্যন্ত খবর আছে। এখন আর কোন খবর নেই। খবর আমরা পাচ্ছি না। হোয়ার এ্যাবাউটস্ জানা— এই আর কি।

— কি করতে হবে আমাকে?

আমাদের ফাইলে, আপনার বুদ্ধিমত্তা, আই. কিউ. সবই নোট করা আছে।

এই বলে কয়েকটি কাগজ মেলে ধরে। সত্যেন বোঝে, ফাইল দেখিয়ে চাপ দিচ্ছে। আরও বোঝবার চেষ্টা করে এরা কি ধরণের কাজ চাইছে। সঠিক কি চাইছে।

কথার পূর্বসম্বন্ধ করে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার বলে, আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন, আপনাকে কি করতে হবে। লোকটা যখন এ অঞ্চলে আছে তখন আপনার কাছে আসতে পারে। একটু সহযোগিতা করবেন।

এই রকম আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এদের ধূর্ততা পরিমাপ করতে পারে না সত্যেন। 'যাই হোক' 'চেষ্টা করবো' এই রকম গোছের একটা কিছু আপাতত বলা যেতে পারে। আর এই বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করবার সংসাহস তার আজ নেই।

সত্যেনের কাছ থেকে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার হাত বাড়িয়ে দেয়। সত্যেনও অনেকটা যন্ত্রচালিত মতন হাত বাড়ায়।

বাইরে আসার পর সত্যেনের মনে হয়, এরা সবই জানে। গত রাতে যে নরেশদা বাড়িতে এসেছিলো তাও জানে। ভীষণ একটি আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে। তথাপি এরই মধ্যে সে ভাবে 'বিশ্বাসঘাতকতা করিনি' বা 'গতরাতের কথা বলিনি।' কিন্তু পরমুহূর্তে গত রাতের কথা না বলার মধ্যে যে চাতুরী অর্থাৎ নিজস্ব নিরাপত্তার প্রশ্নে গুহ্য তথ্যটি আরও প্রকট ভাবে তাকে তাড়িত করে। মুখ আবার তেতো হয়ে বমি হয় কিছুটা। থানার বাইরে ফাঁকা মতন জায়গা দেখে কিছুক্ষণ বসে। তখনই মনে হয় গত রাতে নাইটকুইনের জন্য কিছু পেটে পড়েনি। সেই ফুলের গন্ধ এখনও নিশ্চই তার শরীরে লেগে আছে, এই রকম এক বিশ্বাস নিয়ে চলা শুরু করে। এবং 'সহযোগিতা' ভদ্রগোছের শব্দ উদ্ভাবনের জন্য সেই অফিসারকে ধন্যবাদ দেয় মনে মনে।

কিছুদূর যাবার পর সেই কাগজটার কথা, যা গতরাতে নরেশ সরকার রাখতে দিয়েছিল, মনে পড়ে সত্যেনের। উদভ্রান্তের মতন রাস্তার মধ্যেই জামা প্যান্টের পকেট হাতড়ায়। কোথাও নেই। ছুটতে যাবে এই রকম সময়ে তার মনে হয়; কেউ নিশ্চয় নজর করছে, ছুটলে ব্যাপারটা ঘোরালো হবে। সে মানুষের ভীড়ে মিশে বাড়ি ফেরে। দরজায় চাবি ঠিকই ঘুরিয়েছিল কিন্তু তাড়াহুড়র ফলে তালা লাগেনি। খোলা তালার দিকে তাকিয়ে, বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ হতাশায় সে সশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। যদিও ভেতরের জিনিসপত্র যথাযথ তবুও নজরে নজরে হিসাব করে দেখে কিছুক্ষণ সব ঠিক আছে কিনা। তারপর যেখানে যেখানে কাগজপত্র রাখবার জায়গা, ড্রয়ার, বাইরের আলমারী, বিছানার তল সবখানে তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কোনখানেই নেই। তখন শীতল একটা স্রোত নেমে আসতে লাগলো গলা বেয়ে, শিরদাঁড়া ছুঁয়ে তার দেহে ও হৃদপিণ্ডে প্রবাহিত রক্তস্রোতের মতোই। হঠাৎ এমন একটা পক্ষাঘাতের অনুভূতি তাকে চেপে ধরলো যে, ভয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেললো।

হঠাৎই সে রেগে উঠল— অতীতের দিকে ছুটে চললো তার চিন্তা। ঝুঁকি নিলো কাগজটিকে আরও একবার খোঁজবার। দরজা বন্ধ করে খুঁজতে শুরু করলো। নেই। কোনখানেই নেই। কিন্তু যে বিশ্বাসে সেদিন সে রাস্তায় নেমেছিল তা সবগুলিই আছে। বিশ্বাসগুলোকে এক ধারে রাখতে রাখতে রাস্তাটি হারিয়ে ফেলেছে সত্যেন। তখনই অফিসারের শেষ কথা— নীতি নিয়ে খুব একটা জিদ করবেন না যেন এখন, মনে পড়ে। 'জিদ' শব্দটি এই বর্তমান আবর্ত ভাঙতে সাহায্য করে। কেননা খুব ছোটবেলায় জিদ ধরলে সত্যেনের বাবা বলতেন 'সিংহ রাশির ছেলে এরকমই জেদী হয়।

মাটি কাঁপিয়ে শেষরাতের ট্রেন ছুটে চলে যায়। বন্ধ দরজার ভিতরে স্তূপীকৃত সাংসারিক স্থাবর-অস্থাবর সহকারে কেঁপে ওঠে সত্যেন। তখন সত্যেনের কেন জানি মনে হয়— 'তবে কি নরেশদা বিশ্বাস করে শেষ পর্য্যন্ত কাগজটি তাকে দেয়নি?'

বুলি তোমাকে লিখছি

সুব্রত বড়ুয়া

আমি কখনো সমুদ্রে যাই নি। সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গের বিপুল করতালির উপর ভাসতে ভাসতে কখনো সীমাহীন নীল দেখতে দেখতে নিজেকে বিস্মৃত হই নি। কখনো কখনো সাগরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে ভালো লাগত। হু-হু শব্দে ভেসে আসা বাতাসের বুকের গভীরে দাঁড়িয়ে এক-এক সময় বিহ্বল হতাম বটে কিন্তু সমুদ্রে নামতে আমার ভীষণ ভয়। আমি মাটির পৃথিবীর মানুষ— মাটির উপর যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ ভরসা থাকে। তুমি তো জানতে বুলি, আমি খুব বেশী কিছু চাই নি। চক মিলানো বাড়ি, চমৎকার গাড়ি— চকচকে মেয়েমানুষ— কোনো কিছুই ব্যাকুল হয়ে কামনা করি নি।

কিন্তু মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে কি কোনো নির্দয় সীমারেখা জোর করে টেনে দেওয়া চলে? না-কি অঙ্কের নির্ভুল হিসেবে জীবনের ছক-কাটা ঘরে সবকিছু একাকার করতে পারা যায়? হয়তো যায়, হয়তো বা যায় না। সে আমি কোনোদিন খুব বেশী করে ভেবে দেখি নি। কিংবা বলা যায়— ওই ভেবে দেখায় আমি কোনো ফল দেখতে পাই নি। অথবা দেখতে পেলেও কি।

আমি একজন সাধারণ মানুষ। অসাধারণ হবার চেষ্টা যে কখনো ছিল না— একথা ঠিক নির্দ্বিধায় বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছি না। প্রথম দিকে যখন ঠিক জীবনকে বুঝতে পারি নি, তখন আকাশকুসুম অনেক কিছুই তো ভেবেছি। ওই দেখ, কথাটা এমনভাবে বলছি, যেন জীবনকে আমি কত চিনে ফেলেছি! তুমি হলে বলতে— আহা! কত যেন ন্যাকা! ন্যাকা! ন্যাকা কথাটা তুমি খুব ব্যবহার করতে। আর বলবার সময় বাচ্চা মেয়ের মতো মাথা দুলিয়ে এমন ভাবে তাকাতে— যেন— সাংঘাতিক একটা কিছু বুঝে ফেলেছ তুমি।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তোমার মুখটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। কখনো নাক, কখনো চোখ, কখনো চিবুকের নিচে শাদা কণ্ঠ— কখনো বা এক টুকরো হাসি— অথচ সব মিলিয়ে পুরো তোমাকে একসাথে স্মরণ করতে পারছি না। এই মনে করতে না পারায় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে— মুঠোর মধ্য থেকে বিন্দু বিন্দু জল চুঁইয়ে পড়ার কষ্ট।

আজ এ মুহূর্তে পেছনে ফেলে আসা পুরো জীবনটাকে আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়। কোন পরম পুরুষের কাছ থেকে জেনে নিতে ইচ্ছে করে জীবনে যা ঘটে তার সবই কি সত্যি! নাকি কোন স্বপ্নের মধ্যে আমরা জেগে ছিলাম, আবৃত কুয়াশার অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে জেনেছিলাম।

এখানে এই সাড়ে এগারোটার দুপুর ছুঁই ছুঁই রোদ্দুর এখন বাড়ির বাইরে এক চিলতে উঠোনে গা বিছিয়ে তেজ নিচ্ছে। ঘরের ভেতর দোতলার একটা ঘরে আমি মেঝেয় শুয়ে লিখছি। কাকে? তোমাকে?

বুলি, আমার এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাহলে তুমি কি ভাববে জানি না। অথবা তুমি কিছু ভাবলে আমার কি! কারো ভাবনার মধ্যে অন্তর্গত হয়ে বেঁচে থাকায় কি সুখ! সুখ কি শুধু বোধের মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যে চোখ বুজে শুয়ে থাকা এ্যাকুইরিয়ামের সোনালি মাছ?

এখানে দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল নামে তন্ময়। কাছের রাস্তায় গাড়ির শব্দ। সিঁড়ির পাশের ঘরে থাকি বলেই সারাক্ষণ ওঠা-নামার উড়ন্ত শব্দ ঝুলতে থাকে মগজের মধ্যে। ঘর বলতে বুঝি নিরাপদ আশ্রয়, নির্বিঘ্ন শান্তি।

তোমার ঠিক মনে আছে কিনা জানি নে— তুমি একদিন হাসতে হাসতে (মজা করে?) ঘর বাঁধার কথা বলেছিলে।

ঘর! দুপুরে কলেজের ক্লাশ পালিয়ে তোমার সেই বান্ধবীর বাসায় এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলে— জানেন, আপনার জন্য ইংরেজির ক্লাশ না করেই চলে এলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার ইংরেজির ক্লাস বিসর্জনের মতো চরম আত্মত্যাগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার উচিত ছিল কিংবা একটি দুরন্ত চুম্বন। অথচ আমি কি বোকা! বলেছিলাম— 'না এলেই পারতে।'

ততক্ষণে আমার হাতে জোরে-সোরে একটা চিমটি কেটে বলেছিলে— 'আহা!'

তোমার কথা বলার ঢং-টা আমার ভাল লাগে নি। নিজেকে ভীষণ রকম ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হচ্ছিল। কেবলই জানতে ইচ্ছে করছিল— কি এমন লাভ ওই লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা এবং অর্থহীন শব্দ ছুঁড়ে।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলাম— 'আচ্ছা বুলি! বলতে পার, এমনিভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ!'

আমার কথা শুনে তুমি অবাক হবার ভাণ করেছিলে। তোমরা— তুমি এবং তোমার মতো মেয়েরা, এত মধুর সব ভাণ করতে পার যে, আমরা যেন ওইসব দেখে-শুনে নিয়মের ঘোড়ার মতো বর্তে যাই।

অতঃপর মৃদু হেসে বলেছিলে— 'না মশাই, ঘর বাঁধার জন্যেই এতসব! আমরা ঘর বাঁধব, বাঁচব— তারপর একদিন মরে যাব। তখন থাকবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা।'

আমাদের ছেলে-মেয়েরা— একথা শুনতেই আমি চমকে তোমার দিকে চেয়েছিলাম। তুমি, চোখে চোখ পড়তেই, ঈষৎ হেসে মুখটা নিচু করেছিলে। আমি নিজের মনে হেসেছিলাম। কেন? ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা— আমাদের ছেলে-মেয়েরা কথাটা বলে তুমি সেদিন কি বোঝাতে চেয়েছিলে? কিংবা আদৌ কিছু একটা কি বোঝাতে চেয়েছিলে তুমি?

আমি কী ভেবে হেসেছিলাম। এখন আর আমার কোন কিছুই মনে পড়ছে না। আদতে সে মুহূর্তে কিছু একটা কি ভেবেছিলাম?

নিজের ভাবনাগুলোকে যদি সেলুলয়েডের ফিতের মতো কিছু একটাতে বেঁধে রাখতে পারতাম! তাহলে হয়তো একদিন ফের দেখতে গিয়ে অবাক হতাম। কত অসম্ভব অবাস্তব সব ভাবনা! মনের মধ্যে নিজের একটি ভুবন তৈরী করেছিলাম— সে আমার একান্ত নিজস্ব।

দোতলার ঘরে হাওয়া দিচ্ছে। কোন্ দিকের হাওয়া— বুঝতে পারছি না। এখানে দিক নেই— আমি চিনি না। রাস্তায় নেমে মানুষ দেখলে ভয় পাই, গাড়ি দেখলে চমকে উঠি। ভয় আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রবারের পুতুল। চলতে ফিরতে শব্দ করে— হাওয়ায় মন রাখলে যেন কান্নার শব্দ শুনি।

জীবনটা সত্যিই আশ্চর্য! বুলি, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কি আমি ভাবছি! কি ভাবছি সেটা কি নিজের কাছেও খুব বেশী স্পষ্ট? সাত সমুদ্দুর

তেরো নদীর পারে জনাকীর্ণ লণ্ডন শহরে বসে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না কি ভীষণ ভয়ংকর সময়ের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। সবকিছু কেমন যেন উল্টে গিয়ে চেনা-ভুবনের সাজানো ছবিটা হারিয়ে গেল কোথায়! কোথায়?

সাজানো বাগান হয়ে গেল এলোমেলো।

এলোমেলো! কত লক্ষ লোকের জীবন হারিয়ে গেল!

বুলি, তোমার ওই সাজানো ঘরে বসে এখন তুমি কি ভাবছ জানি না। তোমার ভাবনায় অবশ্য আমাদের কিছুই এসে যায় না। অথচ তবু ঠিক লিখতে বসে তোমার কথাই মনে পড়ল। কেন?— নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করছি। কিন্তু জবাব দেবে কে।

আমাদের সেই স্বপ্নের শহরটার কথা তোমার এখনো মনে আছে কিনা জানি না। আশৈশব সেই স্মৃতির শহরকে আমি কখনো ভুলতে পারি না।

আমি তো ভুলতেও চাই না!

পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যেয় নিজেকে ভীষণ একা লাগছিল। সারা দুপুর ঘুমোবার নাম করে বিছানায় শুয়ে বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছি। Franz Kafka-র Dairy। ঠিক ডায়েরী বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়। দিন-লিপির নির্ভেজাল সংবাদ পরিবেশন নয়। তার চেয়েও বেশী। একজন তন্নিষ্ঠ স্রষ্টার আন্তরিক প্রতিবেদন।

পড়তে পড়তে নিজের দিকে বার বার ফিরে চাইতে ইচ্ছে করে। রেডিওটা খারাপ হয়ে ছিল। টিউনিং-এর কাঁটা কেবল এক জায়গায় অনড় অচল। চালিয়ে দিলে ঢাকা-বেতারের অসহ্য কমার্শিয়াল সার্ভিস।

[এই মুহূর্তে আমার পাশে বন্ধুরা আড্ডা মারছে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে সামান্য অবসর। বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠানে মহম্মদ রফি গাইছেন — মুঝে তুম ইয়াদ আইয়ে।]

ভালো কথা! ইয়াদ আইয়ে। ইয়াদ মানে স্মরণ। স্মরণে কতজনকেই তো মনে পড়ে। কিন্তু একজনের কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে।

কে সে?

সেদিন দুপুরে কার কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়েছিল— আজ আর তা মনে নেই। মনে নেই! মাঝে মাঝে ক্যাপস্টানের প্যাকেট থেকে একটি করে সিগারেট তুলে নিয়ে দেশলাইয়ের গায়ে কাঠি ঘষি। সিগারেটের ধূসর ধোঁয়া কেমন স্বপ্নের মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। শূন্যে মিলিয়ে যায় আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

আমাদের সাধের স্বপ্নেরা এমনি করে শূন্যে শেষ হয়ে যায়।

বুলি, না আমি অনুশোচনা করছি না। যা পাবার কথা ছিল তা পাই নি বলে কপালে করাঘাত করে, দুঃখ করে লাভ কি!

সারা দুপুর এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিয়ে বিকেলে উৎকর্ণ হয়েছিলাম আইনুলের টেলিফোনের জন্যে। প্রতিদিন বিকেলে আইনুল আসত। আসার আগে টেলিফোন। আমি কাপড় পরে তৈরী থাকতাম। দরজার পর বন্ধ গেটের বাইরে গাড়ির হর্ন শুনলেই বুঝতাম আইনুল এসে গেছে। তারপর সেই চেনা গাড়ি, চেনা রাস্তা, চেনা দোকান এবং চেনা জায়গায় বসে চা খাওয়া। চা খেতে খেতে গল্প। অথবা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

বুলি, তোমার মনে পড়ে কিনা জানি না। মাঝে মাঝে দুপুরে একটা চীনা হোটেলে গিয়ে বসতাম আমরা। ছোট হোটেল। খাবারের অর্ডার দিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্প করা চলত। কাউণ্টারে বসত যে ছেলেটা সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসত। কেন? ও কি বুঝতে পেরেছিল আমরা খেতে নয় বরং গল্প করতেই আসি!

বসে বসে কথা বলতাম। কি কথা? হাজার রকমের কথা। আজ এই মুহূর্তে সে-সব কথার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না।

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। আমি কিন্তু তোমার যাবার পর কখনো কোন দিন আর ওই হোটেলে খেতে যাই নি। কখনো পাশ দিয়ে যেতে হলে ভীষণ ভয় পেতাম। নিজের সব কিছু হারিয়ে যাবার ভয়!

পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যেয় আইনুল আসে নি। টেলিফোনও করে নি। সন্ধ্যে হতেই আমি একা বেরিয়েছিলাম। সারা শহর কেমন এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে। লোকগুলোর চোখেমুখে তীব্র আশঙ্কার ছাপ। রাস্তায় নামতেই খোলা বাতাস গায়ে হাওয়া লাগিয়ে গেল।

মোড়ের দোকানটা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানী সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে খুচরো পয়সা গুণতে গুণতে বলল— 'শেখ সাহেবের সাথে মিটমাট হবে নাকি, সাব?' দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকতে গিয়ে আমি থমকে পড়েছিলাম। কি উত্তর দেব আমি! আমার নিজের তো কিছুই জানা নেই।

বললাম— দেখা যাক কি হয়!

কথাটা যেন নিজেকেই বলেছিলাম। দেখা যাক কি হয়। নেহাৎ ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে। ভাবছিলাম কোথায় যাব!

আমার আজন্ম স্মৃতির শহরটাকে ঠিক যেন চিনতে পারছিলাম না। রাস্তা ফাঁকা। কমিশনারস্ হিলটাকে বাঁয়ে রেখে ফুটপাথ দিয়ে এগোচ্ছিলাম। ডাস্টবিনের ময়লা উপচে পড়ছে একপাশে। পেচ্ছাবের গন্ধ। এক জায়গায় পানি জমে আছে। সাবধানে হাঁটছি। ডান হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছে। রাস্তার অপর পাশ দিয়ে একদল মেয়ে কথা বলতে বলতে আমাকে পেছনে রেখে বিপরীতে চলে গেল। এদের মতো অনেককেই প্রতিদিন বিকেলে হাঁটতে দেখি। জানাতখানা থেকে বেরিয়ে ওরা চলে যায়। আবার প্রতিদিন বিকেলে আসে। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে, ওই উঁচু দেয়ালটার অন্তর্গত কি এমন আছে— যেখানে ওরা প্রতিদিন আসে।

বুলি, আমার বন্ধুরা বলে— ছুঁড়িগুলো দেখতে খাসা মাইরি!

ওই দেখ, কথাটা এমনভাবে বললাম যেন এতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ-অনাগ্রহ নেই। না, তোমার কাছে সাধু সাজবার এতটুকু সদিচ্ছা আমার থাকার কথা নয়। আমি শুধু একটি কথাই বলতে পারি— আমিও তো একজন মানুষ।

রাস্তাটার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখানটায় মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারি। আর কাউকে পটাতে পারলেই সামনের ঘিঞ্জি নোংরা ছোট রেস্তোরাঁটায় বসে চা খাই।

আজ কেউ নেই। ফাঁকা জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে।

ঠিক এখানটায় এসে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। ওকে তুমি চেন বুলি। ভীষণভাবে চেন। নাম শুনলে হয়তো চমকে উঠবে। চমকে উঠে স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টিতে বলবে— এ আমি জানতাম।

কিন্তু আমি জানতাম না। অথচ ঠিক আমিই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে গেলাম ওর সাথে।

জুঁই সবই জানত। সব জেনেও সামনে বসে নিজের দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'আমার যে আর অন্য কোন উপায় নেই। আমি চেষ্টা করেছি— কিন্তু পারি নি। নিজেকে ফাঁকি দেবার সাধ্য আমার নেই।'

বুলি, আমি ওকে ফেরাতে পারি নি।

মোড়ের খালি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করলাম। বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। ভাবছিলাম জুঁইদের বাসায় যাব কিনা।

তোমার বান্ধবী জুঁই। জুঁই আমাদের সর্বকিছুই জানে বুলি, সবকিছুই জানত। আর কখনও তোমাকে নিয়ে কথা উঠলে হঠাৎ করে কেঁদে ফেলত।

সেদিন জুঁইদের বাসায় যাই নি। বাঁদিকের পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে। রেস্তোরাঁটায় ঢুকতেই দেখা পেলাম সবার। সব মক্কেলই আছে। তুমুল কথা চলছে। একদিকে বসে পড়লাম। মনে পড়ল— আমার এককাপ চা খাওয়া দরকার। বিকেলে চা না খেলে এমন মাথা ধরে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে কথার মধ্যে ডুবে গেলাম। সবাই কেমন উত্তেজিত। কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু কি। এমন কেউ কি নেই যে বলে দিতে পারে কি এমন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন এগিয়ে আসছে নির্ধারিত ট্রেনের মতো, অজগরের মতো!

নিরঞ্জন পান চিবোচ্ছিল আর কেবল বাইরে গিয়ে কি যেন দেখছিল। সামনে ওয়াসার কাজ হবে বলে রাস্তাটা খোঁড়া। জলের পাইপ লাইন বসাবার জন্যে বিরাট সব লম্বা গর্ত। অসাবধানে পেরোতে গেলেই গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে।

কোণার দিকের এক টেবিলে বসে শাহেদ, লতিফ আর হাবিব কি যেন বলছে। কি!

আগের দিন বিকেল থেকেই সারা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। রোববার সকালে গিয়ে আমি জাহাজটা দেখেছিলাম। আইনুল সকালে এসে বলেছিল— 'চল্, পোর্টে যাবি।'

আমি ওর সাথে বেরিয়েছিলাম। তারপর সেই জাহাজটা কি যেন নাম সোয়াত না কি দেখেছিলাম। পঁচিশ গজ দূর থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার সময় আইনুল বলেছিল— ওই যে দাঁড়িয়ে, ওটিই অস্ত্রবাহী জাহাজ।

আমি ভয় পেয়েছিলাম ওর কথায়। জনা আষ্টেক সৈন্য রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে সামনে। ওরা আমাদের দেখছিল। চোখের দৃষ্টিটা যেন রক্তখেকো বাঘের মতো।

গিয়ারটা বদলাতে বদলাতে আইনুল বলেছিল, 'লেবাররা সাফ জবাব দিয়েছে— কেউ মাল নামাবে না, নামাতেও দেবে না।

কি যেন একটা ভাবছিলাম আমি আইনুলের কথার উত্তরে, শুধু বলেছিলাম— 'ও'।

আইনুল আর কথা বলে নি। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছিল। পোর্টে আইনুলের কাজ শেষ। এবার কোথাও গিয়ে বসব আমরা অথবা কোনো স্পেশাল শো'র টিকিট।

২৪-এ মার্চ বিকেল তিনটে থেকেই শুরু হ'ল গণ্ডগোল। সৈন্যরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে গিয়েছিল। শ্রমিক-জনতা বাধা দিল। না— অস্ত্র নামানো চলবে না। শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র আমরা নামাতে দেব না।

তারপর। তারপর শুরু হ'ল গুলি। অনেক লোক মরল। ততক্ষণে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড, গাড়ি চলাচল বন্ধ। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল একটা তীব্র বিস্ফোরণ।

তারপর কেমন করে যেন মিটমাট হ'ল। কিন্তু ব্যারিকেড সরল না। সারারাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে রইল মানুষ। জেগে রইল গুঞ্জরণ, শব্দ, সন্দেহ, উত্তেজনা আর চাপা বিক্ষোভ।

এই একদিনে সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে। আমি চা শেষ করলাম, সিগারেট ধরালাম। সবকিছু কেমন যেন বিস্বাদ লাগছিল। থমথমে পরিবেশ। বন্ধুরা সবাই যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু আশা করছে।— ভীষণ ভয়ঙ্কর তীব্র অচিন্তানীয়।

হঠাৎ মনে পড়েছিল জুঁইদের বাসায় গিয়ে একবার ঘুরে আসলে ভাল হত। ওরা নিশ্চয়ই এই নিয়ে ভাবছে।

কয়েকদিন আগে জুঁইকে যখন বলেছিলাম— 'দু'-এক দিনের মধ্যেই ঢাকায় ফিরছি'— ও প্রায় আঁৎকে উঠেছিল।

ভীষণ কাছে এসে বলেছিল— 'না লক্ষ্মীটি, না। পঁচিশ তারিখের আগে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।'

জুঁই। বুলি, জুঁই-এর নাম করলেই তুমি রেগে যেতে। তুমি ওকে একেবারে সহ্য করতে পারতে না। কেন? হয়তো তোমার ওই রাগের পেছনে একটা যুক্তি ছিল। তুমি কি ভেবেছিলে— আমি তোমাকে নিয়ে খেলছিলাম?

এই মুহূর্তে এর বিপরীত কথাটাই আমি ভাবতে পারি। আমার জায়গায় তুমি আর তোমার জায়গায় আমি। মানুষ কি ভীষণভাবে বদলে যায়!

বুলি, তোমার বিয়ের দিন সানাই বেজেছিল কিনা জানি না। সানাই শুনলে আমার কান্না আসে। মনে হয়, আমি যেন ডুবে যাচ্ছি। আমার চারদিকের মানুষ, উজ্জ্বল আলো, শব্দ-ছন্দ-গান সবকিছু পেরিয়ে আমি যেন বিশ হাজার লগী অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যেয় জুঁইদের বাসায় আর যাওয়া হয় নি। কখন আটটা বেজে গেল। পোকার মতো মানুষেরা রেডিও ঘিরে খবর শুনছে।

খবর! শব্দ! শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে একটা কিছু দাঁড় করানো চলে। আমরা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খবর শুনছিলাম। ইয়াহিয়ার নাম বলতেই কে একজন ভিড়ের মধ্যে চীৎকার করে বলল— শুয়ারের বাচ্চা।

তুমিও নিশ্চয় এতদিনে অনেক খবর শুনেছ। সংবাদপত্রে বোল্ড টাইপে বাংলাদেশের খবর অনেকবার নিশ্চয়ই ছাপা হয়েছে। এই চার মাসে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে এইসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে তোমার অজানা আর কিছুই নেই। তবু আর একবার বলি— আশি লক্ষ লোক দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে মরেছে দশ লক্ষ—হাজার হাজার মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে—শিকার হয়েছে নরপশুদের কামোল্লাসের।

জানি, এসব তোমারও জানা। তোমার লণ্ডনের ঘরে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে তুমিও নিশ্চয়ই আতঙ্কে ভয়ে শিউরে উঠেছ। ভেবেছ— এও কি সম্ভব।

হ্যাঁ— সম্ভব।

আমি এখন সংবাদ পরিক্রমায় আবার নতুন করে তাই সব শুনলাম। শুনতে শুনতে আজকাল আর ভয় পাই না। তেমন কোন চিন্তাও আসে না। শুধু জানি— আমরা এখন লড়ছি।

তুমি রেগে যেও না বুলি। আর একবার জুঁই-এর কথা বলছি। সেদিন সন্ধ্যেয় ওদের বাসায় আমি যাই নি। যেতে পারি নি। না, তার পরদিনও না। তারপর আর কখনো যাই নি। যাবার দরকার হয় নি।

শুধু খবর পেয়েছি— ওর সেই দুর্দান্ত ছোট ভাইটি নরপশুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছে। আমি ওর কোনো খবর জানি না। জানি না বেঁচে আছে কিনা। কিংবা বেঁচে থাকলেও এই মুহূর্তে আমি কিছুই করতে পারি না।

বুলি, এসব জেনে তোমার আনন্দ হবে এমন আশা আমি করি না। কিংবা না জানলেও কি এমন ক্ষতি তোমার।

আমি নিয়তির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে গ্রহণ করেছি। আমরা সবাই জীবনের কাছে শপথ নিয়েছি— আমাদের ছেলে-মেয়েরা বেঁচে থাকবে। না, তোমার আমার ছেলে-মেয়েরা নয়। সে কথার কোন প্রশ্নই আজ আর ওঠে না। তা ছাড়া— এতদিন পর কথাটা তোমার মনে না থাকারই কথা।

আমি বলছি— আমাদের ছেলে-মেয়েরা। স্বাধীন বাংলাদেশের আগামী দিনের মানুষেরা। ওরা সুন্দরভাবে বাঁচবে বলেই আমরা মরছি!!

ছায়াসূর্য

সেলিনা হোসেন

ও একটা দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয়।

ও একটা আশ্চর্য পুরুষ ইচ্ছে।

অথচ কৈশোরের অনাবিল মাধুর্য ওর চেহারাকে সঘন করে রেখেছে। ও দুরন্ত বেয়াড়া উল্লাসে মাতোয়ারা যুবতী বিধবার বিলাসী স্বপ্নের মতো। প্রচণ্ডতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অবাক দৃষ্টির প্রতিফলন ওর সব কাজে। তেরো বছরের অপুষ্ট দেহটা হৃদয়ের এ আবেগকে ধারণ করতে পারে না। যে জন্য চরবিলাপীর লোকেরা ওকে বলে ডেঁপো। আসলে ও তা নয়। ওর হৃদয়ে অদ্ভুত পুরুষ ইচ্ছে শাপলার গহীন বুকে কেলিরত পানকৌড়ির মতো মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ওর প্রারব্ধ বাসনা কোনো কিছুতেই বিমূর্ত নয়।

বৈকালীর পড়ন্ত রোদ যখন চরবিলাপীর কোণ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া বঙ্গোপসাগরে আছড়ে পড়ে তখন ও পার ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। সাগরের সীমাহীনতা ওর দুচোখে কোনো এক প্রত্যয়ের ইশারা ঘনিয়ে তোলে। বিলীয়মান রোদের কণা আর সাগরের কৌতূহলী শব্দ ওকে উষ্ণ করে। তারপর ঝুপ করে রোদ বুড়িগাঙ্গের বুকে ডুব দিলে ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর তক্ষুণি মার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মা লাল মোরগের ঝুঁটিটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আলোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলে নরম মাটি সুরসুরি দিচ্ছে; মা সরে সরে দাঁড়াচ্ছে। এটা মা'র একটা অভ্যেস। ও জানে সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে না ফিরলে মা কেবলই ছটফট করে। আর তখনই ওর হৃদয়ে পুলক জাগে। পুলকিত হয় ওর সমগ্র চেতনা। মা শুধু ওর জন্য— শুধু ওর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর কথা স্মরণ করেই মা অন্ধকার ঘরে কুপি দেয়। ওর লাল মোরগটা বুকে নিয়ে পাখায় হাত বুলায়। উপলব্ধির এ বোধে আনন্দিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ও অদ্ভুত বিষণ্নতায় চেঁচিয়ে ওঠে। মার জন্য বুকটা কেমন যেন করে।

কেননা বাবা মারা যাবার পর থেকেই মা-র বুকটা পোড়া মাটির মতো এখন কালো। ও দেখেছে জায়নামাজে উবুড় হয়ে মা বাবার জন্য কাঁদে। উঠোনের পুব পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জামরুলের ছায়া যেখানে আছড়ে পড়ে প্রসক্তির নিবিড় প্রলেপে কান পেতে মা রোজই সেদিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা সম্ভোগের নরম রেণু গায়ে মেখে ঘাসফুলের প্রসূন-হৃদয় যেমন উন্মনা হয়, মার আদিম ইচ্ছে তখন বাবাকেই খোঁজে। এমন মার বেতসলতার মতো বিছানো আকাঙ্ক্ষাগুলো প্রতি মুহূর্তে ওকে কেন্দ্র করেই বাঙ্ময় হতে চায়। সজল দৃষ্টি সর্বক্ষণ ওকে অনুসরণ করে ফিরতে থাকে। এ জীবনে মার যে আর কেউ নেই।

চরবিলাপীর শেয়ালগুলো যখন ঝোপের ভেতর থেকে ডাকতে থাকে কিংবা দু-একটি যখন এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে তখন ওর তেরো বছরের ক্ষীণ শরীর দুলে ওঠে। বঙ্গোপসাগরের ঘোলা জল কালো হয়ে যায়। মার তোবড়ানো গালের মতো দূরের

গাছগুলো বাঁকা বাঁকা মনে হয়। আর মার ছেঁড়া শাড়িটার মতো অন্ধকার যেন জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে থাকে। ফিকে আলো মিটমিট করে চারদিকে। মনে হয় মা এখনো ভূতুড়ে অন্ধকারে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ ওর দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয় এই কালো রাতেই চরবিলাপীতে ঘুরতে চায়। বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলের আদুরে স্পর্শে গড়ে ওঠা চরবিলাপী প্রতিনিয়ত ওর বিলাসী স্বপ্নের সমীকরণ ঘটায়। কাদার কবোষ্ণ আলতো ছোঁয়ায় উন্মুখ হৃদয় কলমিলতা যেমন লজ্জায় চিত্রিত বেগুনিপরাগে অজানিত সুরভির গন্ধ মাখে, চরবিলাপীর বুকেও তেমনি ঘ্রাণ পায়। এ ঘ্রাণ ওর তেরো বছরের জীবনকে আশ্চর্য মায়ায় জড়িয়ে রেখেছে। চরবিলাপীর মাঠে মাঠে ফুটে ওঠা রাংচিতা আর রঙ্গন ফুল ওকে কোনোদিন যেন এ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না। সরিয়ে দিতে পারবে না আর কোথাও।

বাবা মারা যাবার পর মামারা এসেছিল মাকে নিয়ে যেতে। মা-র ইচ্ছে ছিলো যাবার কিন্তু ওর কান্নাকাটিতে যেতে পারেনি। উপরন্তু বাবার জন্য মা-র দুর্বলতা ছিলো বলেই বাবার গড়া এ ভিটে ছাড়তে পারেনি। মামারা ফিরে গিয়েছিলো। সেই থেকে মা শিকদারদের বাসায় কাজ করে আর ও শিকদারের গরু চরায়। দিন ওদের কোনোমতে চলে যায়। ক্ষুধার জ্বালায় মা মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে অদৃশ্যকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল দেয়। মার জন্য তখন ভয়ানক খারাপ লাগে ওর। কেবলই মনে হয় মাকে যদি পেট পুরে খেতে দেবার ক্ষমতা থাকতো ওর তবে পৃথিবীতে আর কিছুই চাইতো না। কখনো কখনো বশির ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। ওর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বশির ভাই অনেকদিন বলেছে, এ দেশে মানুষের কোনো দাম নেইরে জব্বুইরা? ও এর অর্থ বোঝেনি কিন্তু কথাটা মনে রেখেছে। বশির ভাই শহরে পড়ে সে নিশ্চয় বাজে কথা বলে না। চরবিলাপীর জব্বুইরা নামক ছেলেটাকে বাজে কথা বলার দরকারই বা কী তার?

যেদিন শিকদারের বড়ো ছেলে গরু হারানোর অপরাধে ওকে বেদম প্রহার করেছিলো সেদিন মা সারাদিন কোনো কাজ করতে পারেনি। রাতেও ঘুমোতে পারেনি। ওর মাথাটা বুকে জড়িয়ে বসেছিলো। ওর দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয় মা-র কাছে অবোধ হতে বেধেছিলো। শরীরের কোনো ব্যথা এবং বেদনাকে স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত ছিলো। বার বার মাকে বলেছে, 'মাগো তুই শুমা। আমার কিছু অয় নাই। মাগো তুই আমার জন্য কাঁদিস না। মাইর খাইলে আমার এটটুও লাগে না। মাগো তুই শো। এইহানে শো।' নিজেই কাঁথার ওপর মাকে শুইয়ে দিয়েছিল এবং মার পাশে শুয়ে উপলব্ধি করছিলো বঙ্গোপসাগরের লোনা জল মার গাল বেয়ে অবিরত ধারায় পড়ে যাচ্ছে। অথচ ও কাঁদেনি। কাঁদতে পারে না। মার খেলে আবার উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। শিশুর মতো অবোধ হয়ে চিৎকার করা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। মা-ও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে আশ্চর্য সহ্যশক্তি ওর। এই ছোটো ক্ষীণ দুর্বল শরীরটার মধ্যে এতো তেজ কোথা থেকে আসে? আসলে কেউ বোঝে না যে ওর সব জোর মনে। ও একটা দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয়।

মাঝে মাঝে গরু নিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। প্রায় চরবিলাপীর শেষ সীমানার কাছাকাছি। হোগলার বুকে সারসী দেখে ওর বুকটা কেমন করে। এমনি করে ও নিজেও কোনো নিভৃত হৃদয়ে ঠাঁই চাচ্ছে। সে বুক কার? সে বুক মার। সে বুক চরবিলাপীর। মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম আসতে চায় না। চুপচাপ বসে থাকে দাওয়ার ওপর। কামরাঙ্গার ছায়া ঘন হয়ে নামে রাত্রির গায়ে গা এলিয়ে— ফোঁটায় ফোঁটায় শিশির জমে সজনে ডালে, তখন শ্রাবণ সন্ধ্যে উন্মুখ হয় ধূসর হৃদয়ে। বর্ষণ নামে ওর নির্ঘুম যন্ত্রণায়।

চরবিলাপীর অন্ধকার বুকের দিকে তাকিয়ে ওর বুকটা গুম গুম করে। ঘরের ভেতর মা পাশ ফিরে শোয়। মুখে বিড়বিড় করে জব্বুইরা বাজান রে? ও জানে হাত বাড়িয়ে ওকে না পেলে মা উঠে আসবে। মাথাটা বুকের ভেতর রাখবে। আস্তে আস্তে ফিসফিস করবে, বাজান কী অইছে?

ও কথা বলতে পারে না। কী বলবে? ওতো জানে না ওর কী হয়েছে। শুধু বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে একটানা শোঁ শোঁ শব্দ আসে। সে যেন নিশির ডাকের মতো ওকে বিহ্বল করে তোলে। ও মার আঁচল টেনে ধরে, মাগো তুই ক চরবিলাপী ছাইড়া আর কোনোহানে যাবি না?

না বাজান আর কই যামু?

এ বিশ্বস্ততায় ও স্বস্তি পায় না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সারা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে নেয়।

তারপর ওর তেরো বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় নতুন পরীক্ষা নিয়ে এসেছিলো সেই কালরাত্রি। সত্তরের বারোই নভেম্বর। সেই সন্ধ্যায় মা ওকে বের হতেই দেয়নি। বিকাল বেলায় টেনে এনে ঘরে পুরেছিলো। শিকদারের গরুগুলো সেদিন ভয়ানক ডেকেছিলো। ও লাল মোরগটা বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসেছিলো। বেড়ার গায়ে উদাম বাতাসের ধাক্কা সেদিন ওর কাছে ঘুমপাড়ানিয়া গানের মতো মনে হয়েছিলো। মা ওকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিলো। ঠোঁট দুটো কাঁপছিলো— নড়ছিলো। মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত দুটো বাঁকা হয়ে ভেঙে পড়ছিলো। ওর বারবার মনে হচ্ছিলো মা ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে। মা যেন কিসের আশঙ্কায় ভীত। লাল মোরগটা ওর বুকের ভেতর গরগর করছিলো। আর ওর বুকটা বারবার ফুলে ফুলে উঠছিলো বাইরে বেরিয়ে পড়ার দুরন্ত পুরুষ ইচ্ছেয়।

অথচ সেই কালো ভয়ানক দুঃস্বপ্নের রাতই চরবিলাপীর জব্বুইরার তেরো বছরের জীবনটাকে হঠাৎ ধাক্কায় অকস্মাৎ বুড়িয়ে দিয়েছে। সেদিনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। শুনেছিলো ভয়ার্ত মানুষের সরব আর্তনাদ। আর অনুভব করেছিলো হিমশীতল পানির স্রোতে ও তলিয়ে গেলো। সে কী ভয়ানক ঠাণ্ডা! মা সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো। কিন্তু তাতে কোনো উত্তাপের সঞ্চার হয়নি। মা-র শক্ত বাহু কী করে শিথিল হলো তাও ও জানেনি। পরদিন দুপুরে জ্ঞান ফিরে পাবার পর নিজেকে হোগলার বুকে আবিষ্কার করে ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিল ও। চরবিলাপীর তেরো বছরের জব্বুইয়ার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই বদলে গেলো। চরবিলাপীর মাটিতে পা রেখেই বুঝলো, নেই, সে চরবিলাপী আর কোথাও অবশিষ্ট নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো মার কথা। মা-মাগো-মা—

ছুটতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। এ কার লাশ? শিউরে উঠলো ও। না মা নয়। মা কখনো মারেনি। ওকে একলা রেখে মা মরতে পারে না। নিশ্চয় এখনো লাল মোরগের ঝুঁটিটা বুকে চেপে ওর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে। ওকে না দেখে মার বুকটা তোলপাড় করে কান্না আসছে। জব্বুইরা বাজানরে— ও যেন শুনতে পাচ্ছে সে ডাক। চরবিলাপীর বুকে কোথায় ওর ঘর ছিলো তা ও ঠাহর করে বের করতে পারলো না। চারদিকে একটা প্রচণ্ড শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে।

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। সে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার চিহ্নও নেই। সে বিরাট জনপদে ও পাগলের মতো দৌড়তে লাগলো। ওর সমস্ত স্নায়ু দিশেহারা হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে দলা পাকিয়ে জীবিত মানুষগুলো বসে বসে ধুঁকছে। ওর দিকে কেউ

দেখছে না। ওকে কাছে ডাকছে না। ওর সমস্ত অন্তঃকরণটা চরবিলাপীর দিগন্তবিথারি শূন্যতার মতো হা হা করছে। ওর পুরুষ হৃদয়ে আর কোনো সচল ইচ্ছের স্ফুরণ নেই।

দুপুরে রোদ মাথার ওপর আলতো ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে ও। অথচ জব্বুইরা বাজান বলে এখনও কেউ কোলে টেনে নেয়নি। না, ওর প্রিয় চরবিলাপীর প্রিয়তম মাকে কোথাও ধারণ করে রাখেনি। চরবিলাপীর মাটি, রোদ, আকাশ অবিকল সেই রকম আছে কিন্তু মা নেই। সেহেতু কোনো ভালোবাসা নেই— কোনো শব্দ নেই— পাখি নেই। শুধু আছে কেবল দমধরা নিস্তব্ধতা— নীরবতা, বুক চাপড়ানো বিলাপ। ওর চোখে কান্না নেই। যারা আছে তারাও কাঁদতে পারছে না। বুকটা ভেঙে গেছে। এতো শোক ধারণ করবে কোথায়? তবুও মাঝে মাঝে কোথা থেকে অস্ফুট গোঙানি আসে।

জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে ও দৌড়ে গেলো। অসংখ্য লাশ ভেসে আসছে। কিন্তু কৈ মা? তিন দিন ধরে জব্বুইরা আর কিছুই জানে না। অবাক দৃষ্টিটা উৎসুক করে রাখে কখন জোয়ার আসবে। বঙ্গোপসাগরের নীল জল থেকে স্নাত হয়ে এলোচুলে মা আসবে। ওর কপালে চুমু দেবে। জব্বুইয়ার নীল চোখের পাপড়িতে রোদের সোনালি কণা বিশ্বাস আশ্বাসে দুলতে থাকে।

চতুর্থ দিন দুপুরের আগেই ভেসে এলো ওর মা।

আনন্দ উত্তেজনায় নির্বাক ও সে দেহ আঁকড়ে ধরে কোনো অনুভূতিই প্রকাশ করতে পারে না। কতো সহস্র দিন এ দেহকে ও কতো ভাবে কতো ভঙ্গিতে দেখেছে। কিন্তু এমন করে কোন দিনই দেখেনি। ও দেহকে সামনে রেখে বসে রইলো। সূর্য যখন বঙ্গোপসাগরের ঘোলা জলে লাল আলো ফেলে লুকোচুরি খেলছে তখন কারা যেন ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। ও তাকালো না। তাকিয়ে রইলো দূরের দিকে। চরবিলাপীর নাম সার্থক করে দিয়ে এ চরের বুকে আজ বিলাপের ধ্বনি।

কে যেন খসখসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

এই ছেলে এখানে বসে আছিস যে?

অ্যামনি।

রিলিফ এসেছে। তোর জন্য খাবার এনেছি নে।

না।

আয় উঠে আয়।

না। না।

এই লাশ কার?

আমি জানি না। আমি চিনি না। আমি জানি না। আমি চিনি না।

ওর কণ্ঠস্বর কুঁকড়ে কুঁকড়ে গেলো।

প্রতিবাদ করলো শিকদারের বড়ো ছেলে।

মিছা কলি ক্যান। ঐডা তোর মা-র লাশ।

আমার খুশি আমি মিছা কৈছি। আরো কমু। একশো বার কমু। তুমার কী? তুমি কও ক্যামনে আমি বিশ্বাস করি যে ঐডা আমার মা। আমার মা-তো মরে নাই।

এতোক্ষণে জলে ভরে উঠলো ওর চোখ। চারদিন পর আজ জব্বুইরার চোখে পানি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো লোকগুলো।

আর ওর দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয় তখন ফুঁপিয়ে উঠেছে। দুর্দান্ত পুরুষ হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে চরবিলাপীর জব্বুইরা।

চরবিলাপীর মতো সব হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত সে হাহাকারের অশ্রু।

রাবণ

ভগীরথ মিশ্র

গত রাতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

আমার খেজুর গুড়ের মহালে প্রহরাজ বেজ খুন হয়ে গিয়েছে। সে বড় মর্ম-বিদারক মরণ! পরম শত্রুর মরণও যেন এমন না হয়।

আমি ভোরে উঠে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলাম। ক্ষুদিরাম সিং— আমার গুড়ের মহালের মাইন্দার এসে খবরটা দিল। ওহ্! নরক-যন্ত্রণা সইতে সইতে মরেছে গো লোকটা! লাখো লাখো বিষপিঁপড়া উয়ার সর্বাঙ্গ কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। চোখ দুটা বেমালুম নাই।

চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্যটা দিনকতক বেড়েছে এ তল্লাটে। এখন মহালে গুড় বানানো চলছে। গুড়, নবাত...। সেই আশ্বিনের শেষ থেকে গাছ কামানো, হাঁড়ি টাঙানো শুরু হয়েছে। এখন পৌষেও চলছে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি তক চলবে। ইজারাবন্দী খেজুর গাছে গাছে খিল গোঁজা রয়েছে। গুঁজি ঝুলছে। আমার মহালে রোজ দু'শো গাছের রস আসে। দু'শো গুঁজি। অর্থাৎ প্রায় একশ কেজি মত রস। তা থেকে গুড় পাচ্ছি অবশ্যি রোজ এক কুইণ্টালের থেকে কিছু কম। পাইকাররা আসছে বাঁকুড়া, তালডাংরা, সিমলাপাল থেকে। দরদাম করছে। কিনে নিচ্ছে গুড়। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সে গুড় চলে যাচ্ছে দূরে-দূরান্তে। কাঁচা টাকা কিছু-না-কিছু রোজ ঢুকছে মহালে। রাতের জাগুয়া আছে সব মহালেই। যেমন আমার ছিল প্রহরাজ বেজ। তবুও, গুড়ের গন্ধে যেমন পিঁপড়া আসে, গুয়ের গন্ধে মাছি, ঠিক তেমনি, রাতের আঁধারে মহালে হানা দেয় রাত-কুটুমের দল। সুলুকসন্ধান খোঁজে। সুযোগমত লুটেপুটে নিয়ে যায়। সিমলাপাল থানা থেকে 'পুলুশ' আসে। লাঠিধারী 'কনিষ্ঠবল'। তারা চোর ধরতে আসে না। আসে মাল-টাল খেতে। তা দিই, মহাল-মালিকেরা যুক্তি বুদ্ধি করে দু'এক পাঁইট রাখি মহালে। নচেৎ উহারা আইবেক ক্যানে শুধুমুদু অতখানি পথ ঠেঙিয়ে! ঠাকুরদাবা্তা হেন চিজ, উঁয়ারাও শুধুমুদু আসেন না। দস্তুর মতো 'পাঁঠা দুবো, পূজা দুবো' বলে ডাকতে লাগে। আর ইয়ারা তো নেহাৎই মনিষ্যি। তায় আবার পুলুশ। তবু উয়ারা রাতেভিতে মহালে মহালে পা'র ধূলাটা দেয় বলেই টুকচান বাঁচোয়া। রাতের কুটুমরা ভেবেচিন্তে হানা দেয়।

ক্ষুদিরাম সিং দু'চোখ কপালে তুলে বলে যাচ্ছিল প্রহরাজ বেজের নরক যন্ত্রণার কাহিনী। সম্পূর্ণ ন্যাংটো মানুষটা রাতভর লাখে লাখে বিষপিঁপড়ার খাদ্য হয়ে মরেছে।

বললাম, 'বলু কি রে? চোখ দু'টা একেরে নাই?'

'নয় আইজ্ঞা।' ক্ষুদিরাম সিং ভয়ে রক্তশূন্য, 'চোখের থানে একজোড়া বিশাল গড্ভর। উহার মধ্যে কালো রক্তের ঢেলা। তা বাদে লিঙ্গ, এ্যাঁড়কুষায়ও শতেক ছিদ্র করে সুড়ুং খাইনেছে বিষপিঁপড়ার দল। 'থাম্‌রে। শুইন্‌তে লারি।' ক্ষুদিরাম সিংকে ধমকে থামিয়ে দিই,

'যা, প্রহরাজের বউকে খবরটা দে। আর গুলু মাঝিকে বল, সিমলাপাল থানায় একটা খবর দিক। আর মাচাতোড়া পঞ্চাৎ অফিসে।'

ক্ষুদিরাম সিং চলে যায়। আমি চুপটি মেরে বসে থাকি। মনশ্চক্ষে দেখতে থাকি হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা। সারা শরীর সহসা কেমন গুলিয়ে ওঠে আমার। এহ্! বড় বিদঘুটে এই মরণটা। দুনিয়ার কোনও কষ্টের সাথেই বোধ লেয় তুলনা চলে না এমন মৃত্যুর। চোরেরা বিরক্ত হয়ে মাঝে মধ্যে বেয়াড়া জাগুয়াদের সাজাটাজা দেয় বটে। বছরটাক আগে মাচাতোড়ার শম্ভু গুচ্ছাতের মহালের জাগুয়াটির ঠোঁটের ধার থেকে গাল অবধি ছুরি দিয়ে ফালা করে দিয়েছিল। রাতভর 'হো-হো-খবরদার'— বলে চিল্লানোর সাজা। মরেনি। তবে বহুৎ দিগ্‌দারি পেয়েছিল লোকটা। প্রহরাজের কষ্টের সাথে অবশ্যি তার তুলনা হয় না। এমন কি সতীকান্ত সিংহবাবুর মরণটাও এর তুলনায় নগণ্য। সতীকান্ত সিংহবাবু। জিরাবাইদ গাঁয়ের সেই প্রতাপশালী মনিষ্যিটির মরণও আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন ওর নব্বুইয়ের ওধারে উমর। অঙ্গের সব ইন্দ্রিয়ের দুয়ার শিথিল। নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্র। দিনরাত শুয়ে থাকে বিছানায়। তলা দিয়ে বাহ্যি বেরিয়ে যায়। সুমুখপানে পেচ্ছাব। দেহের কোনও বস্তু তো নয়ই, মনের বাক্যিগুলানও চেপে রাখতে পারে না একতিল। ফোকলা মুখে অবিরাম বিড়বিড় বকে চলে। আক্ষেপ, অভিযোগ, অভিমান। নিজের উপর, বউ-ছাওয়ালের উপর। উপরওয়ালা— যিনি দিনকে রাত করেন— তাঁর ওপর। চব্বিশ ঘণ্টা বিছানা বন্দী। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। তবুও মরে না। বুকের খাঁচা থেকে শেষ হাওয়াটুকু আর বেরোয় না কিছুতেই। বিছানাতেই পাশ ফিরিয়ে দিতে হোত। দিনের মধ্যে যতবার সম্ভব। দিতো, যার যখন সময় হোত। চিৎ থেকে উপুড়। উপুড় থেকে বাঁ-পাশ। যেন কড়াইয়ের ওপর ভাজা কই মাছ ওল্টানো। আবার কাজে-কর্মে বেরিয়ে গেলে, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক মুদ্রায় শয়ন। অসহায় সতীকান্ত চিল-চিৎকার জুড়ে দেয়। আরে গু খাউকির ব্যাটা-বেটিরা। একপাশে শুয়ো শুয়ো যে কাঠ হইয়ে গেলাম রে খালমুয়ার দল! কেউ শোনে না। ইদানিং চিল্লানোর ক্ষমতাটাও প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই কাঁটাসার একটি শরীর দিনের পর দিন শুয়ে থাকে তেল চিটচিটে বিছানায়। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে অধিকাংশ সময়। চোখের কোনায় জলের ধার শুকিয়ে থাকে। দু'চোখে মরা মরা চাউনি নিয়ে সে কেবল নিঃশব্দে দিন গুনে যায়।

এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে সতীকান্তর পিঠে ছোট্ট ছোট্ট ফুস্কুড়ি বড় হোল। বিছানার সাথে তাদের ঘসাঘসি চললো অবিরাম। রস চোয়ালো। ঘা হোল। কালে কালে দগ্‌দগে হোল সে ঘা। দুর্গন্ধ ছড়ালো। মাছি ভনভনালো ঘায়ের ওপর। তখন কার সাধ্যি সতীকান্তর ঘরে ঢোকে। ফলে, কালেভদ্রে যারা উল্টে পাল্টে দিতে আসতো, তারাও যেন না আসতে পারলে বেঁচে যায়। চানের আগে আগে মনে পড়লে তবু উল্টে দেবার ইচ্ছেটা জাগে একটু আধটু। উল্টে দিয়েই সোজা পুকুরে গিয়ে ডুব মারা। একটা সময় এলো, যখন দিন যায়, রাত যায়, একলা ঘরে একরাশ আঁধার, মাছি, দুর্গন্ধ ও যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকতো সতীকান্ত সিংহবাবু। দিন নয়, তখন কেবল ক্ষণই গুনতো। তখন প্রতিটি দণ্ডকে মনে হোত যেন এক একটি যুগ।

সতীকান্ত সিংহবাবুর ঐ সময়টাতেই আমি ওর ঘরে যেতাম। রোজ পালা করে একবার। নাকে কাপড় চাপা না দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকতাম। থির পলকে দেখতাম ওকে। শুধু দেখবার জন্যই তো যেতাম। অন্য কোন কারণেই নয়। সতীকান্ত সিংহবাবুর মতো একটা মানুষ মরছে। দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে। সেটাই তারিয়ে দেখবার মতো ব্যাপার ছিল আমার কাছে। সতীকান্তও আমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকতো। অবোলা সময় বয়ে যেতো তিরতিরিয়ে। পুরোনো দিনগুলো কি ওর মনের মধ্যে ঘাই মারে এখনো? ওর সেই দাপটের দিনগুলো?

অনুতাপ হয়? অমন আকণ্ঠ যন্ত্রণার দিনেও কি পুরানো দিনের স্মৃতিগুলান মজলিশ বসায় উয়ার মগজে? কে জানে! মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ গলায় কতকিছু বলে যেতো সতীকান্ত সিংহবাবু। কথার বারো আনাই ছিল অভিযোগ। আত্মীয়স্বজন, গরম-ঘাম, মশা-মাছি, সরকার আর ভগবানের বিরুদ্ধে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলতো, 'ভগবান যদি বর দিতে চায় তুয়াকে, সোনাদানা, যশ-খ্যাতি, রূপ-বৈভব, —না, না, লিবি নাই উ'সব। বইল্‌বি, কিচ্ছোটি নাই চাই আইজ্ঞা। শুধু আচম্বিতে মরণ দাও। আচম্বিতে মরণ।' যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসে ওর ক্ষীণ গলা, 'আইছু যখন এ দুনিয়ায় ফেরৎ যাবিই! তেবে সার কথাটি শুনে লে। আসা যত সহজ, যাবা তত সহজ লয় হে—।'

আমি রা' কাড়ি না। শুধু নয়ন ভরে দেইখে যাই। কান ভরে শুনে যাই। একসময় পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসি ওর ঘর থেকে। তখন সর্বাঙ্গ জুড়ে কুলকুল করে লদী বয়!

দিন কয় বাদে মরে গেল সতীকান্ত সিংহবাবু। সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেললো। কেবল আমি ছাড়া। বড় দুঃখ হয়েছিল আমার। হায়রে! অত জলদি মর্‌লো গেল! আরো কিছো দিন দেইখ্‌তে পেল্যাম নাই শালার লরকযন্তন্নাটা। আমার বুকের মইধ্যে একটা শাগ্‌না বাচ্চা সেই ছা' বেলা থেকেই কাঁদ্‌ছে। অহরহ শুধুই কাঁদ্‌ছে। সতীকান্ত সিংহবাবুর লরকভোগের দৃশ্যটা দেখে সে টুকচান থামাতো তার কাঁদ্‌নাটা। আসলে উই শাগ্‌না ছা'র কাঁদ্‌নাটা থামাবার তরেই লিত্যিদিন সতীকান্তর ঘরে যেতাম আমি।

।। দুই।।

তখন আমার বয়েস সাত কি আট। জিরাবাইদ ইস্কুলে পড়ি। ইস্কুলের এক নম্বর পড়ুয়া ছিলাম আমি। বাড়ির লাগাও একটা জমিন ছিল আমাদের। একচাকেই প্রায় চার বিঘা। ঐ জমির ওপর পেট চলতো ছ'টা। বাবা, দিদি আর আমরা চার ভাই। কাজেই পেট চালাতে বাড়ির সব্বাই অষ্টপ্রহর পড়ে রইতো ঐ জমিনে। শোল জমিন ছিল। সবার মেহনতে ফলতো হাতিঠেলা ধান। আধপেটা খেয়ে আমাদের দিন চলে যেতো কোনও গতিকে। সতীকান্ত সিংহবাবু বংশের শেষ জমিদার। তার পরেই জমিদারী লোপ পায় সরকারি আইনে। জিরাবাইদ গাঁয়ে ছিল তাঁর বিশাল বাখুল, গড়। তাঁর সুমুখে খাড়া হলেও সিংহও নিমেষে হয়ে যেতো মূষাটি। অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। সারাক্ষণ মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। তার ওপর ছিল মেয়ামানুষের দোষ। বিত্তবানদের এ রোগটা বোধ করি মজ্জাগত। অর্থ বৈভব পেলেই মাইনুষের সখ হয় মেয়ামানুষ পোষার। নিজের অন্দরমহলে মা-লক্ষ্মীর পায়ের ছাপটি পড়লেই, মানুষ অন্যের অন্দরমহলে নিজের পায়ের ছাপটি ফেলতে চায়। তো, অতুল বৈভবের মধ্যে সতীকান্ত সিংহবাবুর কেবল নিজের ঘরের মেয়ামানুষটিকে লিয়ে আর কিছুতেই সাধখানা মিটছিল না। লিত্যিদিন সে নতুন মেয়ামানুষ খোঁজে। চারপাশের গাঁ'র এ-ঘরে ও-ঘরে তার অনেক সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ঠেক। আর, বাঘও আড়াল করে খায়। কিন্তু সতীকান্ত সিংহবাবু কদাচ সেই আড়ালখান্‌ও রাখতো না। দিনে-দুপুরে শতচক্ষুর সুমুখ দিয়ে ছাতি ফুলিয়ে সে রক্ষিতার বাড়ি যেতো। সিংহবাবু বংশের বড়কর্তাকে ঠেকাবে, অমন ছাতির পাটা কার? বড় হয়ে বুঝেছি, আমাদের ঘরেও সেঁধাবার সাধ হয়েছিল তার। দিদির তখন বছর আঠারো বয়স। বিয়ের উপাড় আসছে। বাবা ছিল এমনিতে খুব নরম আর দুর্বল

ধাতের মানুষ। সতীকান্ত সিংহবাবুর মতো মানুষের সুমুখে একতাল কাদাটি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সে রাজি হয়নি সতীকান্তর প্রস্তাবে। ছোটবেলায় অতসব ব্যাপার মোটেই বুঝিনি। কেবল দেখেছিলাম, একদিন ঠায় দুপুরে বাবা ফিরলো মাঠ থেকে। সেটা বোধ করি কার্তিকের শেষ। ধানের ডগায় শীষ এসেছে। কাঁদি পড়ছে। দুধ জমছে বুকে। বাবা ঘরে ঢুকেই বাখান জুড়লেন আর খুঁজতে লাগলেন বড়দাকে। আজ্ঞ উয়ার একদিন কি আমার একদিন! গাইটাকে চড়াই-বুলাই আনতো পাঠাল্যাম্ উয়াকে। গাই ছেইড়ে উ লেবেছে ভূতদীঘির জলায় পদ্মচাকির তরে। উদিকে গাই লেবেছে সিংহবাবুর জমিনে। প্রায় চার হাত আন্দাজ জমিনের ধানগাছ লণ্ডভণ্ড! বড়দা লুকিয়ে লুকিয়ে রইলো সারা দুপুর। বাবাও গুম মেরে রইলেন সারাক্ষণ। সারা মুখে অপার দুশ্চিন্তা নিয়ে।

দুপুরের তেজ একটুখানি পড়তেই সাহেব বাঁধের পাড় ধরে হেলতে দুলতে এলেন সতীকান্ত সিংহবাবু। বিশাল বপুখানি নিয়ে দাঁড়ালেন আমাদের জমিনের আলে। পেছনে পেছনে পাইকের কাঁধে চড়ে এলো তাঁর পেয়ারের কুর্শিটি। বত্রিশ সিংহাসনের পুতুলের মতোন নকশাকাটা তার সর্বাঙ্গে। কুর্শির পিছু পিছু এলো তাঁর রূপো বাঁধানো আলবোলা। সোনালী ঝালর দেওয়া পাখা নিয়ে এলো সিংহবাবু বাড়ির পুরোনো ঝি বিন্দুবাসিনী। সিংহবাবু কুর্শি জাঁকিয়ে বসলেন প্রশস্ত আলের ওপর। লগেন বাগ্দী ছাতা ধরলো মাথায়। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো বিন্দুবাসিনী। পুরুষ মাইন্ষের হাতের হাওয়া সিংহবাবুর শরীরে সয় না। জ্বলন্ত কলকে বসানো হোল আলবেলায়। লম্বা নলটি ধরিয়ে দেওয়া হোল সিংহবাবুর হাতে। ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ তুলে তামাক খেতে লাগলেন তিনি মৌজ করে। সুগন্ধি অম্বুরী তামাকের তীব্র সুবাস ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। সতীকান্ত সিংহবাবুর মুখ থমথমে। চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখে-শুনে প্রমাদ গুনি আমরা। ভয়ে যাব কাপাস পাতা। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে থাকি ওকে। কেবল বাবাই এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে পাশটিতে দাঁড়ান। দাঁড়িয়েই থাকেন বোবার মতো। সতীকান্ত সিংহবাবুর অমন সাড়ম্বরে আগমনের হেতুটা জিগাতেও সাহস হয় না তাঁর।

হেতুখান্ অল্প বাদেই দেখা গেল স্বচক্ষে। জমিন থেকে অল্প তফাতে এসে দাঁড়ালো সিংহবাবুদের বাছাবাছা জনাদশেক লাঠিধারী পাইক আর গোটা বিশেক পাহাড়িয়া গোরু। আলবোলায় সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সিংহবাবু একবার আড়চোখে তাকালেন বাবার দিকে। তারপর ইঙ্গিত করলেন লগদীদের। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্তর বিশটা পাহাড়িয়া গোরু নেমে পড়লো আমাদের জমিনে। মনের পুলকে খেতে লাগলো সবুজ ধানের গাছ। গোছায় গোছায়। জমিনের চৌহদ্দি ঘিরে আলের ওপর খাড়া রইলো লগদীর দল। হাতে তাদের তেল মাখানো লম্বা লাঠি। বাবা হাঁউমাউ করে ছুটে যাচ্ছিলেন গোরুগুলোকে তাড়াতে। দু'জন লগদী দু'ডানায় ধরে থামিয়ে দিল তাঁকে। ঐ অবস্থায় বাবা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিংহবাবুর পায়ের তলায়। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে মড়াকান্না কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চিৎকারে দু'চারজন পাড়াপড়শী জমলো এধার-ওধার থেকে। আশে-পাশে এসে পুতুলের মতো দাঁড়ালো। কিন্তু মুখ থেকে কথা খসায়, সাধ্যি কি ওদের? কে আর সেধে সিংহবাবুর কোপে পড়তে চায়।

সিংহবাবু মৌজ করে তামাক খেতে লাগলেন। তাঁর দশাসই গোরুগুলান প্রাণভরে খেতে লাগলো আমাদের জমিনের ধানগাছ। খেলো যতো মাড়ালো তার চেয়েও বেশি। আর, বাবা সারাক্ষণ সিংহবাবুর পায়ের তলায় নিথর হয়ে পড়ে রইলেন। আমরা আড়াল থেকে পাথরের মতোন শক্ত হয়ে দেখতে লাগলাম দৃশ্যটা। ভয়ে কেঁদে কাঠ হয়ে গেছি সক্কলে। ধীরে ধীরে আমাদের জমিনটা ফাঁকা হতে লাগলো। কাদায় চটকে লণ্ডভণ্ড।

এক সময় সূয্যিদেব পাটে বসলেন। তাঁর সোনার বর্ণ চাকি লাল হয়ে এলো পশ্চিম গগনে। সিংহবাবু উঠে দাঁড়ালেন কুর্শি থেকে। ভারি ভারি পা ফেলে ফিরে চললেন গড়ের দিকে। পেছন পেছন তাঁর কুর্শি, গড়গড়া, পাখা শুদ্ধু বিন্দুবাসিনী, লগদী, গোরু ও লোকলস্কর। আমাদের চার বিঘার চাকটিতে তখন একটি ধানগাছও আস্ত নেই।

ধাক্কাটা হয়তো কোন প্রকারে সামলে নিতেন বাবা। কিন্তু বিধি বাম। পরের বছরই হোল অজন্মা। দেশ জুড়ে। দারুণ খাটারশাল। ফলে একটা-দুটা করে তাবৎ জিনিসপত্তর, গোরু-ছাগল, জমিজিরাত, মায় ভিটাটি পর্যন্ত বিক্রি কিংবা বন্ধক দিতে দিতে বছর দুয়েকের মধ্যে এক্কেবারে ফতুর হয়ে গেলাম আমরা। আর ঐ জমিনের বারো আনাই জলের দামে কিনে নিল সতীকান্ত সিংহবাবু। ধাক্কাটা বাবা সইতে পারলো নাই কিছুতেই। সেই দুপুরের গুম মারা ভাবখানা আর নড়লো না তাঁর মুখ থেকে। সর্বদাই বসে বসে শুধু ভাবতো আর খকরখকর কাশতো। বছর দুই না পেরাতে অতবড় জোয়ান লোকটা কেমন বুড়িয়ে ডাং মেরে গেল। এবং একদিন টুপ করে ঝরে গেল।

তার পরের অবস্থা আর কহতব্য নয়। দু'দিন না যেতেই ভিটা থেকে হটিয়ে দিল সিংহবাবু। আমরা পথে দাঁড়ালাম। দিন কতক এধার ওধার ফল-পাকুড় খেয়ে, ভিখ-সিক মেগে একেবারে হেদিয়ে পড়লাম আমরা। শুরু হোল আসল অর্থে উপবাস। পেটের জ্বালায় আমরা, যে যেদিকে মন চায় পালালাম। বড়দা কোন্ একটা মাটিকাটা দলের সাথে পালিয়ে গেল গোরাবাড়ির দিকে। সেখানে কংসাবতীর উপর ড্যামের কাজ চলছে। মেজদা ছিল চিররুগ্ণা। সে সিমলাপালের বাজারে চট বিছিয়ে ভিখ মাগতে লাগলো। আমার তলার ভাইটার তখন বছর সাত-আট বয়েস। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতো। ফল-পাকুড় পেড়ে খেতো। শিলাবতীর ঝিরঝিরে জলে ন্যাকড়া দিয়ে মাছ ধরতো। একদিন রিঠা ফল পাড়তে গাছে উঠেছিল সাহেব বাঁধের পাড়ে। মাচাতোড়ার গুচ্ছাতদের সেজ বৌয়ের মাথা ঘসবার জন্য। মাত্তর এক কাঁসি পান্তাভাতের লোভে। পা ফসকে পড়লো মাটিতে। বাপু বলবার সময় ছিল না। মুখে রক্ত উঠলো ঝলকে ঝলকে! আমি তখন বাঁশকানালী গাঁয়ে শক্তি চঁদের ইস্টেটে পেটভাতুয়ায় থাকি। ওদের ছাগল-টাগল চরাই। ছা-ছাওয়াল ধরি। খবর পেয়ে ছুটে গেলাম মাচাতোড়ায়। চোখের জলে বুক ভাসালাম। শক্তি চঁদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা কর্জ নিয়ে সংকার করলাম ভাইকে। তারপর ফিরে এলাম জিরাবাইদ। আর দিদি— যার জন্য সতীকান্ত সিংহবাবুর কোপে পড়ে আমাদের হেন দুরবস্থা— তার ঠাঁই হোল পাঁচ থান ঘুরে সিংহবাবুদের বাখুলে। দিদি তখন চারপাশের গাঁ'গুলোতে পাগলিনীর মতো ঘুরছিল। কোনও ভদ্র ঘরে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটালির বদলে একচিলতে আশ্রয়ের তরে। কিন্তু দিদিকে ঠাঁই দিতে ভরসা পায়নি কেউ। দিদি যে ঘরে ঠাঁই নেবে, সেই ঘরেই তো আনাগোনা জুড়বে সতীকান্ত সিংহবাবু। কালে কালে তার দৃষ্টিখান্ দিদিকে ছাড়িয়ে ঐ বাড়ির অন্যদের ওপর পড়াও বিচিত্র নয়। আরে রামো কহো। ঘরে হাঁস-মুরগীর ভাড়ি বানিয়ে কে আর শিয়াল আমদানি করতে চায় নিজের ভিটায়!

গাঁয়ে গাঁয়ে ঠাঁই না পেয়ে দিদি দিনকয় ছিল সিমলাপাল বাজারের হরিবোল মেলায়। সেখানে প্রথম রাতে হাজির হোল লক্কা পায়রার মতো একদল ছোকরা। পরের রাতে ওদের হটিয়ে হরিবোল মেলার দখল নিল একদল খাঁকি। খাঁকি চোখের আড়াল হতেই এলো এক দালাল। সে দিদিকে নিয়ে যেতে চায় কোলকাতায়। সেখানে নাকি অতুল সুখ, বৈভব। দিনের বেলায় যেমন তেমন। রাতটি হলেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যায় দিদি। বুকের মধ্যে একটা জন্তু যেন হাঁচোড়-পাঁচোড় মাটি আঁচড়ায়। গর্ত খোঁড়ে। সারারাত।

শেষ অবধি সতীকান্ত সিংহবাবুর দুয়োরেই মাথা খুঁড়তে হোল দিদিকে। এমনিতে পেটের জ্বালার তুল্য জ্বালা নাই এ দুনিয়ায়। মানুষের ইহকাল-পরকাল ভুলিয়ে দেয়— ঠাঁই নিতে হোতই, কোথাও না কোথাও। দালালের সাথে কোলকাতা যাওয়ার চেয়ে এ বরং ভালো। কথায় বলে অচেনা দহ আর চেনা শ্মশান, দুটোই ভয়ের। দিদির কাছে এ হোল অচেনা দহর বদলে এক চেনা দহ।

সিংহবাবুদের গড়ে থাকাকালীনই একদিন গলায় দড়ি দিয়েছিল দিদি। জিভ ঝুলে পড়েছিল হাতটাক। চোখ বেরিয়ে এসেছিল কোটর ঠেলে। যে দেখেছে, সে-ই আঁতকে উঠেছে।

সাহেব বাঁধের পাড়ে দেখা হতেই তারিণী ওঝা আমায় একান্তে বলেছিল, শুধু তুয়ার দিদি লয়। পেটের মইধ্যেও একটা মইর‌্লো উই সাথে।'

শুধু তারিণী ওঝা নয়, তল্লাটের সব্বাই জানতো ওটা আত্মহত্যা নয়। দিদিকে মেরে ওরা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়িতে। সে নাকি সতীকান্ত সিংহবাবুর হাজার পীড়াপীড়িতে পেট নামাতে রাজি হয়নি। ফলে, সিংহবাবুর বংশের 'মর্যাদা' রাখতে মরতে হোল দিদিকে।

আমি তখনও বাঁশকানালীর শক্তি চঁদের দোরে পেটভাতুয়া আছি। খবরটা তারিণী ওঝার মুখে শোনামাত্তরই ছুটে গিয়েছিলাম জিরাবাইদ গাঁয়ে, ওরা লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। আমার জীবনে এই প্রথম শরীরের তাবৎ রক্ত উথালপাতাল। মাথায় জ্বলন্ত রাবণের চিতা। শয়তান জেগে উঠেছে মনে। প্রসন্ন ঠাকুরের আমবাগানে তপ্‌নি-ভাটের ঝোড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম সারারাত। হাতে নিলাম মাছ মারবার কাঁচা। ঐ পথ দিয়েই সতীকান্ত সিংহবাবু আনাগোনা করে রোজ। আম বাগিচার পশ্চিম কোণেই ওর এক রাঁঢ়ের ঘর। কিন্তু না। আমার কপাল মন্দ। পরপর তিনচার রাত উজাগর হয়েও ধরতে পারলাম না সিংহবাবুকে। শালা বোধ লেয় কোনও কিছু আন্দাজ করে সতর্ হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ফের ফিরে এলাম শক্তি চঁদের গুড়ের মহালে। সেখানে দিনভর গুড়ে জাল দিতে দিতে রাগের ফেনাটা মরে গেল দু'দশ দিনেই। আসল রাগটা ক্রমশ আঠা-গুড়ের মতোই গাঢ় হতে লাগলো। একটি ছবি বুকের মধ্যে ছিলই। একটা খালমুয়া সব-খাউকী বিকালের ছবি। একটা পুরুষ্টু ধানের চাক। আর থোড়ে থোড়ে গাঢ় দুধ। এক বিকালের মধ্যে শতচক্ষুর সুমুখে উড়ে গেল, যেন সতীকান্ত সিংহবাবুর অম্বুরী তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়া হয়ে। এর সঙ্গে আর একখান্ ছবি যোগ হোল। ফুলের মতোন একটি মেয়া উঁচু কড়িকাঠে অসহায় ঝুলছে। তার জিভ ঝুলে পড়েছে। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কোটর ঠেলে। তার পেটের মধ্যে নিষ্পাপ এক শিশু।

।। তিন।।

প্রহরাজের বউটা বড় আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। আমারই ঘরের দাওয়ায় আমার পা'দুটো জাপটে ধরে কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতে লেগেছে। কিছুতেই প্রবোধ দেওয়া যাচ্ছে না তাকে। হাজার হোক, মেয়ামাইন্‌ষের প্রাণ। সোয়ামীর অমন দগ্ধে দগ্ধে মরণ। চরম অসতীও সইতে লারে। এ'তো ফের ভালা ঝি। গরীব হলেও উত্তম বংশে জনম।

ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিই আমি। বলি, 'মেয়া তুই কাঁদিস না। প্রহরাজ ছিল আমার মাইন্দার। সে বিহনে তুয়ার সব দায়-দায়িত্ব আমার। সেটুকু মনুষ্যত্ব আমার আছে বটে। বিশ্ব-সনসার জানে সেটা। মাইন্দারী কর্‌্যে কর্‌্যে এ থানে উইঠেছি আমি। মাইন্দারের জীবনের দিগ্‌দারিটা বুঝি।'

প্রহরাজের বউয়ের কানে ঢোকে না বুঝি সেসব কথা। সে কেবল অবোধের মতোন ফুলকুলিয়ে কেঁদে যায়। মেয়ার মনটা ভারি নরম। মায়া-মমতাও অঢেল। আমি জানি। তিল তিল করে আমার মনে তেমন প্রত্যয় জন্মেছে। সে ঘটনাগুলো বড় মনে পড়ছে আজ।

আমার গুড়ের মহালে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল তিন। ক্ষুদিরাম সিং আর গুলু মাঝি ছিল মহালের মাইন্দার। আর প্রহরাজ বেজ ছিল রাতের জাগুয়া। জাগুয়া হবার যোগ্য মনিষ্যি সে বটে। ইয়া বড় ছাতি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মুগুরের পারা বাহু। আকাট জোয়ান সে। সাহসও ধরে মনে। আর, নিজের কাজটি চেনে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। রাতের বেলায় সে দু'চোখের পাতা এক করে না। ছিঁচকে চোর-বাটপাড়দের যম সে।

মহালে মহালে চুরির হিড়িক পড়েছে। আমার ভরসা প্রহরাজ বেজ।

ঐ আনন্দেই ছিলাম। কিন্তু আনন্দটা মাটি করে দিল সিমলাপাল থানার বাঁটুল সিপাই। থানার পাশেই পঞ্চাৎ অফিস। গেটের সুমুখে খাড়া হয়ে দাঁত খোঁটাচ্ছিল বাঁটুল সিপাই। আমাকে দেখে দাঁতের কানাচে হাসলো।

বললো, 'মাস মাইনে দিয়ে পাহারাদার পুষছো রাবণ। রাতে পাখি খাঁচায় থাকে তো? নাকি পাখনা মেলে ফুরুৎ!'

প্রবল ধন্দের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে শুধোই, 'তার মানে?'

'মানে, তিন রাত পরপর গিয়েও তাকে মহালে পাইনি।' বাঁটুল সিপাই আবারো হাসে।

মালের লোভে এরা রাতের বেলায় মহালে মহালে ঘুরে বেড়ায়, এটা ঠিক। শুধু শুধু মিছে বলবার লোক নয় এরা।

আমি মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম।

সেই রাতেই বেরোলাম আমি। মহালে পৌঁছে দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে এলো। মহাল খাঁ খাঁ। কুমা'র মধ্যে কেউ নেই। তিনটে কুঠরীই বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

সকাল হতেই প্রহরাজকে তলব দিলাম বাখুলে। বাঘের ঝাপট নিলাম ওর ওপর। অতবড় জোয়ানটা আমার ধমক-ধামকের মুখে সারাক্ষণ মাথা হেঁট করে খাড়া রইলো। শেষমেষ অধোবদন হয়ে লজ্জায় সরে যেতে যেতে বললো, 'বউটা, আইজ্ঞা, রাতের বেলায় একলাটি রইতে লারে।'

রোগটা এতক্ষণে ধরা পড়েছে আমার কাছে। গেল ফাগুনে বিয়া করেছে প্রহরাজ বেজ। ফাগুনের বউ আগুন। তা সে বউ নাকি সত্যসত্যই এক আগুনে খাপ্‌রা। শোনা কথা। চর্মচক্ষে দেখি নাই। তো, এই কারণে প্রহরাজ রাতের বেলায় মহাল ছাড়ে? আমি তাকে এই মারি তো সেই মারি। শালা মোর হাজার টাকার চিজ রইলো মহালে। আর তুই চইল্‌লি বউ'র কোড়ে শুইতে! কালকেই শালা ডাইরী কইর্‌বো তুয়ার নামে। মহালে চুরি হল্যে তুয়াকে বি'বাঁধবেক পুলুশ। মুখের ধমক দিই বটে। কিন্তু মনে মনে হাসি। ঘরে সাক্ষাৎ আগুনের খাপ্‌রাটি গণগইন্যা হয়ে জ্বলবেক রাতভর, আর প্রহরাজ বেজ লিত্যিদিন শরীরের সখ-সাধ চেপে পাহারা দিবেক আমার গুড়ের মহাল! তাও কি হয়? নিজে বিয়া-থা না করলেও সেটা আমি বুঝি। কিন্তু এক্কেরে ঢিলাও দেওয়া যায় না। মহালটি লাটে উঠবে তা'লে। তাছাড়া মাসটি গেলে বিশটি টাকা দিচ্ছি ওকে। ছ'মাসের আগাম নিয়েছে। করকরে একশো বিশটি টাকা। সে তো আর লিত্যিদিন বউয়ের কোড়ে গিয়ে শোবার তরে নয়। কাজেই ফোঁস করতেই হয়। ধমকধামক খেয়ে সে দু'রাত মহাল জাগে তো তৃতীয় রাতে বিগড়ায়। আমি বিষম ভাবনায় পড়ি।

মাঝে মাঝে ওই আগুনে খাপ্‌রাটিকে একটিবার দেখতে সাধ হয়। দেখি কেমন সে মেয়া, কি উয়ার অপার মায়া, যার তরে বাঁধা চাকরীকে তুচ্ছ করে প্রহ্‌রাজ বেজ ফি রাতে পালায় কাজের থান থেকে উয়ার সঙ্গ-লালসায়।

একদিন কানে এলো, প্রহ্‌রাজের নাকি বেজায় জ্বর। শুনে গেলাম ওর বাড়ি। প্রহ্‌রাজের বউ তড়িঘড়ি আসন এনে পেতে দিল দাওয়ায়। ঘটিতে জল এনে বসিয়ে দিল সুমুখে। আমি নয়ন ভরে দেখলাম ওকে। ডাগর-ডোগর শরীরে যৌবনের ভিয়েন চড়েছে যেন। কারণে-অকারণে হাঁসের মতো পায়ের পাতা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রহ্‌রাজের বউ। আমি ওকে পলকহীন দেখতে থাকি। দেখতেই থাকি। একসময় ট্যাক থেকে ফস্‌ করে বের করে ফেলি একটি পাঁচটাকার নোট। বউকে কাছে ডাকি। হাত পাতলে বলি। নোটখানা গুঁজে দিই ওর হাতে। অল্প দূরে বসে বসে কুলকুচো করছিল প্রহ্‌রাজ বেজ। লাজুক হেসে শুধোয়, 'ফের টাকা কিসের লেগে আইজ্ঞা?'

'পরথম্‌ এল্যাম্‌ যে। বউয়ের মু' দেখত্যে হয় টাকা দিয়ে।'

টাকাটি বামহাতে মুঠো করে ধরে বউ গড় হয়ে প্রণাম করলো আমাকে। আমি মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করি।

বলি, 'বাহ্‌! ভারি সুলক্ষণা মেয়ে। সর্ব অঙ্গে সুলক্ষণ। বাঁইচে থাকো মা।'

অতঃপর প্রহ্‌রাজের শরীরের খোঁজ-খবর করি আমি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর ব্যারামের সুলুকসন্ধান নিই। উঠোনে নামতে নামতে বলি, 'ভয় নাই তুয়ার। আমি তো আছি। ফের বৈকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো। চলি বৌমা।'

অমন উদার 'গলা' (মালিক) ক'জনের কপালে হয়? প্রহ্‌রাজ আর তার বউ কৃতজ্ঞতায় গলে যেতে থাকে।

জ্বর সারলে প্রহ্‌রাজ ফের যোগ দিল কাজে। একটা ছোট্ট কলসীতে সের দুই গুড় ভরে তুলে দিলাম প্রহ্‌রাজের হাতে। লিয়ে যা। বউমা গুড়-মুড়ি খাবেক।

দিন দুই বাদে সেই গুড় ফিরে আসে কলাপাতার ঠোঙায় গুড়পিঠা হয়ে।

প্রহ্‌রাজ বলে, আপনি মু' দেইখ্‌বার টাকা দিছলেন। উই টাকায় তেল আর আওয়াচাল কিনেছে মেয়া। আর আপনার দিবা গুড়। তিনে মিলে এই গুড়-পিঠা।'

শুনতে শুনতে আমার মনে পুলক আর ধরে না। মুচকি হেসে বলি, 'অমন গুড়পিঠা পেইলে আমি রোজ্ঞ রোজ্ঞ গিয়ে বৌমাকে মু'দেখানি টাকা দিয়ে আসবো।'

শুনে প্রহ্‌রাজ বেজ হল্‌দে দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'আপনার বৌমা বলে, একদিন আপনাকে পাত পেইড়ে খাবাব্যেক্‌। মুর্‌লা মাছের টক রাঁধবেক পাকা তেঁতুল দিয়ে। আলতি দিয়ে মৌ-ডাল ছাতুর ঝাল। কাল্লা দিয়ে লটিয়া শাক। আমচুর দিয়ে মুসুর-কলাইয়ের ডাল—।'

'শুইন্‌তে শুইন্‌তে আমার জিভে জল সরে রে। আহা। ঝিমির ঝিমির পানি হবেক। তখন আমচুর দিয়ে মুসুর-কলাইয়ের ডাল। সাথে টুকচান পস্ত দিয়ে চুড়চুড়ি খাতোন। আ—হা! তা, কবে? সিট্যা হব্যেক কবে? বৌমাকে শুধাই আইবি কাল।'

লাজুক লাজুক গলায় আকাট জোয়ানটা বলতে থাকে, 'তুমার তরে বড় দুখ্‌ করে তুমার বৌমা। বলে, আহারে, বেবসাপাতি, গুড়ের মহাল, দু'পাকিটে টাকা, — কিন্তু টুকচান আদর সুহাগ দিবার কোউ নাই বিশ্ব সম্‌সারে। একটা বিয়া-থাও করলেক নাই ইখন তক্কো।'

শুনতে শুনতে মনটা যেন ভুয়াশ গাছের কোটর। কেমন খাঁ খাঁ, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সারা জীবনটাকে মনে হয় যেন এক বগ্‌চরা বিল। যুঝতে যুঝতে কবে চলে গেল বিয়ার সময়? শক্তি চঁদের মহালে? ব্যাঙ্ক বাবুর পশ্চাতে? কে জানে!

কোনও গতিকে মনের কথা চেপে বলি, 'উ'সব কথা ছাড়্‌তো। আগে বল্, উই মুরলা মাছের টক কবে খাবাবেক আমার বৌমা?'

।। চার ।।

শক্তি চঁদের মহালে রসে জ্বাল দিচ্ছিলাম সকাল থেকে। এখন বৈশাখ মাস। তাল গুড়ের সময়। উনানে ডেগ্ চাপিয়ে তালরস ছেঁকে ছেঁকে ঢালি। জ্বাল দিতে থাকি উনানের পেটে। রস ফুটতে ফুটতে গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু সে যে কি কষ্টের কাম! রোদের তাপ বাড়তে না বাড়তেই সারা অঙ্গে জ্বালা ধরে। তার ওপর আগুনের তাপ। আঙ্‌রা পোড়া হয়ে যায় শরীর। আগুনের বেষ্টনীর মধ্যে কেটে যায় দিন-রাত-মাস-মরসুম।

একদিন দুপুরবেলা তলব এলো শক্তির চঁদের বাখুল থেকে। বিডো সাহেব এসেছেন। তাঁকে জীপে তুলতে যেতে হব্যেক্। সাহেবদের মহিমা আমার ভালোই জানা আছে। মাঝে মাঝে এক ব্যাঙ্কের বাবু আসেন শক্তি চঁদের দুয়োরে। 'সাহেব-বাঁধের' পাড়ে থাকেন তাঁর ভুটভুটি। কেজি দুই গুড়, লবাং, আধসেরটাক নিমফুলের মধু কিংবা খড়ে জড়ানো পাকা রুই মাঝে মাঝেই পৌঁছে দিতে হয় আমাকে ভুটভুটির পাশে। আজ দেখলাম বিডো সাহেব বসে রয়েছেন শক্তি চঁদের বারান্দায়। সামনে রাখা মাটির কলসীতে গুড়। সের পাঁচেক। পাতার ঠোঙায় লবাং।

বিডো সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলাম সাহেবের সুটকেশ। ডান হাতে গুড়ের কলসীখান্ তুলতে যাচ্ছি সাহেব বললেন, 'ও গুলো থাক। তাহলে, শক্তিবাবু, এবার থেকে মজুরদের খাতাপত্রগুলো ঠিকঠাক রাখবেন। একবার ছেড়ে দিলাম। বারবার দেব না।' আমি তো থ'! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, এ কেমন ধারা সাহেব? অগত্যা সুটকেশখানা বাগিয়েই হাঁটতে থাকি সাহেবের পিছু পিছু। মাথার ওপর সূয্যিদেব জ্বলতে থাকেন।

হাঁটতে হাঁটতে সেই পুরানো লোভখানা ভুট কাটলো মনে। ব্যাঙ্কের বাবুকে যে আর্জিটা জানিয়ে জানিয়ে থকে গেছি, সেটাই ফের উগ্‌রে বসলাম বিডো সাহেবের সাক্ষাতে।

'একটা লোন-পাতি কিছো কইরে দ্যান আইজ্ঞা। এই চৈত-বৈশাখের রোদ-গরমে দিনরাত একঠাঁই আগুনের পাশ বইসে বইসে রক্ত আম্‌শা ধইরে গেল।'

বিডো সাহেব শুধোন, 'তোর নাম কি?'

আমি বলি, 'অধমের নাম আইজ্ঞা, রাবণ মাজি।'

বিডো সাহেব শুধোন, 'এখানে তোর মাইনে কত?'

'মাইনা নাই আইজ্ঞা। আমি চঁদের দুয়ারে পেটভাতুয়া।'

অল্প চমক খেলেন বিডো সাহেব, 'মানে? মাইনে নেই?'

'লয় অইজ্ঞা। ছা' বেলায় ছুটভাইটা গাছ থিক্যে আছাড় খেইয়্যে মরলেক। উয়ার সংকার কইর্‌তে বিশ টাকা লিল্যাম্ শক্তি চঁদের পাশ থিক্যে। সে কর্জ সুদে-আসলে শোধ হইল্যে পয় মাইনে দিবেক্।'

বিডো সাহেবের চোখ কপালে উঠে যাচ্ছিল। বললেন, 'কর্জ শোধ আর কত বাকি?'

'সে আমি কি জানি? চঁদবাবু জানে বটে।'

গুম মেরে গেলেন বিডো সাহেব। হাঁটতে লাগলেন চুপটি করে। একটু বাদে বললেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ দিলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি?'

শুনে আমার ছাতি কাঁপে। ডর লাগে। ফের লোভ হয়। জবাব দিই না।

বিডো সাহেব বলেন, 'টাকা পেলে কি করবি?'

ভেবে-টেবে জবাব দিই, 'একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া খাটাই আইজ্ঞা। ইদিগ্ সম্বচ্ছর গুড়ের মরসুম। তা বাদে মাছের ডিমের পাউস আছে আনেক। ঘোড়াগাড়ির চাহিদা খো-ব।'

'আমার নাম করে একটা ফরম্ আনিস ব্যাঙ্ক থেকে। বলবি, মৈত্র সাহেব পাঠিয়েছেন।'

বিডো সাহেবের দয়ায় ঘোড়ার গাড়ি পেলাম ব্যাঙ্ক থেকে। মাসে দেড়শো টাকা শোধ দিতে হবে। শক্তি চঁদ তো রেগে কাঁই। শালা, নিমকহারাম। জেলের ঘানি টানাবো তুয়াকে। মৈত্র সাহেব আর ক' দিন? তারপর তুয়াকে কে বাঁচায়?

চৈত-বৈশাখে দেদার তালের রস নামে। মহালে মহালে গুড় হয়। আবার কার্তিক থেকে মাঘ অবধি খেজুর গুড়। গুড়ের টিনে গাড়ি বোঝাই করে আমি জোরসে ছুটাই। দিনভর। ভাড়া যা পাই মন্দ নয়। খেয়ে দেয়ে কিছু বাঁচে।

আকাট দুপুরে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে মুঝলীর চায়ের দোকানে বসে চা আর লেড়ে বিস্কুটি খাই। আরাম করি বসে বসে। ঘোড়াটা গাড়ির সাথেই বাঁধা থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঠ পুড়ায়। তপ্ত মাটিতে বেশিক্ষণ পা রাখতে পারে না। মাঝে মাঝেই পা তুলে নেয় মাটি থেকে। ক্ষুরে ক্ষুরে খটাখট আওয়াজ তোলে।

মৈত্র সাহেব মানুষটি বড় ভালো। তাই, মাসখানেক বাদে যখন একটা মহাল খোলবার লোনের জন্য আর্জি জানালাম, পক্ষাত্কে বলে করে দিলেন লোনটা। বললেন, 'ঘোড়া-গাড়িটার কি গতি হবে?'

বললাম, 'সিটা আমি যজ্ঞেশ্বর লোহারকে ভাড়ায় দুবো। মাসে মাসে ভাড়া দিবেক সে। ব্যাঙ্কের লুন তো শোধ কইরে দিছি।'

মহালটা চালু হোল। চলছেও খোব। ভিটা কিনেছি। ঘর বানিয়েছি। সহায়-সম্বল হয়েছে। তবুও যখন তখন মনটা বড় খাঁ-খাঁ করে। মনে হয়, কিছুই যেন নাই আমার। সবাই বলে, 'ইবার একটা বিয়া-টিয়া কর হে রাবণ। বংশে বাতি দিবেক কে?'

শুনে মনটা খারাব হয়ে যায়। ফোঁপরা বাঁশের মতোন বাজে। আড়াই কুড়ি উমর হোল আমার। বিয়া করবার কি আর বইস্ আছে?

।। পাঁচ।।

মুর্‌লা মাছের টক খেয়ে ফের নিমপাতা দিয়ে সইজ্‌না ডাঁটার শুক্তানি খাওয়ার সাধ জাগলো মনে। তার পর বেশি পরিমাণে রসুন দিয়ে বগা লাউয়ের ছেঁচকি। তারপর জলা গুড় দিয়ে মুড়ির ছাতু। সিঁদুর-পাকা আমের সাথে ধবলী গাইয়ের মারা দুধ...।

প্রহরাজ বেজের যদ্দিনে হুঁশ হোল, তদ্দিনে মাছির পা আটকে গেছে গুড়ে। প্রহরাজ লোকটার যেমন ষাঁড়ের মতো বল, তেমনি ষাঁড়ের মতো গোঁয়ারও। আর গোঁয়ার লোকগুলো যেমন সরল, ক্ষেপে গেলে তেমনি বিপজ্জনক। বউটাকে গুমসে গুমসে আম ছ্যাঁচা করলো প্রথমে। তার পর রাতের বেলায় হেতার নিয়ে বসে রইলো সাহেব বাঁধের পাড়ে। নিজেকে দিয়ে বুঝি তো। ঐ ক্ষণটা বড় খ্যারাব। দিদি যেদিন মরলো, সেদিন রাতে সতীকান্ত সিংহবাবু প্রসন্ন ঠাকুরের আমবাগিচা দিয়ে হাঁটলে ঐ রাতেই খতম হয়ে যেতো। বাপ বলে আর উঠে দাঁড়াতে হোত না। ভাবলাম, নাহ্। সংযম হারানো ঠিক লয়। আজকের রাতে ফিরে যাওয়াই উচিত। বড় কষ্টে কাটলো সারা রাত।

একদিন সকালবেলা প্রহরাজ এসে হাজির। আমি তখন উঠানের আকোড় গাছটার তলায় বসে খিয়ান জালখানা সারাচ্ছিলাম মনোযোগ দিয়ে।

বললাম, 'কিরে? সকাল সকাল বড় যে?'

চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো প্রহ্‌রাজ।

বললাম, 'দাদন-টাদন এখন হবেক্ নাই। আগের গুলান আগে শোধ কর্।'

প্রহরাজের মুখখানা গম্ভীর লাগছিল। রগের শিরা টানটান। একটুখানি চুপ থেকে আচমকা বলে উঠলো, 'একটা কথা জিগারার লেইগ্যে এলাম্।'

'কি কথা?'

'বউ ক্যানে লিদের ঘোরে তুমার নাম আউড়ায়?'

আমি চমকে উঠি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি প্রহরাজের দিকে। তারপর হা-হা রবে হেসে উঠি।

'অউড়ায় নাকি? আমার নাম? তুই শুইনেছিস?'

নীরবে মাথা দোলায় প্রহরাজ। শুকনো খটখটে গলায় বলে, 'কিন্তু আউড়ায় ক্যানে? সিট্যা বল।'

আমার মনে পুলক আর বাগ মানছিল না। আড়চোখে প্রহরাজকে একবার দেখে নিয়ে বলি, 'সিট্যা আমি জানবো ক্যামন কর্যে?' মিচিক মিচিক হাসি আমি, 'তুয়ার বৌকে জিগাস্ নাই?'

'জিগাইছিল্যম্। শালী বলে, স্বপনের কথা আমি কি জানি?' বলতে বলতে প্রহ্‌রাজের মুখ অসহায় হয়ে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'আমার বৌটাকে তুমি ছেইড়ে দাও রাবণ। সে তুমার মেয়ার মতন।'

'এই দ্যাখ্।' আমি নাচার হয়ে বলি, 'শুধুমুদু আমাকে দোষ দিস্ তুই। যাহ্ শালা, ঘরে যা।' আমি ফের ফাতি চালাতে থাকি জালে।

অল্পক্ষণ চুপ করে খাড়া থেকে ঘরের দিকে পা বাড়ায় প্রহরাজ।

'একটা কথা।' আমি পেছন থেকে ওকে ডাকি, 'তুই বাপ্ আজ ফের ধরা পইড়্লি আমার পাশ। মহাল ছেইড়ে ফের ঘর পালাচ্ছু তুই। তা না'লে স্বপনের কথা জানলি ক্যান্নে?'

প্রহরাজ দাঁড়ালো বটে। তবে জবাব দিল না আমার কথার।

আমি খিঁচিয়ে উঠি, 'অমন করল্যে ঘাড়টি ধরে দূর কইর়ে দুবো মহাল থিক্যে। আর একটা দিন দেখি। ভাত ছড়ালে আমার কাগের অভাব হবেক নাই।'

মাথা নিচু করে প্রহরাজ পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল আমার উঠান থেকে।

বললাম, তাড়াবো, তা বলে কি সত্যি সত্যিই তাড়াবো? তাই কি আমি পারি? এককালের মাইন্দার হয়ে মাইন্দারের চাকরি খাবো আমি? তাছাড়া প্রহ্‌রাজকে তাড়ানো মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াট মারা। আমি তাড়ালে সে অন্য মহালে গিয়ে মাইন্দারের কাজ নেবে। রাত কাটবে নিজের ঘরে। আর মানে আমার ইহকাল ফর্সা। এখন তবু রাতগুলোতে ভাগাভাগি করে চলছে। না, প্রহরাজ বেজকে তাড়ানো যাবে না। তার বদলে, দরকার হলে, আরো দাদন দিয়ে ওকে পাকে-প্রকারে বেঁধে ফেলতে হবে।

পাশের গাঁয়ের যজ্ঞেশ্বর লোহার আমার প্রাণের বন্ধু। শক্তি চন্দের মহালে বহুদিন পাশাপাশি গুড় পাক করেছি দু'জনে। এখন আমার ঘোড়ার গাড়িখানা ওই ভাড়ায় চালায়।

যজ্ঞেশ্বর একদিন সঙ্গোপনে বললো, 'মানুষকে কব্জা করতো হইলে লিশা খাবাও হে। লিশার পাশ দ্যাব্তাও জব্দ।'

সিংহবাবুর বাড়িতে এ টা চন্দনা ছিল। খাঁচার মধ্যে নয়। বাবুদের বাগানে ওড়াওড়ি করতো। কিন্তু পালাতো না। দিনের মধ্যে রোজ দু'বার একটি নির্দিষ্ট টাইমে সে অন্দরমহলে গিয়ে দানাপানি খেতো। তারপর ফের উড়ে যেতো বাগানে। ভারি অবাক লাগতো আমার। বাঁধা নেই, ছাঁদা নেই, ড্যানক্ ছাঁটার বালাই নেই, পাখি তবুও পালায় না। পরে জেনেছিলাম, পাখিটাকে আফিম খাওয়াতো ওরা। আফিমের নেশার কাছে বশ ছিল ওটা।

কাজেই যজ্ঞেশ্বরের কথাটা মনে ধরে আমার। কয়েক বোতল দেশী নিয়ে ঘড়িটাক রাতে গেলাম মহালে। প্রহরাজ তখনো ঘরের দিকে পা বাড়ায়নি। আমাকে দেখে অবাক।

বললাম, 'মনটা ভালো নাই রে প্রহরাজ, ভালো নাই। আজ আমি থাইক্‌বো মহালে। ছুইটে যা দেখি। হাইস্কুলের পাশ থিক্যে একঠোঙা ফুলরি কিনে লিয়ে আয়। এই লে টাকা।'

ফুলরি দিয়ে মদ খেতে লাগলাম আমি। প্রহরাজ পাশটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ভুলভুল করে।

বললাম, 'আয়, বস্।' বসলো ও।

বললাম, 'খা'। ওর লাজ-সঙ্কোচ যায় না তখনো।

বললাম 'খা না। লজ্জা কি? আমি অত মালিক-চাকর বুঝি না। আরে দু'দিন আগে তো চাকরই ছিলাম। শক্তি চঁদের গুলাম।'

বলতে বলতে একটা বোতল এগিয়ে দিলাম প্রহরাজের দিকে। বোতলটা খুলে ঢকঢক করে দু'ঢোক খেলো প্রহরাজ।

'শক্তি চঁদের মহালে রস জ্বাল দিতে দিতে আমার সর্বাঙ্গের চাম সিদ্ধ হয়ে যেতো।' আমি পুরোনো দিনের কথা পাড়লাম, 'একদিন ভোখের জ্বালায় এক মগ রস খেইয়েছিলাম্ বলে শক্তি চঁদ মু' চিরে ঢেলে দিয়েছিল এক মগ গরম গুড়। মু'য়ের সেই পুড়া দাগ, এই দ্যাখ, ইখনো রয়্যেছে ঠোঁটে, নাকে, গালে। এই দ্যাখ্। এই দ্যাখ্।'

বলতে বলতে গলা ধরে আসে আমার। চোখের কোনা চিকচিকিয়ে ওঠে। বুঝি, নেশাটা হচ্ছে। নেশা হলেই আমার ভিতরের বহুৎ কিছু ভুড় মারতে মারতে উঠে আসে ওপরে। কিছু কিছু গুপ্ত ইচ্ছা প্রকট হতে থাকে।

একটা নতুন বোতল খুলে দু'ঢোক গলায় ঢেলে বলি, 'খেজুর গাছের তব্যে দয়া মায়া আছে, বল্? শীতকালেই বেশির ভাগ রস পয়দা করে। শীতের রস জ্বাল দিতে অত কষ্ট নাই। আগুনের পাশে আরাম। দয়া নাই তাল গাছের। শালা ঘোর বৈশাখে রস ঝরাবেক। বৈশাখে বলে এমনিতেই মাইনষের অঙ্গের চাম সর্বক্ষণ জ্বইল্‌ছে। উয়ার মধ্যে রস জ্বাল দাও দিনরাত। শালা বেআক্কেলে গাছ। গাছ বলে তুমার একটা বেবেচনা থাইক্‌বেক নাই হে!'

প্রহরাজ নিঃশব্দে খাচ্ছিল। ওর সারা মুখে ঘাম জমছিল। চোখের লালিটা গাঢ় হচ্ছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। বিড়বিড় করে বললো, 'এ দুনিয়ায় কারই বা বেবেচনা আছে? সব শালা মা-নেইগাকে চিনা আছে!'

এমন কথায় বড় ব্যথা পেলাম আমি। মানুষ জাতের ওপর প্রহরাজের ঘৃণা যে মলত আমাকে কেন্দ্র করেই, সেটা বুঝি। একটা আলতো ঢেঁকুর তুলে আমি তাকালাম ওর দিকে। মনটা কেমন হাল্কা লাগছে। ভাবনাগুলান যেন শিমূল তুলার মতোন ফুরফুরে হয়ে উড়ছে মগজে। বড় উদার উদার লাগছে নিজেকে।

বললাম 'একটা কথা তুয়াকে সোজাসুজি বলি প্রহরাজ। তুয়ার বউটাকে দেইখে ইদানিং ফের বিয়ার ইচ্ছা জেইগছে রে। বড় ভালা বটে তুয়ার বউটা। অর্থাৎ কিনা আমার বৌমাটা। কেমন বাঁশপাতির পারা নাক। চালতা ফুলি মুখ। জামিরের কুয়ার পারা ঠোঁট...।'

প্রহরাজ নিঃশব্দে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমার মুখে নিজের বউয়ের অঙ্গের বাখান শুনছিল মন দিয়ে।

ফিক করে হেসে বললাম, 'তুই দেখিস নাই?'

প্রহরাজের মুখের সে ধার নেই এখন। চোখেও নেই সেই আগুন। তার বদলে ঘোলাটে চোখে একধরনের ভোঁতা নজর। চাল ধোওয়া জলের মতন। মাথা নাড়তে নাড়তে প্রহরাজ বললো, 'লয়। দেখি নাই।'

'ধুশ্ শালা!' আমি ঢোক দুই খাই। তারপর ওর কাঁধে চাপ্পড় মেরে বলি, 'ইসব না ভাইল্লে বউ তো রাতের বেলায় আমার নাম আউড়াবেক্ই।'

কেমন অসহায় লাগছিল প্রহরাজকে। ঢুলু-ঢুলু চোখে একধরনের বোবা যন্ত্রণা। একটা চার পা বাঁধা শুয়ারের মতোন লাগছিল ওকে। সহসা খাওয়াটা বাড়িয়ে দিল সে। এক এক ঢোকে বোতলের মাল নাবতে লাগলো তলায়। মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে ঢুলতে লাগলো ও।

এক সময় মুখ তুলে ফিক্ করে হাসলো। বললো, 'তুমাকে একটা কথা বলি নাই।'

আমি চোখ তুলে তাকাই, 'কি কথা? বল্!'

হি-হি করে হাসলো প্রহরাজ। তারপর বললো, 'আমরা আর নাই থাকবো ই-তল্লাটে।'

'মানে?' আমি ভীষণ চমকে উঠি।

'আমরা চল্যে যাবো বেলিয়াতোড়। সিখ্যেনে আমার একটা মামু আছে না? উয়ার তো ছেইলা-পুইল্যা নাই। উ' আমাদেরকে জমিন দিবেক। ঘর কইরে দিবেক।'

হি-হি করে হাসতে লাগলো প্রহরাজ। আমার চুপসে আসা মুখখানার দিকে তাকিয়ে সহসা হাসিখানা বেড়ে গেল তার। বললো, 'মামু কয়, প্ররাজ রে, এ শালা মহাল পাহারা দিতে দিতে কবে না কবে চোরের হাতে মরবি তুই। তার চে আমার ঘরে চল্। কথাটা তুমার পাশ ভাঁড়ি নাই। তুমি বাদী হবে। আজ আচমকা মু' ফুইটো বাহার হইয়ো গেল কথাটা।'

শুনতে শুনতে নেশাটা কেটে যাচ্ছিল দ্রুত। বললাম, 'চইলে যাবি মানে? আমার মহাল পাহারা দিবেক কে? ঘোর মরসুম ইখন।'

প্রহরাজ বেজ বালকের মতো সরলপ্রাণা হাসে। তারপর মাথার ওপর আঙুল তুলে দেখায়, 'উই। উ-ই যে, যিনি উপ্‌রে আছেন, তিনি জাগবেক্ তুমার মহাল।'

'থাম্। তামাশা রাখ্। সহসা জেগে ওঠে পিতল-চোঁয়া রাগ, 'আমার বকেয়া দাদন ফেরং দিয়ে তেবে লড়বি ইখ্যেন থিক্যে।'

প্রহরাজ যেন নেতিয়ে পড়েছে ক্রমশ। তারই মধ্যে বিড়বিড় করে বললো, 'দুবো। মামুর সম্পত্তিটা পেইল্যে সবার ধার মিটাই দুবো কড়া-গণ্ডায়।' বলতে বলতে খেজুরপাতার তালাইয়ের ওপর সটান শুয়ে পড়লো প্রহরাজ বেজ। শুয়েই চোখ বুজলো।

আমার ভেতরের সব কলকব্জায় তক্ষণে আওয়াজ উঠেছে ঝনাঝন্। প্রহরাজকে দু'হাতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলি, 'এই প্ররাজ, এই শালা, কবে যাবি তুয়ারা? কবে?'

আমার ঝাঁকুনিতে চোখ খুললো প্রহরাজ। যেন এই মাত্তর এক অন্য জগৎ থেকে ফিরে এলো। মুখখানা অকারণে চুষছিল সে। যেন যষ্টিমধু চুষছে। কিন্তু জবাব দেবার ক্ষমতা নেই তার। তবু কোনও ক্রমে উচ্চারণ করলো, 'ঠিক নাই। কাল ভোরেও চইলে যেত্যে পারি।' ফের বেহুঁশ হয়ে গেল প্রহরাজ বেজ।

আমার ভেতরে একটা ঘণ্টা বাজছিল অবিরাম। ঘণ্টাটা থামছিল না কিছুতেই। দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে আমি বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

এক সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে প্রহ্‌রাজের পাশটিতে গেলাম। শক্ত হাতে ওকে তুলে ধরে বসালাম। চোখ দুটো অনেক কষ্টে খুললো প্রহ্‌রাজ। পাত্‌নি কুঁচকে তাকালো আমার দিকে।

বললাম, 'কাল ভোরে গাঁ ছাড়বি শালা, আইজ রাতভর মদ গিলছিস ইখোনে? উদিকে কচি লাউডগের পারা মেয়াটা হয়তো ভয়ে-ভাবনায় কাঠ। শালা চামার। উঠ্‌। উঠ্‌ শালা ভোঁদড়।'

আমার বাখানের চোটে প্রহ্‌রাজের নেশাটা যেন অল্প পাতলা হোল। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে খাড়া হোল সে। তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের তলায়।

'আমার বউটাকে তুমি ছেইড়ে দাও রাবণদা। পায় পড়ি তুমার। তুমার ধরম হবেক্‌ হে—

আমার পায়ের তলায় শুয়ে শুয়ে কাটা পাঁঠার মতোন ছটকাতে থাকে প্রহ্‌রাজ বেজ। খানিকবাদে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি ওকে টেনে তুলি। খাড়া করে দাঁড় করাই।

বলি, 'চল্‌ বাপ। তুয়াকে বৌমার পাশ পৌঁছে দিয়ে আসি। আহা, সোনার বন্যো মেয়া সে। তুই বিহনে উয়ার চোখের কোনায় কালি জইম্‌ছে। রাত পুহালে তুয়াদ্যার কত ঝঞ্ঝাট।'

আমার কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বেরোয় প্রহ্‌রাজ। টলোমলো পায়ে হাঁটতে থাকে। আমার বাঁ-হাতে আর কাঁধে তার মুখের দুর্গন্ধময় লালা গড়িয়ে পড়ে।

উঠানের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছ। বছর দশেক বয়েস তার। চামড়ায় ফাট ধরেছে। উল্কি ছাপ পড়েছে গায়ে। লাল বিষপিঁপড়ের দল আনাগোনার পথ বানিয়েছে গাছের সারা অঙ্গে।

ঐ অবধি গিয়ে আর হাঁটতে পারলো না প্রহ্‌রাজ। গাছের গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি বলি, 'কি হোল রে? চল্‌। বউমার পাশ যাবি নাই?'

আলতো মাথা দোলায় প্রহ্‌রাজ। যাবে। মুখ দিয়ে তার গোঙানির মতো একজাতের আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

'একি ফ্যাসাদে ফেইল্‌লি বল্‌তো এই মাঝরাতে?' আমি নিজের মনে গজগজ করি, 'কাল ভোরেই যার জনম্‌ভূমি ছেইড়ে যাবার কথা, সে কিনা মাঝরাত অবধি মদ গিলে আমার ঘাড়টিতে চাপ্‌ল্যাক্‌! দাঁড়া। খাড়া হইয়েঁ থাক্‌ ইখ্যেনে। দেখি, কি বেবস্থা কইর্‌তে পারি।'

বলতে বলতে আমি ঝটিতি ঘরে ঢুকি। দু'গাছা মোটা পাটের দড়ি নিয়ে ফের ফিরে আসি তেঁতুল গাছের গোড়ায়। প্রথমে ওর হাত দু'টাকে গাছের সাথে বেড় দিয়ে পেছন দিয়ে শক্ত করে বাঁধি। বার দুই হাত নাড়ায় সে। কিন্তু বেহুঁশ ভাবটা কাটে না। তারপর তার পা' দুটোকে একসাথে কষে বাঁধি। জোড়া পা খিঁচে বেঁধে দিই গাছের সাথে।

ততক্ষণে বোধ লেয় নেশাটা খানিক কেটে এসেছে ওর। মৃদু টানাটানি জুড়ে দেয় প্রহ্‌রাজ। মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'আমাকে বাঁইধ্‌ল্যো ক্যানে রাবণদা? বাঁইধ্‌লে ক্যানে?' 'অমনি রে। ভয় পাস্‌ নাই।' বলতে বলতে ওর পরনের নৈতাখানা খুলে নিয়ে চরচর করে দু'টুকরা করে ফেলি। এক টুকরা ওর মুখের মধ্যে ভালো করে গুঁজে দিই। অপর টুকরা দিয়ে ওর মুখখানা ঠেসে বেঁধে দিই। এবার অন্য দড়িগাছা দিয়ে ওকে পা থেকে গলা অবধি গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আচ্ছাটি করে বাঁধি। বিপদের আঁচ পেয়ে তখন নিষ্ফলা ছটকানি শুরু হয়েছে প্রহ্‌রাজের। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। নড়াচড়া কিংবা কথা বলার আর কোনও উপায়ই নেই ওর।

আমার আর অল্পই কাজ বাকি ছিল। আড়ত থেকে একখানা গুড়ের পায়া এনে গাছের তলায় রাখি। তারপর খাবলা খাবলা গুড় নিয়ে মাখাতে থাকি প্রহ্‌রাজের সারা গায়ে। বেশ পরিপাটি করে মাখাই। নাকের ছ্যাঁদা, কানের গর্ত, চোখ, মুখ, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ— কিছুই বাদ দিইনা।

গুড়ের মিঠে গন্ধটা আমার নাকে ধাক্কা মারছিল বারবার। গন্ধটা চিরকালই আমার বড় প্রিয়। আহা, কি মিঠা সুবাস! তেঁতুল গাছের বিষপিঁপড়া গুলানও এই গন্ধটাকে যে কি ভালবাসে!

গুড় মাখানো শেষ হলে আমি আড়তে ঢুকি। দু'চারটা গুড়ের পায়া ফাটাই। কিছু গুড় গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। বাঁধের জলে হাত ধুয়ে মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙাগুলো ছুঁড়ে দিই জলে। তারপর ফের ফিরে আসি তেঁতুল তলায়।

গাছের ছায়ার আঁধারে প্রহ্রাজের গুড় মাখানো শরীরখানা পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কেবল, পিছু ফিরবার পূর্ব মুহূর্তে, দেখলাম একজোড় পলকহীন চোখ। ভয়ে, তরাসে, অবিশ্বাসে পাথরের মতোন থির।

আঁধার পথ ভাঙতে ভাঙতে আমি এগোচ্ছিলাম প্রহ্রাজের বাড়ির দিকে। প্রহ্রাজের বউটা নিশ্চয় এতোক্ষণে ভয়ে-তরাসে কাঠ। রাতের বেলা একলা থাকতে ভারি ডর লাগে সে মেয়ার। ইচ্ছে করছে, আজ রাতে টুকচান সাহস জুগাই তাকে। কিন্তু না। ঘরের কাছটিতে এসেই সামলে নিলাম নিজেকে। আজ রাতে কদাচ লয়। সতীকান্ত সিংহবাবু বার বার বলতেন, 'কোনও অবস্থাতেই সংযম হারাতে নাই।' যে রমণীর সোয়ামী মরছে শীতের রাতে, গাছের তলায়, নিঃশব্দে, উয়ার সাথে সহবাস! কদাচ লয়। সংযম মাইন্ষের সবচে' বড় চিজ।

ফড়িঙ হইল পক্ষী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগানে পায়চারি করতে করতে হলুদ দাঁতে নিমের দাঁতন ঘষছিলেন বাগুইবাবু, হঠাৎ কি মনে হতে বললেন, তুই তো ভূমিহীন চাষী রে, যতন। সরকার ভূমিহীনদের খাসজমির পাট্টা দিচ্ছে, তা তুই একটা নিস নে কেন?

যতন তখন উমসুম ভোরবেলায় বাগুইবাবুর আড়াই বিঘের বাগানখানায় নিড়েন দিচ্ছে, ঘাস তুলে সাফাই করছে ধ্যাঁড়শ লঙ্কা আর উচ্ছের গোড়া। নিড়েন দিতে দিতেই অনেকক্ষণ থেকে তার মনটা বিড়ি বিড়ি করছে, কানের গোড়া থেকে আধপোড়া বিড়িটা নামিয়ে শলাই জ্বালাবে ভাবছিল, হঠাৎ বাগুইবাবুর কথা শুনে তার বিড়ির পিপাসা উবে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আমারে কে খাসজমি দিবে, বাবু। বোকাসোকা মানুষ আমি।

বাগুইবাবু চকাস্ করে একদলা নিমের থুতু ছিটিয়ে বলেন, বোকা, তাতে কি হয়েছে, ভূমিহীন তো বটে। গবরমেণ্টের অর্ডার, জমি না দিয়ে যাবে কোথায়। তুই জে এল আর ও অফিসে যা। বাবুদের ধর। গিয়ে চা। না চাইলে কেউ কিছু দ্যায়?

শুনে যতনের মাথায় প্রায় আকাশ ভেঙে পড়ে। যাতায়াতের পথে সাদা দোতলা বাড়িটা তার চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু তার বাপ-চোদ্দপুরুষের কেউ কখনো জেলারো আপিসে গেছে বলে সে শোনেনি। অতবড় দোতলা বাড়িখানা সারা দিনমান গমগম করতে থাকে। বাবুদের নাকের ডগায় ভারী ভারী চশমা, বগলে হাতে কাগজপত্তরের তাড়া, হনহন করে হাঁটে, সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বাতাসটা গন্ধ করে ফ্যালে। এহেন জেলারো আপিসে যতন কিভাবে জমি চাইতে যাবে তা ভেবে মুখ আমসি হয়ে যায় তার।

কিন্তু এখন বাগুইবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে, বাবুরা জমিন নিয়ে হত্যে দিয়ে বসে আছে, গিয়ে চাইলেই দিয়ে দেবে। বাগুইবাবুর কথা ফেলনা নয়, লোকটা জুনিয়র হাইস্কুলের হেডমাস্টার, এদিকে আবার কেরোসিন তেলের ডিলার। ক'বছরে সাত-আট বিঘে জমিও কিনে ফেলেছে এ-গাঁয়ে। বাস্তুর পাশে এই আড়াই বিঘের প্লটে সাত-আট রকম সব্জীর চাষ হয়, বছরভর বাজার হাট থেকে ধানচাল, আনাজপত্তর কিছুই কিনাতে হয় না। বরং দু-তিন বছর হল ধানের দাদনের ব্যবসা শুরু করেছে। বর্ষায় একবস্তা ধান দাদন দিলে ধান ওঠার মরসুমে তা দেড়গুণ দু-গুণ হয়ে ফিরে আসে। যতন শুনেছে, লনইসিন পেলে খুব শিগগির টাকা ধারের ব্যবসাও শুরু করবেন উনি। সব মিলিয়ে বাগুইবাবুর বেশ রমরমা। খুব এলেমদার লোক। এলেমদার হলেও যতনকে ভারী ভালবাসেন। প্রায় তিন-চার বছর ধরে বাগুইবাবুর মুনিশ খাটে সে। দিনমজুরি একটু কম দ্যান বটে, কিন্তু মাঝেমধ্যে কলাটা মুলোটা ধ্যাঁড়শটা বেগুনটা দিয়ে পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। গত বর্ষায় একবস্তা ধানও কর্জ নিয়েছে যতন, এখনো সেটা ফেরৎ চাননি। এহেন বাগুইবাবুর কথা যতন অমান্যি করে কি করে!

জমিন যে তার নিজের হতে পারে এ কথা যতনের ধারণার বাইরে। তার বাপও তার মতো সারা জীবন মুনিশ খেটেছে। যতন জমিনের জন্য জেলারো-আপিসে যাবে শুনলে হয়তো তার বাপ হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যেত। বলত, ফড়িঙ আবার পক্ষি হয় নাকি? তার বাপের কথাবার্তার ধরনই ছিল এরকম। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। এই তো তাদের পাড়ার কালু মণ্ডল, খুব কদিন মিছিলটিছিল করল, তারপর একদিন পট করে একখণ্ড কাগজ নিয়ে এসে বলল, এই দ্যাখ, পাট্টা জমিন পেয়েছি।

তাই একদিন রোজ কামাই দিয়ে গুটি গুটি জেলারো-আপিসের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় সে। উঁচু সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে তার বুক হিম হয়ে যায়। এতগুলো সিঁড়ি পার হয়ে সে কি ঠিকঠাক তার জমিনের কাছে পৌঁছুতে পারবে?

একজন ফুলপ্যাণ্টপরা লোককে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে তাকেই ধরল যতন, আচ্ছা, খাসজমিন এখেনে কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু লোকটা দাঁড়ালই না, খাসজমির কথা শুনে যতনের দিকে টেরচাচোখে একলহমা তাকিয়ে হনহন করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভারী দমে গেল যতন লোকটার রকম দেখে। তার পরের লোকটা ধুতি-পরা, তাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসা করায় সে-ও দৃকপাত করল না। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। যতনের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই কারো। এতসব হোমরা-চোমরা মানুষদের মাঝে দাঁড়িয়ে বেশ সিঁটিয়ে থাকে সে। এখানে সব ভারী, ভারী ব্যাপার, কেন যে বাগুইবাবুর কথা শুনে সে জমির তরে জেলারো আপিসে আসতে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর একজন হঠাৎ বলল, খাসজমি তো আমিনবাবুর কাছে। সেখেনে যাও।

আমিনবাবু? যতন যেন একবলগা স্রোতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে একটা ঠেক পেল। তারপর আমিনবাবুর খোঁজে এ টেবিল ও টেবিলে ঢুঁ খেতে খেতে যে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা ফাঁকা। পাশের একজনকে দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর সে বলল, সিটে নেই।

সিটে নেই তো নেই, বেশ কয়েকঘণ্টা পরও সেই একই উত্তর, সিটে নেই। সারাদিনে তাঁর দেখাই মিলল না। তারপর একদিন এসে ফের সেই একই দৃশ্য এবং জিজ্ঞাসা করতেই শুনল, আমিনবাবু মফস্বলে। এরকম তিনচারদিন, 'সিটে নেই', 'মফস্বলে' শোনার পর একদিন দেখল খালি চেয়ারটায় বসে আছেন শার্ট-ধুতি পরা রোগাভোগা কালো চেহারার একজন ভদ্রলোক।

আমিনবাবু তখন নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে ভারী ভারী খাতায় কেবলই হিজিবিজি লিখছেন। যতনকে যেন দেখেও দেখলেন না। লিখছেন, আর ফুকফুক করে সিগ্রেট খেয়েই যাচ্ছেন। যতন দু'তিনবার গলা খাঁকারি দিতেই আমিনবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, কে?

ভয়ে তখন যতনের বুক গুড়গুড় করছে, কোনক্রমে বলতে পারল, এজ্ঞে, বাবু আমি ভূমিহীন --

তা এখেনে কি দরকার?

আরেকটা হুঙ্কার শুনতেই যতনের হাঁটুর মালাইচাকি ঠকঠক করতে থাকে, খাবি খেতে খেতে বলল, যদি একটু খাসজমি—

অ, খাসজমি? আমিনবাবু কলম থামিয়ে চশমা নাকের ডগায় আরেকটু ঝুলিয়ে এমনভাবে তাকালেন যতনের দিকে যেন একটা কেন্নো কিংবা ফড়িঙ। তারপর ফের লেখায় মনোনিবেশ করে বললেন, জমিটমি নেই, সব একদম ফরসা।

যতন তবু দাঁড়িয়ে থাকে, খানিক পরে আবার বলে, এজ্ঞে বাবু—

আমিনবাবু এবার বিরক্ত হন, খেঁকিয়ে উঠে বললেন, বলছি না, জমি নেই। সব বিলি হয়ে গেছে। এই দ্যাখো, খতিয়ান। একদম ফরসা। বলে ভারী খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আছে কোথাও? দেখতে পাচ্ছো কোথাও, জমি? এখন যাও, হিসেবে ভুল হয়ে যাবে।

যতন হাঁ করে ভারী খাতাখানা দ্যাখে। সত্যিই ভারী খতিয়ানের কোথাও এক টুকরো সবুজের চিহ্ন নেই। আমিনবাবুর 'এখন যাও' হুঙ্কার শুনে সে প্রায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। বেলা দুপুরে একগলা রোদ মাথায় নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবে, সে তো একটা মুনিশ। মুনিশ খাটায় তার পক্ষে ঢের সুবিধের। ওসব জমিনটমিন পাওয়া কি তার কম্মো?

পরদিন মুনিশ খাটতে যেতেই বাগুইবাবু ধরলেন তাকে, কি রে, গেছিলি? খোঁজ পেলি খাসজমির?

যতন মুখ গোঁজ করে বলে, গিয়েলাম তো। খাতা দেখিয়ে আমিনবাবু বলল, জমিনটমিন নি।

আমিনবাবু বলল, আর তুই চলে এলি? বাগুইবাবু নিমের দাঁতন জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে বলেন, ধরতে হলে জে এল আর ও সাহেবকে ধরবি। খোদ মালিক তো উনিই। যা গিয়ে, আবার ধর। জমি পেতে হলে লেগে থাকতে হবে।

আবার জেলারো-আপিসে যেতে হবে শুনে যতন খাবি খায়, কিন্তু বাগুইবাবু নাছোড়বান্দা। ফলে রোজ কামাই দিয়ে পায়ে-পায়ে হাজির হয় জেলারো সাহেবের ঘরের সামনে। দরজায় পর্দা, ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতেই কোত্থেকে একটা লোক এসে খপ্ করে তার হাত ধরে, কি ব্যাপার, না বলে ঢুকছ যে বড়।

যতন দেখল, এ সেই প্রথমদিন দেখা ফুলপ্যান্টপরা হোমরা-চোমরা চেহারার লোকটা। বলল এজ্ঞে, জেলারো সাহেবের সঙ্গে কথা আছে।

কথা? লোকটা এক ধমক দ্যায়, সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। সাহেব টুরে।

টুরে? সে আবার কোথায়?

যতনের অজ্ঞতায় ফুলপ্যান্টপরা লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হাসে, টুরে, টুরে। টুর মানে ভ্রমণ।

ভ্রমণ? যতন ক্রমাগত খাবি খায়, ভ্রমণ আবার কি?

হ্যাঁ, ভ্রমণ, মানে কাজে গেছেন, মফস্বলে। বুঝলে? ফুলপ্যান্ট বেশ বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে।

যতন এতক্ষণে বোঝে। এবং এভাবেই আরও তিন-চারদিন 'টুরে' শোনার পর একদিন দ্যাখে, সামনের ঘরে টানা পাখা চলছে, বাইরে টুলের ওপর সেই ফুলপ্যান্ট। উঁকি মারার আগেই সে খপ্ করে জামা টেনে ধরে যতনের, কি হল, না বলে ভেতরে ঢুকছ যে বড়।

যতন আর্জি জানায়, এজ্ঞে, কটা কথা আছে। জেলারো সাহেবের সঙ্গে।

ফুলপ্যান্ট বলল, এখন দেখা হবে না। সাহেব ফাইল সই করছেন।

অতএব যতন অপেক্ষা করে, ওদিকে ফাইল সই হচ্ছে তো হচ্ছেই, বোধহয় একঘণ্টা দুঘণ্টা পর সে আবার ঝোঁক দ্যায়, এবার যাব?

দাঁড়াও, সাহেব এখন জল খাচ্ছেন।

ও জল খাচ্ছেন? যতন আবার অপেক্ষা করে। এর মধ্যে নানা লোকজন ঘরের মধ্যে যায়, আবার বেরিয়ে আসে, আবার যায়। একঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করল, জল খাওয়া হয়েছে?

ফুলপ্যান্ট বলে, এখন হাকিমসাহেব বিচার করছেন, দেখা হবে না।

ও! যতন এককোণে গিয়ে উবু হয়ে বসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পা টনটন করছিল, এবার বসে বসে পা ফেটে যায়। অনেকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করে, বিচার এখনও শেষ হয়নি?

কত লোক ঘরে যায়, কত লোক বেরিয়ে আসে। এবারে শুনল, সাহেব এখন মিটিং করছেন।

বসে থাকতে থাকতে বিকেল ভেরে আসে। অফিস ভাঙার শেষ মুখে যতন মরিয়া হল, এবার যাই?

ফুলপ্যাণ্ট বিরক্ত হয়ে বলল, সাহেব এখন জল খাচ্ছেন।

আবার জল? যতন পর্দা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে। সাহেবের জল খাওয়া শেষ হতে বলে, এবার যাব?

যাও, যাও, সকাল থেকে বড্ড ঘ্যানঘ্যান করছ। ফুলপ্যাণ্ট খেঁকিয়ে ওঠে।

যতনের পা টনটন করছিল, একবার হাঁটু কাঁপতে থাকে। তবু বেশ ক'দিন ঘোরাঘুরির ফলে যতনের মনে খানিকটা ভয় কেটেছে, তবু বুকের ধুকপুকুনি কাটে না। পর্দার বাইরের লোকটা যদি হুমদোমুখো হয়, তবে ভেতরের লোকটা না জানি কেমন কড়া মেজাজের। ভেতরে ঢুকে যতন এক নিঃশ্বাসে হুড়মুড়িয়ে বলে ফেলল, এজ্ঞে, আমি ভূমিহীন, যদি একটু খাসজমিন—

খাসজমি? হাকিমসাহেব তার চশমার ফাঁক দিয়ে লোকটাকে জরিপ করলেন, তারপর একটা ফাইলের ফিতে খুলতে খুলতে গভীরভাবে বললেন, খাসজমি কি আর এখন এই অফিসে পাওয়া যায়, জমি পেতে হলে ওই প্রধানকে ধরো। জমিজমার মালিক তো এখন ওঁরাই—

যতন ধন্দে পড়ে। তবে যে বাগুইবাবু বললেন, জমিজমার মালিক হলেন—

ঘামতে ঘামতে জেলারো-আপিসের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। একবার প্রধানসাহেবের বাড়ি গিয়েছিল রিলিফ আনতে। এমন ধমক খেয়েছিল যে ছুটে পালাবার পথ পায়নি। প্রধানসাহেব বলেছিলেন যাদের দুটো হাত, দুটো পা আর একখানা মুণ্ডু আছে, তারা রিলিফ পায় না। যাও খেটে খাও।

তা যতন খেটেই যায়। কিন্তু এখন সেই প্রধানসাহেবের কাছেই খাসজমি চাইতে হবে জেনে তার জ্বর এসে যায়। কিন্তু বাগুইবাবু তাকে ছাড়েন না। আরও দশকেজি ধান দিয়ে বললেন, এই তো অনেকগুলো ধাপ পেরিয়েছিস, আর ক'ধাপ পেরোলেই— বলে প্রায় ঠেলে পাঠালেন রামগড়ের প্রধান বলরাম ওঝার বাড়ি।

রোজ কামাই করে সে আবার ঘোরাফেরা করে প্রধানের বাড়ির চারপাশে। আর প্রতিদিন শোনে, প্রধানসাহেব ঘরে নাই। মিটিং করতে গেছেন।

পরদিন গিয়ে শোনে, আজকেও মিটিং। তার পরের দিন, সেদিনও মিটিং। মিটিং মিটিং আর মিটিং। সকালে গেলে মিটিং, দুপুরে গেলেও মিটিং, রাত্রেও তাই। ক'দিনে যতন একেবারে জেরবার হয়ে গেল মিটিং-এর কথা শুনে শুনে। লোকটা এত মিটিং করে তো খায়-শোয় কখন।

তা শেষে একদিন নাগাল পেয়ে গেল যতন। সেদিন ঘরের ভেতর প্রধানসাহেব ইঞ্জিরি লেখা প্র্যাকটিস করছেন? ইঞ্জিরিতে নাকি সই করতে হবে।

প্র্যাকটিস করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। চারপাশে লোকে লোকারণ্য, সেসব ঠেলে ভূমিহীন যতন ভেতরে সেঁধুতেই পারল না। দুপুর গড়িয়ে যেতে একপেট খিদে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

তারপরে একদিন গিয়ে শুনল, ইস্কুলের মাঠে গেছেন নতুন কেনা মোটরসাইকেল প্র্যাকটিস করতে। যতন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছুল হাইস্কুলের বিশাল মাঠটিতে। মাঠের চারপাশে দু'তিনশো লোক, তারা সবাই উৎসাহ দিচ্ছে, আরেকটু জোরে স্যার। দারুণ

হচ্ছে। এই তো শিখে গেছেন। আর মাঠের ভেতরে একখানা লালরঙের বিশাল মহিষের মত সাইজের মোটরসাইকেলে চড়ে বাঁই বাঁই করে ছুটছেন প্রধানসাহেব, আর কেবলই গোত্তা খাচ্ছেন ঘুড়ির মত।

মোটরসাইকেলখানা যেমন আনকোরা তেমনি প্রধানসাহেবের চড়ার ধরনটাও। টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সিধে হয়ে ছুটছেন ফের। অমন জবরদস্ত প্রধানসাহেবও বেশ কাবু হয়ে পড়ছেন দুর্দান্ত বাহনখানার পিঠে চড়ে।

ঘণ্টা দু, তিন টা-টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার পর যতন হঠাৎ ফুরসৎ পায়। প্র্যাকটিস সেরে যখন সদলবলে ঘরে ফিরছেন, সঙ্গে সঙ্গে গড় হয়ে পেন্নাম। মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি ততক্ষণে প্রধানসাহেব ফের ঠিকঠাক করে কোঁচা লুটিয়ে দিয়েছেন ধুলোয়। যতনকে গড় হতে দেখে বললেন, কি হল, তোর আবার কি হল?

কাঁচাপাকা চুলের মানুষটার ভুরুতে বিস্ময়ের রেখ্। যতন সেই বুলিটাই আবার বলে, এজ্ঞে আমি ভূমিহীন। যদি একটু খাসজমিন—

প্রধানসাহেবের ভুরুর কোঁচ আরো বাড়ে। আশপাশের ভিড় করে থাকা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, চেন নাকি তোমরা? কে লোকটা? খাসজমি চায়।

যতন বাগুইবাবুর বাড়ি মুনিশ খাটে, তাকে কেউ চেনে না। প্রধানসাহেব যতনকে পাশ কাটিয়ে কোঁচা দুলোতে দুলোতে হাঁটতে থাকেন ঘরমুখো। তাঁর মোটর সাইকেল ততক্ষণে এক সাগরেদ যুবকের হাতে।

যতন হাল ছাড়ে না, সে-ও ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুতে থাকে। প্রধানসাহেব কোঁচা লুটোতে লুটোতে বেশ জোরপায়ে হেঁটে চলেছেন, আবার নাকি মিটিং আছে কোন গাঁয়ে।

সঙ্গের একজন লোক বিরক্ত হয়ে বলল, পায়ে পায়ে হাঁটছ কেন। জমি পেতে হলে আগে অঞ্চলের মেম্বার ধর। মেম্বারের সুপারিশ হলে তবেই তো জমির কথা ভাবা হবে। কোন পাড়ায় বাড়ি?

যতন পাড়ার নাম বলতেই তিনি বললেন, হুঁ পঞ্চুবাবুর এলাকা। যাও, তাঁকে ধর।

বাপরে, আবার পঞ্চুবাবু? যতন চোখে আঁধার দ্যাখে। কে যে জমির আসল মালিক তা বুঝতে তার ঘাম ছুটে যায়।

গয়লাপাড়ার পঞ্চুবাবু তাদের এলাকার মাতব্বর। ঝাঁকড় মত চুল এক হাঁক মারলে গোটা পাড়ার লোক জমে যায়। খুব খ্যামতা লোকটার। ঝাণ্ডা হাতে নিলে চোখে মশাল জ্বলে। সেবার জোতদার নগেন সামন্তর তিন বিঘের ধান দেড়শ লোক নামিয়ে এক ঘণ্টায় কেটে নিয়েছিল। তাঁর মুখোমুখি হয় যতনের সাধ্যি কি। এই তো ক'মাস আগে তাঁর এক ছোকরা চ্যালা রাখাল যতনকে দেখে বলেছিল, এই যে যতন, ফেমিলি প্লেনিংটা করে নাও হে, সামনের হপ্তায় ক্যাম্প বসবে ইস্কুলে।

যতন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলেছিল, এজ্ঞে বাবু, কেম্পের আমরা কি বুঝি, বোকাসোকা মানুষ।

রাখাল হি হি করে হেসে বলেছিল, প্লেনিং-এর বেলায় তুমি বোকাসোকা মানুষ, আর বউ-এর পেটে পাঁচপাঁচটা বাচ্চা তোয়ের করার বেলায় তখন তো খুব বুদ্ধি, এ্যাঁ?

তারপর থেকে যতন আর পঞ্চুবাবুদের ধারকাছ মাড়ায় না। কিন্তু সব শুনেটুনে বাগুইবাবু বললেন, এই তো যতন, আরও একধাপ পার হয়েছিস। এবার মাতব্বারকে কব্জা করতে পারলেই—বাস্।

ফলে আবার একদিন ভোর ভোর পঞ্চায়েতের মেম্বার পঞ্চুবাবুর দোরগোড়ায় হাজির হয় যতন। এই ভোরে কাকপক্ষিও জাগে না, কিন্তু পঞ্চুবাবুর বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার।

যত বেলা বাড়ে আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁ থেকে মানুষজন এসে হত্যে দিতে থাকে তাঁর দাওয়ায়। কাগজপত্তর খুলে কিসব শলা চলছে, তক্কো-বিতক্কো হচ্ছে, আবার তার মধ্যে ফিসফাস কথা। আর কথা চলছে তো চলছেই। তার মধ্যে ভূমিহীন যতন তার নাকটি সেঁধুবার অবসর পেলই না। পঞ্চুবাবু হট করে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন হঠাৎ।

তারপর দিন গিয়ে দ্যাখে, পঞ্চুবাবুর বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছে রাখাল। দেখেই সে গা-ঢাকা দিল। রাখাল হয়তো তাকে দেখলেই বলবে, চল হে যতন, কেম্পে চলো—

দু-তিনদিন পাক দেবার পর একদিন দুপুর গড়িয়ে গিয়ে যখন পেট টাও-টাও করছে খিদেয়, তখন একলহমা ফুরসৎ পেলেই পঞ্চুবাবুর সামনে গড় হয় যতন।

পঞ্চুবাবু ভুরু টানটান করে বলেন, তোর আবার কি হল? তোকে তো কখনো দেখিনি বলে মনে হচ্ছে।

এজ্ঞে বাবু, আমি ভূমিহীন—

হুঁ, তা ভূমিহীন, কি সমিস্যে তোর? ভাগজমির সমিস্যে নাকি? মালিক ধান কেটে নিয়েছে, ফসলের ভাগ দিচ্ছে না? নাকি ভাগে কম দিয়েছে।

যতন সাহস পেয়ে বলল, এজ্ঞে না বাবু, জমিন বলতে কিছু নি আমার। ভাগজমিও নি। যদি একটু খাসজমিন—

খাসজমির কথা শুনে পঞ্চুবাবু লাফিয়ে ওঠেন, খাসজমি কোত্থেকে পাব, এ্যাঁ? জমিজমা যা ছেল, সব বিলিবাটা হয়ে গেছে, এখনও ঘরে পাঁচশ দরখাস্ত পড়ে আছে। দিনকাল যা পড়েছে তাতে এখন পৃথিবীর উপরের মাটিই বেশি আক্রা, বরং মাটির নিচ খুঁড়ে সোনা খুঁজে পাওয়া ঢের সহজ। বুঝলি?

যতন বুঝল না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে পঞ্চুবাবু বলেন, দু-চার বছরের মধ্যে আর হবে না। একটা দরখাস্তে টিপ দিয়ে যা। পরে দেখা যাবে।

শুনে বাগুইবাবু যতনকে আরও দশ কেজি চাল দিয়ে দিলেন। রোজ কামাই দিতে দিতে যতনের কতদিন রোজগার নেই। ভাগ্যিস বাগুইবাবু তাকে ধানচাল যুগিয়ে যাচ্ছেন, নচেৎ তার সংসারের কি যে হাল হত। বাগুইবাবু সমানে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, আর বলছেন পঞ্চুবাবু যাই বলুক, তুই লেগে থাক। লেগে থাকলেই দেখবি একদিন বলবে, এই নে, যতন, পাট্টা।

যতনের সামনে সেই মুহূর্তে ঘাই দিয়ে ওঠে একখণ্ড সবুজ ফসলে ভরা মাঠ, সে কেবল সেই ফসলের মধ্যে বসে নিড়ান দিচ্ছে, ঘাস বেছে বেছে ফেলে দিচ্ছে আইলের চারপাশে। তার বাপ-ঠাকুর্দা কারোরই একছিটে জমিনটমিন বলতে ছিল না, এখন সে খাসজমির স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেমন বিভোর হয়ে থাকে।

দু-চারদিন পর যতন পঞ্চুবাবুর দোরগোড়ায় ঝুল কাটে। পঞ্চুবাবুর দেখা পায় না, তাঁর এক সাগরেদ যতনকে দেখে বলল, জমি কি গাছের আম, যে চাইলে আর টুপ করে পেড়ে দিলাম। বিকেলে বারোয়ারিতলায় একটা মিছিল আছে আজ, চলে এসো। দু-চারদিন মিছিল-টিছিল করো—

ক'দিন মিছিল করার পর যতন আবার ঘুরঘুর করে পঞ্চুবাবুর বাড়ির আশেপাশে। হঠাৎ একদিন দেখা হতেই বলল, এজ্ঞে বাবু, আমার জমিন—

পঞ্চুবাবু হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, দ্যাখ্, ভূমিহীন, সারাক্ষণ কেবল সবার সামনে 'বাবু', 'বাবু' করবি নে। আমি পঞ্চায়েতের মেম্বার; ইলেকশনে ভোট পেয়ে জিতেছি। আমার একটি প্রেস্টিজ আছে। কেন, বি ডি ও সাহেব বলিস, জে এল আর ও সাহেব

বলিস, এম এল এ সাহেব বলিস, এমনকি প্রধান সাহেব বলিস। আর আমার বেলায় 'বাবু'? আমিই বা কম কিসে। এখন থেকে মেম্বারসাহেব বলবি, বুঝলি?

যতন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘাড় নাড়ে, হুঁ, বলব—বলেই 'পঞ্চুবাবু' শব্দটা মুখে এসে গিয়েছিল, ঢোক গিলে বলল, মেম্বারসাহেব।

পঞ্চাবাবু তার এক সাগরেদকে ডেকে বললেন, অ্যাই বংশী, যা তো, খাসজমির দরখাস্তে ভূমিহীনের একটা টিপছাপ নিয়ে নে। হ্যাঁ, আর বাপের নাম, মহল্লার নাম, সবকিছু ঠিকঠাক লিখে রাখ।

যতন হাত জোড় করে বলল, আপনের দয়া, মেম্বারসাহেব।

পঞ্চুবাবু খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে, প্রধানসাহেবের কাছে তোর দরখাস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভূমিহীন আনন্দে ভাসতে ভাসতে ফিরে এল, তাহলে এতদিনে বোধহয় তার জমিন হচ্ছে। সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে তার ভূমিখণ্ডটিতে ক্রমাগত লাঙ্গল দিতে থাকবে। দখনে হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাবে তার সবুজ ধানের মাঠে।

পঞ্চুবাবুর কাছ থেকে ভাসতে ভাসতে যতন গিয়ে ঠেক খেল প্রধানসাহেবের বাড়িতে। গিয়ে দেখল, রামগড়ের জবরদস্ত প্রধানের হাতে পায়ে মাথায় মস্ত ব্যাণ্ডেজে, আড় হয়ে শুয়ে আছেন দাওয়ায়, তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে। দাওয়ার অন্য কোণে মহিষের মতো সাইজের মস্ত মোটরসাইকেল। উঠোনে ভিড়।

প্রধানসাহেবের চেহারা দেখে দমে গেল যতন, ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে?

অ্যাকসিডেন্, একজন দমদেয়া পুতুলের মত বলল। তা এমন অ্যাকসিডেনের সময় তো আর খাসজমির কথা বলা যায় না। ক'দিন পরে গিয়ে দ্যাখে মাথার ব্যাণ্ডেজ নেই, কিন্তু ডানহাত-পায়ের ব্যাণ্ডেজ তখনও খোলা হয়নি, বাঁ-হাত দিয়ে শাদা কাগজে কিসব লিখছেন।

শুনল, ডানহাত তো বন্ধ, বাঁহাতে সই করা প্র্যাকটিস করছেন। প্রচুর সই বাকি রয়ে গেছে যে।

ক'দিন ঘোরাঘুরি করে এমনই একটা বাঁ-হাতের সুপারিশ আদায় করল যতন, প্রধানসাহেব দরখাস্তখানা ঠেলে দিয়ে বললেন, যা রে ভূমিহীন, জে এল আর ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করবি। কোথায় জমিন আছে, খুঁজে বার করতে হবে।

ভূমিহীন আরও একবার ভাসতে ভাসতে জেলারোসাহেবের সঙ্গে দেখা করে, সেখান থেকে ফের আমিনবাবু। আমিনবাবু খতিয়ান থেকে বেশ চোখ পাকিয়ে তাকালেন। ফড়িংটার দিকে, কি হে ভূমিহীন, খুব ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ?

ভূমিহীন খাবি খেতে থাক। খাবি, না জল, কে জানে। বলল, এজ্ঞে, প্রধানসাহেব পেইঠে দেলেন—

পেইঠে তো দেলেন, আমিনবাবু একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ফুক করে ধোঁয়া ওড়ালেন, কিন্তু ওটা তো বাঁ-হাতের সই, ভূমিহীন—

বাঁ-হাত? ভূমিহীন ঢকঢক করে জল খেতে থাকে।

আরে বাবা, সুপারিশ দুরকম আছে, বাঁ-হাতের আর ডানহাতের বুঝলে? তারপর চোখ পাকিয়ে আমিনবাবু বললেন, সেই তো নানান ঘাটের জল খেতে খেতে শেষে এই শর্মার কাছে এসে ঠেক খেতে হল। এখন যদি আমি বলি, কোথাও জমি নেই, তো জমি নেই। এই ঢাউস খাতাখানা খুলে কারুরই সাধ্যি নেই যে জমি খুঁজে বার করে।

যতনের চারপাশের আলোয় ক্রমে জল ভরে যেতে থাকে। প্রায় বছর গড়াতে চলল, এই এক টুকরো জমির খোঁজে সে ক্রমাগত ঘুরছে, মাসের পর মাস রোজ কামাই করে সাহেবদের তোয়াজ করেছে, বিভোর হয়েছে সবুজ মাঠ আর সোনালি ফসলের স্বপ্নে।

এতদিনে কতবার তার পায়ের নুনছাল উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে কাতর হয়ে বলতে যাচ্ছিল, এজ্ঞে, আমিনবাবু—। কিন্তু থমকে গিয়ে ভাবল, 'বাবু' বললে বাবু যদি রাগ করেন? তাই বলল, এজ্ঞে আমিনসাহেব, আপনি খাতাটায় যদি একটা জমিন খুঁজে দ্যান। আপনেই তো সব, আমিনসাহেব—

ভূমিহীনের মুখে 'আমিনসাহেব' শুনে আমিনবাবু একটা ঢোক গিললেন। লোকটা তাকে সাহেব বলছে? সাহেব! বাহ্, আমিনসাহেব শব্দটা শুনতে ভারী ভাল লাগে তো? পট্ করে নিজের শার্ট আর ধুতিটার দিকে নজর পড়ল আমিনবাবুর। ছ'দিন টানা পরে থাকা শার্টটা যেন ময়লা আর ম্যাড়ম্যাড় করছে। ধুতিটাও কেমন নোংরা। একটা ফুলপ্যান্টুল পরলে সাহেব শব্দটা বোধহয় বেশ মানানসই হত!

তিনদিন দাঁড়ি না কামানো মুখটায় হাত বোলাতে বোলাতে পিটপিট করে তাকালেন ভূমিহীনদের দিকে, ঠিক আছে, দেখি খাতাটাতা খুঁজে কোথাও এক-আধ টুকরো জমি পড়ে আছে কিনা—

হঠাৎ একদিন আমিনবাবুর সঙ্গে যতনের দেখা হয়ে গেল পথে। দেখা হতেই শুনল, তোমার কপাল ফিরে গেল হে, ভূমিহীন। একটা জমি পেয়েছি, কালীনগর মৌজায়, ছত্রিশ ডেসিমেল শালিজমি। সামনের মঙ্গলবার মিটিং-এ পাশ করিয়ে নেব—

খবরটা শুনে যতনের চোখের পলক আর পড়ে না। তাহলে এতদিন পর—। সেই সবুজ ভূমিখণ্ড হঠাৎ ঘাই দিয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। সে সত্যিই তাহলে খাসজমির মালিক হতে চলেছে? তার একান্ত নিজস্ব জমি? হঠাৎ ফড়িংটা যেন পক্ষি হয়ে উড়তে চাইল নীল আকাশের গভীরে।

মঙ্গলবার বিকেলে মিটিং-এর শেষে আমিনবাবু বললেন, তোমার জমিন পাকা। পরশু ভোর ভোর রেজিস্ট্রি অফিসের মোড়ে এসে দাঁড়াবে। জমির দখল দিয়ে দেব। এই দ্যাখো, লিস্টি। ভূমিহীন নস্কর পিতা ঈশ্বর বনমালী নস্কর। কালীনগর মৌজা, একনম্বর খতিয়ান, ২৪৪ দাগে ৩৬ ডেসিমেল জমি।

শুনে যতন একটু আমতা আমতা করল, নামটা যেন ঠিক তার বলে হচ্ছে না। বলল, এজ্ঞে, আমিনসাহেব, আমার নামতো যতন, যতন নস্কর, ভূমিহীন নয়।

যতন? আমিনবাবু বিস্মিত হলেন, সে কি হে, সেদিন যে এসে বললে, আমি ভূমিহীন জমি চাই। তাছাড়া পঞ্চুবাবুও বললেন, ভূমিহীনকে পাঠাচ্ছি, জমি জমি করে খুব জ্বালাচ্ছে। একটা কিছু করে দেবেন তো! আর দেখি দেখি, তোমার দরখাস্তটা। হ্যাঁ, এই তো টিপছাপ। নিচে নাম লেখা ভূমিহীন নস্কর, ব'কলমে।

বলে একটু থেমে বললেন, হুঁ, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। মিটিংয়ে তো পাশ হয়ে গেছে। গবরমেন্টের খাতায় নাম বদলাতে গেলে এখন অনেক হাঙ্গামা। আবার দরখাস্ত করতে হবে, তার সঙ্গে একটা এফিডেভিট করতে হবে কোর্টে, যতন নস্কর এবং ভূমিহীন নস্কর এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। তারপর পরের মিটিং-এ আবার নতুন করে পাশ করাতে হবে। সে অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে খানিক ভেবে আবার বললেন, তার চেয়ে এই ভূমিহীনই থাক। জমি পাওয়া নিয়ে তো কথা। তুমি তো ভূমিহীনই, তাই না? ঠিক আছে, তুমি তাহলে পরশু ভোরে—।

সেদিন ভোরে তার পুরনো ছেঁড়া জামাটা পরে তোয়ের হয়ে নেয় যতন। বেরুবার আগে বাগুইবাবুকে একটা পেন্নাম করতে গেল সে। বাগুইবাবু তখন ধানের দাদনের হিসেব কষছে। তাকে দেখেই বললেন, কি রে, তোর জমি তো তাহলে হয়ে গেল।

এজ্ঞে, বাবু, আপনের দয়ায়। হঠাৎ বাগুইবাবু একটু কঠিন হয়ে বললেন, কিন্তু আমার খাতায় তোর নামে তো অনেক দাদন জমে গেছে দেখছি। তিন বস্তা ধান এতদিন ছ'বস্তা হয়ে গেছে। শুধবি কি করে অ্যাঁ। বরং কাজ কর্। তোর খাসজমিটা ক'বছরের জন্যে আমার কাছে বাঁধা রাখ। ধান শোধ হয়ে গেলে ফেরৎ নিবি। বুঝলি?

যতন একগলা বিস্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে পৌঁছুল রেজিস্ট্রি অফিসের মোড়ে। ভোর ভোর এসেছেন আমিনবাবুও। হাতে মস্ত চেন। খোপ-কাটা মৌজা ম্যাপ, আর একদঙ্গল কাগজপত্তর। হাঁটতে হাঁটতে কালীনগর মৌজার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুল তারা। আর একটু ওপাশে বিশাল গাঙ। গাঙের প্রান্তে দুজনে চেন ফেলে জমিন খুঁজতে থাকে। আমিনবাবু চেন ফেলেন আর, চৌকো ছককাটা মৌজা ম্যাপে খুঁজতে থাকেন যতনের জমি। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বলেন, খুব তো মুশকিল হল দেখছি। তোর জমি বোধহয় শিকস্তি চলে গেছে।

শিকস্তি শব্দটা যতনের ঠিক ঠাহর হয় না। কি বলতে চাইছেন আমিনবাবু!

আমিনবাবু মৌজা ম্যাপে চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করতে থাকেন, নদীর যা ভাঙন ধরেছে, তাতে আজকের শালিজমি কাল নদীর গর্ভে চলে যাচ্ছে। এখানে পাঁচ-পাঁচটা দাগ যে নদীগর্ভে চলে গেছে, তা আমাদের খাতায় কোথাও লেখাজোকা নেই। ২৪৪ দাগের গোটাটাই এখন শিকস্তি। যাই হোক, একটু থেমে আমিনবাবু বললেন, এখন নদীর এ পার ভাঙছে, ওপারে জেগে উঠেছে চর, আবার কবে ওপার ভাঙবে, এপারে তোমার জমি ফের জেগে উঠবে। তখন তোমার জমি তোমার কাছেই ফিরে আসবে। এই যে, নদীর এই কিনার থেকে ২৪৪ দাগের শুরু, আর ঠিক সন্নাসন্নি নদীর মধ্যে দু'শ হাত, আর এদিকে পশ্চিমের সীমানা, এই কিনার থেকেও, দু'শ হাত নদীর ভেতর। বুঝলে, ভূমিহীন?

যতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে। আমিনবাবু এবার কাগজপত্তরের তাড়া বার করে বললেন, নাও, এখানে একটা টিপছাপ দাও। জমি বুঝিয়া পাইলাম। টিপ নিয়ে হনহন করে ফিরে চললেন আমিনবাবু, যতনের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে।

যতন সেই বিশাল নদীর কিনারে একা বসে থাকে পা ঝুলিয়ে, পায়ের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে গাঙা জল। ছুঁয়ে, ছুঁয়েই আবার চলে যাচ্ছে ওদিকে, যেদিকে নদী গিয়ে মিশেছে সমুদ্দুরের সঙ্গে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ যতনের মনে হল, এই-ই ভাল। তার জমিন নদীর গর্ভে না গেলে বাগুইবাবুর গর্ভে চলে যেত। এখন অন্তত জমিটুকু তারই থাকবে। হলই বা সে নদীর গর্ভে থাকা জমিন। তবু তো নদীর ভেতরের ভূমিখণ্ডটুকু একমাত্র তার। সেও তো কম নয়। তার ভূমিখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই বিশাল গাঙ, এমনকি গোটা সমুদ্দুরও। এই নদী, এতবড় সমুদ্র, বলতে গেলে এই সমস্তই তো এখন তার।

ব্যাঙ্কোর চেয়ার

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশীথ সরকারকে আপনারা অনেকেই চেনেন না। নিশীথ সেই দলের লোক যারা নিজেদের জাহির করতে পারে না। অনেক নেমন্তন্ন বাড়িতে হয়তো নিশীথের হাত আপনাদের পাতে দই দিয়ে গেছে, কিন্তু আপনি তাকিয়ে সে হাতের মালিককে দেখেন নি। জীবনে সব কাজই সে করেছে নিঃশব্দে। নিশীথ মারাও গেলো বাড়ি থেকে অনেক দূরে— নিঃশব্দে।

সহদেবকে অনেকেই চেনে। সে ফূর্তিবাজ, কথায় কথায় কবিতা শুনিয়ে দেয়। বন্ধুদের নিজের পয়সায় সিনেমা দেখায়, রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়। যা করে তা খুব হইচই করে। নিশীথ ছিল সহদেবের বন্ধু।

নিশীথ ভালো ক্রিকেট খেলতো। এমন কিছু বড়ো খেলোয়াড় নয়, কিন্তু খেলতে ভালোবাসতো। কোনোদিনই সে চমক লাগানো রান সংখ্যায় পৌঁছাতে পারেনি; সত্যি বলতে কি সাতান্নর বেশি রানও সে কখনো করেনি অথচ খেলা যখন হাতের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হতো তখন ক্লাব নামাতো নিশীথকে। নিশীথ সে খেলার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে আউট হয়ে ফিরে আসতো।

সময়টা ডিসেম্বরের শেষ। শীতের ভেতর হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সবাই এগিয়ে চলেছিল বেণী মিস্তিরের ঘাটের দিকে। খাটিয়ার এককোণ ছিল সহদেবের কাঁধে। পেছনে শবানুগমনকারীদের একজনের হাতে দুলছিল একটি লণ্ঠন, মাঝে মাঝে উঠছিল হরিধ্বনি। এক একবার হরিধ্বনির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছিল খই আর খুচরো পয়সা। আঠাশ বছরের জীবন শেষ করে খাটে চেপে চলে যাচ্ছে নিশীথ সরকার। ফেলে যাচ্ছে তার বাবা-মা-বোন, স্কুলের চাকরি, কষ্ট করে কেনা বইপত্র, মুদির দোকানে সামান্য কিছু দেনা এবং আলমারির পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ক্রিকেট ব্যাটটি।

এসব গতকালকের কথা। খুব ব্যস্ত সহদেব। আজ তার মাসতুতো বোন শর্মিষ্ঠার বিয়ে। শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে স্নান করেই মাসীর বাড়ি এসে কাজে লেগেছে। পঁয়ত্রিশ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল সে ঘুমোয়নি। অথচ খুব যে ঘুম পাচ্ছে, ক্লান্ত লাগছে, তাও নয়। সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করছে সহদেব। একবার ছাদে টাঙানো সামিয়ানার একটা কোণ খুলে ঝুলে পড়লো। সহদেব ডাকতে গেল ডেকরেটার্স-এর লোককে। তাঁরা এসে দুপুর নাগাদ ঠিক করে বেঁধে দিয়ে গেল সামিয়ানা। দু টিন ঘি কম এসেছিল, সহদেব গিয়ে নিয়ে এলো। রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তদারক করল। ছাদের ওপর করল নিমন্ত্রিতদের খেতে বসবার ব্যবস্থা।

কাজ করে যাচ্ছে সহদেব যন্ত্রের মতো, কিন্তু মনের ভেতর পর্যন্ত যেন সে-সবের সাড়া পৌঁছচ্ছে না। নিশীথ কাল মারা গেছে। তবে এখন সবাই আনন্দ করছে কেন? শর্মিষ্ঠার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে। সকালের ব্যারাকপুর লোকাল ছেড়ে গেছে ঠিক

সময়ে। পাশে সিনেমা হলটায় দুপুরের শো-তে অনেক লোককে সে দেখেছে টিকিট কেটে ঢুকতে। নিশীথ বেঁচে নেই, তবুও শর্মিষ্ঠার বিয়ে নির্দিষ্ট লগ্নে হবে, লোকে স্ফূর্তি করবে, ট্রেনে চেপে যাবে কলকাতায়।

সহদেব এত কাছ থেকে কখনো মৃত্যুকে দেখেনি। শ্মশানে গেল জীবনে এই প্রথম। আর নিশীথকে সে রোজ দেখেছে শতকাজের মধ্যে। তাকে যখন গতকাল ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধূপকাঠি গুঁজে দেওয়া হচ্ছে খাটিয়ার কোণে কোণে তখনই সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ ভীষণ অবাস্তব লাগছিল সহদেবের কাছে। নিশীথটা একেবারে মরে গেছে, আর উঠবে না, দাড়ি কামাবে না, স্কুলে যাবে না, জুতো সারাবে না মুচির কাছে। যাঃ, তাও কি কখনো হয়! আসলে নিশীথের এটা গুরুত্ব পাবার একটা কায়দা। কোনোদিন জীবনে কারো মনোযোগের কেন্দ্র হতে পারলো না নিশীথ, এখন তাই এভাবে চেষ্টা করে দেখছে।

কিন্তু যখন খাটিয়া তুলে ফেলা হলো কাঁধে, অমরকাকা বললেন— ধরো হে সহদেব, তুমিও ধরো একটা দিক, তখন এগিয়ে নিশীথের মাথার দিকে কাঁধ দিতে দিতে সহদেবের মনে হল সমস্ত ঘটনাটা তাহলে সত্যি। তারপর সারা রাস্তা সে শুধু শুনেছে হরিধ্বনি, দেখেছে মুঠো মুঠো সাদা খই ছড়িয়ে পড়ছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের কালো পিচের ওপর। সেই সঙ্গে দু'-একটা পয়সার টুং-টাং। শহরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছিলো নিশীথ।

— কে যায় হে, কে যায়?

— যায় পূব পাড়ার নিশীথ সরকার।

— নিশীথ? ভবতারণের ছেলে? আহা, অল্প বয়সে গেলো। শুনেছি ভুগছিলো—

আলো ঝলমলে রাস্তা দিয়ে চলে যায় নিশীথ। তারা শহর ছেড়ে চলে যায় শুয়ে শুয়ে। ক্রমে আলো ছেড়ে অন্ধকারে, বেণী মিস্তিরের ঘাটের দিকে। পেছনে একজনের হাতে দোলে লণ্ঠন, রাতের আকাশ থেকে খসে পড়া একটা হলুদ নক্ষত্রের মতো। অন্ধকার রাস্তায় দ্রুত চলে চারজোড়া পা, কাঁধে তাদের খাটিয়া। সে খাটিয়ায় শুয়ে থাকে নিশীথ সরকার, শিক্ষক, টাউন স্কুল।

—এই যে সহদেব, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে। চট্ করে দ্যাখো তো, ফ্রাইগুলো হলো কিনা। আর চাটনিতে নাকি তিন সের চিনি বেশি লাগবে। অমিয়কে পাঠিয়ে দাও একবার—

কাজ— কাজ। ফ্রাই হয়ে আসে, একসময় চাটনিও নেমে যায়। তখনও কাজ বাকী থাকে। একটু সময় করে বিকেলের দিকে হলুদের দাগ লাগা তোয়ালেটা এঁটে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকে যে ঘরে সাজানো হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সহদেব। বড়রা কেউ নেই সব কিশোরী-যুবতীর ভিড়। বেশির ভাগই চেনা। অর্ধেক কপালে চন্দন পরানো হয়েছে কনের, অর্ধেক বাকি। দরজার পাল্লায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেখতে লাগলো সহদেব। শর্মিষ্ঠা হেসে বললো— বড়দার এতক্ষণে সময় হলো?

সহদেব গুছিয়ে উত্তর দিতে পারলো না। বললো— না মানে, সকাল থেকেই তো নানা রকম— এখন আবার ফ্রাইটা—

দুটো মেয়ে হেসে উঠলো। শর্মিষ্ঠা খাটের একটা কোণ দেখিয়ে বললো— বোসো না, বসে সিগারেট খাও।

সহদেব বসলো। তাকালো শর্মিষ্ঠার দিকে।

— কেমন লাগছে রে শর্মি?

— কি কেমন লাগছে?

— বিয়ে করতে কেমন লাগছে?

— বারে! সে এখন কি করে বলবো? বিয়েটা হোক আগে। কাল সকালে জেনে নিও বরং।

— কি রঙের বেনারসী পরবি রে শর্মি। আমারই তো সব কেনবার কথা ছিলো। এদিকে আবার নিশীথের ব্যাপারটা—

থেমে গেলো সহদেব। আজকের শুভদিনে নিশীথের কথা বলা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। শর্মিষ্ঠা একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো— সত্যি, এখনো বিশ্বাস হয় না নিশীথদা আজ নেই। সেই সেবার বুলুর অন্নপ্রাশনে—

কে দুজন প্রৌঢ়া মহিলা ঘরে ঢুকে তাড়া দিতে লাগলেন— হাত চালা, লগ্ন অবদি সাজাবি নাকি রে, অ্যাঁ?

নিশীথের কথা চাপা পড়ে যায়। সহদেব বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। চারদিন আগেও ঠিক এই সময় সে হাসপাতালে কথা বলছিলো নিশীথের সঙ্গে। লম্বা হলঘরটায় ঢুকেই বাঁদিকে চারটে বেড্ ছেড়ে জায়গা পেয়েছিলো নিশীথ। প্রায়ই শুয়ে থাকতো গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে, বইটই পড়তো। সহদেবরা কেউ গেলে হঠাৎ চোখে উৎসাহের আলো খেলতো। বই সরিয়ে রেখে দুর্বল স্বরে রসিকতা করার চেষ্টা করতো— ইস্কুলের কিবা সমাচার, কহো মোরে, হে বান্ধব?

চারদিন আগেও সহদেব বলছিলো— কাল স্টুডেন্ট ভার্সেস স্টাফ ক্রিকেট ম্যাচ হলো রে, আমি খেললাম—

নিশীথ সত্যি উৎসাহ পেলো । বললো— সত্যি? কারা জিতলো?

সহদেব বললো— আমরা।

— তুই কত রান করলি?

— দূর, আমি বাজে খেলেছি। যা করবার করেছে অপূর্ব দত্ত।

— আউট হলি কি করে? কত রানে?

— তিনটে রান মাত্র। একটা বল খুব লাফালো, প্রায় কোমর সমান। লোভে পড়ে ব্যাকফুট খেলতে গেলাম, আনাড়ি হাত তো— উঠে গেলো ক্যাচ।

উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসলো নিশীথ। — ওই তো তোর দোষ। অত উঁচু বল কেন ব্যাকফুটে খেললি? তুই একটা আনাড়ি, ও বল ব্যাকফুটে খেলা কি তোর কর্ম? কত প্র্যাকটিস দরকার জানিস?

— শুয়ে পড়ে নিশীথ। আবার শরীর খারাপ হবে নইলে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমরা তো আর হারিনি। তাছাড়া মর্নিং সেকশনের স্টাফরা একটা ম্যাচ দিতে চাইছে, তুই সেরে উঠলে সেটাও সেটল করা যাবে।

সেরে ওঠার কথাটা নিশীথ বিশ্বাস করেছিলো। অথচ নিশীথকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগের দিন সহদেব গিয়েছিলো ডাঃ সেনের চেম্বারে। ডাক্তারবাবুর চশমার কাঁচে ফ্লুরোসেন্ট আলো ঠিকরে পড়েছিলো। আন্তরিক উৎকণ্ঠার সঙ্গে সহদেব জিজ্ঞাসা করেছিলো— নিশীথ সেরে উঠবে ডাক্তারবাবু?

পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন ডাঃ সেন। সহদেবের মনে হলো উনি প্রশ্নটা শুনতে পাননি।

— ডাক্তারবাবু, নিশীথ সেরে উঠবে না?

ডাঃ সেনের উত্তর এত খাদের গলায় এলো যে প্রায় চমকে উঠেছিলো সহদেব।

— ভেরি স্যাড কেস, সহদেব। এ রোগ আমাদের দেশে— কিডনী টোট্যালি ড্যামেজ্‌ড। আমার মনে হয় না— আই ডোন্‌ট্‌ থিংক দি পুওর বয় উইল সারভাইভ্‌।

নিঃস্তব্ধতা। কেবল বহু দূরে কোথায় একটা কুকুর ডাকছে। বাকি সব শান্ত। কি বলবে সহদেব? এখন কী বলতে হয়?

আবার বললেন, ডাঃ সেন— সহদেব, আজ থেকে আঠাশ বছর আগে, তখন আমি সবে প্রাকটিস শুরু করেছি, আমার হাতেই নিশীথের জন্ম হয়। হি ওয়াজ এ ভেরি হেলদি চাইলড্‌।

নিঃস্তব্ধতা। দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক। সহদেবের গলায় সব শব্দ জমাট বেঁধে গেছে।

এক সময় ডাঃ সেন উঠে দাঁড়ালেন। — সহদেব, প্যাথোলজিই শেষ কথা নয়। শেষ কথা কে বলতে পারে? দেয়ার ইজ ইয়েট হোপ্‌। আচ্ছা, আমি এখন ডাক্তারখানা বন্ধ করবো। গুড্‌ নাইট্‌।

মাসীর পুরনো চাকর ভূষণ আতরদানে গোলাপজল ভরছে। নিমন্ত্রিতদের গায়ে জল ছিটোনো হবে। বেলা গড়িয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে চাপা ব্যস্ততা। আজ শুভ দিন— আনন্দের দিন, আজ একটা উৎসবের দিন। অথচ নিশীথ সরকার গতকাল মারা গেছে।

সহদেবের মনে হলো আমাদের জীবনে এক-একটা ঘটনা যেন অতিথি, প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক-একটি নির্দিষ্ট আসন। অন্নপ্রাশন, পৈতে, প্রেম, বিয়ে— এই সব। জীবন এগিয়ে চলে, ধীরে ধীরে ভরে ওঠে এক-একটি আসন। কেবল একটি থেকে যায় খালি। তখন, সেই নির্জন প্রহরের পড়ন্ত রোদ্দুরে গা দিয়ে বসে কেবল অপেক্ষা, কখন আসবে শেষ অতিথি।

হঠাৎ সহদেবের মনে পড়লো ম্যাকবেথের কথা। কতবার সে বন্ধুদের জায়গাটা শুনিয়েছে আবৃত্তি করে। সেই যেখানে ভোজ হচ্ছে সবাই এসেছে, কিন্তু ব্যাঙ্কো আর আসে না। ব্যাঙ্কোর মৃতদেহ তখন পড়ে আছে কোথায়! ব্যাঙ্কো ম্যাকবেথের ভাড়াটে খুনীর দ্বারা নিহত। ভোজ আরম্ভ হতেই ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ। ম্যাকবেথের আসনে গিয়ে বসলো ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথের জীবনের সব আসনগুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, বাকি ছিল একটি। এসে গিয়েছিলো শেষ অতিথি। কতবারই তো স্কুলের টিফিন আওয়ারে ঐ জায়গাটা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে সহদেব। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রতি ম্যাকবেথের উক্তি— দাই বোন্‌স আর ম্যারোলেস্‌, দাই ব্লাড্‌ ইজ কোলড্‌।

শেষ অতিথি যে আসে তার শরীর গঠিত মজ্জাহীন অস্থি দিয়ে, তার রক্ত হিমস্পর্শ। সে জীবনের উৎসবের মধ্যে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে দখল করে তার জন্য পেতে রাখা আসন। সহদেব অনুভব করলো সমস্ত জীবনটা আসলে একটা দীর্ঘ প্রতিক্ষা ছাড়া কিছু নয়। কবে ভোজসভার হুল্লোড়ে প্রবেশ করবে ব্যাঙ্কোর কায়াহীন অস্তিত্ব— সেটা উৎসবের শেষ দিন।

নিশীথ ভালোবেসেছিলো একটা কালো মেয়েকে। রোজ মেয়েটি যেতো স্টাফ রুমের পাশ দিয়ে বিকেলবেলা, আড়চোখে তাকাতো। সহদেব বলতো— নিশীথ, তোকে খুঁজছে রে—

নিশীথ যেন কেমন হয়ে যেতো, ওর চোখে নেমে আসতো আশ্চর্য তৃপ্তির গাঢ় ছায়া।

সহদেব ভালোবেসেছিল নন্দিনীকে। নন্দিনী এক অদ্ভুত মেয়ে। তার স্পর্শ সহদেবের জীবনের তাবৎ স্তরকে এক এক করে ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে লাভ হয়নি কিছুই।

নন্দিনীরা বিয়ে করে না, ধরা দেয় না। নন্দিনীরা শান্ত জলের বুকে সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। ধরতে গেলে ভেঙে যায়, প্রতিচ্ছবি কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে আসে।

আসলে সেই কালো মেয়েটির প্রতি নিশীথের ভালোবাসা, নন্দিনীর প্রতি সহদেবের প্রেম— এ সবই শেষ অতিথিকে অস্বীকার করার জন্য। সহদেব, নিশীথ এবং ওদের মত আরো সবাই দু'হাতে প্রাণপণ ঠেকাচ্ছে তাকে, যে এসে বসে পড়তে পারে খালি আসনে। যার অস্থি মজ্জাহীন, যার রক্ত হিমস্পর্শ।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললো— ধরো সহদেব, এক কোণ ধরো পিঁড়ির—

শর্মিষ্ঠা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে বরকে। বর সপ্রতিভভাবে সোজা তাকিয়ে শর্মিষ্ঠার চোখে। মেয়েদের চিৎকার— তাকিয়েছে, তাকিয়েছে। পিঁড়ির কোণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহদেবের মনে হলো সে চাকরি করে, ভালোবাসে, সিনেমা দেখে, পাড়ার স্যুভেনিরে লেখা দেয়, উৎসব করে— কিন্তু জীবনের সব উৎসব, আনন্দ ও কলরোলের মধ্যে তার চেতনার কিনারা ধরে হেঁটে যায় চারজোড়া পা। হাঁটে— হাঁটে— হাঁটে। পেছনে যেন নিরালম্ব শূন্যে দোলে একটা খসে পড়া নক্ষত্রের মতো লণ্ঠন। মাথার ওপরে ধীরে ধীরে ঘুরে যায় ছায়াপথ। মৃদুকণ্ঠে ওঠে হরিধ্বনি, ছড়িয়ে পড়ে সাদা খই।

এখন এই ছাঁদনাতলায়, যে কোনো মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারে চারজন ক্লান্ত মানুষ। তাদের কাঁধে খাটিয়া। তার ওপর চিত হয়ে শুয়ে নিশীথ সরকারের মৃতদেহ।

স্মরণ সভার তারিখ

গৌর বৈরাগী

— আর আধ ঘণ্টা।

নীচে থেকে কে যেন বলল কথাটা। সবাই এতক্ষণ যে যেখানে বসে ছিল নড়েচড়ে উঠল। বিনায়করাও। ওদের এই সময় খেয়াল হল বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ওদিকে। ওদিকে আগুন। আগুনের লাল আভা ছিটকে এসে বিনায়কদের দলের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এতক্ষণ ওদিকেই তাকিয়ে ছিল সবাই।

— ভাবাই যায় না। কথাটার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল পুলকের।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগুনের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মনন।

— যা হবার তা ত' হল। এখন মীনা আর ঐ ফুটফুটে বাচ্চাটার।

— এই ত' বছর খানেকের। মাটির দিকে তাকিয়ে বলল মনন। সবে একটা দুটো কথা বলতে শিখেছে। গত সপ্তাতেই ও বলছিল মেয়েটার জন্য এবার একটা ক্যাশ-সার্টিফিকেট কিনতে হবে।

— ইশ, ভাবা যায় না! এইটুকু বলে বিকাশ থেমে গেল।

আর আর সবাই। ঐ ছোট্ট সুখ সুখ ভাবনাটার মধ্যে এখন একটা কষ্ট।

সবাই ভাবতে ভাবতে কষ্ট হয়ে গেল। সবাই খুব চুপচাপ। মাথা নীচু।

গঙ্গার ওপারে খুব গম্ভীর স্বরে মিলের ভোঁ বাজতেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল হঠাৎ। সবাই পা বদল করল।

বিকাশ বলল— ক'টা বাজছে।

বিনায়ক হাত তুলে ঘড়ি দেখল— দশটা।

আগুনের দিক থেকে এইমাত্র চোখ সরিয়ে আনল প্রণব। বলল— খুব একটা দেরী হল না কিন্তু।

— আশ্চর্য! বলে খুব কষ্টের সঙ্গে থেমে গেল বিনায়ক। তারপর চাপা গলা। ফিসফিস করল— মাত্র দশ ঘণ্টা আগেও যে মানুষটা।

এই কথায় হঠাৎ আবার ভয়াবহ রকম স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক।

কেউ কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওদিকে। যেদিকে আগুন।

সবারই মুখে জ্বলজ্বলে আগুনের লাল। চোখের মণির মধ্যে আগুন। আর মাত্র আধ ঘণ্টা। তারপর এই অস্তিত্বটুকুও।

কে একজন এইমাত্র সাইকেলে চেপে এল। খুব ধীরে ধীরে এই শান্ত নীরবতা যাতে আহত না হয় এমন করে সে এগিয়ে গেল আগুনের দিকে। পলকহীন চেয়ে রইল। তারপর একসময় সে মুখ ফেরালো, সঙ্গে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ।

— আঃ!

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল ওটা। আলো আর অন্ধকারের মধ্যে ছোট ছোট্ট জটলা। ঐ ছোট্ট শব্দটুকু ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সবাই উদগ্রীব হয়ে, ওটার উৎস খুঁজতে খুঁজতে... খুঁজতে খুঁজতে... শোনা গেল কে একজন বলছে— কার যে কখন...।

চুপচাপের মধ্যে ঐ শব্দ ক'টি আগুনের আভায় আরও জ্বলজ্বলে হয়ে দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন একজন করে প্রত্যেককে আহত করে ফিরে গেল সেই শব্দটা আগুনের কাছে। সেখানে আগুন। লাল গনগনে। ধীরে ধীরে গভীরতা হারিয়ে ফেলছে আভা। আর মাত্র আধঘণ্টা।

— এমন হঠাৎ হল রোগটা। এরপর একটা রুমাল বার করে শেষটুকু বলল প্রণব— কেউ কিছু টের পাবার আগেই। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ও। চোখ থেকে চশমা খুলে চোখ নাক মুছল ভাল করে। তারপর বলল— আজ যা গরম পড়েছে না।

— আমি ত' বাড়ি ফিরে চান না করে থাকতে পারি না। বিকাশ পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করতে করতে বলল— আজ আসতেই শিখা খবরটা দিল আমায়। সঙ্গে সঙ্গে...

দেশলাই জ্বেলে এরপর সিগারেট ধরাল বিকাশ। বিনায়কের দিকে আগুনটা বাড়িয়ে দিল।

প্রণব সিগারেটে টান দিয়ে বলল— আমার ত' আজ আবার ছেলেটাকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল। কিন্তু স্টেশনে নেমেই একজনের কাছে খবরটা পেলুম।

বিকাশ কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। তারপর হাত নামিয়ে রাখল চুপচাপ।

মনন হাত দিয়ে চুল ঠিক করে হাতটা নামিয়ে রাখল পাশে।

বিনায়ক আঙুল দিয়ে জামার বোতাম নাড়াচাড়া করতে করতে বলল— মীনার কি অবস্থা বলত। আমি যেতেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। এটুকু বলে চুপ করে গেল বিনায়ক।

— এবার তোমরা রেডি হও।

জোরালো সবাইকে শুনিয়ে দেওয়া কথাটায় সবাই ফিরে তাকাল ওদিকে। ম্লান নিভে আসা আগুন। দুজন নাড়াচাড়া করছে ওটা। যারা যারা বসেছিল তারা সবাই উঠে দাঁড়াল। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। একজন ঘাট বেয়ে নেমে গেল নীচে। জলের দিকে।

অন্ধকার রাস্তার ওপর দিয়ে ওরা চুপচাপ হাঁটতে লাগল। শুধু পথ চলার ভৌতিক শব্দ ছাড়া। নির্জনতাকে ভেঙে দিয়ে প্রস্তাবটা প্রথম রাখল বিনায়ক।

— ওর জন্যে একটা স্মরণসভা করলে হয় না।

— তুই ব্যবস্থা কর। পুলক এগিয়ে এল কথাটায়।

— একদিন, বিনায়ক ধীরে ধীরে খুব ভেতর থেকে বলতে লাগল— অন্তত একদিন বেশ কিছুটা সময় শুধু ওকে নিয়েই—

— আমাদের চেঁ ও আরও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল নিজেকে। ছ'জনের একজন বলল কথাটা।

— ক্লাবের সেক্রেটারি ছিল দু'বছর।

— নাটকের উদ্যোক্তা—

— সকলের বিপদে আপদে ও ঠিক—

— তাহলে একটা দিন আমরা সবাই মিলে—

প্রণব বলল— ওর একটা ভাল ছবি—

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণের সেই ছবিটা। কথাটা ছুঁড়ে দিল পুলক।

না, একটা একলা ছবি চাই। বিনায়ক পুলকের দিকে তাকাল, একেবারে একলা। সেখানে ওর সঙ্গে আর কেউ নেই।

চুপ করে গেল সবাই। ওরা হাঁটছিল। রাত্রির নির্জনতা ভেঙে শুধু হাঁটার শব্দ। একটা কুকুর ডেকে উঠল ঝাঁ ঝাঁ করে। উৎকট চিৎকারে চারদিক ভরে উঠল। খান খান হয়ে গেল সময়। ঠিক এইসময় একটা সাইকেল।

— তোরা ফিরে এলি!

মিহিরকে চিনল সবাই। তার মধ্যে একজন চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল— কাজ মিটে গেল।

অজান্তে মিহিরের মাথাটা নীচু হল। থেমে থেমে বলল লাস্ট ট্রেনে ফিরে শুনলাম—

মিহিরের কাঁধে হাত দিল একজন। ও মুখ তুলল— এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গলায় থমথম করছে দুঃখ।

একটুক্ষণ থামার পর আবার হাঁটতে লাগল দলটা। কুকুরটা সরে গেছে দূরে। দূর থেকে ভয়ার্ত গলায় ডেকে যাচ্ছে ওটা।

— আমরা ঠিক করেছি, একটা স্মরণসভা করব।

— বেশ ত'। মিহির তাকাল বিনায়কের দিকে— কবে?

— সামনের সপ্তায়, ধর রবিবার। বিনায়ক সকলের উদ্দেশেই বলল কথাটা। তোরা কি বলিস।

— ঠিক আছে। পুলক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল— তবে এর মধ্যে সকলকে জানাতে হবে। আর ওর একটা ভাল ছবি।

— আচ্ছা রোববার বাদ দিয়ে যদি অন্য একটা দিন—

সবাই এবার বিকাশের দিকে। বিকাশ বলল— আসলে ওই দিন আগে থেকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা আছে। যদি ওই দিনটা বাদ দিয়ে অন্য কোন ছুটি—

উত্তরে কেউ কিছু বলল না। চারদিক বড় নির্জন। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের ফ্যাকাশে ছায়া। শুধু হেঁটে যাবার শব্দ। খুব মৃদু বাতাসের শব্দ। আর রাত্তির।

— আমি ত' এবার ডান দিকে যাব।

থেমে গেল দলটা। বিনায়ক বলল— তাই ত'। আমরা কথা বলতে বলতে—।

— তুই তাহলে আয়।

— তাহলে ডেটটা ঠিক করে আমায় জানাস।

— আচ্ছা, ঠিক আছে। মনন এগিয়ে দিল কথাটা।

— আমি তাহলে আসি। পুলক সামান্য হাত তুলল।

অন্ধকার রাস্তার এধার থেকে পাঁচটা 'আয়' রাস্তার ও ধারে যেতেই ও হাঁটতে আরম্ভ করল।

পাঁচজন। ধূ ধূ শূন্য রাস্তা। রাস্তার পাশের গাছটা হঠাৎ দুলে উঠল।

ঝটপট শব্দ হল। চমকে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। মিহির বলল— পেঁচা-টেঁচা বোধহয়।

— বিকাশ, পরের রোববার যদি হয়। প্রসঙ্গটা এবার মননের গলায়।

— তাহলে আর অসুবিধে কি—

— কিন্তু ও রবিবারেই ত' ফাইনাল খেলাটা। বিকাশ থামতে প্রণব বলে কথাটা। বেশির ভাগ প্লেয়ারই ত' বাইরে থেকে আসছে। আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ—

সবাই চুপ। শুধু পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া। দু'পাশে বাড়ি। বড় চুপচাপ। খোলা জানলার ওপারে নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ঘুম গাঢ় অচেতনে এখন। দূরে কোথায় পুলিশের হুইসেল। তারপরেই উদাত্ত গম্ভীর গির্জার ঘড়ি ঘণ্টার শব্দ।

— ওটা পেছিয়ে দেওয়া যায় না। শ্লথ হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলল বিনায়ক।

— সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। প্রণব হাসবার চেষ্টা করে। দু'বার অলরেডি পেছিয়ে গেছে।

— হ্যাঁ ঠিকই বলেছে ও। মিহির বলে ওঠে। আর ক্যানসেল হলে, এবছর টুর্ণামেন্টটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

— তার চে' বরং কোন ওয়ার্কিং ডে'জে। কথাটা পাড়ে বিকাশ।

— তা কি সম্ভব। হাঁটতে হাঁটতে মনন বলে এবার। ব্যাপারটা ত' শুধু আমাদের নয়। ক্লাব আছে। ওর অফিসে খবর দিতে হবে। ওয়ার্কিং ডে'জে—

— এই অবধি বলে থেমে যায় মনন।

— আচ্ছা আর কোন ছুটি।

বাঁকের মাথায় এসে থমকে দাঁড়ায় সবাই।

— আমরা তাহলে—

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনন বলে ওঠে। তোরা ত' আবার এদিকেই।

— হ্যাঁ এদিকেই আমাদের সর্টকাট। বিকাশ অল্প হাসে।

— তাহলে একটা ছুটি টুটি দেখে বলতে বলতে মিহিররা রাস্তার ওপিঠে এগিয়ে যেতে থাকে। একটা ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়।

— তোরাই একটা দিন ঠিক করে নিস না বিনায়ক। ওপার থেকে বলে ওঠে প্রণব। ছুটি-ছাটা দেখে যে কোন একটা দিন।

বিনায়ক শুধু বলে— আচ্ছা।

ওরা তিনজন রাস্তার ওপার থেকে অল্প হাত তোলে। আবছা দেখা যায় ওদের। নির্জনতা চেপে ধরে আরও। বুক শূন্য করা ধূ ধূ নির্জন রাস্তা। ভেতরে স্তব্ধতা বাজে ঝিম ঝিম।

আমি ভাবতে পারছি না জানিস।

মননের দিকে তাকাল বিনায়ক। ওর চোখ মাটির দিকে। গলা খাদে— এভাবে একটা আস্ত মানুষ।

— আমাদেরই মত একজন। একেবারে সাদামাটা। বিনায়কের গলাও গাঢ় মমতায় ধূসর। পুজো কমিটির ট্রেজারার। ক্লাবের দু বছরের সেক্রেটারি। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বড় সাদামাটা ভূমিকা আমাদের।

— এইমাত্র মনে পড়ল। মনন কিছু আবিষ্কার করার গলায় বলে ওঠে। ওর একটা ছবি আমার কাছে রয়েছে।

— তাই নাকি!

— হ্যাঁ, ওর একলার ছবি, খুব ভাল ছবিটা। তখন ওর চমৎকার স্বাস্থ্য। আমার অ্যালবামে।

— বেশ তাহলে ওটাই।

— কিন্তু দিনটা!

— তাড়াতাড়ির কি আছে। ছুটি-টুটি দেখে সবাই একদিন। ওদের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনায়ক। তারপর বলল— তোকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

— না না তার দরকার হবে না। মনন বলে উঠল। আমি একাই—

এরপর সে একা।

জনক

সিদ্ধার্থ ঘোষ

ঘুমটা ভেঙেও ভাঙছে না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন আবছা একটা শব্দ। বার বার। শব্দটা ভারী নরম। পাতলা হয়ে আসা ঘুমের ওড়না ঠেলে কানে পৌঁছচ্ছে কিন্তু ধাক্কা দিচ্ছে না। একবার চোখ খুলল শ্রাবন্তী। আলোরা হইচই জোড়েনি এখনো। আবার চোখ বুজল। শব্দটা এখনো আসছে। এবার বুঝতে পেরেছে। শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটাকে শাসন করছে মেসোমশাই। এই বাড়ি তৈরি হওয়ার পর থেকেই বাইরের ঘরের দেওয়ালে ঘড়িটার মৌরসীপাট্টা। বয়স তার ষাটের কোঠা পেরিয়েছে। মেসোমশাইয়ের চেয়ে বয়সে বড়। মেসোমশাই এখন চেয়ারে চড়ে বাঁ হাতে ঘড়ির বুক টিপে ধরেছে। আর কাঁটা ঘুরিয়ে বাজনা মেলাচ্ছে। সময়ের হিসেব বুড়ো ঘড়িটা ঠিকই রাখে কিন্তু ন'টার সময় বারোটা বাজে বা ছ'টা। বাকবিভ্রম। রোজ মেলাতে হয়।

একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে শ্রাবন্তীর। মাসীমণি চান করে এল। চোখ না খুলেই বলে দিতে পারে। ছোটবেলায় গামছা ভুলে যেত শ্রাবন্তী। তখন গন্ধ শুঁকে ঠিক করত কোনটা কার। এখন আর পারবে কি-না বলা শক্ত। তবে মাসীমণির গায়ের মিষ্টি গন্ধটা এতটুকু বদলে যায়নি। ঘরে ঢুকলেই টের পাওয়া যায়। ভীষণ হিংসে হত শ্রাবন্তীর প্রথমে। এই বাড়িতে আসার পর। তখন সে নেহাত ছোটটি নেই। কতদিন আর, বছর দশেক আগের কথা। মায়ের গায়ে তো কই অমন সুন্দর গন্ধ নেই। 'আমি মাসিমণির সাবান মাখবো।' এক দিন বায়না জুড়েছিল। মা, মাসী, মেসোমশাই— কেউ বোঝাতে পারেনি। নতুন সাবান এল। গন্ধ শুঁকে মেলানো হল জয়ার সাবানের সঙ্গে। কিন্তু শ্রাবন্তীর বিশ্বাস হয়নি। মাসীমণির সাবানের কৌটোর মধ্যে ওই ভিজে সাবানটাই তার চাই। প্রথমে কারণটা বলেনি শ্রাবন্তী। বলার পর সে কী হাসি সকলের। জয়া তার আতর এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতেও হয়নি। মাসীমণির তেল সাবান আতর ক্রিম— সব চাই।

সব মেখেও শ্রাবন্তীর শান্তি হয়নি। মা বলেছিল, 'ও কি এক দিনে হয়। জয়া শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পর থেকেই গন্ধটা—'। সত্যি, গন্ধটা মাসীমণির চামড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে।

'কি গো রাজকন্যে, চোখ খুলুন এবার—'

মিষ্টি গন্ধটা এগিয়ে আসে। ঠাণ্ডা ভিজে গালের স্পর্শ পেয়েই শ্রাবন্তী চোখ খোলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভিজে চুল শুদ্ধু গলাটা।

'এত তাড়াতাড়ি চান করে ফেলেছ কেন?'

গালে গাল ঘষতে ঘষতে জয়া আঙুলে আদর নিয়ে শ্রাবন্তীর চুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতেই বলে, 'ওমা। সকাল কোথায়!'

জয়ার গলা জড়িয়েই চোখ খোলে শ্রাবন্তী। তবে কি মেঘ করেছে বলে... তারপরেই মনে পড়ে যায় দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বাঁশের মাথায় তেরপলের ছাউনি পড়েছে। সন্ধ্যেবেলায় আজ অনেক লোক আসবে। আলো, ফুল, হাসিখুশি, গান আর খাওয়া দাওয়া— আর সব কিছুই শ্রাবন্তীর কারণে, শ্রাবন্তীকে নিয়ে, শ্রাবন্তীকে ঘিরে। গা-টা শিরশির করে। ক'দিন আগে রুমার বিয়ে হয়েছে। সারাটা দিন কেমন হাসিতে মজাতে দুষ্টুমিতে ভাসতে ভাসতে পার হয়ে গেছল। কিন্তু সেটা ছিল রুমার বিয়ের দিন, রুমার বন্ধু হিসেবে দিনটাকে সে উপভোগ করেছে। রুমা কি করছিল সেদিন মনে করার চেষ্টা করে শ্রাবন্তী। সেদিনই রুমার মনটাকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত ছিল তার। তাহলে হয়তো আজ নিজেকে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। শ্রাবন্তী বুঝতে পারছে না, আজ তার দায়িত্ব কি? শ্রাবন্তীর বিয়ের দিন শ্রাবন্তীর কাছে কি চায় সকলে? কিছু চায় কি?

'এবার ওঠা হক রাজকন্যার।' বলতে বলতেই শ্রাবন্তীকে দু'হাতের বাঁধনে বেঁধে টেনে বসিয়ে দিল জয়া। নিজেকেও সেইসঙ্গে বসে পড়তে হয়েছে খাটের ওপর।

'দ্যাখ্, তুই এখনো আড়মোড়া ভাঙছিস তো, তোর রাজপুত্তুর হয়তো সারা রাত চোখের পাতাই এক করতে পারেনি।'

'যাও— সকাল বেলায় উঠেই ঠাট্টা ভাল লাগেনা। তুমিও আর সবার মতো করো না মাসীমণি— লক্ষ্মীটি!'

'সকাল কিরে! শ্বশুরবাড়ি গিয়েও এমনি বেলা করে উঠবি নাকি! ওঠ— ওঠ—'

শ্রাবন্তী উঠে পড়ল।

মাসীমণির এখন ঠাট্টা করার মতো মনের অবস্থা নয়। আর পাঁচজনের সামনে নিজেকে যাতে সামলে রাখতে পারে তার জন্যে এখন থেকেই সতর্ক করছে নিজেকে। শ্রাবন্তীর বিয়েতে আনন্দ দুঃখ ভাবনা— অনুভূতির সব স্তরেই মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ মাসীমণি। সেটাই গত দশ বছরের রীতি। সেই যেদিন মায়া আর শ্রাবন্তী এই বাড়িতে এল, তার পরের মুহূর্ত থেকেই জয়া আবিষ্কার করেছে, শ্রাবন্তীই তার জীবনের কেন্দ্র। ঘটনার পিছনে কারণ খুঁজতে চাওয়াই মানুষের ধর্ম। জয়ার নিঃসন্তান হওয়াটা তাই অনেককেই সন্তুষ্ট করে। তারা জানে না, জয়া মাতৃত্বের দাবি নিয়ে বোনের মেয়েকে গ্রহণ করেনি। মায়ের বিকল্প হতে চায়নি। মায়ের স্থান দখল করে নেবার মতো কোন আদিম অবচেতন নির্দেশের পুতুল হয়নি। চিরদিন মাসীমণি হয়েই থেকেছে। একটি রাতেও সে শ্রাবন্তীকে পাশে নিয়ে শোবার জন্য অধীরতা দেখায়নি। কিন্তু তারপরেও শ্রাবন্তীর জীবনে মাসীমণি অপরিহার্য। মা কাজে বেরিয়ে যায় সকাল ন'টায়। ফিরতে ফিরতে ছ'টা। ক্লাবের কাজ পড়লে আটটাও হয়। শ্রাবন্তীর জন্যেই জয়া তার চাকরি ছেড়েছে। সেটাও বড় কথা নয়। জয়া গানও ছেড়েছিল। অনুযোগ করেছে গুণমুগ্ধরা। জয়া তর্ক করেনি কোনদিন। উত্তর তার একটাই— তার জীবনে শ্রাবন্তীই সেরা গান। কেউ সন্তুষ্ট হয়েছে এই উত্তরে, অনেকেই হয়নি কিন্তু জয়া হয়েছে এবং সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। শুধু তাই নয়, শ্রাবন্তীর প্রয়োজনে জয়া যেমন গান ছেড়েছিল আবার শুরুও করেছিল নতুন করে। শ্রাবন্তী তার যোগ্য উত্তরসূরী। প্রসঙ্গতঃ মেসোমশাই একদিন শেক্সপীয়ারের সনেট উদ্ধৃত করেছিল,'বুঝলে জয়া, তুমি না থামালেও তোমার গান একদিন থেমে যেত ঠিকই। প্রকৃতির নির্দেশেই। আর থামবে না। তোমার গান এখন নতুন জীবন পেয়েছে শ্রাবন্তীতে— হ্যাঁ—

'দিস ওয়্যার টু বি নিউ মেড হোয়েন দাউ আর্ট ওল্ড,
অ্যান্ড সি দাই ব্লাড ওয়ার্ম হোয়েন দাউ ফিলেস্ট ইট কোল্ড।'

বাথরুম থেকে জলের ফোঁস-ফোঁসানি কানে আসে। বেসিনের কল খুলেছে শ্রাবন্তী। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। জয়া উঠে গেল।

'শ্রাবন্তী! বালতিতে গরম জল রাখা আছে। একেবারে চান করে নিও।'

শ্রাবন্তী কিছু একটা বলল কিন্তু শোনা গেল না।

'কলটা বন্ধ করে বলো।'

'কাপড় জামা নিইনি—'

'আমি দিয়ে যাচ্ছি।'

শাড়ি ব্লাউজ দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল জয়া। মায়া পাশের বাথরুম থেকে চান করে এসেছে। ভিজে চুলের সঙ্গে তোয়ালে পাকাতে পাকাতে মায়া হাসছিল জয়ার দিকে তাকিয়ে।

'হাসছো যে?'

'হাসি এলে হাসব না!'

'হাসি এল কেন সেইটাই তো জানতে চাইছি। কি করলুম আবার?'

'করবি আর কি! আজও শাড়ি-ব্লাউজ যোগাচ্ছিস হাতে হাতে। কাল থেকে কি হবে শুনি।'

'কি আবার হবে? কাপড়-চোপড় কাচাকাচি আর সারাদিন ধরে রান্নাবাড়া করার জন্য নিশ্চয় বিয়ে দিচ্ছি না। ওগুলো করার জন্য মেয়ের অভাব নেই। সেকথা ওরা ভালভাবেই জানে। অমিতদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় একদিনের নয়, সব দেখে বুঝে নিশ্চিন্ত না হয়ে—'

'আরে দূর— ওকথা বলিনি। শ্রাবন্তী নয়, তোর কি হবে তাই ভাবছি।'

'ও, তাই বলো। হ্যাঁ, সেটা সত্যিই সমস্যা। আমি এখনো জানি না। ভাবতে পারছি না। কাল থেকে আমার পুরো ছুটি।'

শাড়িটা আলগা করে গায়ে জড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল শ্রাবন্তী।

''দিদি আজকে একটু কপালে সিঁদুর ঠেকাও।' মাসীমণির গলা। মাকে বলছে।

'অত আদিখ্যেতা আমার আসে না।'

'তা নয়, আজ একটা শুভদিন। ধর্মকর্মের কথা হচ্ছে না। তুমি জানো, আচার বিচারের আমি পরোয়া করি না। তবু বোঝো তো কয়েক শতাব্দীর অভ্যাস। রক্তে মিশে আছে। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে বাবা থাকছে না—'

'ধরে নাও না, সে নেই। যে নেই তার জন্যে—'

''দিদি, ওকথা বলো না—''

'কেন? কেন বলবো না? যে থেকেও নেই, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথাও নেই।'

'শ্রাবন্তীর কথা ভাবো। যতই হোক তার বাবা আজ—'

'শ্রাবন্তীর কথা ভাবি বলেই বলেছি। শুধু নিজের কথা ভাবলে হয়তো কোন অসুবিধেই হত না। জাহান্নামে গিয়েও তার সঙ্গে বাস করতে পারতাম। কপালে সিঁদুর জ্বলজ্বল করত। নিশ্চয়ই সেটা তুই—'

'না, না, তুমি ভুল বুঝোনা দিদি। তুমি জানো তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি স্ট্রিক্ট। তাছাড়া এটাও তোমার মস্ত ভুল। শুধু কি শ্রাবন্তীর কারণেই তুমি এই ডিসিশান নিয়েছ? কক্ষণো নয়। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অজয়দার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেই কি তার মন পেতে? তা হয় না। যে নিজের মেয়ের কথা ভাবে না, সে দেশের কথাও ভাবতে

পারে না। ওসব ভড়ং— হয় না, হয় না। দুটো মানুষের মধ্যে, দুটো পরিবারের মধ্যে কালচারাল গ্যাপটা এত বড় হলে মিল হতে পারে না।'

জড়সড় হয়ে যায় শ্রাবন্তী। এখন ঘরে ঢোকা যতটা কষ্টকর, দাঁড়িয়ে থাকাও ততটাই। মা বা মাসীর নজরে পড়লে একটা লজ্জা মাখানো অস্বস্তি তিনজনেরই কণ্ঠরোধ করবে।

শ্রাবন্তী তবু সরে যেতে পারে না। শোনে।

জয়া বোঝাচ্ছে, 'দ্যাখো, সত্যিই যদি ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝির হ'ত, সত্যি যদি অজয়দার কাছে তার আদর্শটাই এত বড় হত, মানে যে আদর্শের দোহাই তিনি দেন— তাহলে সে কখনোই আরেকটি মেয়েছেলের সঙ্গে—'

'না!' শ্রাবন্তী নীরবে একটা আর্তনাদ করে দরজার পাল্লাটা ধরে ফেলল। ধরে না ফেললে পড়ে যেতে পারত। মাসীমণির মুখে—

'— সে বাস করত না। তোমারও তো সমস্ত জীবনটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তার একার নয়। কই তোমার তো নতুন কারুর সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধার দরকার পড়ে নি। ওসব আদর্শ, জনগণ কিচ্ছু নয়— মুখের বুলি, আসল কারণ ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটার জন্যই বাকী সব কিছু তৈরি করা হয়েছে—'

শ্রাবন্তী নিঃশব্দে ফিরে গেল বাথরুমে। একটা মুহূর্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ধাক্কাটা আচমকা। আলতো করে কলঘরের পাল্লাটা টেনে আনল। সন্তর্পণে তুলে দিল ছিটকিনি। ঠাণ্ডা ভিজে দেওয়ালটায় পিঠের ঠেস রেখেছে। চোখ বন্ধ। বুকটা আরো বাতাস নেবার জন্য ছটফট করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে শরীরের জ্বালাটা কমে এল। আর উথলে উঠল অভিমান। মার ওপর, মাসীর ওপর, বাবার ওপরেও। মা না বলুক, মাসীমণি তো বলতে পারত। বাবার সম্বন্ধে যত কথা সবই তো মাসীমণি জানিয়েছে। একথাটা বলতে কি দোষ ছিল!

মাসীমণি শ্রাবন্তীকে নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা করেছে। শ্রাবন্তীকে গড়ে তুলেছে তার বাবার সমস্ত অনাচারের বিকল্প রূপে, আদর্শ জবাব হিসেবে। এটা মাসীমণির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। শ্রাবন্তী জানে মাসীমণির কাছে এই লড়াই জীবনমরণের সমস্যা। তাতে শ্রাবন্তীর আপত্তি নেই। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়নি কারণ তার ইচ্ছাগুলোকে ঠিক সময়মতো সযত্নে স্নেহভরে গড়ে তোলা হয়েছে। মনটাই তো ভাললাগা মন্দলাগা নির্ধারণ করে। সেই মনটা তার গড়ে উঠেছে শান্ত সুন্দর পরিবেশে। শান্ত আর সুন্দরের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করার জন্য তাকে সচেষ্ট হতে হয় না, কোনো নিষেধ নির্দেশ পালন করতে হয় না। কাজেই, আজ সে যেটা শুনল, মানে শুনে ফেলল, সেটা তাকে আগেই বলা উচিত ছিল। না বলে ঠিক করেনি মাসীমণি।

একটা যন্ত্রণা মাথার পিছন থেকে ঘাড় বেয়ে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। ঘাড়টা বেঁকিয়ে মুখটা উঁচু করল। কলঘরের উঁচু জানলার পাল্লার ওপর আড়াআড়ি দুটো কাঠ আঁটা পেরেক ঠুকে। মেঝে ছাপিয়ে মাঝ দেয়াল অবধি মোজেক উঠেছে, তারপর সাদা ডিস্‌টেমপার। কলঘর হলেও কোথাও এতটুকু ঝুল নেই, মালিন্য নেই। এর মধ্যে একেবারেই বেমানান ওই জানলার পাল্লায় আটকানো রঙহীন রুক্ষ দু'ফালি কাঠ। ঠিক যেমন বেমানান তার বাবা এ-বাড়িতে। আর সত্যিই ওই কাঠ দুটোর সঙ্গে তার বাবার একটা সম্পর্ক আছে। বাবার কারণেই জানলায় কাঠ আঁটা হয়েছে। বাবার আসা-যাওয়া

বন্ধ করার জন্য। শ্রাবন্তীর হাসি পায় অথচ এখনো চোখের কোণে জল শুকোয়নি। কলঘরে ঢুকে জানলাটার দিকে তাকালেই তার হাসি পায়। দু'বছর আগে বাবা কলঘরের এই জানলা গলে বাড়িতে ঢুকেছিল শ্রাবন্তীর জন্মদিনে। বছরে বাবার সঙ্গে এই একবার দেখা হয় শ্রাবন্তীর। এই নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হয়নি। সবাই বাধা দেবার চেষ্টা করে হার মেনেছে। তবে সেবারের কথা স্বতন্ত্র। বাবার খোঁজে পুলিশ তিন বার হানা দিয়ে গেছে। সত্তরের কলকাতা। পুলিশের ডি সি সাউথের সঙ্গে মেসোমশাইয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মা-কে সাদা সিঁথি দেখিয়ে পুলিশকে বোঝাতে হয়েছে যে ফেরারী আসামীর সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখেন না। তিনি সরকারী অফিসের কর্মী। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শকে স্বীকার করেন না। কেউ ভাবেনি এর মধ্যেও বাবা আসবে। পুলিশও নয়। একা শ্রাবন্তী জানতো, বাবা আসবেই। বোসেদের বাড়ির রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে উঠে, বাথরুমের জানালা গলে... মাসীমণির মুখ দিয়ে কথা সরেনি। মা সরে গেছল। পুলিশের কালো গাড়ি আসছে কি-না দেখতে মেসোমশাই বারান্দায়। বাবা চলে যাবার পর একটাই শব্দ উচ্চারণ করেছিল জয়া— ব্রুট। তারপর প্রসঙ্গটা অশালীন স্তানে সবরকম আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল নিঃশব্দে। শ্রাবন্তীর তবু হাসি পায়। বাবা সত্যিই ব্রুট। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে এই ব্রুট-শক্তিকে ঠেকাবার সাধ্য নেই কারুর। এটা নিয়ে গর্ব করার কিছু আছে কি-না জানেনা শ্রাবন্তী। কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে, তার জন্মদিনে বাবা আসবেই। গত বছরেও বাবা এসেছে। বাড়িতে দেখা করার উপায় ছিল না। দেখা হয়েছিল কলেজে। এক প্রফেসার বন্ধুর কক্ষে নিভৃতে আধঘণ্টা কাটিয়ে গেছে শ্রাবন্তীর সঙ্গে।

শ্রাবন্তী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতেই আবার মনে পড়ে, মা মাসী বাবা সবাই তার কাছ থেকে একটা কথা গোপন করেছে। শ্রাবন্তী অবাক হয়ে যায়। বাবার ওপরই যেন বেশী অভিমান জন্মেছে। যার সঙ্গে বছরে একদিন দেখা হয়, যার সঙ্গে প্রায় দুর্ঘটনামূলক রক্তের একটা সম্পর্ক তার ওপর অভিমান করার কোনো মানে হয় কি! বাবার ওপর তার যে একটা দাবী আছে সেটা শ্রাবন্তীও বোধ হয় বোঝে না। মনে মনে সে স্থির করে নেয়, আজ বাবাকে সে ছাড়বে না। জিজ্ঞেস করবেই। বাবার তো বলা উচিত ছিল। কলঘরের ছিটকিনি খুলে বেরোতে বেরোতেই প্রশ্নটাকে গুছিয়ে নেয়। অভিমানের জায়গায় শ্রাবন্তীর মনে একটা কৌতূহল তৈরী হচ্ছে। বাবা যার সঙ্গে থাকে কেমন তিনি? তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে শ্রাবন্তীর। মায়ের পাশে দাঁড় করাতে। বাবাকে সে বলবেই— কেন জানাওনি এতদিন? বাবা এলেই বলবে। আর বাবা যে আজ আসবেই সে সম্বন্ধে তার ছিটেফোঁটা সন্দেহ নেই।

শ্রাবন্তী গুটি গুটি পায়ে বারান্দায় এল। মেসোমশাই জলখাবারের পালা শেষ হতেই বারান্দায় এসে বসেছে।

'আয় শ্রাবন্তী। বসবি? রোদ্দুরটা বেশ ভালই লাগছে। সকালটা এখানে বসেই বই পড়ে কাটিয়ে দেব ভাবছি। বাড়ির ভেতর ঢুকলেই দুশ্চিন্তা। আমি আর আজ কিছু ভাবতে রাজী নই। তোর মা মাসী বড়মামা তো আছে— বল্!'

মেসোমশাই শ্রাবন্তীর হাতটা ধরল। মেসোমশাইয়ের চোখে চশমা দেখে অবাক হল শ্রাবন্তী। বই পড়ার জন্য তো চশমা লাগে না, তবে কি? শ্রাবন্তী বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে নিঃসন্দেহ হল। এখানে বসে সদর দরজাটা দেখা যায়। গলি দিয়ে মানুষজনের চলাচলের ওপর নজর রাখছে মেসোমশাই। বাবা যে আসবে সেটা

মেসোমশাই আন্দাজ করেছে। কিন্তু এত ভয় কিসের? বাবা এলেই বা কি? অমিত তো সব জানে। বলা হয়নি একটাই কথা। অমিত বোধ হয় ধরে নিয়েছে শ্রাবন্তী বছর দশেব তার বাবাকে দেখেনি। মাসীমণি বারণ করেছিল শ্রাবন্তীকে। অমিত খুব সেন্টিমেন্টাল। মনটা তার ভারী নরম। হঠাৎ যদি কোনো সফ্‌ট কর্নার তৈরি হয়, কে জানে তখন হয়তো বলে বসবে বিয়ের আগে তাঁর শুভাশীষ নেওয়াটা অবশ্য কর্তব্য। অমিত খুবই ভদ্র ছেলে কিন্তু জেদ তার ভয়ানক। শান্তিনিকেতনে বছর আষ্টেক কাটিয়েও রায়বাহাদুর ঠাকুর্দার কাছ থেকে অর্জন করা উত্তরাধিকার মলিন হয়নি। জয়া একথা ভাল্ করেই জানে কারণ অমিতদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটার বয়সও প্রায় দুই পুরুষের। কিন্তু বাবা যদি আসেন মেসোমশাই কি বারান্দায় বসে দৃষ্টি রেখেই— অসম্ভব! এই জন্যেই তো বিয়ের কথাটা গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল। মায়ের ভুলে সেদিন যখন— ওই একবারই মাসীমণিকে রাগতে দেখেছে শ্রাবন্তী। জয়ার গায়ের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন দেহটা তার কোমল আর বৃত্তাকার কিছু রেখার সমন্বয়। কোনো কারণে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হলেও কপালে বা ভুরুতে কর্কশ রেখা জন্মায় না।

সেই জয়াই বলেছিল, 'দিদি তোমার মাথার ঠিক নেই। ছি ছি— কি দরকার ছিল তোমার ওদের সঙ্গে অত কথা বলার! যা ভয় করেছিলাম তাই হল— কথাটা এবার ঠিক অজয়দার কানে যাবে।'

মায়া মাথা নিচু করে নিয়েছিল। প্রতিবাদ করেনি। ভুল তো সত্যিই হয়েছে। তিনটে ছেলে মায়ের অফিসে গিয়েছিল দেখা করতে। মায়ের কাছে বাবার লেখা কোন চিঠি আছে কিনা খোঁজ করেছিল। ওরা নাকি বাবার লেখা নিয়ে একটা সংকলন বার করবে। মা বলেছিল, কোনো সম্পর্কই নেই যার সঙ্গে... ছেলেগুলো নিরস্ত হয়নি। ৪২-এর মুভমেন্টের সময় বাবার সঙ্গে মায়ের প্রথম পরিচয় ও সেই সূত্রেই বিবাহ। ৪৭-এর আগে তাঁদের সম্পর্কে কোনো বড় রকম সংকট দেখা দেয়নি। ছেলেগুলো সব খবরই জানতো। সাতচল্লিশের আগে (যাকে মা বলে স্বাধীনতা আর বাবা বলে স্বাধীনতার ধাপ্পা) জেল থেকে সত্যিই বেশ কিছু চিঠি লিখেছিল বাবা। সেই চিঠিগুলোর খবর ওরা যখন জানত, নিশ্চয় পার্টির ছেলে এবং বাবার খুব ঘনিষ্ঠও। হয়তো বাবাই ওদের— মা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি, 'তোমরা কি আমাকে এতটুকু শান্তি দেবে না? আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে জোর করে প্রমাণ করে ছাড়বে! সে কোন্ যুগে কি লিখেছিল, সেগুলো আমার কাছে কোন অমূল্য সম্পদ নয় যে সিন্দুকে ভরে সযত্নে রক্ষা করব। কয়েক বছর আগে শুধু সন্দেহের বশে আমায় অফিস থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সে কথা জানো? তোমরা কি চাও আবার আমি... আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি—'

'না, না! তা নয়! আমরা আর কখনো আসব না। না এসে যে... জানতাম হয়তো, আপনার কাছে কিছু নেই, তবু এটা আমাদের দায়িত্ব। অজয়দার স্মৃতি রক্ষা—'

আর সহ্য করতে পারেনি মায়া। স্মৃতি রক্ষা! অজয়ের মৃত্যুর খবর এর আগেও বার তিনেক অন্তত এসেছে গত তিন বছরে। আসলে সেন্টিমেন্টে ঘা দেওয়া। প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে হাত জোড় করে মিনতি করেছিল মায়া, 'দোহাই তোমাদের, বিশ্বাস করো আমার কাছে কিছু নেই। বিশ্বাস করো। আমি তো কিচ্ছু চাই না তোমাদের কাছে। শুধু আমার মেয়েকে নিয়ে আমায় একটু সুস্থ ভাবে শান্তিতে বাঁচতে দাও। আজ বাদে কাল তার বিয়ে—'

অকারণে উত্তেজিত হয়নি জয়া। সেদিনের পর থেকে এ বাড়ির সকলেই বুঝেছে যে শ্রাবন্তীর বিয়ের দিন সেই মহাপুরুষের পদধূলি পড়বেই। আনন্দের আয়োজনে অনুক্ষণ

কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে চিন্তাটা। লোকটা এখনো ওয়ান্টেড। বলা যায় না পুলিশও হয়তো ওত পেতে থাকবে। শেষে বিয়ের দিন যদি রেড্ হয়— ভাবা যায় না।

ভেতরের ঘর থেকে মাসীমণি ডাকছে।

'শ্রাবন্তী, তুই বরং বইগুলো দেখেশুনে ট্রাঙ্কে পুরে রাখ এই বেলা। আমি গুরুদেবের ছবিটা পরিষ্কার করে ফেলি—'

'তুমি বই তোলো, আমি ছবিটা পরিষ্কার করছি।' শ্রাবন্তী ঘরে এল।

চেয়ার টেনে রবীন্দ্রনাথের অয়েল পেন্টিংটা নামিয়ে আনল। বড্ড ভারী ছবিটা। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর বসবে। ছবিটাকে সাজিয়ে রাখা হবে। মাস্টার মশাই আসবেন। তিনি শান্তিনিকেতনের মানুষ। স্নেহভাজন কন্যাসমা ছাত্রী জয়ার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে কলকাতায় এসেছেন।

তুলোর থুপিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখের ময়লা সরায় শ্রাবন্তী। এই শ্মশ্রুধারী ফ্রেমে বাঁধানো মানুষটিকে মাঝখানে রেখে জয়া লড়াইটা জিতে গেছে। শ্রাবন্তী যখন প্রথম জানতে পারে যে তার বাবা রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, বাবার পার্টির ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকেও খানখান করে দিয়েছে স্কুল পুড়িয়ে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা নিপাত করার সময়, ততদিনে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হয়ে পড়েছেন শ্রাবন্তীর জীবনে। গানে-নৃত্যে-নাট্যে কবিত পাঠে সে স্কুলজীবনের নিচু ক্লাশ থেকেই অংশগ্রহণ করেছে। জয়া নিজে তাকে পিয়ানো বাজিয়ে গান শিখিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শ্রাবন্তীর সুরের জগতের ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়ে। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে পরাস্ত করার কোন সুযোগই পায় নি বাবা। তাছাড়া সেরকম কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। ক'বছর আগে তার জন্মদিনে শ্রাবন্তী বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রবীন্দ্রনাথকে তুমি পছন্দ করো না কেন বাবা? আমার তো খুব ভাল লাগে।'

'তোমার ভাল লাগাটাই তো স্বাভাবিক শ্রাবন্তী। কিন্তু সবার ভাল লাগার মতো অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। তুমি যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছ সবাই তো সে পরিবেশ পায় না। আমরা সেই পরিবেশটাই তৈরি করতে চাই সবার আগে।'

শ্রাবন্তীর হাতের তুলোটা বেশ ময়লা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মুখে এত ধুলো!

বাবার মতামত মেনে নিতে পারেনি শ্রাবন্তী। কিন্তু তা বলে বাবাকে বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। মনে পড়ে, সেদিন একটা মাছি ভনভন করে বিরক্ত করছিল। হঠাৎ এক থাপ্পড়ে সেটাকে মেরে টেবিলের ওপর ঝেড়ে ফেলে দিল বাবা। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠেছিল তার। মাসীমণি 'হরিবল্' বলে চলে গেল। বাবা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে নি। শ্রাবন্তী বলল,'হাতটা ধোবে?' — 'কেন?' — 'মাছিটা মারলে...' এবার বাবা হেসেছিলেন। সেই দেবব্রত বিশ্বাসের গানের মতো হাসি। বাবার চিন্তাভাবনা বা জীবনযাপন, কোনটাই শ্রাবন্তীকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু বাবা করে। কিংবা, হাতের শির-ফোলা একটা খোলামেলা রুক্ষতা তাকে আকর্ষণ করে। পৌরুষ। শ্রাবন্তীর জীবনে বাবাই সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। কলেজে প্রফেসারের ঘরে শ্রাবন্তী সুযোগ পেয়েছিল নিভৃতে প্রশ্ন করার,'বাবা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, সব জেনেশুনে তুমি আর মা কেন...'

প্রশ্ন শেষ করতে হয় নি। 'সব জেনেশুনে নয় শ্রাবন্তী। সাতচল্লিশের আগে বড়লোক ছোটলোক বিভেদটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ভাবতে পারো বিয়াল্লিশের মুভমেন্টে তোমার মা রাস্তায় নেমেছিল, মিছিলে স্লোগান দিয়েছিল, হাত মুঠো করে— হ্যাঁ, শত্রু ব্রিটিশ বলে গান্ধীভক্ত রবীন্দ্রপ্রেমীরাও তখন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করতেও তারা নারাজ।'

শ্রাবন্তী মাথা হেঁট করে বসেছিল। মিনিট খানেক দু'জনেই চুপচাপ। তারপরে বাবা বললেন,'তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমার মায়ের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তাঁর পথ আমার পথ থেকে আলাদা। লোকে বলে অ্যাডজাস্ট করে চলার কথা। কিন্তু মিথ্যের সঙ্গে বাস করেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বাধ্য হবার মতো অভিশাপ দুটো নেই। সেই অন্যায় আমরা করি। এই সততারও একটা মূল্য আছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে একদিন। আসল কথাটা কি জানো, তোমার মা তোমাকে যেভাবে ভালবাসে তার তুলনা নেই। সে ভালবাসার হাজার ভাগের এক ভাগও তোমাকে আমি দিতে পারি না। তোমার মায়ের জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু তোমার কথা ভাবতে পারলেই তোমার মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তুমি নিশ্চয় জানো তোমাকে নিয়েই—'

হ্যাঁ। বাবার বিরুদ্ধে মা ও মাসীর সবচেয়ে জোরালো অভিযোগ এইটাই। নিজের মেয়ের দিকেও তাঁর এতটুকু নজর নেই। একটা শিশুর জীবন নিয়ে খেলা। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। নিজের ঘর যে সামলাতে পারে না সে করবে জগৎ সংসারের উপকার।

এসব বিতর্কের বিষয়। নিজেকে ন্যায় অন্যায়ের বিচারকের পদে বসাবার মতো বয়স হয়নি শ্রাবন্তীর। শ্রাবন্তী এটাই বোঝে যে বাবা আর যাই হোক মনটা তার উদার। শ্রাবন্তী যদি আজ তার বাউণ্ডুলে বাবার অনুগামিনী হয়, তার মা বা মাসী হয়তো শয্যা নেবে কিন্তু ভুলেও তার জন্মদিনে দেখা করবার জন্য ব্যাকুল হবে না।

চমকে গেল শ্রাবন্তী। কলিং বেলের শব্দ। ছুটে এল বারান্দায়। মেসোমশাই রেলিঙের ওপর দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

'দাঁড়াও— খুলে দিচ্ছি।' মেসোমশাই পিছন ফিরলেন। 'শ্রাবন্তী— তোর ছোটমামা।'

শ্রাবন্তী নীচে নেমে এল দরজা খুলতে। যত বেলা বাড়ছে, অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলছে প্রত্যাশা।

ছোটমামাকে ওপরে যেতে বলে শ্রাবন্তী একতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল। ছোটমামা আগে চলে যাক। সদর দরজাটা আলগা করে ভেজিয়ে রেখে দেবে। ছিটকিনি তুলবে না। বাবাকে প্রশ্নটা না করা অবধি স্বস্তি নেই। কেন গোপন করেছে কথাটা? বাবা মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। সত্যিই কি ওই ভদ্রমহিলাকে ভালবাসে বলেই বাবা বাড়ি ছেড়েছে, না বাড়ি ছাড়ার পর... ক্লান্ত লাগে শ্রাবন্তীর। কথাটা কানে আসার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ার ঝাঁঝটা কমে এসেছে। বাবার ছবির পাশে আরেকটা ছবি ফুটিয়ে তোলার নিয়ত চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু মেলাতে পারছে না। সন্তুষ্ট হচ্ছে না। কেমন দেখতে তাঁকে, কি করেন, শ্রাবন্তীর কথা কি বাবা তাঁকে বলেছে। একটা অদম্য কৌতূহলে শ্রাবন্তী অস্থির। বাবা একটু তাড়াতাড়ি আসছে না কেন আজ?

শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা ঢঙ ঢঙ করে উঠল তিন বার। বয়সের শ্লেষ্মা জমা ঘড় ঘড়ে শব্দে। আশ্চর্য, আজ আর ওর কোন ভুল হচ্ছে না। এখন ঠিক তিনটেই বাজে। শ্রাবন্তী উঠে দাঁড়াল। বাড়ির সকলে খেতে বসেছে, নিচের দরজাটা যদি বন্ধ থাকে।

'কি রে যাচ্ছিস কোথায়?' মা প্রশ্ন করল।

'না— দেখে আসছি, নীচের দরজাটা বন্ধ আছে কি-না।'

'আমি বন্ধ করেছি।' মামাতো ভাই খোকা জানাল।

'তোর যা খেয়াল! কোন বিশ্বাস নেই।'

শ্রাবন্তী নেমে এল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দার গেটের ধারে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তে যদি বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়... কেন যে আসছে না এখনো! সন্ধেবেলা থেকেই তো শুরু হয়ে যাবে অবিরাম আনাগোনা। এক মুহূর্ত ফুরসত পাবে কি তখন। তাছাড়া... নাঃ, সেটা কোন কথা নয়। বাবা এলে কেউ তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না...।

সন্ধে এল। লোকজন আসা শুরু হল। সানাই বাজল। শ্রাবন্তী সাজল। বাবা এলেন না। একটা কোলাহল ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে আর তার মাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে চারপাশে আলোর উজ্জ্বলতা। বাড়ছে আড়ষ্টতা, বাড়ছে হাসবার— শুধুই হেসে উত্তর দেবার তাগিদ। বাবা আসেননি এখনো।

মাস্টারমশাই এলেন। ধূপের ধোঁয়া কাঁপিয়ে সুরের লহরী বইল। রজনীগন্ধার সাদা পাহারার মধ্যে মালাবন্দী রইলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রাবন্তী শুনল, গাইল, ভাল লাগল। কিন্তু সে এখন নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো মাটিতে পা রেখেও সাঁতরে বেড়াচ্ছে কিংবা হাওয়ায় ভাসছে। সব শব্দই কানে আসছে কিন্তু শুধু একটি কণ্ঠকে চেনবার জন্য সে উদগ্রীব। সবার মুখ চোখের পর্দায় ভাসছে কিন্তু একটি মুখকে দেখবার জন্য তার চঞ্চলতা। বাবা এখনো এলেন না।

মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। ঘর ফাঁকা করে কেউ ছুটল বারান্দায়, কেউ এক তলায়। শ্রাবন্তী একা বসে রইল কয়েক মিনিট। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এই প্রথম সে একা হল। বাবাও কি তাহলে... সমস্ত শরীরটা যেন তৃষ্ণার্ত। হাঁ করে অনেকটা শ্বাস নেয়। শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা আবার জানান দেয়, সে আছে, চলছে এবং আজ রাতে সময়ের মাপে ভুল হচ্ছে না। সাতটা বাজল, বাবার দেখা নেই।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের আলো চমকে দিল শ্রাবন্তীকে। অমিতকে পাশে নিয়ে তার ছবি তোলা হল। আরো হবে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে। অমিত এখন তার পাশে দাঁড়াবার সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু ফটোগ্রাফে যদি শুধু মনের ছবি ধরা পড়ত তাহলে এই ছবিটাতে অমিতের পাশের অংশে অহেতুক শূন্যতা থাকত। ফটোগ্রাফারকে আনাড়ী মনে হত, একজনের ছবি তোলার জন্য নেগেটিভের অর্ধেকটা ফ্রেম ফাঁকা রেখে নষ্ট করার জন্য। ফ্ল্যাশের ঝলসানির সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবন্তীর মনে হয়েছে, সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম, বাবা হয়তো আসবে না। কিন্তু কেন? খবর পায়নি? বিশ্বাস করা যায় না। শ্রাবন্তী নিজের সঙ্গে তর্ক করে। এখনো সময় আছে। বাবা নিশ্চয় আসবে। তাছাড়া বাবা তো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছে না।

বর বউকে নিয়ে বাড়ির লোকে খেতে বসল। শ্রাবন্তী মুখে গ্রাস নিয়ে বসে থাকে। গ্রাসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটাও যেন খুব কোলাহল সৃষ্টি করছে। যদি কোন প্রয়োজনীয় শব্দ শুনতে না পায়।

পরিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করেই শ্রাবন্তী খাওয়া সারল, হাত মুখ ধুয়ে ফুলের জলসায় এসে বসল। শ্রাবন্তী এখন দুটো সত্তায় যুগপৎ বিরাজ করছে। তার একটা ব্যবহারিক, অন্যটা মানসিক। সম্পূর্ণ সংযোগ-রহিত দু'টি সত্তা দু'টি ভিন্ন নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে চালিত হচ্ছে।

শ্রাবন্তী তবু আশা ছাড়েনি। বাবা আসবে না কেন? কি কারণ থাকতে পারে না আসার। সে বুঝতে পারে না। তাই আশাও ছাড়তে পারে না।

একে একে সকলে ঘর খালি করে চলে যাচ্ছে। স্থূল লোকাচারকে এই পরিবারে হিন্দুধর্ম জ্ঞানে পালন করা হয় না। বাসর ঘরে নবদম্পতির সঙ্গে বিনিদ্র রাত জাগার বা পরস্পরকে জাগিয়ে রাখার রেওয়াজ নেই। সবার শেষে বেরিয়ে গেলেন মাসীমণি। দু'হাতে অমিতের মাথাভরা কালো চুলে অজস্র আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে। যা আস্থা স্থাপনের ও সেই মর্মে একটি নীরব বিজ্ঞপ্তির প্রকারান্তর। দরজার পাল্লাদুটো বন্ধ হয়ে এল যেমন সিনেমার গতি কমিয়ে হরিণের লাফকে দীর্ঘায়ত করা হয়। বন্ধ দরজার পিছনে কোন কৌতুক অপেক্ষা করছে না— এটা শ্রাবন্তীও জানে, অমিতেরও অজানা নয়। ওদের আর কোন শত্রু নেই এখন। আর নেই বলেই বোধ হয় সুখকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়েও দু'জনেই নির্বাক। নিজেদের মধ্যে এক হাত মাত্র পরিসরের বাধা অতিক্রম করেও হাত ধরতে পারে না দু'জনে।

শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা আবার বাজছে। দুটো দেওয়াল পেরিয়েও তার কাতর কণ্ঠ কানে আসে শ্রাবন্তীর। এক দুই তিন চার... লোলচর্ম অশীতিপর বৃদ্ধ যেন শ্লেষ্মার বাধা অতিক্রম করে কাশছে আর দম নিচ্ছে... সাত আট নয় দশ... শতায়ু লাভের বাসনা আমৃত্যু পোষণ করাই বুঝি জীবনের ধর্ম... এগারো বারো। বারোটা! ঘড়িটা আজ সারাদিন বিশ্বস্ত থেকেছে। দিনটা পার হয়ে গেছে।

নতুন দিনে পৌঁছেই সমস্ত গা-টা গুলিয়ে উঠল শ্রাবন্তীর। ঢোঁক গিলে ওয়াকটাকে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল। অমিত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সোজা কলঘরে।

দরজাটা টেনে দিয়ে তার ওপরে পিঠের ভর রেখে দাঁড়াল। দেহে এমন শক্তি নেই যে ছিটকিনিটা তুলে দেয়। আবার ওয়াক উঠল। শুকনো জ্বালায় শরীর জ্বলছে। 'বাবা! বাবা! তুমি সত্যিই এলে না বাবা!' শ্রাবন্তীর শরীরটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ আর্তনাদে ফেটে পড়ল। শ্রাবন্তী কলের মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও আস্তে আস্তে বসে পড়ে। 'না! না! আমি জানি বাবা আর কোনদিন আসবে না। বাবা নেই। যে নেই, সে আর আসতে পারে না!'

'শ্রাবন্তী! শ্রাবন্তী!' বাইরে মাসীমণির গলা। মা মেসোমশাই— সকলেই ছুটে এসেছে। ঠেলা পড়তেই দরজা খুলে গেল।

শ্রাবন্তী মুখ তুলল, 'তোমরা সবাই হেরে গেছ! সবাই। বাবা তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে। তোমাদের সব অভিযোগ মিথ্যে!'

শ্রাবন্তী উঠে দাঁড়াল। এখন যেন অনেক হালকা লাগছে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শ্রাবন্তী মাসীমণির মুখের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, তোমরা হেরে গেছ। যে নিজেকে শেষ করে দিতে পারে... তোমরা মিথ্যে অপবাদ দিয়েছ— ওরা ঠিকই বলেছিল সেদিন, সেই যে স্মৃতিরক্ষার কথা... মিথ্যে ভয় দেখায়নি। আমি জানি বাবা নেই! বাবা থাকলে আজ আসতোই... আসতোই...'

শ্রাবন্তীর আর তার বাবার কাছে কোন প্রশ্ন নেই।

প্রসব

স্বর্ণ মিত্র

হৃদয়পুরের কাঁচা রাস্তায় পা দেওয়ামাত্র আন্না পথের ওপর পেট ধরে বসে পড়ে। ঠিক সীমান্তরক্ষীর ক্যাম্পটির সামনে।

খানিকক্ষণ সে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করে। আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তারা কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। যারা তাকাল, তাদের মায়া হল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে স্থায়ী হল না। যার যার নিজের নিরাপত্তাটুকু এখন আগে। তারপর বাকি মানুষদের জন্য দয়া-মায়া, সহানুভূতি ও করুণা।

সামনে তারকাঁটা দিয়ে সাময়িককালের জন্য ভোর ছ'টা পর্যন্ত হৃদয়পুরের সীমান্ত ঘেরা। সীমানার এ দিকে আজ ভোররাত থেকে জোর তল্লাশি চলছে। দশ হাত দূরে দূরে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী। হাতে বন্দুক নিয়ে তারা দৃঢ় সংকল্পে ব্রত। অথচ চোখে-মুখে একটা চাপা আতঙ্ক আর ভয়। কারণ এখন গোটা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে টানাটানি। অবশ্য এমন রহস্যময় পরিস্থিতির সঙ্গে এলাকার মানুষেরা বেশ খানিকটা পরিচিত। কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশ কিছু আগে সাঁওতাল হুলের প্রধান নায়ক সিদুমাঝি-কানুমাঝি এই অঞ্চলেই নাকি ঘাঁটি গেড়েছিলেন। এক পক্ষকালের মধ্যে কেবল ওপারবান্ধা ও লাঙ্গুলিয়া থানার তিরিশটিরও অধিক গ্রাম তাঁদের দখলে এসেছিল। লোরোজোর থেকে দেওঘরের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই তাঁরা মাসখানেকের মধ্যে দখল করে নিয়েছিলেন। আরও শোনা যায়— সেপ্টেম্বর মাসে ওপারবান্ধা গ্রাম থেকে খানিক দূরে প্রায় সাত হাজার সাঁওতাল মাটি কেটে গর্ত নির্মাণ করে সেই দুর্গাপুজোর উৎসব করেছিলেন।

প্রায় পৌনে দুশো বছর পথ হাঁটার পর গাঁয়ের কূলে আবার এই পুরোন পরিস্থিতি— রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ। গঞ্জের মুখে খদ্দেরের অভাবে ভরদুপুরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে ভুজঙ্গ কবরেজ আশঙ্কার স্বরে বলেন, 'চারদিকের অবস্থা দেখে বোঝা যায়— কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে।'

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই গাঁয়ের মানুষের দীর্ঘ পথ হাঁটা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের চলাফেরা ক্রমশ খাপছাড়া আর রহস্যময় হয়ে ওঠে। চেনা মুখের সন্ধান না পেলে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। অনাত্মীয়ের মতো নির্জনতার বিস্তৃতি আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মুখময় যন্ত্রণা আর অস্বস্তি নিয়ে আন্না আবার পেট ধরে উঠবার চেষ্টা করে। খানিক উঠে আবার সে বসে পড়ে। যেন দশ মাসের পেটটা এখনই এক অসহনীয় জন্ম-যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। এই পেটটাই এখন তার বড়ো সম্বল। বড়ো আতঙ্ক আর উত্তেজনা।

ছিবড়ানো শরীর। হাতে কয়েকটা কাচের চুড়ি। উদলা গা। পোড়-খাওয়া চাটুর মতন রং। গায়ে জড়ানো তেলচিটে ডোরাকাটা একফালি কাপড়। থ্যাবড়ানো নাকে চ্যাপটা পেতলের নাকছাবি। কোনও উজ্জ্বলতা নেই। বাঁহাতে শিবের উলকি। চুলগুলো সামান্য ভেজা। গোছ দেখলে বোঝা যায়, এককালে ঘনত্ব ছিল। চোখ দুটো বড় হলেও সুন্দর নয়। গর্তে ঢুকে গিয়ে পোয়াতি চাউনিটা যন্ত্রণাক্ষুব্ধ।

শরীর আন্দাজে বেমানান পেটটা নিয়ে আন্না আবার দাঁতে দাঁত ঘষে দু'ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। যে সব লোকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ আছে, তাঁরা দেখলে হেসে কুটিপাটি হত।

বাজার থেকে কেনা হ্যালেঞ্চা শাকের আঁটি হাতে সে একটু একটু করে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করল।

—খবরদার!

আন্না থামে। পোয়াতি শরীরের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। সারি সারি খাকি পোশাকের মানুষ। হাতে বন্দুক। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে। পাথরের মতো। নির্দেশ পাওয়ামাত্র সচল হয়ে উঠবে। চোখেমুখে একটা দৃঢ়তার ভাব প্রকাশের কঠোর প্রচেষ্টা। অথচ দৃষ্টিগুলো কেমন চঞ্চল। ভয় আর চঞ্চলতা।

তবু আন্না পা টেনে টেনে এগোয়। থামবে না সে। পরিণতির কথাও জানে। বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে, খুড়ি-পিসির কাছেও পুলিশের হামলায় পোয়াতি বউয়ের ইজ্জতহানির নানা ঘটনা শুনেছে এবং সেই কারণে মরণের আগেই মরতে শুনেছে পেটের ছানাকে। তবু সে থামে না। থামার উপায় নেই। তার চেয়ে মরণ ভালো।

আবার হুঙ্কার আসে—'এক দফা বোলে গা, দো দফা বোলে গা, তিন্ দফা মে...!'

—মুই কী দোষটা করিছি? তীব্র প্রতিবাদের স্বরে ক্যান্‌কেনে গলায় আন্না কথাটা বলে পেটটা ধরে বসে পড়ে। ক্লান্ত চোখে।

এখন আর আশেপাশে কেউ নেই। কোনও লোক নেই। সব ফাঁকা। হৃদয়পুরের জীবনে আর কিছুক্ষণ বাদেই সন্ধ্যা নামবে। সান্ধ্য আইনের শ্বাস বন্ধ করা নির্জনতা নিয়ে।

সীমান্তরক্ষীরা আন্নার প্রতিবাদের কোনও জবাব দেয় না। মুখের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেই পূর্বের চেহারা। একইভাবে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার আন্না ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করে 'সিপাইজি, মুই কোন্‌ঠে ডাকাতি করিছি? কোন্‌ঠে বদ্‌মাসি করিছি? মোকে ঘরে নাই যাতি দিবি কেনে?' কথা বলতে বলতে আন্না আর এক পা এগোতেই আবার হুঙ্কার আসে, 'এক দফা বোলে গা দো দফা মে...!'

সতর্কবাণী হৃদয়পুরের বিকেল গড়িয়ে যাওয়া নির্জন পরিবেশে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে...এক দফা বোলে গা দো...!

শব্দ শুনে কম্যান্ডার সাহেব বেরিয়ে আসেন। ক্যাম্প থেকে। মাথায় শক্ত খাকি টুপি। পরনেও খাকি জামাকাপড়। অকুতোভয় আর দেশরক্ষার গৌরবের জন্য বুকে একটি সাতরঙা ফিতে। রামধনুর মতো। গায়ের রং তামাটে। চোখ দুটো ছোটো কিন্তু কাচের মতন চিকচিক করছে।

তিনি আন্নার দিকে এগিয়ে আসেন। পেছন পেছন অনুগত রক্ষিবৃন্দ। বাঁ ভুরু সামান্য কপালের দিকে ঠেলে তিনি এক পলক রক্ষিদলের দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে তারা সামরিক কায়দায় সেলাম জানায়। তারপর তিনি আন্নার দিকে তাকান। ঘেন্না আর বিরক্তিভরা মুখে।

দশ হাত দূরে আন্না। দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। হাবা-গোবা চোখ দুটোর তলায় মুহূর্তের মধ্যে যেন কালশিটে পড়ে গেছে। চাপা যন্ত্রণায় মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

—এই মাগি! শালী, তখন থেকে চিল্লাচিল্লি শুরু করেছিস কেন? চোয়াল শক্ত করে খেঁকিয়ে উঠলেন কম্যান্ডার সাহেব।

আন্না এবার যেন কিছুটা চাঙ্গা হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ল্যাংড়ানোর মতন করে কম্যান্ডার সাহেবের পায়ের খানিক দূরে হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

কম্যান্ডার সাহেবও কিছুটা হকচকিয়ে যান। তাড়াতাড়ি কিছুটা তফাতে সরে দাঁড়ান। অন্যান্যরা প্রস্তুত হয়ে থাকে— নির্দেশের অপেক্ষায়।

গর্তে ঢোকা চোখ দুটোকে কম্যান্ডার সাহেবের দিকে তুলে ধরে আন্না কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে থাকে,'বাবু, মোকে ছাড়ি দে। মোর অ্যাকটা ছানাও নাই বাঁচল। ইটাও যদি মরে, তাইলে মোর কী থাকল। ও বাবু—মুই কোনও পার্টিতে নেই। কোনও বজ্জাতের সঙ্গি মোর সাঙাৎ নাই। মোকে সাচ্ করবি?' কথাটা শেষ করেই আন্না উরুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে তার আধপোড়া বাঁশের মতো শীর্ণ ঠ্যাংদুটোকে বার করে। তারপর রাগে বিরক্তিতে আর খানিকটা তুলতে গেলে কম্যান্ডার সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন,'থাম্ শালী।' ঘেন্নায় ওয়াক তুলে একরাশ থুতু ফেলে তিনি ভুরু কুঁচকে রক্ষিবাহিনীর দিকে তাকান। আন্না পাথরের মূর্তির মতো থেমে থাকে।

—বুকের ওপর কী?

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে আন্না জবাব দেয়,'মোর বুক ছাড়া অন্য কিছু নাই।'

বুকের ওপর থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে কম্যান্ডার সাহেব পেটের ওপর চোখ ফেলতেই আন্না আশঙ্কায় পেটটাকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'দোহাই বাবু। ইটার মধ্যে মোর ছানা গো বাবু। মায়ের কিরা।'

— হা— রামজাদি। পেটে ভাত জোটে না, পেটটা ঠিক বানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বাবুদের জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। মারতে হয় এক লাথ্। বুটসুদ্ধু লাথিটা তুলেও মারলেন না কম্যান্ডার সাহেব। হয়তো ইজ্জত আর ঐতিহ্যের টানে। অহেতুক ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

ঠিক সন্ধ্যার মুখে আন্না ছাড়া পেল। অনুমতি পেল এ সীমানা থেকে ও সীমানায় নিজের ভিটেয় পা ফেলার। শুধু তার নাম, পদবি, গাঁয়ের নাম, স্বোয়ামির নাম, সরপঞ্চের নাম, পাঁচটা গ্রামবাসীর পরিচয়— জানা-অজানা অনেক প্রশ্নের পরীক্ষা দিতে দিতে সন্ধ্যা শুরু হয়ে গেল।

হৃদয়পুরের সন্ধ্যায় এখন ঘোরাফেরা বারণ।

দিন-দুপুরেও পথে নেমে দাঁড়ায় না কেউ। গঞ্জের থেকে গোরুর গাড়িতে আসার পথেও প্রকাশ্যে গলা হাঁকিয়ে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঝিমধরা পরিবেশে জঙ্গলের পথ ধরে মানুষের হঠাৎ হঠাৎ অর্থপূর্ণ চলাফেরা নির্জনতার গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সাঁঝের ভিটেয় গেঁয়ো মানুষের চোখ ডিবের আলোর মতোই মিটমিট করে জ্বলে।

আন্না তাড়াতড়ি হাঁটবার চেষ্টা করে। শীতের কুয়াশায় কণ্ঠস্থ কাঁচা পথটাও কিছুটা ঘোলাটে ঠেকে। হিম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এতক্ষণের উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় তার সমস্ত শরীরে বিনিবিনি ঘাম ফুটে উঠেছে। অথচ এটা মাঘের শীত। আকাশে ছোটো চাঁদটি দিনে দিনে বড়ো হচ্ছে, অমাবস্যার জমকালো অন্ধকার রোজ পিছিয়ে যেতে থাকে।

আন্না টাউস ভুঁড়িটা নিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে খানিক এগিয়ে নিবিড় শালবনের ডান পথে তরতর করে নেমে যায়। তার পিছু পিছু ঢালু জমি গড়িয়ে কাঁচা রাস্তার ওপার থেকে টর্চের আলো জঙ্গলের মুখে থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আন্না ভাটিগাছের ঝোপের মধ্যে ঘন অন্ধকারে মিশে যায়।

জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতার বাসী জঞ্জাল মাড়িয়ে সে দ্রুত এগোতে থাকে।

অন্ধকার জঙ্গলের খাপছাড়া মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আন্নার পুরাতন চিন্তায় চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়— চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিবিড় শালবনের ছোট্ট

ঐতিহাসিক স্মৃতিপট—পুলিশের গুলিতে মরণের আগে সিদু মাঝি এই বনেই নাকি ছিলেন। তখন জঙ্গল ছিল ভয়ানক ঘন। পথঘাট নির্ণয় করা যেত না। পুরোনো ইতিহাস ভাবতে ভাবতে আন্নার মনে হল, শরীরটা যেন অনেক হালকা হয়ে এসেছে। পেটের বোঝাটাও যেন আর ভার ভার ঠেকেনা।

অন্ধকার জঙ্গলের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ হেঁটে আন্না নির্দিষ্ট সময়ের কিছু দেরিতে ভিটের পথে পা দিল। তাকে দেখামাত্র ছনের বাড়ির ভাঙা বেড়ার ওপাশ থেকে একের পর এক জোয়ান ছায়া বেরিয়ে এল। হনহন করে। ঘরের ভেতর ডিবেয় আলো জ্বলছে।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ে আন্না একটা বড়ো রকমের হাঁফ ছাড়ল। তিনটে ছানা-বিয়োনো শুকনো জীবনে এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। হাত পাগুলোকে শিথিল করে দিয়ে সে বুকের কাপড় টেনে পোড়া দেহের লজ্জা ঢাকে। তারপর বর্ণনা করতে থাকে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভিটেয় ফেরার কাহিনী। চোখের পলকে একটা চাপা উত্তেজনা বিদ্যুতের ঝলকের মতো বয়ে যায় সারা ঘর জুড়ে।

তারপর সাঙাতদের সামনে ডিবের আলোয়, ছনের চালায়— ছমছমে হৃদয়পুরের সান্ধ্য আইনের বুকে— পোয়াতি আন্না প্রসব করল—চারটে রিভলভার, অনেকগুলো দলিলপত্র এবং—আপত্তিকর লাল বই।

অকাল বোধন

শংকর বসু

নবমী তিথি। কাঞ্চন, জবা, মল্লিকা, মালতী, আর রক্তের ফোঁটার মতো গাঢ় লাল অশোক ফুলের ডালিতে দু ফোঁটা নোনা ঘাম ঝরে পড়ল। কপাল বেয়ে এঁকেবেঁকে এসে টস করে ফুলের ডালিতে ঝরে পড়ল সেই ঘাম। দুবার, পরপর। অকালে দেবীর আরাধনায় মগ্ন রামচন্দ্রের কপালে কুঞ্চন। সৃষ্টির মাতা সুপ্রসন্ন হলেন না তথাপি। মঙ্গলের আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় অকালবোধন বুঝি ব্যর্থ হল। আবাহনে দেবীর মন টলল না। তখন বিভীষণ বললেন, অষ্টোত্তর শত নীল পদ্মে পুষ্পের ডালি সাজতে। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ছেঁচে ছেনে পাহাড় সমুদ্র আর সমতলভূমি চষে রামচন্দ্র নীলপদ্ম ছিঁড়ে আনলেন। জলদগম্ভীর স্বরে সৃষ্টির মাতার স্তুতি গাইতে লাগলেন। মাতা প্রসন্ন না হলে বন্দিনী প্রিয়ার মুক্তি অসম্ভব। কাশ ফুলের বনে মৃদুমন্দ বাতাসের দোলা, আর চাতুরী করে দেবী লুকিয়ে ফেললেন একটি পদ্ম। তপস্যা বিফলে গেল বুঝি, ইহজীবনে বোধ হয় আর চার চোখের মিলন অসম্ভব, মানুষের পবিত্র শ্রম বুঝি কোন নিষ্ঠুর মুনির শাপে ভস্ম হল। গাণ্ডীবে টঙ্কার জাগালেন বীর, আসমুদ্রহিমাচল সেই শব্দ বুকে নিয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে লাগল। আর শোনা গেল বীরের কণ্ঠস্বর ঃ

কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে
একচক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে।।

রাতভর ইঁদুরপচা ভ্যাপসা গরমি, আর ভোর রাতে হৃৎপিণ্ডে বরফ জমানো বাতাস চাবুকের মতো সপ্ সপ্ শব্দে মেটলির মতো হতাশ পাঁচিল টপকে এসে সেলের ভেতর ধামসে পড়ে।

তখন ভোর হয়। ভোর হয় মঙ্গলের আধকানা চোখের টাটানিতে। জেলগেটে ডিউটিবদলের গরুর চামড়ার পুলিসীবুটের মচ মচ শব্দে। রাতভর গরমি কুত্তার মতো খোঁচ পেটে হাঁপায়। আর ভোর রাত্তিরে গরাদ দিয়ে এসে ঠাণ্ডি বাতাস হামলায়। তখন মঙ্গলের হাত পা কুঁকড়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আসে। অথচ চুলকানির ভয়ে কম্বলটা টেনে নিতে পারেনা। কম্বলের খসখসা রোঁয়ার কথা ভেবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কানা চোখটার কথা ভাবে। সারারাত মশা থাবড়ে আর হাজার কিসিমের ভাবনায় জাগান দিয়েছে। এখন আধকানা চোখটা জ্বালা-যন্ত্রণায় মঙ্গলকে খুবলে খাচ্ছে। জাগা ধরে উঠেছে। জল কাটছে। মঙ্গল জানে চোখ জোড়া খোয়াতে হবে। একটার সাথে আরেকটাও ধরেছে। এখন মেটলির টুকরোর মতো লাগে পাঁচিলটা। এখন আর ও সাফসুফ দেখতে পায়না। রাত কাটে গরমিতে, ঠাণ্ডিতে, চোখের টাটানিতে। আর মজবুত স্বপ্নের গাঢ় রঙে।

সেদিনও তাই। ঘুম এসেছিল একেবারে শেষকালে। বেহুঁশ ঘুম। আসলে তো ঘুম নয়, বেহুঁশ হয়েছিল মরার মতো। তখন থেকেই গরাদের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বরফের ছুরির মতো ছাল চামড়া ছাড়িয়ে শিরদাঁড়ায় গিয়ে বিঁধছে।

পয়লা বাইশ সেলের হুড়কো টেনে জমাদার রাবণের গলা গাঁ গাঁ করে ডেকে উঠল সাইরেনের মতো ঃ

এ পয়লা বাইশ গিনতি... ই... ই... গি... ন... তি... গি... ই...।

চাবির গোছা নিয়ে জমাদার জেলখানার এক ছিঁটে স্বস্তি অসাড় বেবশ ঘুমের গলা বুটের তলায় পিষে হাঁক দিয়ে ওঠে। সার সার মানুষ খোপ থেকে ছুটে আসে চোখের পিচুটি নিয়ে। উবু হয়ে বসেই অর্শের যন্ত্রণায় মহিমদা দাঁতে দাঁত ঘষে। আর জমাদার লাঠির লোহা বাঁধানো ডগায় গিনতি করে ঃ রাম দো... তিন... এ শালা সিধা হো যা ... ফিরসে... রাম... দো... তিন...। চোরুয়া ফিরোজ তো উবু হয়ে বসে একদিন হেগেই ফেলেছিল। আর সেই হালতে ডাণ্ডা চলল।

নামতার মতো সেপাই জমাদারের গিনতি এগোয়। আর ডাণ্ডা ঠোকার একটা শব্দ। শব্দের প্রতিধ্বনি।

বাইশ... বাইশ... হাঁ... কয় আদামী... চোত্তবিশ... চোওবিশ। গিনতির সংখ্যাগুলো অব্দি পাঁচিলটা গেলার জন্যে হাঁ হয়ে আছে। গাঁক করে গিলে ফেলে। আবার উগরে দেয়।

রাত দুটোয় একবার দফা বদলী হয়। সেলের চোরকুঠ্রীর মতো ছোট্ট দরজাটা ঠেলে নয়া সেপাই হাঁক দেয় ঃ হেইই। ডিউটি সেপাই মা তুলে খিস্তি করে। মঙ্গল তখন গরাদের ফাঁক দিয়ে দুটো ঠ্যাঙ বের করে গরমির হাত থেকে রেহাই পেতে হাঁসফাঁস করে। তখন ঘণ্টা বাজে, টিংটিং করে। দুটোর ঘণ্টা। মানুষটা জাগান দেয় তখনও। এখন শুক্লপক্ষ। মজুরের হাসির মতো ফটফটা জোছনায় জেলখানাটাও নেয়ে ওঠে। গোটা পৃথিবী আড়াল করে পাঁচিলটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইঁট, চুন, বালি, সিমেণ্ট মিলে কংক্রীটের এই পাঁচিলটা যেন জ্যান্ত হয়ে যায়। মঙ্গলের ঝাপসা চোখে, একটা বিরাট হা মুখ ভেসে ওঠে। যেন গিলতে আসছে। টাওয়ারের ওপর সেপাই'র সঙ্গীনের ডগায় জোছনা খেলছিল। লকলক করছিল সঙ্গীনটা। টাওয়ারের ওপর বন্দুকধারী সেপাইটা রোজ ঢোলে। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে বন্দুকটা হাতড়ায়। এসব দেখতে দেখতে রাত কাবার হয়ে আসে। তখন আর চোখ টেনে রাখতে পারে না। আর জাগান দিতে পারে না।

আকাশটা চাঁদোয়ার মত মাথার ওপর টানানো। মেঘ আর রঙ্। কখনও পেঁজাতুলোর মতো মেঘে ভয়ঙ্কর জন্তুর ছবি জাগে। আবার মানুষের মুখের আদল আসে। আকাশটা ঢাকতে পারেনি। অথচ মঙ্গলের দেখতাই পাঁচিলটা চড়চড়িয়ে তিন হাত ওপরে উঠে গেল। ভুখ হরতালের পর একদফায় এক হাত উঠল। ফের দু দফা গোপন সতর্কতায় আরো দু হাত। অশোক গাছটা আর নজরে আসে না। গাছটা কি এক আহ্লাদে পাগলের মতো চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছটার দিকে মঙ্গল ঠায় চেয়ে থাকত। এখন গাছটা মালুম হয় না। কেবল অশোক ফুলের লাল ফুটকিগুলো পরপর মিশে কেমন একটা থ্যাবড়া লাল ছোপ জাগে।

পাছার চুলকানি পূঁজ আর রসে জাগ ধরে উঠেছে। পাশ ফিরতে ফেটে গ্যালো। দপ্ দপ্ করে টাটাচ্ছে এখন। মিলে স্পিনিং মেশিনের হাতল টানতে, যন্তর নিয়ে লড়তে গিয়ে কেটে ওয়ার হয়ে গ্যাছে কতবার। দু'দিন না যেতেই মিলিয়ে যেত। পুলিশের ভ্যাটকা মুখ খিস্তির মতো চুলকানির চেয়ে তার ভোগান্তি ঢের কম। দুসরা গিন্তি এসে গেল। মহারাজ জমাদার। পায়ের শব্দেই আঁচ করল। মঙ্গলের কান দুটো তুখোর হচ্ছে দিন দিন।

— এ... বাহার নিক্লো...।

দোসরা গিনতি এসে গ্যাছে। মঙ্গল লাফ দিয়ে উঠল। পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হবে এখন। ফাইলে দাঁড়িয়ে বিজু ফিস ফিস করে গতরাতের স্বপ্নটা আধো আধো বলবেঃ দেখলুম কত মানুষ... লাখ লাখ... গেট উপড়ে ফেলছে, পাঁচিলটা বিদ্যুতের কড়াৎ কড়াৎ শব্দে ভেঙে দুখান... ভীষণ লড়াই... বিজু রোজই এক স্বপ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কমসেকম দু'বার মহারাজ সেপাই গিনতিতে গলতি করবে। রামচন্দর মেট সব বাতলে দেয়। ফালি কাগজের ছোট্ট খাতা খুলে জমাদার হিসেব করল। পেনসিলটা গোঁফে ঠেকিয়ে। শেষে মুদির মতো ডিউটি সেপাই আর মেটকে সমঝে দিলঃ তব্ চাল্লিশ রহা।

পাশের সেলের মহিমই কথাটা বলল। পাঁচিল নাকি আরও এক হাত উঠবে। আই, জি, বলে গ্যাছে। মোলাকাতের মওকায় সেলের বাইরে গেছিল মহিম। তখনই জানতে পারে। জেলারের পাকা আতার মতো মুখখানা নাকি ভয়ডরে ফেটে যাচ্ছে।

— হঠাৎ !

— কি সব খবর আছে নাকি!

— ও।

— এবারে আকাশটাও জেলে পূরবে।

কানাপোকা ছোলার নাসতা ডালায় চেপে এল। পেটের জ্বালায় সব তাই চিবোবে। আবার থু থু দেয়ালে ছিটিয়ে দেবে। সুবলা সবটাই মেরে দেয়। ছেলেটার ধাত কড়া। মঙ্গলের নাম গলতি করে একবার রাইটার ডেকেছিল। সুবলারও মোলাকাত। খাঁচার জালে আঙুল ছড়িয়ে বুড়ো বাপকে বললঃ জেল তো আমাদের জন্য ইউনিভার্সিটি। মঙ্গলের মোলাকাত হয়নি। বুঁচি আসেনি। কি যে হল বৌটার। মরে হেজে গেলেই বা কে খোঁজ করছে। বচ্ছর পুরতে চলল।

ডাণ্ডাবেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে মাষ্টার ঘষটে ঘষটে পায়চারী করছিল। সুবলা তখনও পাঁচিলটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাষ্টার জলদি পা টেনে টেনে সামনে এল। চুরুটের পোড়া দাগটা কাঁপিয়ে মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল।

— চোখ কেমন?

— কি জানি।

— আবছা দেখছো?

— হুঁ।

— দেখতে পাচ্ছো তো?

— একটু একটু পাই এখনও।

মঙ্গলের মুখটা দু হাতের থাবায় শক্ত করে ধরে মাষ্টার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মঙ্গলের চোখের মনিতে মাষ্টারের গালের শ্বেতির মতো দগদগে পোড়া দাগটা ভাসছে। দাগটা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গরম নিশ্বাস পড়ছে মঙ্গলের কপালে, গালে। মাষ্টারের বুকের ধুক ধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে মঙ্গল। আর মঙ্গলের ভ্যাপসা চোখ দুটোয় অজস্র সূক্ষ্ম শিরা আর আঁশের মতো সাদা ডিম দেখতে দেখতে মাষ্টারের চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠে। রাগে শুখ্‌নো ঢোঁক গেলে— শিশির মাড়াতে পারলে—। মানুষটা তখনও হাঁফাচ্ছে।

— শিশির!

— হুঁ।

মঙ্গল ফের মাথাটা পাঁচিলে কাত করে দিল। ঠ্যাং দুটো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিল। কানের কাছে বিড়িটা ঘুরিয়ে আগুনের ধাক্কায় চারদিকে চোখ ঘোরায়। আর মাষ্টার মাথাটা শানের দিকে ঝুঁকিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি ঘষটে সিধে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। স্কুলের ছেলে চোদ্দ বছরের বিজু সাথ দিল। ফিসফিস করে ঘাড় নেড়ে কি সব বলে চলল। বোধহয় গত রাতের স্বপ্নের কথা। শোনা যাচ্ছে না। সেরেফ বিজুর ঘন ঘন হাত নাড়া আর দু একটা ছেটকানো কথা থেকে মঙ্গল আন্দাজ করল তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। লঙ্কা বাটার ছ্যানছেনে জ্বলুনি আসে কথা শুনলে ঃ পায়ের তলা ডাণ্ডা দিয়ে ফেঁড়ে ফেলেছিল। হাজার নিংড়ানিতেও কথা বের করতে পারেনি। পা ফুলে ঢোল হল। সেঁকা রুটির মতো। তাতেই তো চোখটা...।

সেলের কোনে সুবলা ছিপিয়ে চা বানাচ্ছে। লাল চা। এখন আধা ঘণ্টা ছাড়। তারপর মহারাজ জমাদার ফের বেঁকা লাঠি ঠুকে ছ্যাঁচড়ে আসবে। ছ্যাঁচড়ানির বিচ্ছিরি একটা প্রতিধ্বনি জাগবে পাঁচিলে ঠিকরে। মঙ্গল টিনের মগটা আগিয়ে ধরে জুলুজুলু চোখে সুবলার দিকে তাকিয়ে আছে। সুবলা তেড়িয়াভাবে ঘাড় নাড়ল ঃ চা খাওয়া বারণ না তোমার! শেষে মায়া হল, খানিকটা ঢেলে দিল ঃ মরগে আমার কি! ফুরফুর করে ঘুরে ঘুরে চা খাচ্ছে মঙ্গল। আর মাষ্টার চোখ বুজিয়ে গান ধরেছে ঃ লাখো লাখো করতাল, হরতাল হেঁকেছে... হরতাল...। সেপাই মুখ খারাপ করতে গেলে, সুবলা হুমকি দিল ঃ হুঁশিয়ার!

মঙ্গল আবার পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসেছে। মনটা উথাল পাথাল হলেই ও পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে। মাথার চাঁদিতে গোল করে রোদ পড়েছে। মহিম এসে হাত ধরে টানল ঃ ওঠ। সুবলার সেলের সামনে টেনে নিয়ে গেল। পা মেলে ছড়িয়ে বসেছে সব। আর খসখস করে ঠ্যাং চুলকোয়। এখনও কাগজ আসেনি, তাই সব উড়ু উড়ু। কাগজ আসামাত্তর মৌমাছির মতো চাক ধরে উঠবে সব। কাস্তের ধার নামবে চোখের তারায়।

— আলিপুর জেলে আবার পিটিয়েছে!

— এই দ্যাখ সুবলা, দক্ষিণ রেলে ধর্মঘট!

— সাবাস! সাবাস মজদুর ভাই!

তরতাজা সব্জীর মতো টাটকা গন্ধ নিয়ে কাগজ আসেনি এখনও। আজ সব আনচান করছে তাই। ওদিকে খাঁচায় পোরার সময় হয়ে এল। দেড় ঠেঙে জমাদার পেতলের চাবির গোছা নাকের কাছে নাড়ছে। একটু বাদেই মেটকে নিয়ে সাথে তল্লাশী চালাবে। মোলাকাতের লেবুটা এই মওকায় ঢোলা পকেটে চালান করে দেবে। সিগারেট হাতানোর ধান্ধা করবে। লণ্ডভণ্ড করে ফ্যালে আজব সংসার। সুবলা মঙ্গলের দিকে ঘেঁষে এল। চার তরফে চোখের মনি ঘোরাচ্ছে। কিছুতেই মঙ্গলের মুখের দিকে চাইতে পারে না। নটার সিটি ফুঁ'ক দিল। মহিম সেপাইকে ছিপিয়ে একটা বই নিয়ে চট করে সেলে ঢুকে পড়ল।

— মাষ্টারদা বলছিল...।

— কি?

— সবুজ গাছপালার দিকে তোমার তাকানো উচিত।

— আর?

— আর কি!

— শিশির মাড়ানো।

সুবলার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে মাড়িতে জড়িয়ে থাকে। কথা সরে না মুখে। শুধু জ্বলে। গোটা শরীরটা জ্বলে। ওদিকে মঙ্গল ঠোঁট ঝুলিয়ে একটু হেসে, গড় গড় করে বলে চলল ঃ গাছের পাতার সবুজ রঙে এমন একটা জিনিষ আছে, যা রোজ দেখলে চোখের পুষ্টি হয়... আর শিশির হল...।

সুবলা চুপ মেরে গ্যাছে। আর কি ই বা বলার আছে। চোখের সামনে একটা মানুষ.....। সুবলার চোখ ছলছল করে ওঠে। আজকাল ওরা মুখের দিকে তাকাতে পারে না। নিঃসাড়ে বিড়ির রেশন দেয়। ছটা বিড়ি রোজকার বরাদ্দ। জমাদার বন্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁচড়ানির শব্দ সমেত।

— পাঁচিল নাকি আরো এক হাত উঠবে?

— কে বল্ল?

— মহিমদা।

সুবলা মাথা ঝাঁকিয়ে সেলে ঢুকে গেল। এ লাইনের লাসটে মঙ্গলের সেল বন্ধ হবে। আসলে সবাই সেপাই জমাদারকে সমঝে দিয়েছে ঃ লাসট্ মে মঙ্গল। আধা ঘণ্টা কাবার। সেলের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মঙ্গল। মাষ্টারদা সেলে ঢুকেও পায়চারী করে। ডাণ্ডা বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দটা কানে আসছে। পয়লা বাইশ সেল ঠাণ্ডা। সেপাইর ডাণ্ডা ঠোকার শব্দ ওঠে থেকে থেকে। আজ মেজাজ বিগড়েছে। নাহলে সুবলটা ঠিক চেঁচাত—

— মহিমদা... আ...।

— কি ই... ই—।

— মঙ্গলদাকে গান ধরতে বল।

আজ আর এসব কিছুই নেই। সুবলা হয়ত মাথার খুস্কি টানছে। মঙ্গল উপুড় হয়ে শুয়েছিল। এমন সময় ফাঁকা সেলটায় (সেলের সামনে পাঁচিল ঘেঁষে লম্বা শান বাঁধানো চত্বরটায়) গরজন সিঙের খনখনে গলা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। গতবার পাগলীর সময় লোকটা দুজনকে সেরেফ ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। পয়লা বাইশ সেলের বাসিন্দেরা হাতের ফানা কামড়াচ্ছে। মঙ্গল দুবলা চোখ দুটোয় আগুন জ্বেলে সেলের গরাদ ধরে গরজন সিঙের মিলিটারী গোঁফ, আর গোঁফের পাশে নিষ্ঠুর রেখাটা দেখছে। মাষ্টার অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। ডাণ্ডা বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ পাগলীর ঘণ্টির মতো বাজছে। হাতুড়ীর বাড়ীর মতো জোরালো শব্দে সিঁদেল চোর ফালতু এক বস্তা সিমেন্ট এনে ফেলল। পয়লা বাইশ সেলটার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। হঠাৎ তাদের ফেটে পড়া আশ্চর্য নয়।

পয়লা বাইশ বেজায় শান্ত। চুলকানির খসখস শব্দটা অব্দি বন্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতো সেলের চার হাত জমিতে পায়চারী করতে করতে মাষ্টার গরাদ মুঠো করে ধরেছে এক সময়। আর তখন ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বালির বস্তা আসতে লাগল। ঝটপট সি আর পি স্কোয়াডে পাঁচিলে মই লাগাচ্ছে দশ হাতে ভারা বেঁধে, কিলবিল করে আট দশ জন মিস্ত্রি চড়ে বসল। হাতুড়ীর ঠক ঠক শব্দে পাঁচিলের ইঁট খসাচ্ছে। খানিক বাদেই ক্ষ্যাপা অশোক গাছটার মাথা গাঢ় সবুজ রঙ নিয়ে জেগে উঠল। সুবলা কি বুঝেছে কে জানে, হঠাৎ উল্লাসের সাথে চেঁচিয়ে উঠল ঃ মঙ্গলদা!

— কি?

— দ্যাখো, সবুজ...।

— দেখছি।

— তোমার চোখ সেরে যাবে...।

ততক্ষণে খসানো ইঁট দুটো ফের চাপিয়ে মিস্তিরি করণি বোলাচ্ছে। পয়লা বাইশ গলার কাছে শ্বাস আটকে পাঁচিলটার স্পর্ধা দেখে। মিস্ত্রির ব্রন-বসা মুখখানা ওদের কাছে কুচ্ছিত হয়ে উঠল। সুবলার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। লক আপ খুলে দিয়েছে। ছেলেটা সেল থেকে বাইরে এল না। অশোক ফুলের ঢালাই লোহার মতো লাল রঙটা আর দেখা যাচ্ছে না। বাড়তি এক হাত চড়চড়িয়ে উঠল। পাঁচিলটা ওপরের দিকে ক্রমশঃ কুঁজোর মতো বেঁকে গ্যাছে। মাষ্টার মহারাজ সেপাইকে হাদাগোবা সেজে জিজ্ঞেস করল ঃ পারলে সূর্যটাকেও তেরপল দিয়ে ঢেকে দিতে না?

মহারাজ বেঁকা লাঠি ঠুকে ছ্যাঁচড়ে চলে গেল।

পাঁচিলের কুঁজটা আরেক হাত চড়ল, মিস্ত্রির করণির বুলানি, ফের আরেক হাত... আরেক হাত...।

জান বাঁচাতে মঙ্গল নাড়ী মুচড়ে গুঙরে উঠল। থান ইঁটটা সিধে চাঁদিতে এসে লেগেছে। প্রথমে ধ্বস নামার শব্দ। তারপর সেপাইর দৌড়ঝাঁপ আর হুইসিল। পাগলী। সুবলা গোঙানির শব্দ পেয়েই বাইরে ছিটকে এসেছে। মঙ্গল তখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথাটা থেঁৎলে গ্যাছে। তবু হুঁশ ছিল। মাথার খুনে কব্জি শুদ্ধু হাত চুবিয়ে মঙ্গল চোখের সামনে আঙুল নাড়ছিল। চোখের ডিম ভুবড়ে আসছে। মুখে ছুরির ফিনফিনে ডগায় টানা কাটাকাটা দাগ ফুটছে।

— দেখতে পাচ্ছোনা!

সুবলার গলার সাথে সাথে শরীরটা কেঁপে উঠল।

মহিম আর মাষ্টার পাগলের মতো মঙ্গলকে জাপটে ধরেছে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে। পাগলীর হুইসিলের মধ্যে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করছে ঃ মঙ্গল! মঙ্গল!! মঙ্গল!!

আর সামনে জমাট পাথরের মতো অন্ধকার দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে, শরীরটা বেঁকিয়ে মঙ্গল গলা চিরে ফেলল ঃ আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!

... তারপর জেলখানায় ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে খানা বদল হয়েছে। এখন কপির ডাঁটা সেদ্ধ দিচ্ছে। আর মঙ্গল শীতের রাতে বাতাসের বাড়ি খায়। তবু কান ঢেকে শোয় না। ও বলে ঃ কান তো নয় অস্তর। অনায়াসে ও এখন সেরেফ পায়ের শব্দেই শত্রুমিত্র টের পায়। মহিম লুকিয়ে ছিপিয়ে কেতাব নিয়ে এলে চিকন শান্ত গলায় বলে ঃ ঐ জায়গাটা পড়োনা ঐ যে পুলিশ মিলিটারী জেলখানা রাষ্ট্র...।

আগুনের ছবি

শংকর দাশগুপ্ত

এক।। সুধাপ্রসন্ন সান্যাল ও তিনটে শালিখ উড়ছে

আমার নাম মণিময় সান্যাল। আমার বাবার নাম সুধাপ্রসন্ন সান্যাল। আমার মা'র নাম তুলসীমঞ্জরী। না সান্যাল নয়, বসু। এ'কথাটা আমি জীবনের সতেরটা বছর পার হয়ে যাওয়ার পর জানতে পেরেছিলাম।

আমি জানতাম, জন্ম থেকেই আমি মাতৃহীন। জানতাম, কারণ আমাকে তাই জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেন যে সতের বছর বয়সে আর্ট কলেজের আমি যখন ছাত্র, হায়ার সেকেণ্ডারীতে দুটো বিষয়ে লেটার নিয়ে পাশ করার পর, হঠাৎ একদিন খুব খাঁ খাঁ দুপুরে, আমাদের বরাহনগরের বাড়িতে, পেছনের বাগানে যখন তীব্রতম কেয়াফুলের গন্ধের সঙ্গে ফাল্গুনের শেষ বাতাসের গভীর প্রণয়, ঠিক তেমনি সময়, পেট্রোলের ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে লনের কাছে এসে দাঁড়াল সুধাপ্রসন্ন সান্যাল, আমার ধনী, ব্যবসায়ী পিতার পুরোনো অস্টিন।

'তোমাকে একবার এক্ষুণি যেতে হবে মণি', বাবার চোখ দুটো অসম্ভব লাল।

'কোথায়?' মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বিষয়ক বইটা থেকে চোখ তুলে তাকালাম আমি।

'মুখাগ্নি করতে।' শব্দ দুটো খুব নির্বিকার বের হয়ে এলো বাবার ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠতেই।

'কীক্! মুখাগ্নি। কার?' আমি এবার গাছের বাঁধানো বেদী থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

'গাড়িতে চলো, সব বলছি।' বাবা ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত ক'রে বললেন, 'এসো?'

পুরোনো অস্টিন গাড়িটাকে সেদিন শবাধার বলে মনে হয়েছিল। সেদিন প্রথম জানতে পেরেছিলাম, তুলসীমঞ্জরী নামের এক রক্ষিতা নারীর গর্ভে আমার জন্ম। আমার মা ও আমাকে— দুজনকে দুজনের কাছে মৃত বলে জানানো হয়েছিল এতদিন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে আমার মা তাঁর সতের বছরের এক ছেলের, এই পৃথিবীর জলহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠার কথা জানতে পেরেছেন এবং আমিও সেদিনই প্রথম...

বাবা সুধাপ্রসন্নকে চিরদিনই আমার খুব রহস্যজনক মনে হয়। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তবু মাঝে মাঝে অমানুষিক মার খেয়েছি আমি তাঁর হাতে। একবার দোতলার সিঁড়ি থেকে আমি গড়াতে গড়াতে পড়েছিলাম তাঁর পায়ের লাথি খেয়ে। দুদিন আমার জ্ঞান ছিল না। সেই দুদিনের গভীর ঘুমের মত আচ্ছন্নতায় আমি দেখতাম, তিনটে শালিখ পাখি শুধু বৃত্তাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে অথচ কোথাও বসার জায়গা পাচ্ছে না। তাদের ডানায় জড়ানো প্রাচীন রোদ, কুয়াশা আর জ্যোৎস্না...

এই বাবা, সুধাপ্রসন্ন, আবার আমাকে অসম্ভব ভালোও বাসতেন। আমার একবার খুব জ্বর হলে, পরপর তিনরাত দুচোখের পাতা এক করেননি তিনি। কিছু খাননি পর্যন্ত। শুধু আমার বিছানার সামনে ব'সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন আমার দিকে। আমি বারবার

গাঢ় জ্বরের আচ্ছন্নতার মধ্যে চোখ মেলে দেখেছি, তিনরাত না-ঘুমানো দুই ঈষৎ রক্তাভ চোখ, তার কোণে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুকণা, বড় ভালবাসা আর উৎকণ্ঠায় একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার বাবা।

আমার বাবাকে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। কখনো মনে হত, বড় সরল, বড় ভাল। কখনো মনে হত, বড় সেয়ানা, বড় শয়তান।

আমার বাবা সুধাপ্রসন্ন ছিলেন, কিছুটা গান্ধীজি, কিছুটা নাথুরাম গড্‌সে।

দুই।। আমি মণিময় ও রঙের পৃথিবী

আমার জীবনের বাইশ থেকে তিরিশ বছর বড় দুঃখকষ্টের মধ্যে কেটেছে। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত ব্যবসা, সম্পত্তি, বাড়ি ঋণের গভীর খাদের মধ্যে তলিয়ে গেল। আমি তখন নিরাশ্রয়। একা। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর কোন চাকরি জোটাতে পারিনি। একটা অরফ্যানেজে দেড়শ টাকা মাইনেতে পিতৃমাতৃহীন, পরিচয়হীন পৃথিবীর শিশুদের, রঙের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। দেড়শ টাকা মাইনে ছাড়া আর একটা বাড়তি সুবিধা পেতাম আমি। রাতে একটা ক্লাসঘরে বেঞ্চ জোড়া দিয়ে আমি শুতাম।

ঘুম আসতো না। কাঠের শক্ত বেঞ্চ বড় নিষ্ঠুরভাবে আমার একুশ বছরের সুখে লালিত শরীরে বিঁধতো। এপাশ ওপাশ করতাম সারারাত। সতের বছর মৃত সন্তানের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে-থাকা আমার ফর্সা, ছোট্টখাট্টো তুলসীমঞ্জরী মাকে মনে পড়ত বারবার। কখনো ঘুমের মত আচ্ছন্নতায়, বৃত্তাকারে উড়ে বেড়াতো, প্রাচীন রোদ, জ্যোৎস্না আর কুয়াশা ডানায় জড়ানো তিনটে ক্লান্ত শালিখ...

তিন।। অনুনীতা মিত্র ও আগুনের প্রকৃত রং

'আপনাকে যদি আমি বিয়ে করি, আপনার আপত্তি আছে?' অধ্যাপিকা অনুনীতা মিত্র খুব সহজভাবে কফি হাউসে মুখোমুখি বসে আমাকে প্রশ্ন করেছিল।

আমি বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালে, অনুনীতা বড় সুন্দর হেসে আবার বলেছিল, 'বেটার টু সে, আমাদের দুজনের যদি বিয়ে হয়, আপনার আপত্তি আছে?'

'আমার সঙ্গে? আমি..কিন্তু মানে—'

'একটা শর্ত,' আমার কথা তখনও অসম্পূর্ণ, অনুনীতা বলেছিল, 'আপনি কোন চাকরি করতে পারবেন না। আগামী সপ্তাহে আমি কলেজ ছেড়ে য়্যুনিভার্সিটিতে জয়েন করছি। আমিই সংসার চালাবো।'

'আর আমি?' প্রশ্ন করেছিলাম একটু বোকার মতই।

'তুমি ছবি আঁকবে। মদ খাবে না কখনো। চার'শ টাকা আমি তোমাকে দেবো ট্রাম, বাস, সিগারেট আর কফিহাউসের খরচ।' ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে, আশ্চর্য সুন্দর এক পবিত্র হাসি মুখে নিয়ে অনুনীতা চেয়েছিল আমার দিকে। সে চেয়ে থাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, সমস্ত মন জুড়ে যে দেবালয়ের মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম আমি, বুঝেছিলাম তারই নাম ভালোবাসা।

অনুনীতা ফ্ল্যাট নিলো লেকটাউনে। আমার আর অনুনীতার নীলস্বর্গ। আমার জন্য ব্যালকনির পাশে ছোট্ট একটা ঘরে স্টুডিও। পরপর বেশ কয়েকটা ছবি আঁকলাম আমি। কোন কষ্ট হল না ছবিগুলো আঁকতে, বেশ সহজেই এঁকে ফেললাম যা আঁকতে চাই।

আমি আর অনুনীতা যে সুখী ছিলাম না তা নয়। অনুনীতা আমার ছোট ছোট সুখেরও মূল্য দিত। সেই সুখ আর আনন্দকে সে খুঁজে এনে দিত আমার হাতের মুঠোয়।

মৌলালির সামনে তখন রথের মেলা বসত প্রত্যেক বছর। সব রকম জিনিসের সঙ্গে পাখি আর ফুলের গাছ পাওয়া যেত নানারকম। আমার কি রকম একটা নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকে মেলায় ঘুরে বেড়াবার। এই মেলায় আমার অমল কৈশোরের অবিশ্বাসের এক চারাগাছ পুঁতেছিল আমার বুকে।

তখন আমরা ব্যারাকপুরে থাকতাম। নদীর ধারে চড়কের মেলা বসত। পাখির শখ আমার ছেলেবেলা থেকেই। সেবার চড়কের মেলায় গিয়ে আমি খাঁচাসুদ্ধ বদ্রীপাখি কিনেছিলাম। হলদে, আকাশী আর ছাই রঙের পাখিগুলো কেনার জন্য সারা বছর লক্ষ্মীর ভাড়ে জমানো শেষ সম্বলটুকুও আমি খরচ করেছিলাম। খাঁচা হাতে ঝুলিয়ে এক বুক খুশী নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম! তখনও জানতাম না, আমার জন্য ট্রিগারে অলক্ষ্যে এক আঙুল ছোঁয়ানো ছিল!

বাড়ি ফিরে আমাদের বারান্দায় মাধবীলতার পাশে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম আমার প্রিয় বদ্রী পাখির খাঁচাটা।

কেমন শীত শীত লাগায় খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। ঘুম ভেঙে বুঝেছিলাম, শেষ রাতে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, বারান্দায় রাখা পাখির খাঁচাটার কথা। লাফ দিয়ে উঠে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম খাঁচাটার কাছে। চমকে উঠলাম খাঁচাটার ভেতরে পাখিগুলোর দিকে চেয়ে। চিনতে পারা যাচ্ছে না, একটা পাখিকেও চিনতে পারা যাচ্ছে না! কোথায় সেই হলদে রঙের বদ্রী, আকাশী আর ছাই রং? ধূসর রঙের কয়েকটা চড়াই পাখি বৃষ্টিতে ভিজে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে খাঁচার কোণে। গতরাতের বৃষ্টিতে তাদের গায়ের মিথ্যে রংগুলো সব ধুয়ে মুছে গেছে।

সেই প্রথম ভোরের আলোয়, আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, আমার বুকের ভেতর থেকে এতদিন ধীরে ধীরে ফুটে ওঠা বিশ্বাসের নিষ্পাপ ফুলটিকে ছিঁড়ে নিচ্ছে অচেনা এক পাখিঅলার তীব্র থাবা!

সেই প্রথম, কৈশোরের এক বৃষ্টিভেজা সকালে আমি প্রথম মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখি।

তবু মেলা আমাকে কেমন নেশার মত টানে। আমি আর পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়াই না। কিনিও না। তবু তাদের খাঁচার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, তাদের ডানার শব্দ আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমার মনের বিশ্বাসের সেই মৃত্যুদিনটির কথা। বুক থেকে উঠে আসা সেই কান্নার, মেঘলা ভোরটিকে।

'তোমার কোন পাখি সবচাইতে প্রিয়?' অনুনীতা প্রশ্ন করেছিল একদিন লনে বসে কফি করতে করতে।

পাখির কথায় আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। অন্যমনস্কভাবে ওর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, 'কিছু বললে?'

অনুনীতা এবার কফির কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'পাখি, পাখির কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। কোন্ পাখি তোমার সব চাইতে প্রিয়?'

বুকের ভিতর ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেই মেঘলা ভোরের মেঘ। আমি নিজের অজান্তেই বলেছিলাম, 'যে পাখির রং মিথ্যে নয়।'

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল অনুনীতা, অবাক হয়ে বলেছিল, 'পাখির রং আবার মিথ্যে হয় নাকি?'

'হয়, হয়' আমার চোখের সামনে তখন বৃষ্টিতে ধুয়ে-যাওয়া মিথ্যে রঙের কয়েকটা করুণ চড়ুইয়ের ছবি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমি বিড়বিড় করে বলেছিলাম, 'সে সেয়ানা পাখিওলা আছে অনুনীতা, সে চড়ুইকে মিথ্যে রঙের যাদুতে বন্দী করে দেওয়ার মায়াবী খেলা জানে।'

অনুনীতা জানে, আমি কখনো কখনো অবিন্যস্ত কথা বলি। যে কথা বলি, তা আমি বলি না। আমাকে কেউ বলায়। এসব সময় আমাকে আর বিরক্ত করে না অনুনীতা। তাই সেদিনও পাখির বিষয় পাল্টে আমাকে ও অন্য প্রশ্ন করলো, 'কোন্ ফুল তোমার সব চাইতে প্রিয়?'

আমি বলি,'স্থলপদ্ম।'

'স্থলপদ্ম! ওমা কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অনুনীতা আমার দিকে চেয়ে 'গন্ধ নেই, দেখতেও তেমন কিছু সুন্দর নয়?'

'তবু' আমি আবার বলি, 'পদ্ম তো জলে ফোটে—'

'তো?' মাঝপথে প্রশ্ন করে অনুনীতা। 'কিন্তু এই পদ্ম আমি বলি জলকে অস্বীকার ক'রে, নিজের অহংকার নিয়ে, কেমন স্থলেই ফুটে উঠেছে? নিজের জন্মস্থানকে কেমন বদলে দিয়েছে ও?'

বলেই, আমি নিজেই একটু চমকে উঠি। 'জন্ম' কথাটার সঙ্গে এক আশ্চর্য অনুভূতি জড়িয়ে আছে আমার দীর্ঘদিন ধরে। সে অনুভূতি অনেকটা থান কাপড়ের মত ম্লান আর করুণ। অনুনীতা এ কথা জানে না। একটু হেসেই বলে 'স্থলপদ্ম প্রথম এরকম মর্যাদা পেল।'

'কেন পাবে না মর্যাদা?' আমি অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠি, 'কেন? ওর জন্মের ঠিক নেই বলে?'

'জন্মের ঠিক নেই' শব্দ তিনটে কেটে কেটে উচ্চারণ করে অনুনীতা, 'মানে?'

'নেই-ই তো!' আমি অস্থির হয়ে উঠি, 'ওর তো জন্মাবার কথা ছিল জলে। সেটা কি ওর অপরাধ? না, অপরাধ তার— যে ওর বীজ প্রথম মাটিতে পুঁতেছিল?' আমার কপাল ঘেমে ওঠে ধীরে ধীরে। আমি আগের মতই অসহিষ্ণু গলায় বলি, 'বেশ বেশ, যাই হোক না কেন, ওটাই আমার সবচাইতে প্রিয় ফুল, ওই স্থলপদ্ম।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে কেমন ক্লান্ত লাগছিল আমার, তবু আমি বলি, বা আমাকে সেই অন্য কেউ বলায়, 'সূর্যাস্তের রং যদি তীর হয়ে ঝর্ণার ধারে জল খেতে আসা হরিণের বুকে বেঁধে, তবু হরিণের তৃষ্ণা কি মিথ্যা ছিল অনুনীতা?'

আর কোন কথা বলেনি অনুনীতা। হয় তো ও বুঝতে পেরেছিল আবার আমি অন্য কারও মত কথা বলছি তাই একসময় বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে, ও আমার অবিন্যস্ত একমাথা চুলে বড় ভালবাসার আলপনা এঁকেছিল ওর দীঘল আঙুলগুলো দিয়ে।

এর কিছুদিন পরই ও রথের মেলা থেকে স্থলপদ্মের চারা এনে লাগিয়েছিল আমার স্টুডিওর জানালার পাশে। সে গাছ বড় হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। আমার ভাল লাগায় অনুনীতার এতখানি মনোযোগ ছিল।

একদিন খুব ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। ভাল করে তখনও আলো ফোটেনি। আমার খুব কাছেই ছোট্ট মেয়ের মত জড়সড় হয়ে শুয়ে ছিল অনুনীতা। আমি পাশ ফিরেই ওকে দেখতে পেয়েছিলাম। কয়েকমুহূর্ত আমি একদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম ওর দিকে। গতকাল শেষ রাতে, গভীর সঙ্গমের সুখ-ক্লান্তিতে বালিকার মত নিবিড় ঘুম

ঘুমোচ্ছে এখন অনুনীতা। এত সুন্দর আগে কখনও মনে হয়নি অনুনীতাকে। তুচ্ছ একটা সিঁদুরের টিপ লেপে গিয়ে একজন নারীকে যে এতখানি পবিত্র সৌন্দর্য দান করতে পারে, তা আমি কখনও ভাবতেও পারিনি।

ঠিক সেই সময়, আমার তাঁকে মনে পড়েছিল। আহিরিটোলার পুরানো একটা বাড়ির বনেদী খাটে শুয়ে থাকা ফর্সা, ছোট্টখাট্টো একটা শরীর। কপালে কোনদিন সিঁদুরের চিহ্ন না নিয়েও যে জননী। স্তূপাকার কাঠ একদিন যাঁকে বুকে তুলে নিয়েছিল। আমার হাতের জ্বলন্ত পাটকাঠি, কোনদিন সন্তানের নাম উচ্চারণ-না করা ওষ্ঠ ছুঁয়েছিল যাঁর। আমার মা তুলসীমঞ্জরী, যাঁর আঙুলের নখ পর্যন্ত ছিল যথার্থ জননীর মতই উদ্ভাসিত। নির্জন স্টুডিওতে গিয়ে আমি তুলি তুলে নিয়েছিলাম! চুপচাপ কিছুক্ষণ চেয়েছিলাম সাদা ক্যানভাসটার দিকে। সুগন্ধ ভেসে আসছিল খোলা জানালা দিয়ে। কাছেই কোথায় যেন শিউলি ফুটেছিল। গাছগাছালিতে ভোরের পাখিদের ঘুম ভাঙছে।

আগুনের প্রকৃত রং কী আমি ভাবতে পারছিলাম না কিছুতেই। আমি এক মুখাগ্নির ছবি আঁকতে চাইছিলাম। ভোরের প্রথম আলো, জানালা দিয়ে এসে, গুরুদশার কোরা কাপড়ের মত আমার শরীরে জড়িয়ে ছিল। অথচ আগুনের প্রকৃত রং, যে আগুন প্রজ্বলিত, অথচ তীব্র দাহ নয়। যে আগুনে শুধু সূর্যাস্তের মত পবিত্র আভা...

কী তার প্রকৃত রং? আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

চার।। রাহুল ও আকাশটা কী ভয়ংকর

আমার সব চাইতে বড় অহংকার, আমি জীবনে একবার দেবশিশু দেখেছিলাম।

ফোর্থ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় পৃথিবীতে এল আমাদের প্রথম সন্তান। অনুনীতার নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব ছিল না বলে সিজারিয়ানের বণ্ডে আমাকে সই করতে হয়েছিল। তখনো লেবার রুমে অনুনীতার ক্ষত সেলাই করা হচ্ছে। করিডরে একলা দাঁড়িয়ে আছি আমি। ডক্টর সেনের কাছ থেকে একটু আগে খবর পেয়েছি, বেবীকে এক্ষুনি এখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি অপেক্ষা করছিলাম তাকে দেখবার জন্য।

ঠিক সেই সময়, নির্বিকার একজন নার্স ছোট্ট একটা ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছিল নবজাতককে। আমি একদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। করিডরে তখন দিনশেষের কমলা রঙের একটা রোদের রেখা এসে পড়েছে। সেই স্বর্গের আলো, মুহূর্তের জন্য নবজাতকের ঘুমন্ত মুখ স্পর্শ করেছিল। আর তখনই সেই মৃদু স্পর্শেই চোখ খুলে পলকের জন্য তাকিয়েছিল সেই ঘুমন্ত শিশু। কেমন শিহরণ খেলে গিয়েছিল আমার সমস্ত শরীরে। মনে হয়েছিল আমার, যেন মুহূর্তের জন্য এক দেবশিশু দর্শন করলাম আমি।

একমাথা কোঁকড়া চুল, বড় বড় দুই চোখ, রোগা শ্যামলা রঙের আমাদের প্রথম সন্তান রাহুল তখন সাত বছরে পড়েছে। রাহুল যে কোন সাত বছরের ছেলের চাইতে আলাদা। বয়সের তুলনায় ও অনেক লম্বা। একটু রুক্ষ চেহারা অথচ চোখ দুটো দারুণ গভীর। ওর কণ্ঠস্বর অন্যরকম কথা বলে, সম্পূর্ণ আলাদা রকম কখনই যা সাত বছরের শিশুর মত সরল, ভুলভাল নয়।

খুব ভাল ছবি আঁকত রাহুল। পরীক্ষায় অতিরিক্ত ভাবে ফার্স্ট হত। অঙ্ক সবকটা নির্ভুল করে, খাতার শেষ পাতায় সুন্দর ছবি এঁকে রাখত। স্কুলে আন্টিরা এইসব কারণে ওকে অনেক বেশি ভাল না বেসে পারত না।

রাহুল ভীষণ জিনিস ছিঁড়তে ভালবাসত। বই, কাগজ, খাতা, ছবি। ওর মা ওকে খুব বকত। আমি কাছে ডেকে ওর একমাথা চুলে হাত বুলিয়ে বলতাম, 'বইখাতা, ছবি এভাবে নষ্ট করতে নেই বাবা।'

রাহুল আশ্চর্য রুক্ষ গলায় বলত, 'ওগুলোর কোন মানে নেই বাপি। যেগুলোর মানে আছে, সেগুলো ছিঁড়ি না তো?'

একদিন বিকেলে আমার স্টুডিওতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল রাহুল। জানালার কাছে গিয়ে পশ্চিমের আকাশ দেখিয়ে, সেরকম আশ্চর্য গলায় বলেছিল, 'দ্যাখো, দ্যাখো বাপি, আকাশটা কী ভয়ংকর আগুন ধরিয়েছে!' আমি চমকে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। একমাথা রুক্ষ চুল, লম্বা দুটি শীর্ণ হাতে পশ্চিমের জানালার গ্রিল ধ'রে দাঁড়িয়ে ও গভীর চোখে তাকিয়েছিল সূর্যাস্তের আকাশটার দিকে। তারপর একসময় ওর সেই আশ্চর্য গলায় আবার বলেছিল, 'আঁকব, আমি ঠিক এই আগুনের ছবিটা আঁকব একদিন!'

আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম ওর কথাটা শুনে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, সাত বছর আগের জানুয়ারি মাসের শেষ বিকেলে আশীর্বাদের মত সূর্যের শেষ মহার্ঘ আলো ছুঁয়ে-যাওয়া এক শিশুর কথা মনে পড়েছিল।

আমার অহংকার হত, জীবনে শিল্পী হিসাবে কোন পুরস্কারই হয়ত আমি পাব না, কিন্তু কেউ জানে না, আমি জীবনে একবার দেবশিশু দেখেছি।

পাঁচ।। আবার মণিময় ও নগ্ন শ্মশান

আমার বয়েস এখন পঞ্চান্ন। আগুনের প্রকৃত রং আমি এখনও চিনতে পারিনি। তিনটে শালিখ— তাদের ডানায় প্রাচীন রোদ, জ্যোৎস্না আর কুয়াশা, এখনও বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ায় আমার ঘুমের মত আচ্ছন্নতায়।

লেকটাউনের ফ্ল্যাট ছেড়ে, আজ বহুদিন হ'ল চলে এসেছি আমি, এই বাঁকুড়ার ছান্দার গ্রামে। এখানে একাই থাকি আমি। এখানকার ছোট একটা স্কুলে ড্রইংয়ের টিচার।

কিছুই প্রায় ঘটেছিল না। অনুনীতা আমার স্টুডিওতে কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখা একটা ছবি দেখে, জানতে চেয়েছিল মুখটা কার? আমি কোন উত্তর দিইনি। কারণ অনাবাদী জমির মত সাদা ধবধবে সিঁথির ঐ নারীর মুখের আড়ালে, আমার শৈশবের এক আশ্চর্য বঞ্চনা লুকানো ছিল। তাই কোন উত্তর না দিয়ে, আমি স্টুডিও ছেড়ে বের হ'য়ে এসেছিলাম। অনুনীতা এর পরেও কয়েকবার অধৈর্য হয়ে জানতে চেয়েছে, কিন্তু আমি কোন উত্তর দিইনি। সন্দেহ ক্রমশ বেড়েছে ওর। একজন সাধারণ নারীর মুখ, ডক্টরেট্ অনুনীতা সান্যালকে পাগল ক'রে তুলেছিল। অথবা হয়ত ওর প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ভয়ংকর অপমানিত বোধ করেছিল ও।

আমি একদিন কফি হাউস থেকে বাড়ি ফিরলে দেখেছিলাম, ভয়ংকর রাগে কে যেন ফালাফালা ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে সেই মুখের ছবিটা।

রাহুল তখন স্কুলে। অনুনীতা য়্যুনিভার্সিটিতে। কোনকিছু না নিয়ে, কিছু না জানিয়ে, সেই মুহূর্তে লেকটাউনের ফ্ল্যাট ছেড়ে বের হয়ে এসেছিলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে, কবে যেন একদিন এই ছান্দারে এসে পৌঁছেছিলাম, আজ আর তা মনে পড়ে না। এখানকার ছোট একটা স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা শেখানোর মাস্টারমশাই আমি এখন।

স্কুল থেকে একটু দূরে শালবন, তার পাশেই আমার মাটির বাড়ি। উঠানে একটা ইজিচেয়ার পেতে বসি আমি বিকেল বেলায়। এখান থেকে দূরের শুশুনিয়া পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। আমার এখানে ছোট একটা মেয়ে ঘরের কাজ করে দেয়। মেয়েটার নাম টিকলী। পাশের গ্রামে থাকে ও আর ওর বাবা। টিকলীর জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা গিয়েছিল। এসব আমার ওর বাবার মুখ থেকে শোনা।

সারাদিন খুট খুট করে কাজ করে মেয়েটা।

সেদিন বিকেলে রোজকার মত আমি একলা ইজিচেয়ারে শুয়েছিলাম উঠোনে। দূরে তখন ধীরে ধীরে সূর্যাস্ত হচ্ছে। টিকলী এসে বসল আমার খুব কাছে, ঘাসের ওপর।

'কি রে?' আমি ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম ওকে।

একমাথা তেলহীন পাখির বাসা চুল, ডুরে শাড়ি পরনে, বড় বড় চোখ— সবকিছু মিলিয়ে, টিকলীর মুখটায় মাতৃহীনতার একটা বিষণ্ণ ছায়া মাখা থাকে। মুখ তুলে প্রথমে টিকলী ঘাড় নাড়ে, 'কিছু নয়।'

আমি দূরের সূর্যাস্তের দিকে মুখ ফেরাই। একসময় টিকলী সামনের ঘাসে ছোট্ট হাত বোলাতে বোলাতে খুব নিচু গলায় বলে, 'বাবু, আমারে একটা ফটোক্ এঁইকে দেবে বাবু?'

'কিসের ফটো?' আমি ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করি।

'আমার মায়ের গ।' টিকলী বলে, 'মাটা আমার মইরে গ্যালো। দেইখতেই পেলম না কুনোদিন।...একটা ফটোক আছে ঘরে। মেলা থেইকে তুলাইছিল। বাপ আর মায়ের ফটোক। তো সে ফটোক এখন ঝাপসা, দেইখবার পারা যায় না কিছুই।...তুমি এঁইকে দেবে গ বাবু? আমার মায়ের—'

নিচু হয়ে টিকলীকে দেখি। কতই বা বয়েস? এগারো-বারো। এই বয়েসের মেয়েরা সারাদিন প্রজাপতির মত খেলে বেড়ায় আর টিকলীর সারাটা দিন কেটে যায় আমার ঘর গেরস্থালীতে। ওকে দেখতে দেখতে একসময় প্রশ্ন করি, 'তোর কাজ ক'রতে ভালো লাগে?'

টিকলী ঘাড় হেলায়।

'তোর খেলতে ইচ্ছে করে না?'

টিকলী এবারও ঘাড় হেলায়।

'কাজ করতে, না খেলতে, কোনটা বেশী ভাল লাগে তোর?' প্রশ্ন করি আমি।

বড় বড় চোখ তুলে টিকলী তাকায়, তারপর নীচু গলায় বলে, 'খেলতে।'

'তবে কাজ করিস কেন?'

'আমরা যে গরীব।' ভাঙা ভাঙা গলায় বলে টিকলী।

'গরীব' কথাটা অতটুকু মেয়ের মুখে শুনে অবাক হই। প্রশ্ন করি, 'গরীব মানে কি রে?'

উত্তর দিতে মেয়েটার এতটুকু দেরী হয় না। টপ করে বলে, 'গরীব মানে যার খালি খালি খিদে পায়।'

সূর্যাস্তের শেষ আলোয় বসে থাকা টিকলীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আমি। মাতৃহীনা ক্ষুধার্ত এই বালিকা বহুদিন পর আবার আগুনের প্রকৃত রং খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দেয় আমাকে। ক্ষুধার আগুন ঘিরে নেচে ওঠে সে রাতে, অর্ধনগ্ন শীর্ণ বালক বালিকারা আমার স্বপ্নের মধ্যে। আমি আমার হাতের পাতা সেই আগুনে ডুবিয়ে আগুনের প্রকৃত রং মেখে নিতে চাই। মায়াবী আগুনের শিখা আমার হাত দিয়ে ছলনার খেলা খেলে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে আমি জেগে উঠি। তখন মনে পড়ে, অনুনীতার নখে ছিন্নভিন্ন সেই ছবির মুখটাকে। আমার তুলসীমঞ্জরী মা। আবার তার গর্ভে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আমার।

মনে পড়ে আর একজনকে। সে রাহুল। আর রাহুলকে মনে পড়তেই প্রিয় একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে আমার...

অখ্যাত এই গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ নগ্ন এক শ্মশানে স্তূপাকার কাঠের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছি আমি। আর আমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে হাতের মুঠোয় ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি আমার মুখে ছুঁইয়ে রাহুল তার প্রিয় আগুনের ছবিটা আঁকা সম্পূর্ণ করছে।

কাপড়ের ব্যাগ

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

চামড়ার পা-ঢাকা জুতো। যতো জোরে পা ফেলে জিতেন বাগ, মচ্‌মচ্‌ শব্দটা জুতো ছাপিয়ে পঞ্চায়েতের রাস্তায় গড়ায়। উঁচু নিচু সোলিংয়ের ইট। জিতেন বাগ বাধ্যত নজর করেই হাঁটে। কারণ একটি শুভ মনস্কামনা নিয়ে বেরিয়েছে মানুষটা। অযথা হোঁচট তো বিপদের। কিংবা অসফলতার পূর্বাভাষ। তাই খুব দূরে বা পাশে তেমন নজর রাখতে পারে না। বাম হাতে একখানা কাপড়ের বাজারি ব্যাগ। তার মধ্যে দলিল পরচা পঞ্চায়েতের নোটিশ সব কিছুর জেরক্স কপি। দলিলের সার্টিফায়েড কপিও।

জিতেন বাগ দ্রুত পা ফেলে। শুধু পথটুকু পার হওয়া নয়। এর পরও তো তাকে বাস ধরে অনেকটা সড়কে উজোতে হবে। সাধারণ চাষী মানুষ। মাথার মধ্যে যে, ক বিঘে চাষের জমি ঢুকে আছে।

একদম পিছনে মচ্‌ মচ্‌ শব্দটা। ভীম সামন্ত ঘাড় ফিরে দেখে। থমকে দাঁড়ায়। কাছে আসতেই ভীম সামন্ত বলে, ও জিতেন দা— এই ভরা রোদে সেজেগুজে?

— বলিস নি ভাই সেই দু-বিঘে নিয়ে বি. এল. আর অফিসে, পথ হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বলে।

— প্রথমেই বলেছিলুম ও জমিতে একটা ছোট পুকুর কেটে সে মাটি দিয়ে জমিটা উঁচু মতো করে ফেলো। পাঁচ ছ'শ জবা গাছ পুতে দাও— ডেলি রোজগার।

পাশাপাশি দুই মানুষ। বাম হাতে ব্যাগ সামলে দুঃখ জানায় জিতেন বাগ। মাত্র দু-আড়াই মাসের জন্য জমিটা চাইল ছোকরা বিভূতি। সংসার চলে নি। এই সিজনটা কুমড়ো আর ঢেঁড়শ চাষ দুবো কাকা। তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক—। ভালো কথা। বাজারে দাম পাবি। করে খা। দেশের ছোকরা ছেলে। তা না বর্ষায় হাল নামাতে গেলুম, বিভূতি তিন চারজন লোক নিয়ে বলে, এটা তো ভাগের জমি। বলুক লোকজন— আমি ভাগে সব্‌জি ফলাই নি?

— হুঁ। তারপর? বলতে বলতে এগোয় সামন্ত বাগের সঙ্গে।

— আমরাও তো ঠাকুর দেবতা মানি। মিথ্যে বলি কি করে? সব্‌জি এক জিনিস ধান চাষ আর এক জিনিস। তারপর ভাগের জমি! এ কি আশ্চর্য কাণ্ড গো ভাই...

— তাই তো, বলে সমর্থন জানায় মানুষটাকে। তারপর নিজেই বিবরণ দিতে থাকে ভীম সামন্ত, সাথে আমরা ধানের বদলে তিন তিনটে জমিতে জবা চাষ করেছি। কোন লেবার মজুর ধরার বালাই নাই। এ বছর মজুরির রেট পঞ্চাশ, ধান কাটার সময় ষাট। পরের বছর সত্তর— এসব ঝক্কি নেই। শুধু জবার কুঁড়ি ছেঁড়ো আর খাও—। যেমন ছিঁড়বে তেমন গুনে গুনে পয়সা পাবে— ব্যস।

— দেখি ভগবান সুযোগ দিলে জমিটা ছাড়াই। তারপর তোমার পরামর্শ..., কাছেই ক'খানা নুড়ি পাথরের ঢিবি। বিবির মায়ের থান। মাথা নুইয়ে দেবদেবীকে প্রণতি জানায়। ইট বসিয়ে আয়তাকারে ঘেরা দেবস্থানটুকু পার হয় তারা।

একেবারে পাকা রাস্তায় দুজনে। খোয়া পিচ ঢালাইয়ে সড়কটা ডাইনে বামে অনেকদূর। সামন্ত বলল, তোমার গাড়ি আসতে দেরি। আমি যাই।

— উঁ! যাবে-যাও, যেন ঘোরের মধ্যে বললো কথাটা জিতেন।

বামে টাইল প্লেট বসিয়ে সাদা স্তম্ভ। তার উপর হাস্যমুখে আবক্ষ রাজীব গান্ধী। তলায় তো কালো রঙে লেখা "অমর রহে"। স্তম্ভটার গায়ে তখনও সাঁটা রঙিন পোস্টার। তার মধ্যে কবজি থেকে নিটোল পাঁচখানা আঙুলে একটা হাত। জিতেন বাগের নজর পড়তেই নড়ে ওঠে! থমকে যায় জিতেন বাগ। হাতটা যেন ইঙ্গিতে জানাচ্ছে, উঁহু। আর এগিয়ো না। বর্ণমালায় ভরানো শুখনো বই খাতার আইনের কাছে নয়, লোক খোঁজো— যে তোমায় পরিত্রাণ এনে দেবে।

ডান দিকে তাকাতেই লাল সিমেন্টের স্তম্ভ। "শহিদ স্মরণে"। শহীদ বেদীর গা ঘেঁষে তো লোহার খুঁটি। খুঁটির ডগায় লাল পতাকা তিরতির ওড়ে। জিতেন বাগের বুকের মধ্যে কাঁপন। তখন তো চা-দোকানে ছিটে বেড়ার দেওয়ালে রঙিন পোস্টারে 'পদ্মফুল'। পাপড়ি মেলছে ধীরে ধীরে। পাশে লেখা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে...। তারপরে দুটো খুঁটির ঠেকনোয় দরমা সাঁটা। সেখানে একই শাখায় উঁচু নিচুতে জোড়া ফুল। তলায় ঘাস আগাছার ডগা। এত রঙ ঝোপ ঝাপ প্রতীকের মধ্যে ত্রাতা 'লোক'কে খুঁজে পাওয়া যে দুষ্কর! প্রগাঢ় বিভ্রমের মধ্যে জিতেন বাগ হাঁই ফাঁই ডাক দেয়, ও সামন্ত...

গলার স্বর অতদূর পৌঁছোয় না। দীর্ঘ দেহ নিয়ে পথ হাঁটে ভীম সামন্ত। নিরাপদ পদক্ষেপে ঘরমুখো।

জিতেনের মাথার কত উপরে আকাশ। চারপাশে মানুষজন থাকলেও তার বড় মনোব্যথা। পরামর্শ যাচনায় হাঁক দেয়, ও ভীম ভাই...

তখন চাষের জমি আবাদী মাঠে পড়ে। নোটিশ দলিল পরচা মিশে জিতেনের কাপড় ব্যাগটায় দু-বিঘে মাঠের ভার!

মুখোমুখি

মনোজ দাস

পাঁচিলের দরজা খুলে দিল মনীষা।

অবিনাশ একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে। তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল।

'তুমি শোওনি এখনো?'

'দেখতেই পাচ্ছ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর মনীষার। গলাটা ভারি ভারি। অবিনাশ জামা খুলতে খুলতে থমকাল একবার। স্ত্রীর দিকে তাকাল। মনীষা ততক্ষণে দরজায় খিল তুলে দিচ্ছে।

'তোমার জেগে থাকার কী দরকার ছিল? শ্যামল কী করছে?'

চাকরবাকরের নাম সাধারণতঃ হরিপদ কালীপদ পাঁচু গুপী এই ধরনের হয়। কিন্তু অবিনাশের চাকরের নাম শ্যামল। কিংবা চাকর না বলে কাজের লোক বলা ভাল। শ্যামলের ডাকনাম খ্যাঁদা। তার বিধবা মা ছাড়া এই দুনিয়ায় সবাই তাকে খ্যাঁদা নামেই চেনে। তাই চাকর হিসেবে এ বাড়ীতে এসে সেই প্রথম দিন সে নিজের নাম বলেছিল— খ্যাঁদা।

শুনে হেসে ফেলেছিল মনীষা। বলেছিল, 'না না, খারাপ নাম না, ভাল নামটা বলো।'

শ্যামলের সেকি দুর্দশা তখন। তার ষোলো বছর বয়সের ইতিবৃত্তে এরকম পরিস্থিতি বোধহয় আসেনি কখনো আর। অন্তত তার থমকানো চোখ আর লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে তাই আন্দাজ হয়। সে কোনোরকমে বলেছিল— 'শ্যামল। সিরি শ্যামল কুমার মণ্ডল।'

মনীষা বলেছিল, খ্যাঁদা নামটা বিচ্ছিরি। আমরা তোমাকে শ্যামল বলে ডাকব।'

ষোলো বছর বয়সেই খ্যাঁদার বিস্তর অভিজ্ঞতা। চাকর-বৃত্তিতে এটা তার পঞ্চম ঠেক। সে জানে, মনিব-মনিবানীর 'তুমি' সম্বোধন ক'দিনেই 'তুই' হয়ে যায়। প্রাপ্তিযোগ ঘটে খচ্চর, বদমাস, নচ্ছার এইসব অতিরিক্ত নামের। তার প্রথম কর্মক্ষেত্রে— হয়তো সেটা প্রথম থাকার দরুণই— কিছু সহানুভূতি ছিল মালিক তরফের। তারা একটা সপ্তাহ ডেকেছিল শ্যামল নামে। দ্বিতীয় সপ্তায় শ্যামলের অপভ্রংশ 'শ্যামলা'। এবং চতুর্থ সপ্তার মাঝামাঝি এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তার নামটা হয়ে যায় 'বড়ো এঁড়ে'। এবম্বিধ নামকরণের কারণ— সে-বাড়ীতে একটা এঁড়ে বাছুর ছিল, যার রং শাম্‌লা। বয়েসে সে শ্যামলের ছোট, তাই শ্যামল 'বড়ো এঁড়ে'।

তাই এই তৃতীয় ঠেক্‌-এ এসে যখন বহাল থাকল ভাল নামটা, তখন প্রথমাবধি সন্ত্রস্ত ছিল সে। কি জানি কোথায় গিয়ে কিভাবে দাঁড়াবে যে নামটা। কিন্তু দু-বছর কেটে গেল এই নতুন আশ্রয়ে, পরিবর্তন হল না। গিন্নীমা— না, গিন্নীমা নয়, মনীষার কথামত তাকে 'বউদি' বলে ডাকে সে। তা সেই বউদি তাকে 'তুই' বললেন না এবং শ্যামল নামটাকেও আর কোথাও পৌঁছে দিলেন না। এবং এ ব্যবহার যে শুধু বউদির একার, তা নয়। অবিনাশ— এ বাড়ির কর্তা তার কাছে 'দাদা'। তিনিও স্ত্রী-র মতই যথারীতি 'শ্যামল' বলে ডাকেন। যদিও সম্বোধনে 'তুই'। কিন্তু সেটা স্নেহবশতঃ।

এর কারণ অবিনাশ কম্যুনিস্ট। এর কারণ মনীষা কম্যুনিস্ট। মনীষার বাপের বাড়ি বালুরঘাট, অবিনাশের পৈতৃক ভিটে এখানে। এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক অজ গাঁয়ে। তাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। এক শিক্ষক সম্মেলনে। দুজনেই এসেছিল নিজের নিজের এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ। ওইভাবে আড়াই বছর। তারপর বিয়ের কথা উঠল যখন, তখন একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াল দুই ভিন্ন জায়গায় দুজনের চাকুরি। বালুরঘাট এবং চব্বিশ পরগণার দূরত্ব অনেকখানি। বিয়েটা হওয়াতে গেলে যে কোনো একজনকে ইস্তফা দিতে হয় কাজে। স্বভাবতই এ দায়িত্ব বর্তেছিল মনীষার ওপর। কেননা সে মেয়ে, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা যতই বেড়ে যাক্ না কেন, এখনো সে রকম সময় আসেনি যে, স্ত্রীর চাকুরি রাখতে স্বামী তার ঘর ছেড়ে, কাজ ছেড়ে উঠে যাবে। অবিনাশ কম্যুনিস্ট, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের উচ্চকিত সমর্থক। এসব কথা যে ভাবেনি, তা নয়! তবু চাকরী সে হয়ত ছেড়ে দিত। কিন্তু অন্য কিছু বাধাও যে ছিল তার। গ্রামে তার নিজস্ব একটা বাড়ি আছে, বিঘা আষ্টেক ধানের জমি আছে।

বিয়েটা হয়েছিল জরুরী অবস্থায়। না না, বর-কনের তরফ থেকে কোনোরকম জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি। ওটা রাজনৈতিক টার্ম। দেশ বাঁচাতে দিল্লীশ্বরী ফরমান্ জারী করেছিলেন। আর তার ফলে অবিনাশদের বিপ্লব টিপ্লব বন্ধ রাখতে হয়েছিল। মিটিং, মিছিল, পাবলিক অরগানাইজ্ করা— সব বিলকুল কালো খাতার জিনিষ। নেতৃত্বেরও নিরুপায় নির্দেশ ছিল ঃ বসে থাকো। অবিনাশ তাই বসে ছিল চব্বিশ পরগণায়, মনীষা তাই বসে ছিল বালুরঘাটে। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষেরা জানেন যে, কাজের লোক কখনো বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু করে ফেলে। তাই করল ওরা। আর কিছু কাজ না পেয়ে বিয়েটা সেরে ফেলল একদিন।

মনীষা বালুরঘাট ছেড়ে চলে এল। একা পুরুষ মানুষের সংসার। অগোছালো। গুছিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টায় লাগল। এবং হাতে অঢেল সময় থাকার দরুণ কম্যুনিস্টদের দাম্পত্যজীবনের পরিধি যতটুকু— তার থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ল। শুধু খুনসুটি নয়, টুকিটাকি হাতের কাজও করে দিত অবিনাশ। তাই চাকর-বাকর রাখার দরকার পড়েনি আগে।

রাজনৈতিক জরুরী অবস্থা যদি চিরটাকাল চলত, তাহলে চাকরবাকর রাখার দরকার পড়ত না। কিংবা মনীষার শারীরিক অবস্থাও যদি হঠাৎ জরুরী না হয়ে পড়ত, তাহলেও কাজের লোকের প্রয়োজন হত না। কিন্তু কী দারুণ যোগাযোগ! দুটি ভিন্ন দিক একসাথে— একযোগে অবিনাশকে জানান ছিল— নাহ্, একটা খাটাখাটুনির মানুষ আনতেই হয়। এভাবে চলে না।

সত্যিই চলে না ওভাবে। সাত পেরিয়ে আটমাসের পোয়াতি তখন মনীষা। নড়তে চড়তে দারুণ আলস্য, দারুণ ঝুঁকি। তাই শ্যামল। অবিনাশের কাজ হঠাৎ বেড়ে গেছে। দিল্লীতে পাশাবদল ঘটেছে, সামনে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন। আড়াই বছরের নিদ্রা আড়াই মাসে ঘুচিয়ে দিতে হবে। মিটিং, মিছিল, অরগানাইজেশন। সময় কোথায় বাড়ির কাজ করার? কম্যুনিস্টদের জীবনে বাড়িঘর বউ ছেলেমেয়ে এসব কিছু নয়। তবু কর্তব্য বলে আছে একটা পদার্থ। তাই দরকার কাজের লোক। তাই শ্যামল।

সেই শ্যামলের দু-বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এ বাড়িতে। এখনো সে 'তুমি' এবং এখনো সে 'শ্যামল'।

মনীষার মেয়ের বয়স এক বছর দশ মাস। প্রসবের পর সূতিকা হয়েছিল মনীষার, তাই শরীর রুগ্ন। অধিকাংশ সময় শুয়ে বসে থাকা। আগে স্বামীর সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করত, এখন মেয়ের সাথে আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম গল্প করে।

অবিনাশেরও সময় নেই বউ-এর সাথে রাজনীতি আলোচনার। নতুন দায়িত্ব তার। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। সন্ধ্যে অব্দি ব্লক অফিসে বসতে হয়। লোন্, রিলিফ্, রাস্তাঘাট তৈরী, মেছো ঘেরী, সাত-সতের পারমিট দেয়া— এসব কিছু তাকেই করতে হয়। সেখান থেকে পার্টি অফিস। সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যত্র। বাড়ি ফিরতে কোনোদিন দশটা, কোনোদিন এগারো, কোনোদিন মাঝরাত্তির। তিরিশখানা গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা, বিচার-আচার সব তার হাতে কিনা।

তাই বাড়ির নিয়ম— পাঁচিলের দরজাটা খুলে দেয়ার দায়িত্ব শ্যামলের। মনীষা যেন শরীরকে কষ্ট দিয়ে অত রাত অব্দি জেগে না থাকে। কিন্তু আজ কেন সে জেগে আছে?

অবিনাশ আবার বলল, 'শ্যামল কোথায়?'

মনীষা খাটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'তার মানে?' অবিনাশের রাগী গলা।

মনীষা ভুরু কোঁচকাল। অবিনাশের কথাটা একটু অন্য ভঙ্গীতে ফিরিয়ে বলল, 'তার মানে!'

'চাকরবাকরকে অতটা মাথায় তুলো না, পরে পস্তাতে হবে।'

চাকরবাকর! কথাটা অবিনাশের মুখে এই প্রথম শুনল মনীষা। কানে লাগল, কিন্তু বিস্মিত হল না। আজকাল এত দ্রুত এবং এত ব্যাপকভাবে পাল্টে যাচ্ছে অবিনাশ যে, মনীষা সহজে বিস্মিত হয় না। যে অবিনাশ আগে বিড়ি খেত, সে এখন খায় ফিল্টার টিপ্‌ড্ উইল্‌স্। ক্যানসারের ভয়ে নাকি! যে অবিনাশ আগে বাসে করে যেত কলকাতায়, সেই অবিনাশের জন্যে এখন কাকদ্বীপে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। সময়ের অভাব নাকি! এবং আর কেউ না জানুক, মনীষা জানে— তার সংসারের সচ্ছলতা এখন অবিসংবাদিত।

কিন্তু কিভাবে আসে এই সচ্ছলতা? কিভাবে আসে বিড়ির বদলে ফিল্টার টিপ্‌ড্ উইল্‌স্? কিভাবে আসে বাসের বদলে ট্যাক্সির ভাড়া?

বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য আগেও এসেছে মনীষার কানে। বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছে— শত্রুর রটনা। অবিনাশ--- সেই মিছিলের তেজী অবিনাশ এরকম কখনো হতে পারে না। কিন্তু আজ— আজ বিকালে তার মনে সংশয় জন্ম নিয়েছে। প্রত্যয় নয়, তবে সংশয়টা তীব্র। রমজান মণ্ডলের মা এসে বলেছে...

'আজ আর খাবো না।' ইতিমধ্যে বারান্দা থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেছে অবিনাশ।

'কেন? খেয়ে এসেছ কোথাও?'

'বি. ডি. ও সাহেবের মেয়ে গানের পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, তাই নেমন্তন্ন করেছিলেন ক'জনকে। হঠাৎ। চায়ের নেমন্তন্ন। তোমাকে নিয়ে যাওযার জন্যও লোক পাঠাচ্ছিলেন। আমিই বারণ করলাম।' একটা সিগারেট ধরাল অবিনাশ। খাটে বসল।

'শুধু চা, না আর কিছু?'

'আসলে কী হয়েছিল জানো'— অবিনাশ হাসল। 'চায়ের নিমন্ত্রণে চা বাদ। মাংস পরোটা আর মিষ্টি। সবশেষে কফি।'

'তুমি একা নিমন্ত্রিত ছিলে?'

'না। আরো পাঁচ ছ'জন ছিলেন। থানার বড় দারোগা, সেটেল্‌মেন্ট অফিসার, ফুড ইন্সপেক্টর, আর কে যেন—'

অবিনাশ ভাবতে বসল। মনীষার ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল।

'বাঃ, তোমার অ্যাসোসিয়েশন তো এখন বেশ চমৎকার। সবাই মান্যগণ্য ব্যক্তি।'

একটু কি শ্লেষ ছিল মনীষার গলায়? অবিনাশ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে বলল, 'যে কাজের দায়িত্ব এখন পড়েছে আমার ওপর, তাতে এসব লোকদের সাথে ওঠাবসা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, তোমার এখন অনেক কাজ। বর্গাদার, মেছো ঘেরী, লোন্ ডিষ্ট্রিবিউশন—এতগুলো প্রবলেম—'

মনীষার স্বর তীক্ষ্ণ। কিছু বলতে চায় নাকি ও? কী বলতে চায়? এইজন্যেই কি শ্যামলের বদলে নিজে খুলেছে দরজা? এইজন্যেই কি জেগে আছে?

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে স্ত্রী-র দিকে তাকাল অবিনাশ। কিছু ভাবল। তারপর বলল, 'হঠাৎ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করলে যে বড়!'

'অন্যায় করেছি?'

'না, অন্যায় বলব কিভাবে?' অ্যাশ্‌ট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে বলল অবিনাশ, 'দু-তিন বছর ওপাট একেবারে চুকিয়ে দিয়েছিলে কি না— তাই বলছি।'

'তিন বছরের একটা বছর তোমাদের পার্টির নির্দেশে বসে থাকতে হয়েছিল। তাই ওটা বাদ দিলে পারতে।'

'আমাদের পার্টি! তার মানে? তুমি কি আমাদের রাজনীতিতে বিশ্বাস করো না?'

'তখন করতাম। এখন করি না।' মনীষা কাটাকাটা বলল।

'ও। এখন কি উগ্রপন্থায় বিশ্বাস এসেছে?' অবিনাশ ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করল।

'আমি রাস্তার লোক নই যে, আমার সাথে ওভাবে কথা বলবে তুমি। আমি কেবল কয়েকটা জিনিষ জানতে চাই। কয়েকটা ব্যাখ্যা।'

'অবিনাশ উত্তর করল না একথার। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল, 'রাত অনেক হয়েছে। আলোচনাটা কাল সকালে—'

'না।' তাতে থামিয়ে দিল মনীষা। আশ্চর্য, সেই প্রাক্-বিবাহ সময়ের মনীষা যেন হঠাৎ ফিরে এসেছে আজ। এ মেয়ের প্রেমিকার থেকেও বড় পরিচয় রাজনৈতিক কর্মী। স্বামী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে তাড়া দিয়ে থামাতে পারল না অবিনাশ।

'এসবে কী লাভ?' মনীষা বলল।

'কোন সবে?'

'এই তাসের ঘরের রাজত্বে?'

'জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'—

'এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, না হত্যা করা?' কথা টেনে নিল মনীষা।

'তার মানে?'

'নিজের দিকে তাকাও একবার। বুঝতে পারবে। এই তিন মাসে তুমি বন্ধু হিসেবে পেয়েছ থানার দারোগা, সেটেল্‌মেন্ট অফিসার, ফুড ইন্সপেক্টর— যত ঘুষখোর আর শয়তান আমলা। যারা প্রত্যেকে মেহনতী মানুষের শত্রু শিবিরের লোক।'

'বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী রণনীতি ঠিক করতে হয়।' তর্ক যখন বেধেছে, ভালভাবে বাধুক। অবিনাশ তৈরী হল।

'তা ঠিক। তবে তা মূলনীতিকে বিসর্জন দিয়ে অবশ্যই নয়? মনীষাও স্পষ্ট।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'শত্রুকে শত্রু হিসেবে চিনিয়ে না দেয়াটা অপরাধ। তোমরা তোমাদের শত্রুকে বন্ধু করে তুলছ আর বন্ধুকে করছ শত্রু।'

'মিথ্যে রটনা এসব।'

'না, মিথ্যে নয়। আমি সব জানি। আমি সব শুনেছি।'

নিস্তব্ধ ঘর। দেয়ালঘড়িটায় শুধু টিক্‌টিক্ শব্দ। ঘড়ির নীচে বুক সেল্‌ফ। বুক সেল্‌ফের ওপর পল্‌তে-কমানো হারিকেন। নিভু নিভু। আর মুখোমুখি বসে স্বামী-স্ত্রী। ওদের বাচ্চা মেয়েটা একপাশে গভীর ঘুমে।

'রমজান মণ্ডলকে কেন ধরেছে পুলিশ?' মনীষা প্রশ্ন করল।

'আমি পুলিশ নই।'

'পুলিশ তোমার কথায় চলে।'

'সে আমার বিরুদ্ধে স্ক্যাণ্ডাল করছিল। আমাদের লাইনের বিরোধিতা করছিল।'

'তাই একই পার্টির কর্মী হওয়া সত্ত্বেও সংশোধনের জন্যে পুলিশের হাতে দিতে হল তাকে? কিন্তু এটা তার গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ নয়, এটা তোমাদের নিষ্ক্রিয় থাকার কারণ। গ্রেফতার হওয়ার কারণটা কী?'

'সে মেছোঘেরীর বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছিল।'

'একসময় তুমিও পাকাতে।'

'তখনকার আর এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। আমাদের মূল দায়িত্ব শান্তি বজায় রাখা।'

মনীষার ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি খেলে গেল— 'বেশ!'

একটু থেমে আবার বলল সে, 'রাখাল সরকারকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কেন?'

'আমি করিনি। করেছে জেলা কমিটি।'

'কিন্তু তোমার অভিযোগের ভিত্তিতে।'

'ইটভাঁটার শ্রমিকদের নিয়ে জঙ্গী— মানে সহিংস— মানে সশস্ত্র দল পাকাচ্ছিল সে। ভ্যানডালিজম্—'

'একসময় তুমিও সশস্ত্র দল পাকাতে, সশস্ত্র দল পাকানোর রাজনীতিতে বিশ্বাস করতে।'

'তুমি একটা জিনিষ বারবার ভুল করছ মনীষা,' বোঝানোর ভঙ্গীতে বলল অবিনাশ, 'তখনকার আর এখনকার পরিস্থিতি এক নয়। আগে এক পয়সা ট্রামের ভাড়া বাড়ায় আমরা আন্দোলন করেছি। আর এখন—'

'এখন আমরা নিজেরা বাসের ভাড়া টেন পার্সেন্ট বাড়িয়েছি। তাই তো?'

'তার কারণ—'

'দরকার নেই সে কারণ খুঁজে।' থামিয়ে দিল মনীষা, 'আমাদের মূল কথায় আসা যাক। এখনকার পরিস্থিতি আলাদা—'

'হ্যাঁ, এখন আমাদের মূল দায়িত্ব উৎপাদন বজায় রাখা।'

মনীষা হাসল, 'বেশ!'

তারপর বলল, 'যদি উৎপাদন হ্রাস পায়? যদি শান্তি বিঘ্নিত হয়?'

'দিল্লী আমাদের খারিজ করবে। এমনিতেই দেখতে পারে না, তার ওপর—'

'দিল্লী কি সত্যিসত্যিই খারিজ করতে চায় তোমাদের?'

'এটা কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা রাখেনা।'

'হ্যাঁ, রাখে। দিল্লী যদি সত্যিসত্যিই খারিজ করতে চায় তোমাদের, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা পারে। যারা খল, তাদের ছলের অভাব হয় না কখনো।'

অবিনাশ একটু ভাবল। তারপর বলল 'বেশ, তোমার কথা যদি ঠিক বলে ধরি, তবে প্রশ্ন— দিল্লী আমাদের খারিজ করতে চায় না কেন?'

'তোমরা আগের মত হোস্‌টাইল আর নও, তাই। দিল্লীশ্বরীর প্রগতিশীলতা, কম্যুনিজমে ভক্তি এসবকিছুর বড় সার্টিফিকেট তোমরা। তোমাদের মত নির্বিষ সর্পকে বাঁচিয়ে রাখলে বিশাল ভারতে তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। বরং লাভ। তোমরা যে কোন ডাঙ্গে সাহেবের পেছনে লাগো— বুঝি নে।'

রসিকতার সাহায্যে আক্রমণ ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল অবিনাশ— 'কার ভক্ত হচ্ছ ইদানীং? চারু মজুমদার, না শিবদাস?'

'এখনো কারো হইনি। আগে তোমাদের পচনকার্যটা দেখি, তারপর ও প্রসঙ্গ ভাবব।'

'আমাদের পচনকার্য? মানে?'

'তোমাদের রাজনীতি কিছু ভালো কর্মীকে শুধু চোর করে দিতে পারে। তাছাড়া কিছু পারে না।' থামল মনীষা। সোজাসুজি চোখ রাখল অবিনাশের দিকে। তারপর বলল, 'যেমন তুমি।'

আদিম যুগের মানুষ হলে মনীষার ওপর নির্ঘাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ত অবিনাশ। কিন্তু সময়টা বিংশ শতাব্দী। আর মনীষা মধ্যযুগীয় রমণীর মত 'পতি পরম গুরু' এই মন্ত্র জপ করে না। তাই ওইরকম মারাত্মক কথা বলার পরও সে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে পারল অবিনাশের দিকে। অবিনাশের মধ্যে প্রথমে তীব্র ক্রোধ, তারপর ক্রোধ কমে গিয়ে লজ্জা। ধরা-পড়া চোরের লজ্জা।

'কে— কে তোমাকে বলে এসব কথা?'

'কাল মল্লিকদের মাছের ঘেরীতে গিয়েছিলে কেন?'

মনীষার তীব্র দৃষ্টির সামনে অবিনাশ আপ্রাণ চেষ্টা করল প্রতিরোধের। —'ওখানে চাষীদের সাথে একটা গোলমাল বেধেছিল। জমির দাম নিয়ে।'

'গোলমাল মেটাতে গিয়ে তুমি মালিকানার শেয়ার নিয়েছ?'

'কে বলেছে?'

'যেই বলুক; কথাটা সত্যি কিনা?'

'যদি সত্যি হয়, তাই বা কী? আমি টাকা দিয়ে শেয়ার কিনেছি।'

'কোথায় পেলে টাকা?'

'আমার একটা চাকরি আছে। আমার কিছু জমি আছে?'

'কিন্তু আমি যদি বলি— টাকাটা আদৌ লাগেনি? শেয়ারটা তুমি পেয়েছ ঘুষ হিসেবে। তুমি পার্টির তরফ থেকে কথা দিয়েছ— ওই মেছো ঘেরীতে কোনো গোলমাল করা হবে না। শেয়ারটা তারই প্রতিদান।'

অবিনাশ প্রায়-চেঁচিয়ে উঠল— 'মিথ্যে কথা।'

কিন্তু তার নিজের কানেই কেমন মিনমিনে আর বেখাপ্পা শোনাল প্রতিবাদটা। সে চোখ রাখতে পারল না মনীষার চোখে। নামাল। তারপর নিজেকে, না মনীষাকে, না ঈশ্বরকে— কি জানি কাকে উদ্দেশ্য করে বলল— 'সব শালা যা পারছে, মারছে। আর আমি মারলেই দোষ?'

স্তম্ভিত হয়ে গেল মনীষা। ক্ষোভে দুঃখে-বেদনায় ককিয়ে উঠল সে— 'তুমি এত নীচে নেমে গেছ।'

অবিনাশ কথা বলতে পারল না। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ একা মনে হল তার। এত একা— কেউ তার কাছে নেই। না মনীষা, না তার কমরেডরা। একটা অন্ধ গোলক ধাঁধার মধ্যে নিঃসঙ্গ সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রমশ তার মস্তিষ্কে যন্ত্রণা, চেতনায় মৃত্যুভয় দানা বাঁধে।

অবিনাশ ওঠে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়। নিভিয়ে দেয় আলো। তারপর নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

অন্ধকার ঘরে দেয়ালঘড়ির নিরবচ্ছিন্ন টিক্‌টিক্।... অবিনাশ ঘুমোতে পারেনা। ঘুম আসে না। রাত একটা... রাত দুটো...

শেষরাতে একটুখানি বুঁজে এসেছিল চোখের পাতা এবং তখন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল অবিনাশ। কিংবা ওটা স্বপ্ন নয়, ওটা তার ক্লান্তির ঘোরে ভুল দেখা। কোন্‌টা যে ঠিক, তা অবিনাশ নিজেও বুঝতে পারে না। তার চোখের সামনে ভাসে একটা দৃশ্য ঃ

একটা বিশাল মাঠের মধ্যে সে দৌড়োচ্ছে। তার পিছনে তাড়া ক'রে ফিরছে একটি যুবক। যুবকের ডানহাতে ধারালো ভোজালি, বাম হাতে রেড বুক। অবিনাশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে দূরে সরে যাওয়ার, পারছে না। যুবকটি অনেক বেশি ক্ষিপ্র। সে ক্রমশঃই নিকটতর হচ্ছে। এবং এইভাবে একসময় মুখোমুখি।

'চিনতে পারছ আমাকে?' সরল অথচ হিংস্র মুখে যুবকটির জিজ্ঞাসা।

অবিনাশ কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না।'

যুবকটি বলল, 'আমি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভের অবিনাশ রায়। আমি খুন করতে এসেছি নাইনটিন এইটটির অবিনাশ রায়কে। হি ইজ এ মোস্ট হেটেড ক্লাস এনিমি।'

এবং তারপরই সে হাতের অস্ত্রটা আমূল বিদ্ধ করল অবিনাশের বুকে।

জন্মান্তর

জয়ন্ত জোয়ারদার

— সবই তাঁর ইচ্ছেতে হয়। এ বিশ্ব চরাচর নিয়ন্ত্রণ করছে যে মহাশক্তি, এ দৃশ্যমান জগতের প্রতিটি ঘটনা সেই মহাশক্তিধরেরই আনন্দের প্রকাশ। কতিপয় দুরাত্মার বক্তব্য, আমাদের দেশ নাকি ধর্মবিশ্বাস ভাগ্যে বিশ্বাস ইত্যাদির জন্য পশ্চাদপদ। আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ধর্মের আগল ভেঙ্গে বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যার সহযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান কি?

ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপ্রসন্ন সিদ্ধান্ত। একবার ঢোক গিলে আবার শুরু করেন— জ্ঞানের বিশেষ বিভাগ। যা মানুষের শ্রমকে লাঘব করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি তাদের মানসিক জগতে এক শ্লাঘা সৃষ্টি করেছে। যা বিজ্ঞানে স্বীকৃত নয় তার অস্তিত্বে তারা অস্বীকার করছে। কিন্তু এজাতীয় দর্শন মানুষের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারছে না। তারা এখনও জ্ঞানসমুদ্রের কূলে নুড়ি কুড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা সুপ্রাচীন কালেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। আমাদের ইতিহাসে পরীক্ষিত যে সব সত্য অর্থাৎ জন্মান্তর ও কর্মফল ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়া প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তারা দিতে পারছে না যে এসব মিথ্যে। আর তাই আজ তাদেরই প্রাচুর্যক্লিষ্ট যুবসমাজ ছুটে আসছে আমাদের দর্শনের ছত্রচ্ছায়ে।

কর্মফলই যদি না হবে তবে কেন এই গরীব কেন এই বড়লোক? বিশ্বস্রষ্টা তো কারুর ওপরেই বীতরাগ নন। কেন তিনি একজনকে কষ্ট দেবেন, আরেকজনকে সুখে রাখবেন? এজন্মে যদি আমরা সৎ জীবন যাপন করি, ঈশ্বরে আস্থা রাখি তবে নিশ্চয়ই পরজন্মে আমাদের মোক্ষলাভ হবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কর্মে নিয়োজিত থাকা যাতে এই ধূলিমলিন পৃথিবীতে কোন রূপেই আর ফিরে না আসতে হয়। যেন তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারি।

বক্তৃতা সমাপনের পর গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে রাস্তার মোড়ে তাঁর গ্রাজুয়েট বেকার মেজ ছেলেটাকে পাড়ার একটি কুখ্যাত মেয়ের সঙ্গে বার্তালাপে মগ্ন দেখে তাঁর সন্দেহ হয়, মধ্যম পুত্র ওই নচ্ছার মেয়েটির সঙ্গে ইয়ে মানে প্রেমালাপ করছিল। এতে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। রক্তের উচ্চচাপের জন্য ডাক্তার তাঁকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছিলেন। ঘটনাটিকে ভবিতব্য ভাবতে না পারায় তাঁর হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে।

☆ ☆ ☆

ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে মানবসমাজ দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলেছে। ঈশ্বরও তাই সৃষ্টি আর বিনাশ আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে কর্মভার লাঘব করেছেন। অধ্যাপকের আত্মাকে কি করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিনাশ ডিপার্টমেন্ট কেস ঈশ্বরের সামনে

পেশ করল। ঈশ্বর রেকর্ডের ফাইল খুললেন। পুণ্যকর্মাদি— (১) ঈশ্বরে তথা ধর্মে বিশ্বাসের কথা প্রচার করা। (২) নিয়মিত গঙ্গাস্নান করা। পাপকর্মাদি— (১) যৌবনে পরস্ত্রী দর্শনে কামাবেগ জাগরিত হয়েছিল কয়েকবার। (২) দরিদ্র ছাত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করে প্রাইভেট ট্যুইশনের অর্থ আদায়। (৩) অন্য যোগ্যতর প্রতিযোগীকে বঞ্চিত করে আত্মীয়বন্ধুদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। (৪) উপরি আয়ের জন্য হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের নামে নিজে নোটবই লেখা।

ঈশ্বর আশ্চর্যান্বিত হলেন। আত্মাটি তো যথেষ্ট সৎ জীবন যাপন করেছে। ইদানীং কালে এত কম কুকীর্তির রেকর্ডসম্পন্ন আত্মা পাওয়া দুষ্কর। এটিকে সামান্য সুযোগ দিলেই আর এক জন্মে মুক্ত আত্মায় পরিণত হবে। এ জন্মের অপরাধের মত আগামী জন্মেও যাতে অপরাধী না হতে হয়, আত্মাটিকে এমন সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টি ডিপার্টমেন্টে ঈশ্বর আদেশ দিলেন— এ আত্মাটিকে যেন বেশী দিন পৃথিবীতে থাকতে হবে না এমন ভূমিকায় পাঠানো হয়।

☆ ☆ ☆

কালা উদ্বিগ্ন চোখে বার বার ঘরের দরজার দিকে চায়। ময়নার একটানা কাতরানি থেমে যায়। কি হয় কি হয় চিন্তায় অস্থির কালা পায়চারি করে। দাই বেরিয়ে আসে— ছেলে হয়েছে বটে।

বাপমায়েতে নাম রাখল দুখিয়া। ওদের ঘরে এমন নামই হয়, এমনটিই মানায়। তা' না হলে ছোঁড়াটার বয়েস দশ হতে না হতেই বাপটা মরে! বাপটা ছিল খাঁটি চাষা— যেমন বাইত লাঙল তেমনি চিনত মাটি। আকাশের রঙ দেখে হাওয়ায় কান পেতে বলে দিত বরষা বাদলের খবর। খাটত জানোয়ারের মত আর থাকত মাঠে মাঠেই। মেহনত করেই ভাগ্য ফিরিয়েছিল। দু বিঘেটাক জমি করেছিল। মাঠেঘাটে জল খেয়ে হল পেটের ব্যামো, আর সারল না।

ময়না প্রথমে বলদ বেচল। জমি ভাগে দিল। বছর ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল সম্বৎসর চলেনা আধি ধানে। ধার হল হরিহর মহাজনের কাছে। খরা বর্ষার কমাস, নতুন ধান ওঠার আগে মহাজনের ধানই খেল মা বেটাতে। নতুন ধান উঠলে সুদসমেত শোধ দেবার পর আর কতটুকুই বা বাঁচবে। দয়াপরবশ হয়ে মহাজন বললে— চিন্তা কি দুখিয়ার মা, ছেলেটাতো বড়ই হয়ে গেছে। ওকে পাঠিও আমার কাজে। কোন ভারী কাজ নয়। গাইবাছুর চরাবে। তবে মাইনে কিন্তু হাতে পাবে না। সুদের সঙ্গে কাটাকাটি হবে। দু'চার বচ্ছরেই শোধ হয়ে যাবে। তবে দুপুরে একবার খেতে পাবে আর বছরে গামছা পাবে বটে একটা।

দুখিয়া গরু চরায়। একপাল গরু। মহাজনের গোয়াল থেকে গাইবাছুর খুলে আনার সময় গামছায় মুড়ি নয়ত চিড়া, কখনও ছাতু আর লঙ্কা দিয়ে দেয়। ধৈর্য ধরে দুপুর অব্দি রাখতে পারে না দুখিয়া। সকাল থেকে একটু একটু করে খেতে খেতে সূর্যিঠাকুর মাথার ওপর আসার আগেই শেষ করে ফেলে। পেট ভরে নদীনালার জল খায়। তারপর কোন গাছের ছায়ায় গামছা পেতে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রতিদিনের মত সন্ধ্যেবেলা গোয়ালে গাই-বাছুর গুনতে গিয়ে হরিহর মহাজন দেখে একটা এঁড়ে বকনা কম। খোঁজ খোঁজ। পাওয়া যায় কাছাকাছিই। কিন্তু গুনতি করে ঠিকমত না ধরে আনার অপরাধে পরের দিন আর খাবার পায়না দুখিয়া। বারো বছরের ছেলের খিদে বুঝ মানেনা। বেলা বাড়ে আর খিদেও বাড়ে। দু'চারবার জল খেয়েও খিদের আগুন

নেভেনা। মহাজনের ভয়ে ঘরে গিয়ে একমুঠো খেয়ে আসার কথাও ভাবতে পারে না। যদি হঠাৎ এসে দেখে গাই-বাছুর ছেড়ে ঘরে গিয়েছে তাহলে আর আস্ত রাখবে না। আর কে জানে ঘরেই বা দানা আছে কি না।

দুখিয়ার নজর পড়ে বাদল শেখের বাড়ির বাগানে। চারপাঁচটা গাছ ভরে পেয়ারা ধরেছে। আগেও দেখেছে, নোলায় জল এসেছে, কিন্তু সাহস পায়নি। আজ খিদের তাড়নায় আর পারে না। বড় বড় ডাঁসা পেয়ারাগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে দুখিয়াকে। দুখিয়া চুরি করে, চুরি করে খেয়ে খিদে মেটায়। ধরাও পড়েনা। শাস্তিও পায়না। হয়ত পাওনা থেকে যায়।

বর্ষা নামে অঝোরে। ধানক্ষেতের কচি ধান বাঁচিয়ে গরু চরাতে হয়। একটা বেয়াড়া গরু বারে বারেই ধানক্ষেতের সবুজের দিকে ছুট লাগায়। হয়ত ঘাস খেয়ে খেয়ে অরুচিতে মুখ বদলাতে চায়। জল ভরে আছে ক্ষেতে, আলের বাঁধে আটকে। বেয়াড়া গরুটাকে বাগে এনে জমির বাইরে করতে গিয়ে আলের ধারে গর্তে পা ঢুকে যায়। দুখিয়ার আত্মার পৃথিবীবাসের দিন ফুরোয়। সাপে কামড়ায় দুখিয়াকে।

☆ ☆ ☆

ঈশ্বর আবার এই আত্মাটির ফাইল তলব করেন। এ জন্মে পাপের একটিই মাত্র ঘটনা, খিদের জ্বালায় চুরি করে খাওয়া। কি জ্বালাতন। পুণ্যাত্মা কি তৈরিই হবে না! এ আত্মাটির ওপর তাঁর ভরসা ছিল। তাই সবচেয়ে দুঃখী অথচ সৎ জীবন যাপনের জন্য ভারতবর্ষের চাষীর ঘরে পঠিয়েছিলেন। তাও আত্মাটির রেকর্ড পরিষ্কার থাকল না। ঈশ্বর সত্যিই চিন্তিত। যুধিষ্ঠির ইত্যাদির পর সাময়িক কালে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য আর কোন জীবাত্মা মুক্তিলাভ করছে না। এ কেসটার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সৎ জীবন যাপন মানেই— দরিদ্র ঘরে। অথচ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিতে হবে না এমন জায়গা কোথায় ·পৃথিবীতে?

বিনাশ ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ারস্ সেক্রেটারি ঈশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়— জগদীশ্বর, বিদ্রোহী মানুষেরা পৃথিবীতে কতিপয় অংশে এক নতুন সমাজ কায়েম করেছে। একমাত্র সেখানেই স্যার খাটলেই খেতে পাওয়া যায়।

— কিন্তু তারা তো ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে?

সৃষ্টি ডিপার্টমেন্টের একজন কাতরোক্তি করে।

— কিন্তু সৎজীবন যাপনের নিমিত্ত অমন ব্যবস্থাই যে আত্মাদের দরকার... যদিও তাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বই... তবু... নান্য পন্থাঃ।

ঈশ্বরের সদানন্দ ললাটে চিন্তার রেখা ফুটল। শুধু বললেন— হুম।

কাকতাড়ুয়া

নবারুণ ভট্টাচার্য

[নির্দিষ্ট ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে ঘটেছিল, ১৫ তারিখে। কয়েকটি ক্ষেত্রে জায়গা ও লোকের নাম পাল্টানো হয়েছে। রচনার মধ্যে গম্ভীরা, গণপত রাম, নির্ভয়-পাসোয়ান ও ভারত বিন্দের নাম পাওয়া যাবে। এঁরা বিহারের জমিদার ও পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে নিহত অসংখ্য ক্ষেতমজুর ও হরিজন নেতার মধ্যে কয়েকজন। রচনাটির কোনো অংশই কাল্পনিক নয়]

কাকতাড়ুয়ার ঘুম পাচ্ছিল।

আরও ঘুম পাচ্ছিল কারণ এতক্ষণ ধরে গুমোট থাকায় মাটির থেকে একটা ভাপা গরম উঠছিল। কিন্তু পরে, রাত দুটো নাগাদ মেঘের একটা চাপড়া খসে পড়তে চাঁদ দেখা গেল। অল্প অল্প করে একটু জঙ্গলের হাওয়া আসতে শুরু করায় কাকতাড়ুয়ার গায়ে পরা ফালি ফালি ছেঁড়া জামাটা দুলতে লাগল। সামনেই রাস্তা আর রাস্তার ওপারেই হরিজন বস্তি। দুটো কুকুর রাস্তায় শুয়েছিল কিন্তু পেছন দিকে শুয়োরের খোঁয়াড়ে যেখানে গতবছর নদীর জল ঢুকে শুয়োর মরে পচেছিল সেদিকে শেয়ালের খচ্ মচ্ শব্দ পেয়ে তারা সেদিকে ছুটে গেল। কুকুরগুলো চলে যাবার পর জিপটা এসে থামল।

জিপটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল চাঁদ ওঠার জন্যে। জিপে তিনজন ছিল। তার মধ্যে স্টিয়ারিঙে নেপালীই অল্প নেশা করা, গঙ্গোত্রী আর দৌলত না। জিপটা স্টার্ট দেওয়ার সময় দৌলত পেচ্ছাব করছিল ও দৌড়ে গিয়ে জিপটাতে উঠল। তারপর বন্দুকের কুঁদোটা জিপের তলায় ঠেকিয়ে ঘেমোহাতে নলটা ধরে বসল। কুঁদোর নিচে একসময় পালিশ ছিল কিন্তু যেখানে সেখানে রেখে রেখে জায়গাটা খরখরে আর ঘষা হয়ে গেছে। হেডলাইট না জ্বেলে চাঁদের আলোয় জিপটা এসে পারাকোচুলা ব্লক অফিস পার হয়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে ঘুমন্ত সরাই বাজারের মাঝখান দিয়ে জাতীয় সড়ক ধরল। একটুই। তারপর বাঁদিকে মোড় নিতেই মাটির রাস্তায় ধুলো ওড়া আর লাফানো শুরু হল। ওরা মুখে গামছা জড়িয়ে নিল। সহজে ভূগোলটা এইরকম। ঠাকুর ধর্মনাথ থাকে বিষাণপুরে। সেখান থেকে পারাকোচুলার একটা দিক ছুঁয়ে তারপর সরাই বাজার আসতে হয়— জাতীয় সড়ক— সেখান থেকে বেশ কিছুটা বাঁদিকে চললে বিষাণপুরে সরাইয়া গ্রাম, আর একটু গেলেই ওঝা বিগানা। জিপটা পুরনো কিন্তু মজবুত। কেবল পেছনে শেকলে বাঁধা ওঠানো দরজাটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়।

নির্ভয় পাসোয়ানের বাড়িটা রাস্তার ধারেই আর রাস্তার ওপারে কাকতাড়ুয়া দাঁড়িয়েছিল। নির্ভয় সকালে বেরিয়েছিল, রোজ বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে। ওর দুটো ছেলে আছে। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ওকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ও ছাড়া পায়। জেল থেকে বাড়ি ফিরে কয়েক ঘণ্টা বসেছিল দাওয়াতে, তারপর আবার বেরিয়ে যায়। বিষাণপুর ব্লকে। তারপর থেকে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে (৮ টাকা

দশ পয়সা) চারবার হরিজন ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করেছে এবং বিন্দ ক্ষেতমজুররা ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় অবস্থা খুব গুরুতর হয়ে ওঠে। নির্ভয় জেল থেকে আসার সময় রাস্তায় সরাই বাজার থেকে একটা খাকি সার্ট কিনেছিল। সেই সার্টটাই ওর গায়ে ছিল। নির্ভয় পাসোয়ান হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল আর ওর আধ-খোলা চোখের ওপরে প্রথমে অন্ধকার থাকলেও পরে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

কাকতাড়ুয়ার চিৎকারে ওদের ঘুম ভাঙেনি। নির্ভয়ের বৌ দুই ছেলে (১৪, ১২) ও বুড়ো বাবা ঘরে ও দাওয়াতে ঘুমোচ্ছিল। জিপটা এসে দাঁড়াতে খুব আস্তে আস্তে শব্দ হচ্ছিল, কারণ নেপালী ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। দৌলত আর গঙ্গোত্রী এগিয়ে গেল। সেকেণ্ড সাতেক তারা দাঁড়ায়। তারপর ওরা দুজনে পা টিপে টিপে এসে খাটিয়াটার পাশে দাঁড়াল। খাটিয়ার নিচে মাটিতে একটা কলাই-করা রেকাবি চাপা দেওয়া ঘটি। লোকটা ঘুমোচ্ছে। দৌলত বন্দুকটা নির্ভয়ের ঘুমন্ত হাঁ-করা মুখের মধ্যে তাক করে ট্রিগারটা টানতেই এত কাছে চাপা আওয়াজটা হয় যে ঠিক ফায়ারিঙের শব্দ বলে মনে হয় না। গুলিটা ওর মুখ দিয়ে ঢুকে ওপরের মাড়ি, আলটাকরা ফুটো করে মাথার পেছনে ওপরের দিকটা ফাটিয়ে বেরিয়ে একহাত তলায় মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের দিকে কিছুটা উঠে গিয়েছিল আর নির্ভয়ের লাশটা একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল, হাতদুটো উঠতে চেষ্টা করেছিল কারণ হাতদুটো তখনও বুঝতে পারেনি যে তারা আর কাজে লাগবে না। কুকুরগুলোর ডাক আচমকা থেমে গিয়েছিল আর অন্ধকারে. ঘরে, দাওয়াতে, বস্তির মধ্যে কয়েকটা চিৎকার শুরু হতেই দৌলত সেদিকে এলোপাথাড়ি কয়েকটা গুলি চালালো আর এর মধ্যেই গঙ্গোত্রী নির্ভয়ের চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে মাথাটা খাটিয়ার বাইরে নিয়ে এসে কাতানের দু কোপে কেটে হাতে ঝুলিয়ে নিল। গঙ্গোত্রীর গায়ে রক্ত ছিটকে লেগেছিল। ওর বাবার মাথাটা কেটে নেওয়ার ব্যাপারটা ঘুমচোখে নির্ভয়ের বড় ছেলে দেখেছিল। তারপর ওরা দুজনেই ছুটে এসে চলন্ত জিপে লাফ দিয়ে উঠেছিল। ওঠবার আগে মাথাটা ছুঁড়ে জিপের মধ্যে ফেলেছিল গঙ্গোত্রী। একটা দুটো ছুটে-আসা জ্বলে-ওঠা মশালের দিকে জিপের ঝাঁকুনির মধ্যে টাল সামলে গুলি ছুঁড়েছিল দৌলত আর জিপটার মুখ ঘোরাবার সময় ধক্ করে হেডলাইটটা জ্বালতে এক লহমা আলোটা কাকতাড়ুয়ার মুখের ওপরে পড়েছিল বলে বীভৎস সেই গোল মুখের দিকে ভয় পেয়েই একটা গুলি চালিয়ে দিয়েছিল দৌলত। গুলিটা কাকতাড়ুয়ার বাঁ চোখ ফুটো করে দেয়।

কাকতাড়ুয়া এক চোখে দেখল জিপটা ধুলো উড়িয়ে চলেছে। জিপটা কিছুদূর যেতে ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রাস্তায় ধুলোর ঝড় উঠেছে আর সেই ঝাপসার মধ্যে অনেকগুলো ধাওয়া-করা মশাল দূরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে কাকতাড়ুয়া শুনল কান্নার হাট বসেছে। ধুলোটা থিতিয়ে যেতে শুরু করেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে মশাল দৌড়চ্ছে। হরিজনরা অন্যদের খবর দিতে যাচ্ছে। নির্ভয়ের গলা দিয়ে তখন অনেক রক্ত পড়ে গেছে। প্রথমে দমকে দমকে আসছিল তারপর সরু হয়ে, শেষে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে আর খাটিয়ার কাঠ দড়ি বেয়ে কিছুটা রক্ত এসে খাকি সার্টের পিঠটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আগেকার রক্ত জমাট বেঁধে নতুন রক্তের রাস্তা আটকায়। এখানে ওখানে চাপ চাপ ঘিলু আর খুলির কুচি ছড়িয়ে।

ঘিলুর গন্ধ আর রক্তের গন্ধ আলাদা। জিপটা যখন চলছিল তখন গঙ্গোত্রী নেপালীর কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে নিয়ে নিচে ফেলল। জিপটা মজঃফরপুরের। ট্রাঙ্কের মতো কোনো

ভারি মাল রোজ নিয়ে যাওয়াতে মাঝখানে খোঁদল হয়ে গেছে। সেখানে আলো মেরে ওরা দেখল নির্ভয়ের মাথাটা খোঁদলের মধ্যে পড়ে আটকে ডাইনে বাঁয়ে একটু একটু নড়ছে আর চোখ দুটো আধখোলা। দাঁত দেখা যাচ্ছে। টর্চের আলোটা সরিয়ে আনতে দেখা গেল একটা মবিল-মোছা কাপড় পড়ে আছে। গঙ্গোত্রী সেটাকে নির্ভয়ে মাথার গলার দিকে পা দিয়ে একটু ঠেসে দিল। নির্ভয়ের গুলির আচমকা ধাক্কায় কেমন তেঁড়া-বেঁকা আর লম্বাটে হয়ে গিয়েছিল। পেছনদিকের অনেকটা তো ছিলই না। দমকা বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল আবার পাট হয়ে যাচ্ছিল। সেই রাস্তা দিয়েই আবার ফেরা। বিষাণপুরে ঢুকে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ডান দিকে যেদিকে গেলে ধর্মনাথ ঠাকুরের আড়াইতলা দেহাতী ঢঙের পাকাবাড়ি সেদিকে না যেয়ে বাড়ির পেছনদিকে যে সুরকি-ফেলা রাস্তাটা সোজা কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে সেই রাস্তাটা ধরে জিপটা ঠাকুরের বাড়ির পেছনে দাঁড়াল। ওরা তিনজনই গাড়িতে বসে রইল। ঠাকুর খুব মোটা আর গাঁটে গাঁটে বাত আছে বলে নিজে হাঁটতে পারে না। তিনজন লোক তাকে ধরে নিয়ে এল, সঙ্গে ঠাকুরের বড়ছেলে। সে স্লিপিং পায়জামা আর সার্ট পরা, পায়জামার পকেটে রিভলভার ছিল— এটা অবশ্য লাইসেন্সড্। আগেই বলা ছিল যে হরিজনের মাথা বিষাণপুরের মাটিতে নামানো চলবে না। ঠাকুরকে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখিয়ে জিপের পেছনদিকে নিয়ে এল ওরা। দৌলত আর গঙ্গোত্রী প্রথমে নিচে আলো মেরে দেখাল। তারপর চুল ধরে মাথাটা ঝুলিয়ে ভাল করে দেখাল গঙ্গোত্রী। আর পাক খেয়ে মাথাটা একটু ঘোরবার সময় ওরা গলার হাড় আর তার তলায় কণ্ঠনালীর ফুটো দেখতে পেল। মাথাটা আবার জিপের তলায় নামিয়ে রাখল গঙ্গোত্রী। এর পরের ব্যাপারটা লেন-দেনের শেষের দিকটা তাই রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রাখল ধর্মনাথের ছেলে। নেপালী সিটে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল। জিপের পাশে, বাঁদিকে, কাঁচা মাটির দেয়ালের পেছনে দুটো লোক শট গান হাতে বসেছিল। বাড়ির ছাদ থেকেও একটা রাইফেল ড্রাইভারের মাথায় ধরা আছে। দুটো পাঁচ সেল টর্চের আলো পড়ায় দৌলত আর গঙ্গোত্রীর চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও তাদের মুখে ভয়ের কোনো ছাপ ছিল না। ধর্মনাথকে দুজন বগলের তলায় ধরতে সে গলায় দড়ি পরানো থলিয়াটা আলগা করে ভেতরে হাত ঢোকালো, তারপর একটা একটা করে দশ টাকার নোটে হাজারের বাণ্ডিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের দিতে লাগল। বাণ্ডিলের ওপরের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ছাপ-মারা কাগজগুলো আগের থেকেই ছেঁড়া। চোখ পোড়ানো আলোর মধ্যে নোটের বাণ্ডিলগুলো বড় বড় পোকার মতো অন্ধকার থেকে উড়ে আসে আর ওরা খপ খপ করে ধরে নেয়। এক...দো...তিন...ছ'টা বাণ্ডিল এল। তারপর একটা দোমড়ানো হালকা একশো টাকার নোট এসে পড়ে। মিঠাই খা লেও। টর্চের আলোগুলো প্রায় একসঙ্গে নিভে যায়। জিপটা স্টার্ট দেয় নির্ভয়ের মাথা নিয়ে। এবার মজঃফরপুর। রাস্তায় খাক্‌পহেলির জঙ্গলে জিপটা দাঁড়িয়েছিল। মাথাটাকে ওরা ছুঁড়ে দিল ঝোপের মধ্যে। তখন ভোর রাত। এই মাথাটাই কিছুক্ষণ আগে বিষাণপুর সরাইয়াতে ঘুমোচ্ছিল। শেয়ালে ছাল-চামড়া সব খেয়ে নেবে। চুলগুলো খাবে না। এত ক্লান্ত ছিল যে লোকটা স্বপ্ন দেখছিল না। রাস্তায় ধুলো ওড়ে। ওরা আবার মুখে গামছা জড়িয়ে নেয়। খানার জলে জিপটাকে ঘষে ঘষে ধোয়া হয়। ধোয়া হয় মাথা কাটার কাতান। আবার স্টার্ট দেয় নেপালী। ধুলো ওড়ে। পেছনে গঙ্গোত্রী আর দৌলত ঢুলে ঢুলে ঘুমোয়। সিটের তলায় বন্দুক আর কাতান। নেপালী নিভে-যাওয়া বিড়ি দাঁতে কামড়ে গান গায়— ইয়ে পাবলিক হায়, সব জানতে হায়, ইয়ে পাবলিক হায়। জিপটা জোঙ্গা। ডিসপোজালে কিনে ডিজেল ইঞ্জিন বসানো।

কাকতাড়ুয়া দেখল ওরা পুলিশে গেল না। কারণটা খুবই সহজ। পুলিশ কেস লিখবে না। আর যদি বা লেখে তাহলেও ব্যাপারটা ওখানেই ধামাচাপা হয়ে পড়ে থাকবে। তিন বছর আগে যখন বস্তিতে আগুন দিয়ে চব্বিশটা ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, দুজনকে পুড়িয়ে মারা হয়, রেপ করা হয় তখন পুলিশ কোনো কেস লেখেনি। তিন মাসের একটা বাচ্চাও ওদের পায়ের তলায় থেঁতলে মরেছিল। ওরা বরং নির্ভয় পাসোয়ানের ধড়ের পাশে গ্যাঁদা বুড়ো নির্বিশেষে পিল পিল করে জমতে থাকল। ভারতবর্ষের অনুন্নত কৃষিজীবী এলাকায় মরদ মরে গেলে তাদের অশিক্ষিত বৌ ও অন্যান্য দেহাতী গেঁয়ো মেয়েরা অদ্ভুতভাবে কাঁদে। নির্ভয়ের জন্যও তাই হচ্ছিল। তারা বুক চাপড়াচ্ছিল, নিজেদের মাথার চুল ধরে টানছিল, মাটিতে দণ্ডি কাটার মত আছড়াচ্ছিল। আর নির্ভয়ের বাবা পাসোয়ান ছেলের ধড়ের দিকে তাকিয়ে উবু হয়ে বসে ছিল। দূরদূরান্তের গাঁ থেকে লোক আসছিল। লোক বাড়তে বাড়তে এলাকা উপচে পড়ল। দুটো ছেলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। তারা এসে খবর দিল যে এখন বেরোনো চলবে না কারণ আরও লোক আসছে। যারা নির্ভয়ের সঙ্গে যাবে না তারাও আসছিল শেষবারের মত যতটুকু পারা যায় সঙ্গে থাকার জন্য। খুব দূরের কিছু এল তীরধনুক নিয়ে রণপা পরে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে যা বোঝায় তাও কিছু এসেছিল। লোক যখন দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে তখন নির্ভয়ের বড় ছেলে কয়েকজনকে বলে ধরাধরি করে ওর বাবার ধড় থেকে বাকি সার্টটা খুলে নিল। ওরা যে কিছু করবে বলে যাচ্ছিল তা নয়। এগুলো রটানো হয়েছে। আসলে ওরা সরাইবাজারে যেতে চাইছিল। সেখান থেকে নদীর ঘাট। কিন্তু রামাশ্রিয়া আর ভরোসা বিন্দ যখন জোড়া-দেওয়া সাইকেলের ওপরে দাঁড়িয়ে বলল যে ধর্মনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ওদের নেতা নির্ভয়কে খুন করাতে পারে না তখনই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। খাটিয়ার ওপরে যে অবস্থায় নির্ভয় শুয়েছিল সেই অবস্থায় খাটিয়াটা তুলে দেওয়া হয়। দিনের বেলা হলেও অনেক মশাল আর কেরোসিন যে যতটা ছেঁচে আনতে পেরেছিল সব সঙ্গে নেওয়া হল। রাস্তায় দুধার থেকে লোক আসছিল। তারা জানত এই রাস্তা দিয়েই নির্ভয় পাসোয়ানকে নিয়ে যাওয়া হবে। সরাইবাজারের মোড়ের একটু আগে দশ হাজারের বেশি লোক থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রচণ্ড জোরে উল্টোদিক থেকে জিপ আসছিল। কিন্তু একটা অন্য রকমের জিপ। জিপটার ওপরে লাল ঝাণ্ডা উড়ছিল। জিপটা দাঁড়াল। ওরা যাচ্ছিল অন্য জায়গায়। কিন্তু দেখা গেল রামাশ্রিয়া আর ভরোসা বিন্দ ওদের চেনা। ওরা যাচ্ছিল সারসাঁওয়া কিন্তু জিপটা ওরা ঘুরিয়ে নিল আর জিপটার ওপরে খাটিয়াটা আড়াআড়িভাবে বসিয়ে নেওয়া হলো। গাড়িটা এরপর এমন করে চলতে লাগল যেন হাঁটছে। নির্ভয় পাসোয়ানকে ওরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়নি। লাল ঝাণ্ডার ছায়া পড়ছিল ধড়ের ওপর। সবাই দেখে নাও যে জমিদার ঠাকুর ধর্মনাথ হরিজন নেতা নির্ভয় পাসোয়ানকে খুন করিয়েছে। বাইরে থেকে খুনেরা এসেছিল। লাল ঝাণ্ডার জিপে যারা ছিল তারা ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকল। তাদের মধ্যে এই গরমে গলায় মাফলার জড়ানো আধ-পাগলা চেহারার যে বুড়ো ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর নাম ডাঃ কাথিয়ার। উনি মধ্যপ্রদেশের লোক কিন্তু গত বিশ বছর এদিকেই আছেন।

ফাঁকা গ্রামে মেয়েগুলো কাঁদছিল। কাকতাড়ুয়া ওদের দেখছিল আর তার ফুটো বাঁ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। গরীব মানুষকে মারা হলে গরীব কাকতাড়ুয়ারা তাই করে। দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? একটা অন্যায়ও সে আটকাতে পারে না। খবরটাও তো কোথাও যায় না। যে কলকাতায় সবাই সবকিছু জানে সেখানেই

যখন বিরাট কাগজের এক কোণে খুব ছোট্ট করে বিহারের গ্রামে খুন ও অগ্নি-সংযোগের কথাটা লেখা থাকে তখন কার সাধ্য বোঝে যে কি হয়েছে। প্রথমত কেউ পড়তে চায়ই না আর যদি বা পড়ে তাহলে খবর পাঠানো ও লেখার এমন মজা যে তার মনে হয় আচমকা বিহারের অখ্যাত কোন এক অসভ্য এলাকায় আচমকা বিরাট এক ক্রিমিনাল মতলব সম্পন্ন মব আগুন লাগিয়েছে ও একজন দোকানদারকে মেরেছে। এহেন বিকট একটি ঠগী বাহিনীকে বাগ মানানোর কোনো উপায় নেই দেখে পুলিস যদি কয়েক রাউণ্ড গুলিই চালায় এবং সেই গুলিতে কয়েকটা অজানা লুটেরা ও খুনে যদি মারাই পড়ে তাহলে কার কি এসে যায়? আমাদের বীর প্রেস চব্বিশ ঘণ্টা স্বাধীনতা আন্দোলন করছে কিন্তু ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসেই বিহারে জমিদারদের সশস্ত্র আক্রমণে নিহত ক্ষেতমজদুর ও হরিজন নেতা গণপত রাম, নির্ভয় পাসোয়ান, ভারত বিন্দ ও অন্যরা এদের পাতায় এক মিলিমিটার জায়গাও পায় না। অবশ্য এগ্রো-ইকনমিস্ট বা কৃষি-অর্থনীতিবিদরা সব খবরই রাখেন। সাধারণ পাবলিকের এসব জানবার কথা নয়। শুধু ক্ষেতমজুরদের নিয়েই যে কত দুর্দান্ত চিন্তাভাবনা চলছে তা শুনলে তাজ্জব হয়ে যেতে হবে। সে বিষয়ে পরে একটু সময় নেওয়া যাবে। আপাতত খুন ও অগ্নি সংযোগের ব্যাপারটা একটু দেখা যাক।

সরাইবাজারে এসে ওরা ঠাকুর ধর্মনাথের ডালের আড়ত, মুদির দোকান ও কাপড়ের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়। ডাল নিয়ে বিষাণপুর থেকে ঠাকুরের ট্রাক্টর এসেছিল। সেটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িও তারা জ্বালায়। ঠাকুরের বড় ছেলে গদীতে এসেছিল। সে রিভলভার ছুঁড়েছিল বলে তাকে ফুঁড়ে ফেলতে হয়। গাঁটরি করা কাপড়, থান সব জ্বালিয়ে দেয় তারা। কাকতাড়ুয়ার মতো ফালি ফালি কাপড় পরলেও এক বিঘত কাপড়ও তারা লুট করেনি। দুটো কালো ধোঁয়ার থাম ওপরে উঠছিল আর সেই সময়েই ঠাকুরের টাকা-খাওয়া এস আই মিশ্র সাইকেল নিয়ে পারাকোচুলা ব্লক অফিসে গিয়ে টেলিফোন করে যে সারাইবাজার ফাঁড়ির পাঁচটা বন্দুক দিয়ে দশ হাজারেরও বেশি আর্মড মব সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ওরা একটা কবন্ধ ঘাড়ে করে এসেছে এবং এর পরে কি করবে সেটা বলা যায় না। এখান থেকে ওরা বিষাণপুরের দিকেই যাবে বলে মনে হয় না। টেলিফোনেই শর্মা শুনতে পাচ্ছিল চিৎকার করে অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, ট্রাকের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বুট দৌড়চ্ছে। বিহারে ল্যাণ্ডলর্ডদের ব্যাপারই আলাদা। গম্ভীরাকে মেরে এরা ট্রাক্টরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যদি ওরা এত লাঠি, টাঙি, বর্শা, তীর-ধনুক সব নিয়ে বিষাণপুরে যায় তাহলে? ওরা তো বলছে নির্ভয় পাসোয়ানকে মার্ডার করা হয়েছে। ধড়ও এনেছে একটা। নির্ভয়ের কপালে একটা কাটা দাগ ছিল। তার ছবিও আছে কিন্তু ধড়টা কার? এইখানেই সরকারি ষ্ট্র্যাটেজি জমে ওঠে। ৭৮-এর এপ্রিলে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে সে যে স্রেফ পায়ে হেঁটে আর মুখে কথা বলে চারটে বিরাট স্ট্রাইক বানিয়েছে সেটা সকলেই জানে কিন্তু তারপর আর কিছু খাতায় উঠবে না কারণ ধড় অথরিটি রেকগনাইজ করে না। সো ফার অ্যাজ সরকার ইজ কনসার্ণড নির্ভয় পাসোয়ান ইজ নট ডেড। মাথা নেই এরকম বডি যে কেউ আনতে পারে। হামেশাই আনে। এখানে মজার ব্যাপারটা এই যে হরিজনদের কাছে বা নেহাতই বোবা কাকতাড়ুয়ারও একই বক্তব্য। নির্ভয় পাসোয়ান মরেনি। খাক-পহেলির শেয়ালে ততক্ষণে নির্ভয়ের গাল, ঠোঁট সব খেয়ে ফেলেছে, মাথাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল।

কোনো কোনো জায়গায় যাকে রাক্ষস বলা হয় সেই কাকতাড়ুয়া একটা ব্যাপার ভাল করেই জানে। কোনো হরিজন বিষাণপুরে যায় না। গেলে একলা একলা মাথা

নিচু করে যায়। সে যেখানে বসে গালিগালাজ শোনে সেখানে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। তাই দশ হাজারেরও বেশি হরিজন আর এজাত-বেজাত যখন ধড় নিয়ে এগোচ্ছিল তখন বিষাণপুরকে বাঁচানোর জন্য তাদের গতিরোধ করা হয়। দুটো ট্রাক রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং রাস্তায়, গাড়ির ওপরে, গাছের পেছনে ছিল স্পেশাল আর্মড পুলিশ। এরা সেমি-অটোমেটিক চালায় এবং প্রকৃত অর্থেই প্যারামিলিটারি। তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার পোর্টেবল মাইক নিয়ে চেঁচায়— হট যাও...চলা যাও...হট যাও... নেহিতো গোলি মার দুঙ্গা...ওরা এগিয়ে আসে। পুলিশের তরফে লাল ন্যাকড়া (লাল ঝাণ্ডা নয়) ওড়ানো হয়। তারপর হালকা আওয়াজ শুরু হয় ও বুলেটে জিপটা ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং খুবই সম্মানের ব্যাপার যে জিপের ধাতব বডিতে রিকোচেট করে একটা বুলেট নির্ভয়ের কবন্ধের পায়েও লাগে। দৈবই বলতে হবে কারণ অনেক গুলি চললেও চাষা মরেছিল মাত্র তিনটে। লোক চারদিকে সরে যেতে ওরা জিপটাকেই টার্গেট করেছিল। এইটাই লোক কম মরার কারণ। নির্ভয় পাসোয়ানের ধড় ও অন্যান্য তিনটে দেহাতী মড়া তিনদিন বাদে ছাড়া পায়। টাউন মর্গে বরফ ছিল না। গন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিষাণপুরে আর্মড পুলিশের ছাউনি পড়েছে।

কাকতাড়ুয়ার চোখের ফুটো দিয়ে আকাশের দিনরাত দেখা যায়। সেই আকাশ এখন থমথমে হয়ে আছে। ত্রাস ও সন্ত্রাস! ক্ষেতমজুরদের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। সারসাঁওয়া, আলাওলি, চৌথাম পার হয়ে সেই গুহারপুর— নির্ভয় পাসোয়ানের চিতার থেকে কাঠ, হাড়, মাংস পোড়া গনগনে কয়লা ছিটকে ছিটকে পড়ছে দূরে দূরে আর দপ করে আগুন জ্বলে উঠছে রাতদিন টহলদারির তোয়াক্কা না করেই। নির্ভয়ের বৌ তিনদিন চেঁচামেচি করার পর খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। ওর বাবা দাওয়াতে বসে থাকে আর বার বার দম ফুরিয়ে যায় বলে হাঁ করে। নির্ভয়ের বড় ছেলে সকাল থেকে বেরিয়ে যায়। দিনে দুবার ও রাতে একবার পুলিশ আসে। ওরা এখন রণনীতিগত কারণে নির্ভয়ের বাড়িটা টাচ করছে না। কিন্তু ৩৬ জন হরিজন ও বিন্দ গ্রেপ্তার হয়েছে। অনেকেই ফেরার। সরাইবাজারে কিন্তু একটা ইস্কুল শুরু হয়েছে যার নাম নির্ভয় পাসোয়ান বিদ্যামন্দির— নতুন দুজন মাস্টার এসেছে এই ডামাডোলের মধ্যেই। তারা নোংরা ধুলোমাখা পায়জামা, পানজাবি আর পায় কাবলি জুতো পরা। স্কুলের বেঞ্চির ওপরেই ঘুমোয়। এস, আই শর্মা খুব পালোয়ানি দেখাতে চেষ্টা করলেও এরা গম্ভীর মুখে পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলে শুনে ভয় পায়। দিনের বেলায় ছোটরা আর রাত্তিরে বড়রা আসে। মাস্টাররাও ওদের কাছে যায়।

সমস্ত এলাকা জুড়ে শ্রেণীগত ও বর্ণগত ঐক্য নানাভাবে মিলেমিশে যখন দুটো বিরোধী মেরু তৈরির প্রক্রিয়াটি প্রথমে ছোট ও পরে বড় বড় ডানা মেলে উড়তে থাকা লাল ঝাণ্ডা ও পাল্টা আক্রমণ ধরপাকড় ও কুচকাওয়াজের মধ্যে টক্করে ছড়িয়ে পড়ছে তখন এই সেদিন দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত জনৈক কৃষি-অর্থনীতিবিদ এখানে এসেছিলেন। তিনি মার্কসবাদী চিন্তা ও মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতির যুগপৎ প্রয়োগে বিশ্বাসী। ক্যাসেট টেপরেকর্ডারে তিনি আধ-পাগলা ডাঃ কাথিয়ার, রামাশ্রিয়া, ভরোসা বিন্দ ও দুজন ইস্কুল-মাস্টারের ইণ্টারভিউ নিয়েছেন। সবকিছু অবজার্ভ করেছেন। একটি প্রখ্যাত সাপ্তাহিকে নির্ভয়ের বাবার ও কাকতাড়ুয়ার ছবি ছাপা হয়েছে যদিও তারা ব্যাপারটা জানে না। নানা ধরনের ভেরিয়েবল, এনভায়রনমেণ্টাল স্পেসিফিক্স, দেশী ও বিদেশী প্যারাডাইম— ইত্যাদির সাহায্যে তিনি শেষ অবধি তাঁর প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই লড়াইয়ের

চরিত্র খুবই নৈরাশ্যজনক কারণ নির্ভয় পাসোয়ানকে নিয়ে যে মিথ্ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে তা বড়জোর আর একটি অখ্যাত পুরাণের জন্ম দিতে পারে, বিপ্লবের নয়। বুড়ো একটা রিভিশনিস্ট ভাম এদের মাথা খাচ্ছে এবং এভাবে চললে ভারতের বিপ্লব মায়ের ভোগে চলে যাবে। আসলে ডাঃ কাথিয়ার গান্ধীজীর নাম বলেছিলেন এবং সেটা শুনে কৃষি-অর্থনীতিবিদ প্রচণ্ড রেগে যান। স্টুপিড ওল্ড ফুল— হরিজনরা হাঁ করে টেপ রেকর্ডারটা দেখছিল। নির্ভয়ের নামে যে ইস্কুল খোলা হয়েছে সেটা বিপ্লবের চাকায় ব্রেক বসাবারই একটা কৌশল। সেই দুজন মাস্টার ওঁকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি ফলে উনি ওদের নাম দিয়েছেন প্যারাসাইট। তাঁর 'প্লটার অফ এগ্রিকালচারাল লেবারারস ইন বিহার— রিয়ালিটি অ্যাণ্ড মিথ' বিদগ্ধ মহলে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইস্কুল থেকে ছোট ছোট অনেকগুলো গলা শোনা যায়। মাস্টারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা বলছে—

মাস্ত হো গয়ী পুঁজিশাহী
আব্ অ্যা গয়ী তেরি আবাহি!
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ...

...আরও একজন মাস্টার আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। আর পরিচয়ের ফলে হরিজন বস্তির দেওয়ালে—

যো জমিনকা জোতে বোয়ে
উয়ো জমিনকা মালিক হোয়ে...

...মিনিমাম ওয়েজ... ডাঃ কাথিয়ার মাফলার দিয়ে মুখটা মুছে নেন... নির্ভয়ের ছেলেরা তাঁকে, সবাই তাঁকে ডাক্তারবাবা বলে ডাকে... ঝাঁঝরা জিপটা গরুর গাড়িতে বেঁধে সারাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মজফরপুর... এসে যাবে...

...হামসে জোর টকরায়গা
উয়ো চুর চুর হো যায়গা...

কাকতাড়ুয়ার গায়ে নির্ভয় পাসোয়ানের ছেলে তার বাবার খাকি সার্টটা পরিয়ে দিয়েছে। জামাটা হাওয়ায় অল্প অল্প দোলে। পিঠে রক্তের দাগটা রয়েছে। মাস দুতিনের মধ্যে ভোট হবে। রোজ পুলিশের ট্রাক আর জীপ আসে বলে হরিজন বস্তির বাচ্চা আর কুকুরগুলো রাস্তায় ওঠে না। ভোটে বুথ দখল, বন্দুকবাজি, ব্যালট পেপারের তাড়া ধরে ছাপ মারা— খুব গণ্ডগোল হবে। রাত দুটোর পর কুকুরগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদে। কখনও কখনও মেয়ে ও বুড়োর গলার কান্নাও শোনা যায়। ঠাকুর ধর্মনাথ ভোটে দাঁড়াবে বলে জানা গেছে। পুলিশের ট্রাক ও জিপ যখন বিষাণপুর সরাইয়া থেকে মোড় ঘোরে তখন হেডলাইটের ঝলসানো আলোয় দেখা যায় খাকি সার্টপরা একচোখো কাকতাড়ুয়া দাঁত বার করে হি হি করে হাসছে। তার জামাটা বাতাসে দুলছে। কাকতাড়ুয়ার ভোট নেই।